শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত।

পঞ্চম খণ্ড।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক
গ্রন্থিত।

কলিকাতা—১।১।২০ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট
পত্রিকা-প্রেসে,
শ্রীতড়িৎকান্তি বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩৬৬

৫ম খণ্ডের সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

প্রভু শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে, অগ্রদ্বীপে গোবিন্দ ঘোষ, অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ স্থাপন, গোবিন্দের হত্যা দেওয়া, গোবিন্দ ও গোপীনাথের কথাবার্ত্তা, গোপীনাথের পিতৃভক্তি ও অশৌচ গ্রহণ, প্রভু গৌড়নগরে, দবির খাস ও সাকর মল্লিক, সনাতন ও রূপ, প্রভু শান্তিপুরে, শ্রীশাকের গুণকীর্ত্তন, প্রভু কালনায়, দীন কৃষ্ণদাসের পদ, রঘুনাথ দাস, প্রভু কুমারহটে, শ্রীখণ্ড ভগবান আচার্য্যের স্ত্রীর প্রতি প্রভুর আশীর্ব্বাদ, প্রভু নীলাচলে। ১—২৯

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বনপথে বৃন্দাবনে, তপন মিশ্র, প্রভু বারাণসীতে, প্রভু প্রয়াগে, প্রভু বৃন্দাবনে, প্রভু গোবর্দ্ধনে, কৃষ্ণদাস গুঞ্জমালী, ব্রজের নিগূঢ়রস, শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগের উদ্যোগ, প্রভু ও পাঠান, প্রভু ও সনাতন, রূপ প্রয়াগে, বল্লভ ভট্ট, রূপকে শিক্ষা প্রদান, সনাতনের কারামোচন, সনাতন প্রভুর দ্বারে, সনাতনের দৈন্য, সন্ন্যাসি সভার আয়োজন, প্রভু ও সরস্বতী, কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য, শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য মনঃকল্পিত, কাশীতে হরিনাম, প্রকাশানন্দের পূর্ব্বরাগ, কাশীতে ভক্তি রোপণ, সরস্বতীর নয়নে বারি, প্রভুর চরণে সরস্বতী, বৈষ্ণবধর্ম্ম সকলের উপরে, পাপ ও ভক্তি, মায়াবাদিগণের ধিক্কার, প্রবোধানন্দ বৃন্দাবনে, গোপের পরামর্শ লাভ, প্রভুর শেষ অষ্টাদশ বর্ষ। ৩০—১১৯

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীরূপের শ্লোক, অনুতাপের কি ফল, সনাতনের প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প, সনাতন ও প্রভু, জগদানন্দের সনাতনকে পরামর্শ প্রদান, সনাতনের আক্ষেপোক্তি, হরিদাসের ভঙ্গী, জীব-শিক্ষা, অর্জ্জুন মিশ্র, রামরায়ের মহিমা, সর্ব্বোত্তম ভজন কি, কৃষ্ণকথা কি, শ্রীকৃষ্ণের সমুদায় মধুর, ছোট হরিদাস বর্জ্জন ভোগ, শ্রীভগবানের নরলীলা। ১২০—১৬২

চতুর্থ অধ্যায়।

রঘুনাথ দাসের বৈরাগ্য, ভগবান আচার্য্যের ভ্রান্তি। ১৬৩—১৭০

পঞ্চম অধ্যায়।

বল্লভভটের দৈন্য, হরিদাসের পীড়া, হরিদাসের সমাধি, মহোৎসব, শ্রীশ ও হরিদাস, গোপীনাথ চাঙ্গে, কাশীমিশ্র ও রাজা, ভক্ত ও ভগবান। ১৭১—১৯৬

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[illegible] জগদানন্দের গৌরপ্রেম ১৯৭—২০৩

সপ্তম অধ্যায়

[illegible]পন মিশ্র, রঘুনাথ ভট্ট, গোস্বামিগণের মহত্ত্ব, সনাতন ও আকবর, রঘুনাথ ভট্টের দুইটী কীর্ত্তি, প্রাচীন পদ। ২০৪—২২৩

অষ্টম অধ্যায়।

রাঘবের ঝালী, শিবানন্দ ও শ্রীকুক্কুর, নিতাইয়ের হাস্যময় ক্রোধ, প্রভু শিবানন্দের বাসায়, কর্ণপুরের শপথ, নকুল ব্রহ্মচারী, নৃসিংহ ব্রহ্মচারী, রামচন্দ্রপুরী, পুরীর চরিত্র, শ্রীভগবানের সহিষ্ণুতা। ২২৩—২৫১

নবম অধ্যায়।

জগদানন্দ নদীয়ায়, শচী ও জগদানন্দ, বৈষ্ণবধর্ম্মে খুটিনাটি ন[illegible] শ্রীঅদ্বৈতের তরজা, শ্রীগৌরাঙ্গ কি ভগবান? শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্তার প্রমাণ, প্রভুর রাধাভাব, প্রভুর বিহ্বলতা, প্রভুর বিরহবেদনা, দিব্যোন্মাদ, ক্রন্দন ও হাস্য, ভক্তিযোগের প্রাধান্য, প্রভুর প্রলাপ, বিল্বমঙ্গলের [illegible] প্রলাপ ও দিব্যোন্মাদ, চটক পর্ব্বত, কুলত্যাগের অর্থ কি [illegible] সলীলা, প্রসাদ আস্বাদ। ২৫১—৩০৪

শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।
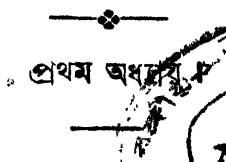
বিজয়া দশমী দিবসে প্রভু প্রায় শতাবধি নীলাচলবাসী ভক্তের সহিত শ্রীগৌড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। উদ্দেশ্য জননী ও গঙ্গা দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করিবেন। জননীকে দর্শন দিবেন ইহা তিনি প্রতিশ্রুত ছিলেন। বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদিগের নিয়ম যে, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া একবার জন্মের মত জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়। যে গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর সহিত নীলাচলে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে গদাধর ভিন্ন সকলেই তাহার সহিত চলিয়াছেন। যে দিন প্রভু বাঙ্গালা দেশে শ্রীপাদপদ্ম অর্পণ করিলেন, সেই দিবস হইতে একদিনের জন্যও তিনি একটু আরাম করিতে পান নাই। যেখানে উপস্থিত হয়েন সেইখানেই লোকারণ্য। যখন চলিয়াছেন তখনও সঙ্গে সঙ্গে লোক চলিয়াছে। কেবল শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া বাচস্পতির বাড়ীতে দুই এক দিন গোপনে থাকিতে পারিয়াছিলেন। তাহার পর, প্রভু আসিয়াছেন এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, আর অমনি লোকারণ্যের সৃষ্টি হইল।

প্রভু শ্রীজননীর নিকটে বিদায় লইয়া শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিতে চলিলেন। সেই সঙ্গে সকলেই চলিলেন। সকলেই যে প্রকৃত বৃন্দাবন

যাইবেন বলিয়া চলিলেন তাহা নহে, প্রভু চলিয়াছেন কাজেই তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। প্রভু চলিতেছেন তাঁহারা, থাকিবেন কেন? শ্রীবৃন্দাবন গমন করিতেছেন সেই আনন্দে প্রভু বিহ্বল। সুতরাং তাঁহার সঙ্গে যে অসংখ্য লোক চলিয়াছে তাহাতে তাঁহার লক্ষ্য নাই। যেমন নদী, যত সমুদ্রাভিমুখে গমন করে ততই পরিসর হয়, সেইরূপ প্রভু শ্রীবৃন্দাবনাভি-মুখে যতই গমন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার সঙ্গে কত লোক যে চলিল তাহা ঠিক করা যায় না। সহস্র হইলে পারে, দশ সহস্র হইলে পারে, লক্ষ হইলেও পারে। গৌড়ীয় পাদশা তাঁহার প্রাসাদ হইতে দূরে প্রভুভক্তগণের কলরব শুনিয়া বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া ভীত হয়েন। প্রভুর সঙ্গে কত লোক, তাহা এই ঘটনা দ্বারা কতক অনুমান করা যাইতে পারে।

সঙ্গে এত লোক, ইহাদিগের আহার কে দিতেছে? অবশ্য ইহাদিগের পথের সম্বল কিছু নাই। কিন্তু তাহাতে কাহাকেও উপবাস করিতে হইতেছে না। প্রভু তাঁহার বহু সহস্র পার্ষদ সঙ্গে করিয়া গমন করিতে-ছেন, এ সংবাদ তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিতেছে। যে গ্রামে প্রভু মধ্যাহ্ন করিবেন, সেই গ্রামস্থ লোকে জানিতে পারিয়াই আতিথ্য সমাধার নিমিত্ত যত্নশীল হইতেছে। একজন কি দুইজনে এ ভার সমাধা করিতে পারেন না। গ্রাম সমেত লোকে একত্রিত হইয়া আতিথ্য ভার লইতেছেন। প্রভু গঙ্গার ধার দিয়া গমন করিতেছেন।

প্রভুর সঙ্গে অন্যান্য ভক্তের সহিত, গোবিন্দ ঘোষও গমন করিতে-ছিলেন। পথে এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ ভিক্ষা (ভোজন) করিয়া, মুখ-শুদ্ধির নিমিত্ত হাত বাড়াইলেন। গোবিন্দঘোষ নিকটে ছিলেন, তিনি গ্রামের ভিতর ছুটিলেন, আর একটি হরীতকী আনিয়া প্রভুকে তাহার এক খণ্ড দিলেন।

পর দিবস প্রভু অগ্রদ্বীপে ভিক্ষা করিলেন। আহার অন্তে, আবার হাত পাতিলেন। তখন গোবিন্দ ঘোষ, তাঁহার বহির্ব্বাসে যে হরীতকী খণ্ড বান্ধা ছিল, তাহা খুলিয়া প্রভুর হস্তে দিলেন। প্রভু যেন তখনি নিদ্রোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া গোবিন্দের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কল্য তুমি যখন আমাকে মুখশুদ্ধি দাও তখন অনেক বিলম্ব হইয়াছিল, অদ্য চাহিবা মাত্র কিরূপে দিলে?' গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন, 'প্রভু, কল্য যে হরীতকী পাইয়াছিলাম তাহার কিছু রাখিয়াছিলাম; অদ্য তাহাই দিলাম।"

প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ! তোমার এখনো সঞ্চয় বাসনা সম্পূর্ণরূপ যায় নাই, অতএব তুমি আমার সহিত গমন করিতে পারিবে না।" ইহা শুনিয়াই গোবিন্দের মুখ শুকাইয়া গেল।

প্রভু বলিতেছেন, "গোবিন্দ, তুমি দুঃখিত হইও না। তুমি এখানে থাক। তোমার দ্বারা আমি বিস্তর কার্য্য সাধন করিব। আমার ইচ্ছায় তোমার সঞ্চয় বাসনা হইয়াছিল। বস্তুতঃ তোমার হৃদয়ে সে বাসনা নাই। তুমি এখানে থাক; তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অচিরাৎ আমি নির্দ্দেশ করিয়া দিব।"

গোবিন্দ হাহাকার করিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

প্রভু তাঁহার অঙ্গে শ্রীহস্ত দিয়া বলিলেন, "তুমি শান্ত হও, আমি আবার তোমার নিকটে আসিব, আর সেই বার তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না। তোমার দ্বারা আমি বহু কার্য্য সাধন করিব, এই জন্য তোমার বিরহজনিত দুঃখ আমি স্ব-ইচ্ছায় স্কন্ধে লইলাম। তুমি এখানে থাকো। আমি সত্বর তোমাকে সন্দেশ পাঠাইয়া দিব।"

গোবিন্দ ঘোষ কাজেই অগ্রদ্বীপে রহিয়া গেলেন। প্রভু আবার আসিবেন; আসিয়া আর তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন না, এই আশার উপর নির্ভর করিয়া তিনি মনকে সান্ত্বনা করিলেন ও গঙ্গাতীরে একখানি কুটীর

করিয়া সেখানে দিবানিশি ভজন করিতে লাগিলেন। এখানে শ্রীগোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের কাহিনী সমাপ্ত করিয়া রাখি।

এক দিবস গোবিন্দ গঙ্গাতীরে শ্রীচরণ ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় গঙ্গার স্রোতে একখানি কি ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিল। তখন তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল, বোধ হইল যেন একখানি পোড়া কাঠ। শ্মশানের কাঠ ভাবিয়া উহা উঠাইয়া তীরে ফেলিয়া দিয়া, আবার ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

একটু পরে দেখিলেন যেন, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইয়া বলিতেছেন, "গোবিন্দ! আমি আসিতেছি। তুমি যেখানি পোড়া কাঠ ভাবিতেছ, উহা যত্ন করিয়া কুটীরে রাখিয়া দাও।" গোবিন্দের ধ্যান ভঙ্গ হইলে ভাবিতে লাগিলেন যে, এ আবার কি ব্যাপার? অনেক ভাবিয়াও কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, সুতরাং কাঠখানি লইয়া কুটীরে রাখিয়া দিলেন।

পর দিবস প্রাতে দেখেন যে, সে পোড়া কাঠ নয়, একখানি কাল পাথর! ইহাতে নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বপ্নকে সত্য মানিয়া লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এক দিবস শ্রীগৌরাঙ্গ দলবল লইয়া সত্যই গোবিন্দের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত।

বহুতর লোক সঙ্গে, সুতরাং প্রভু ও ভক্তগণের সেবার নিমিত্ত, গোবিন্দ অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। এত লোকের আহারীয় কিরূপে সংগ্রহ করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন শুনিয়া গ্রাম হইতে সকলে, যাহার যাহা ছিল, আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রভুর ভিক্ষা হইল, ভক্তগণ প্রসাদ পাইলেন, তৎপরে গোবিন্দও প্রসাদ পাইলেন।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন, "গোবিন্দ, প্রস্তরখানি পাইয়াছ?" গোবিন্দ করযোড়ে বলিলেন, "আজ্ঞা হা।" প্রভু বলিতেছেন, "কল্য ঐ

প্রস্তর দিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিব।" কিন্তু প্রভুর এ কথা অপরে কেহ কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

পর দিবস একজন ভাস্কর আপনি আসিয়া উপস্থিত। প্রভু তাহাকে শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে বলিলেন। সে অতি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া দিল। তখন প্রভু গোবিন্দের সেই কুটীরে সেই শ্রীমূর্ত্তি নিজ হস্তে স্থাপন করিলেন। শ্রীবিগ্রহের নাম রাখিলেন "গোপীনাথ," আর এইরূপে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ প্রকাশ পাইলেন।

ঠাকুর স্থাপিত হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, "গোবিন্দ, এই ঠাকুর তোমাকে দিলাম। ইহাকে সেবা কর, আর আমার বিরহজনিত দুঃখ পাইবে না। আমি বলিয়াছিলাম এবার আসিয়া আর তোমাকে ত্যাগ করিব না। এই আমি তোমার কাছে রহিলাম।"

গোবিন্দের মন শ্রীগৌরাঙ্গে, গোপীনাথে নহে। তিনি প্রভুর এই আজ্ঞা শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন প্রভু আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ! তুমি এখানে থাকো, এই ঠাকুর সেবা কর, ও বিবাহ কর। তোমার দ্বারা শ্রীভগবানের করুণার সীমা দেখান হইবে। শ্রীভগবান তোমার দ্বারা জীবকে দেখাইবেন যে, তিনি কিরূপ ভক্তবৎসল। এরূপ সৌভাগ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিও না।" ইহাই বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ দলবল লইয়া চলিয়া গেলেন, আর গোবিন্দ ও গোপীনাথ অগ্রদ্বীপে রহিয়া গেলেন।

প্রভুর আজ্ঞাক্রমে গোবিন্দ বিবাহ করিলেন। স্ত্রী পুরুষে গোপীনাথের সেবা করেন, আর গোপীনাথের প্রসাদ পাইয়া জীবন ধারণ করেন।

কিছুকাল পরে গোবিন্দের একটী পুত্র হইল। কিন্তু পুত্রটী রাখিয়া গোবিন্দের স্ত্রী পরলোক গমন করিলেন।

গোবিন্দের ঘাড়ে এখন দুইটী সেবার বস্তু পড়িল,—গোপীনাথ ও

তাঁহার শিশু পুত্র। গোবিন্দ ইহাতে কিরূপ বিব্রত হইলেন, তাহা অনুভব করা যাইতে পারে। কষ্টে সৃষ্টে দুই জনকেই সেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে পুত্রের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর হইল। গোবিন্দ গোপীনাথকে পাঁচ বৎসরের শিশু ভাবিয়া বাৎসল্য ভাবে সেবা করেন।

তাঁহার মন এখন দুইজনেই আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে মাঝে মাঝে গোলমাল বাঁধিতে লাগিল। কখন তাঁহার পুত্রকে দেখিয়া ভাবেন, এই "গোপীনাথ." আবার কখনও গোপীনাথকে দেখিয়া ভাবেন, এই তাঁহার পুত্র। কখন গোপীনাথের দ্রব্য পুত্রকে দেন, কখন পুত্রের দ্রব্য গোপীনাথকে দেন। কখন গোপীনাথকে দুঃখ দিয়া পুত্রের সেবা করেন, কখন পুত্রকে দুঃখ দিয়া গোপীনাথের সেবা করেন।

এই অবস্থায় আছেন, এমন সময় রসিকশেখর শ্রীভগবান গোবিন্দের পুত্রটী লইলেন!

তখন গোবিন্দ মর্ম্মাহত হইয়া গোপীনাথকে ভুলিয়া গেলেন। অনেক ক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, প্রাণত্যাগ করিবেন। কিন্তু এমন প্রাণত্যাগ নয়, গোপীনাথের ঘরে হত্যা দিয়া উপবাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন।

প্রকৃত মনের ভাব এই যে, তাঁহার গোপীনাথের উপর রাগ হইয়াছে। গোবিন্দ ভাবিতেছেন, কি অন্যায়! আমি দিবানিশি ঠাকুরের সেবা করি, আর ঠাকুর এমনি অকৃতজ্ঞ যে সচ্ছন্দে আমার পুত্রটী লইয়া গেলেন!

গোবিন্দ মনোদুঃখে ঠাকুরের আগে পড়িয়া রহিলেন, পার্শ্ব পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিলেন না। কাজেই গোপীনাথের কোন সেবা হইল না, তাঁহাকে সমস্ত দিবস উপবাসে থাকিতে হইল। গোবিন্দ ভাবিতেছেন, "যেমন আমার বুকে শেল হানিলেন তেমনি খুব হইয়াছে। এখন ঠাকুর

উপবাস করিতেছেন, দেখি এখন উহাঁকে কে খাইতে দেয়। আমিও উহাঁকে অপরাধ দিয়া উহাঁর সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব।"

কিন্তু গোপীনাথ, গোবিন্দের এই চরিত্রে রাগ করিলেন না। কারণ গোবিন্দ জীব ও গোপীনাথ ভগবান। যেমন সন্তানে মাকে দুঃখ দিয়া থাকে, সেইরূপ জীব মাত্রেই শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গে প্রহার করিয়া থাকে। মাতা ইহাতে কখন কখন ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু ভগবানের ইহাতে ক্রোধ হয় না, তিনি জীবগণের সমুদায় অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকেন।

যখন নিশি হইল তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, "গোবিন্দ বাপ! ক্ষুধায় মরি, তোমার দয়া নাই। সারাদিন গেল, তুমি জল বিন্দু আমাকে দিলে না?" গোপীনাথ এইরূপে গোবিন্দের সহিত কথা বলিলেন। গোপীনাথে ও গোবিন্দে মাঝে মাঝে এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিত। যখন গোপীনাথের কথা শুনিতেন, তখন বিশ্বাস করিতেন যে গোপীনাথ কথা কহিলেন। কিন্তু একটু পরে ভাবিতেন যে তাহার ভ্রম হইয়া থাকিবে।

গোপীনাথের কথায় গোবিন্দ একটু লজ্জা পাইয়া বলিতেছেন, "আমার কি আর ক্ষমতা আছে যে তোমার সেবা করিব? আমি চারি দিকে অন্ধকার দেখিতেছি, আমা দ্বারা তোমার সেবা হইবে না।" গোবিন্দ শোকে এরূপ অভিভূত যে, গোপীনাথ যে তাঁহার সহিত কাতর ভাবে কথা বলিলেন, ইহাতেও তিনি কোমল হইলেন না।

গোপীনাথ ইহাতে ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, "লোকের যদি একটা ছেলে দৈবে মরে, তবে কি তাহার আর একটা ছেলেকে আহার না দিয়া সেই সঙ্গে বধ করে? তোমার এক পুত্র দৈবে মরিয়াছে তাহার নিমিত্ত ক্ষোভ কর তাহাতে দুঃখ নাই, আমাকে অনাহারে কেন বধ কর বাপ?"

তখন গোবিন্দ বলিতেছেন, "ঠাকুর, আমার পুত্রটী কাড়িয়া লইলে তোমার একটু দয়া হইল না? তুমি যে আমাকে বাপ বাপ করিতেছ, সে সমুদয় তোমার বাহ্য।"

তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, "গোবিন্দ! এরূপ বিপদ যে কেবল তোমার একা হইল, তাহা নহে; লোকের চিরকালই এরূপ হইয়া থাকে; দুঃখ সম্বরণ কর। তোমার পুত্রের ভালই হইয়াছে।"

গোবিন্দ কিছু ফাঁফরে পড়িলেন, কি উত্তর করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। শেষে সমস্ত লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া বলিতেছেন, "ঠাকুর, সব বুঝিলাম। আমার পুত্রের উত্তম গতি হইয়াছে তাহা ঠিক। কিন্তু আমাকে তুমি পুত্রশোক দিলে কেন? মাতৃহীন বালকটীকে হঠাৎ আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইয়া গেলে, তোমার একটু দয়া হইল না?"

তখন গোপীনাথ বলিতেছেন, "গোবিন্দ, তোমাকে একটি অতি গোপনীয় কথা বলি। যাঁহার দুই পুত্র, সে পিতার পুত্র আমি হইতে পারি না। তুমি ছিলে পিতা, আমি ছিলাম এক পুত্র, সে বেশ ছিল। কিন্তু যখন তোমার আর একটী পুত্র হইল, তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি যদি যাইতাম তবে তুমি হয়ত তোমার দুই পুত্রই হারাইতে—আমাকেও পাইতে না, আর তোমার পুত্রকেও পাইতে না। তোমার সে পুত্র যাওয়াতে এখন তুমি আমাকেও পাইবে, তাহাকেও পাইবে। গোবিন্দ! দুঃখ সম্বরণ কর, যেমন তোমার এক পুত্র গিয়াছে, তেমনি আমি তোমার পুত্র রহিয়াছি।"

গোবিন্দ একেবারে নিরুত্তর, আর কথা কাটাকাটি করিতে পারিলেন না। তখন হঠাৎ একটি উত্তর মনে আসিল। গোবিন্দ বলিতেছেন, "তুমি ত আমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র, সকল প্রকার ভাল, তাহা বেশ জানি; কিন্তু তুমি কি পুত্রের সব কার্য্য করিবে? তুমি কি আমার শ্রাদ্ধ করিবে?"

অমনি গোপীনাথ মধুর স্বরে বলিতেছেন, 'তথাস্তু!" গোবিন্দ, তুমি আমার পিতা। যদিও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য রাজসিক, তবু তুমি পিতা যখন আপন মুখে পুত্রের নিকট শ্রাদ্ধের কথা উল্লেখ করিলে, তখন আমি শাস্ত্র মত তোমার শ্রাদ্ধ করিব, আমি প্রতিশ্রুত হইলাম।"

তখন গোবিন্দ রোদন করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, 'বাপ! আমি অপরাধ করিয়াছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার পুত্র মরিয়া গিয়াছে উত্তম হইয়াছে, তোমার বালাই লইয়া গিয়াছে।" ইহাই বলিয়া স্নান করিয়া তখনি গোপীনাথের নিমিত্ত রন্ধন করিতে গেলেন।

ইহার কিছু কাল পরেই গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুর অন্তর্ধান করিলেন। দেহ-ত্যাগের পূর্ব্বে তিনি গোপীনাথের সেবার উত্তম বন্দোবস্ত করিলেন, ও আপনার প্রধান শিষ্যের হস্তে গোপীনাথকে সমর্পণ করিলেন। ঐ অগ্রদ্বীপে ঘোষ-ঠাকুর সমাধি দেওয়া হইল।

গোবিন্দ ঘোষের নিমিত্ত শোক করেন এমন কেহ তাঁহার নিকট ছিলেন না। শিষ্যগণ রোদন করিলেন, আর তাঁহার পুত্র রোদন করিলেন। কথিত আছে যে, গোবিন্দ ঘোষের অন্তর্ধানের সময় স্বয়ং গোপীনাথ,—তিনি তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া লওয়ায়,—রোদন করিয়াছিলেন। তাঁহার পদ্ম চক্ষু দিয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে লাগিল। পিতৃ-বিয়োগে রোদন করা কর্ত্তব্য, গোপীনাথ এ কর্ত্তব্যকর্ম্মের ত্রুটি কেন করিবেন?

গোপীনাথ নূতন সেবাইতকে নিশি যোগে বলিতেছেন, "গোবিন্দ ঘোষ আমার পিতা। আমি এক মাস অশৌচগ্রহণ ও হবিষ্যান্ন করিব। তুমি আমাকে কল্য স্নান করাইয়া সময়োচিত বসন পরাইবা।" তখন সেবাইত এই অলৌকিক ব্যাপারে কিছুকাল স্তম্ভিত থাকিলেন। পরে সাহসী হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর, সত্য কি তুমি আমার সহিত কথা কহিতেছ? যদি সত্য তুমি কথা কহিয়া থাক, তবে তোমাকে আমি কি রূপে কাচা

পরাইব? লোকে আমাকে কি বলিবে? ঠাকুর, এ লীলা সম্বরণ করুন্।'

তাহাতে গোপীনাথ বলিলেন, 'আমি আমার পিতার নিকট প্রতিশ্রুত আছি যে, তাঁহার শ্রাদ্ধ করিব। মাসান্তে আমি শাস্ত্র মত সর্ব্বসমক্ষে সমুদায় কার্য্য করিব, ও নিজহস্তে পিণ্ডদান করিব। তুমি আমার আজ্ঞানুসারে সমুদায় কার্য্য কর, তোমার কোন শঙ্কা নাই।"

সেবাইত প্রাতে এই কথা সকলের নিকট বলিলেন। সকলে ভগবানের করুণায় গদ গদ হইয়া বলিলেন যে, তাঁহার সাক্ষাৎ আজ্ঞার উপর আবার কথা কি? তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাই করা হউক।

তখন এই কথা সর্ব্ব দেশে প্রচার হইল। মধুমাসে কৃষ্ণ একাদশী তিথিতে গোবিন্দের শ্রাদ্ধ হইল। বহুতর লোকের সমাগম হইল। তখন কাচা গলায় দিয়া গোপীনাথকে শ্রাদ্ধস্থানে আনা হইল।

যখন সভার মধ্যে কাচা গলায় দিয়া গোপীনাথকে আনা হইল, তখন সভাস্থ সকলে ভাবে নিমগ্ন হইলেন। কেহ উচ্চৈঃস্বরে রোদন, কেহ ধূলায় গড়াগড়ি, কেহ আনন্দে নৃত্য, কেহ ভাবে মূর্চ্ছিত হইলেন। ভগবানের কারুণ্যে সকলে উন্মাদ হইলেন। কেহ গোপীনাথকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন, কেহ বা ঘোষঠাকুরকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। বালক বৃদ্ধ, পুরুষ নারী সকলেই বলিতে লাগিলেন, যেমন ভক্ত তেমনি ঠাকুর, যেমন দাস তেমনি প্রভু, যেমন পিতা তেমনি পুত্র!

কথিত আছে যে, সর্ব্ব সমক্ষে গোপীনাথ নিজ হস্তে গোবিন্দ ঘোষের পিণ্ড দিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের এই অপরূপ লীলা অদ্যাবধি অগ্রদ্বীপে বৎসর বৎসর হইতেছে। আর এখনও একান্ত ভক্তগণ এই পিণ্ডদানরূপ কার্য্য দর্শন করিয়া থাকেন। যদি গোবিন্দ ঘোষের ঔরস পুত্র বাঁচিয়া থাকিতেন, তবে বড় না হয় বিংশতি বৎসর পিতৃদেবের শ্রাদ্ধ করিতেন,

কিন্তু গোপীনাথ এই চারি শত বৎসর গোবিন্দ ঘোষ-ঠাকুরের শ্রাদ্ধ করিলেন। এইরূপ পিতৃভক্ত পুত্র কেবল গোপীনাথই হইতে পারেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়াছিলেন, "হে গোবিন্দ! তোমা দ্বারা শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখান হইবে। এরূপ সৌভাগ্য তুমি পরিত্যাগ করিও না।" হায়! একথা কাহাকে বলিব? শ্রীভগবান শ্রীগোবিন্দ ঘোষের এই চারিশত বৎসর শ্রাদ্ধ করিতেছেন! জয়দেব, "দেহি পদ পল্লব" পর্যন্ত লিখিয়া লেখনী রাখিলেন। তিনি ভাবিলেন, তিনি কিরূপে লিখিবেন যে, ভগবান রাধার পায় ধরিলেন। ভগবান স্বয়ং আসিয়া সেই শ্লোক পূরণ করিলেন। কিন্তু ভগবান গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ করিলেন, আর তাঁহার নিমিত্ত গলায় কাচা পরিলেন! জীবগণ কি নির্ব্বোধ! কি মূঢ়মতি! এরূপ প্রভুকে ভুলিয়া থাকে।

প্রভু গঙ্গার ধারে ধারে বৃন্দাবনে চলিলেন। প্রভুর নিত্য সঙ্গী অসংখ্য লোক। প্রভুকে দর্শন করিতে সহস্রেক লোক আসিতেছে, ইহাতে দিবানিশি তাঁহার চতুঃপার্শ্বে কোলাহল হইতেছে। চতুর্দ্দিকে কেবল নৃত্য গীত ও হরি হরি ধ্বনি। কিন্তু প্রভুর ইহাতে রসভঙ্গ নাই, যেহেতু তিনি আপন মনের আনন্দে বিহ্বল। সকলের ইচ্ছা প্রভুকে দর্শন করিবে, প্রভুর নিকটে যাইবে, প্রভুর সঙ্গে কথা কহিবে। প্রভুর অপার মহিমা; যদিও লক্ষ লোকে তাঁহার দর্শন ও সঙ্গ ইচ্ছা করিতেছে, তবু কাহারও মনের বাঞ্ছা অপূর্ণ রহিতেছে না। এই রূপে মহা কলরব ও হরিধ্বনির সহিত মহাপ্রভু গৌড় নগরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সেখানে বাঙ্গালার মুসলমান রাজার বাসস্থান। রাজা বহু লোকের কলরব শুনিয়া সহজে ভয় পাইলেন। যাহাদের যত বড় সম্পত্তি তাহাদের তত অধিক ভয়। তিনি ভাবিলেন, বুঝি কোন বিপক্ষ লোক তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইতে আসিতেছে। রাজারা ভাবেন যে, তাহারা বড় ভাগ্যবান

ও তাঁহাদের রাজ্যভোগের নিমিত্ত সকলে তাঁহাদিগকে হিংসা করে। কিন্তু এখনকার কয়টি রাজা পরকালে রাজা হইয়াছেন? লোকের কলরব শুনিয়া গৌড়ের রাজা ভয় পাইলেন। তখন সশঙ্ক চিত্তে তাঁহার মন্ত্রী কেশব ছত্রিকে ডাকাইলেন। এখানে বলা উচিত যে, রাজা হোসেন সা যদিও মুসলমান, কিন্তু তাঁহার রাজকার্য্য সমুদয় হিন্দুমন্ত্রিগণই নির্ব্বাহ করিতেন। কেশব ছত্রি বলিলেন যে, ব্যাপার কিছু গুরুতর নহে, একজন সন্ন্যাসী জনকয়েক চেলা লইয়া বৃন্দাবন যাইতেছেন, তাহাতে এই কলরব হইতেছে। কেশব ছত্রির মনের ভাব এই যে, যদি মুসলমান রাজা জানিতে পান যে, প্রভুর সঙ্গে লক্ষ লোক, তাহা হইলে হয়ত তিনি প্রভুর উপর বলপ্রয়োগ করিবেন। কেশব ছত্রি যদিচ এইরূপ করিয়া, ব্যাপার কিছু গুরুতর নয় বলিয়া, রাজাকে সান্ত্বনা করিলেন, কিন্তু রাজা উহা সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করিলেন না। সেই নিমিত্ত তিনি দবির খাস ও সাকর মল্লিক উপাধিধারী আর দুই জন হিন্দু মন্ত্রীকে ডাকাইলেন।

এই দুই জন দাক্ষিণাত্যের কোন রাজবংশীয় ব্রাহ্মণ, দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া, বাঙ্গালা দেশে বাস করিয়াছেন। ইহারা দুই ভাই, বুদ্ধি ও বিদ্যা বলে মুসলমান রাজার মন্ত্রিপদ লাভ করিয়াছেন। মুসলমান রাজার অধীনে কাজ করেন, সুতরাং হিন্দুদের পক্ষে যাহা মহা অকর্ত্তব্য কর্ম্ম এরূপ কাজও তাঁহাদের অনেক করিতে হয়। মুসলমানেরা যে মন্দির ভগ্ন করিতেছে, গো বধ করিতেছে, দেশ ওজাড় করিতেছে, এ সমস্ত কার্য্য ইহারা দুই ভ্রাতা নিজ হাতে না করুন, ইহাতে তাঁহারা সহায়তা করিতেছেন। ইহারা বাহ্যদৃষ্টিতে ঠিক মুসলমান, কার্য্যেও অনেকটা মুসলমানের মত, অথচ অন্তরে ঘোর হিন্দু; নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে পালন করেন। পণ্ডিত সাধু বৈষ্ণবগণে তাঁহাদের বাড়ী অহোরহ পূর্ণ থাকে। বাড়ী কানাই নাটশালা গ্রামে। এই কানাই নাটশালা প্রভু পূর্ব্বে দেখিয়াছেন। যখন গয়া হইতে

প্রভু প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ, নাচিতে নাচিতে, হাসিতে হাসিতে আগমন করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনচ্ছলে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন। * এই কানাই নাটশালা গ্রামে সমগ্র কৃষ্ণলীলার মূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। দেশ বিদেশ হইতে উহা দর্শন করিতে লোক আসিত। এই সকল কীর্ত্তিও সেই দুই ভ্রাতার, যাঁহারা উপরে দবিরখাস ও সাকর মল্লিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। দবিরখাস ও সাকর মল্লিক রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা এই সন্ন্যাসীর কথা আবার তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। এই দুই ব্রাহ্মণ ভ্রাতা যদিও প্রভুকে কখন দর্শন করেন নাই, তবুও তিনি যে শ্রীভগবান তাহা তাঁহাদের মনে এক প্রকার বিশ্বাস হইয়াছে। এই নিমিত্ত তাঁহারা শত মুখে প্রভুর গুণানুবাদ করিলেন। তাঁহারা প্রভুর পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, বোধহয় স্বয়ং শ্রীভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হইয়া সন্ন্যাসীরূপে বিচরণ করিতেছেন। আরও বলিলেন, "মহারাজ, তুমি যাঁহার কৃপায় অধীশ্বর হইয়াছ, তিনি এখন তোমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

প্রভুর অচিন্ত্য শক্তিবলে মুসলমান রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং অতি নম্র হইয়া বলিলেন, "আমারও ঐরূপ কিছু বোধ হয়। আমি রাজা, লোকের জীবন মরণের কর্ত্তা; কিন্তু আমি যদি কাহাকেও বেতন না দিই, তবে ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ আমার কথা শুনিবে না। আমার সৈন্যগণ যদি ছয় মাস বেতন না পায়, তবে অমনি আমাকে বধ করিবার নিমিত্ত ষড়্‌যন্ত্র

* প্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তবে তিনি আপনার হৃদয়ে আপনি প্রবেশ করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? প্রভুর দুই ভাব,—ভক্তভাব ও ভগবৎ ভাব। অর্থাৎ ভক্তের জীবন কিরূপ হওয়া উচিত তিনি তাহাই দেখাইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই, ভক্ত যখন উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন। প্রভু এই লীলা দ্বারা তাহাই দেখাইয়াছিলেন।

করিবে। কিন্তু এই সন্ন্যাসী দরিদ্র, ইহার কাহাকেও এক পয়সা দিবার সঙ্গতি নাই, তবুও লক্ষ লোক আহার নিদ্রা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ইহার সঙ্গে সঙ্গে আহ্লাবহ হইয়া ফিরিতেছে। ঈশ্বরশক্তি ব্যতীত সামান্য জীবের এরূপ শক্তি সম্ভাবিত হয় না।"

রাজা যদিচ এইরূপ ভাল কথা বলিলেন, তবু দুই ভাই ইহাতে সম্পূর্ণ রূপে আশ্বস্ত হইলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন যে, প্রভুকে এই স্বেচ্ছাচারি-মুসলমান রাজার নিকট থাকিতে দেওয়া ভাল নয়। তাহার পরে তাঁহারা প্রভুকে দর্শন না করিয়া দূর হইতে তাঁহাকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন। এখন তিনি নিকটে আসিয়াছেন ও তাঁহার দর্শন সুলভ হইয়াছে। এরূপ সৌভাগ্য তাঁহারা কেন ছাড়িবেন? সুতরাং নিশীথ সময়ে, তাঁহারা মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, অতি গোপনে প্রভুর নিকট গমন করিলেন। যাইয়া দেখিলেন, যদিও গভীর রজনী হইয়াছে, তবুও কেহ ঘুমান নাই, সকলেই প্রেমের হিল্লোলে আনন্দ-কোলাহল করিতেছেন। অনেক কষ্টে কোন কোন পার্ষদের ও পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন পাইলেন। তখন তাঁহাদের কাছে, অতি দীনভাবে, প্রভুর দর্শন ভিক্ষা করিলেন। অবশ্য ইহাদের পরিচয় পাইবা মাত্র ভক্তগণ তটস্থ হইলেন। এই দুই ভাই নদীয়া পণ্ডিতগণের প্রতিপালক বলিয়া তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভদ্রলোক মাত্রেই জানেন। বিশেষতঃ তাঁহারা প্রভূত ধনবান্ ও ক্ষমতাবান বলিয়া আপামর সাধারণের নিকট পরিচিত। সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দ এই দুই ভাইকে অতি যত্নে প্রভুর নিকট লইয়া চলিলেন। প্রভু কৃষ্ণ-প্রেমরসে নিমগ্ন। শ্রীনিত্যানন্দ চেষ্টা করিয়া তাঁহার আবিষ্টচিত্ত ভঙ্গ করিয়া, দুই ভাইয়ের আগমন গোচর করিলেন। প্রভুও তাঁহাদের প্রতি শুভদৃষ্টি করিলেন। তখন দুই ভাই দুই হস্তে দুই গুচ্ছ তৃণ ও মুখে আর এক গুচ্ছ তৃণ ধারণ করিয়া, গলায় বসন দিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন; আর বলিলেন, "প্রভু, পতিত ও কাঙ্গাল

উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তুমি ধরাধামে শুভাগমন করিয়াছ, অতএব আমাদের ন্যায় দয়ার পাত্র তুমি আর পাইবে না। তুমি জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছ। কিন্তু তাহারা নির্ব্বোধ, অজ্ঞানে পাপ করিয়াছে। আমাদের যত পাপ সমস্তই জ্ঞানকৃত, আমাদের ন্যায় অধমের তোমার কৃপা বিনা আর গতি নাই।"

এ কথা পূর্ব্বে বারংবার বলিয়াছি যে, যে ব্যক্তি বলবান্ তাহারই অন্তরে অভিমানের সৃষ্টি হয় এবং যে ব্যক্তি যে বিষয়ে বলবান সে তাহা ত্যাগ না করিলে ভক্তি পায় না, কি পাইলেও উহা তাহার হৃদয়ে পরিস্ফুট হয় না। এই দুই ভাই গৌড়দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা পুরুষ, সুতরাং দীনতাই ইহাদের ঔষধ। ইহারা দৈন্যের অবতার হইয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। ফলকথা তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম পাইবার পাত্র, অথচ নরকে আছেন। তাঁহারা যে প্রেম পাইবার পাত্র সে জ্ঞান তাঁহাদের আছে, আবার এ জ্ঞানও আছে যে, শ্রীভগবান্ কর্তৃক এরূপ ভাগ্য পাইয়াও তাঁহারা বিষ্ঠার ক্রিমি হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের সেই অনুতাপ তখন জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিতেছে। তাঁহারা প্রভুকে যাহা বলিলেন, প্রকৃতই মনে মনে তাঁহাদের ঐরূপ বিশ্বাস ছিল—অর্থাৎ তাঁহারা জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগা।

এই দুই ভাই তখন এক প্রকার বাঙ্গালা দেশের অধিপতি। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না, অর্থাৎ তাঁহারা, স্বয়ং বাদশাহ্ ব্যতীত আর সকলের উপর কর্ত্তা। তাঁহাদের এইরূপ নিষ্কপট দীনতা দেখিয়া সকলেই মোহিত হইলেন। প্রভু দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া বলিলেন, "তোমরা উঠ, দৈন্য সম্বরণ কর। তোমাদের দৈন্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তোমরা আমাকে বারংবার যে দৈন্য পত্র লিখিয়াছ, তাহা দ্বারা তোমাদের মন আমি বেশ জানিয়াছি। তোমাদের কথা ভাবিয়া আমি একটী শ্লোক করিয়া-

ছিলাম।” ইহাই বলিয়া প্রভু শ্লোকটি বলিলেন। শ্রীমুখের শ্লোক এই যথা :—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু
তদেবাস্বদয়ত্যন্ত নবসঙ্গরসায়নং ॥

প্রভুর শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে,—“যাঁহাদের অন্তঃকরণে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারা সেইরূপ বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণ-রস আস্বাদন করিয়া থাকে।” লোকে বলে যে, পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে পরকীয়া রস কেন? ইহার অর্থ এই যে, প্রেমান্ধ কুলটার অবস্থা ও কৃষ্ণ-প্রেমে অভিভুত জীবের অবস্থা একই প্রকার। কৃষ্ণপ্রেম যে কি পদার্থ, তাহা পরকীয়া রস ব্যতীত অন্য উপমার দ্বারা জীবকে বুঝাইবার যো নাই। নিজে পবিত্র হইলে এ সমুদায় অপবিত্র বোধ হয় না। শ্রীরামানন্দ রায় দেবদাসীগণ লইয়া তাঁহার নাটকাভিনয় করিতেন, করিয়া স্বয়ং প্রভুকে দেখাইতেন। কিন্তু যাঁহারা উহা দেখিতেন, অভিনেত্রী বেশ্যা বলিয়া তাঁহা-দের রসাস্বাদনে কোন ব্যাঘাত হইত না। তবে এ সমুদায় বিধি পবিত্র লোকের জন্য।

সে যাহা হউক, প্রভু বলিতে লাগিলেন, “তোমরা আমার প্রিয়, এমনকি এই গৌড় সন্নিধ্যে আসিবার আমার যে কি প্রয়োজন তাহা কেহ জানে না। সে কেবল তোমাদের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক কৃষ্ণ তোমাদিগকে অচিরাৎ কৃপা করিবেন। অদ্য হইতে তোমারা দুই ভাই সনাতন ও রূপ নামে খ্যাত হইবে।”

যখন প্রভু প্রকাশ হইলেন, তখন তাঁহার কথা জগতে সকলে শুনিলেন, কেহ বিশ্বাস করিলেন, কেহ করিলেন না। কিন্তু রূপ সনাতন তাহা বিশ্বাস করিলেন, করিয়া প্রভুকে দৈন্য পত্র লিখিলেন অর্থাৎ পত্রেই আপনাদিগের উদ্ধার ভিক্ষা করিলেন। অবশ্য প্রভু উত্তর দিলেন না।

রূপ সনাতন আবার লিখিলেন। প্রভু তবু উত্তর দিলেন না। এখন তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে লইতে তাহাদের নিকট আসিয়াছেন। কেন না, এই দুই ভাই দ্বারা তিনি জীব উদ্ধার করিবেন।

প্রভুর দুই চারিটী কথায় দুই ভাই চিরদিনের নিমিত্ত শ্রীপ্রভুর দাস হইলেন। এরূপ অচিন্ত্য শক্তি জীবে সম্ভবে না। এই দুই ভাই মহা বিচক্ষণ রাজমন্ত্রী; যুক্তপ্রিয় ও স্বেচ্ছাচারী মুসলমান রাজার অধীনে দাসবৃত্তি ও নানাবিধ কুকর্ম্ম করিয়া মহা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন। তাঁহারা প্রভুকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন, আর অমনি তাঁহাদের পুনর্জন্ম হইল। যে ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত জীব মাত্রে কি না করে, যাহার নিমিত্ত তাহারা দুই ভাই নানাবিধ কুকর্ম্ম করিয়াছেন, এখন প্রভু-দর্শনে সেই সমুদয় ঐশ্বর্য্য তৃণের ন্যায় একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। ক্রমে ক্রমে এই দুই ভাই কিরূপ শক্তিসম্পন্ন হইলেন তাহা পরে বলিব। যাইবার সময় জ্যেষ্ঠ সনাতন প্রভুকে এই কথা বলিলেন, "প্রভু, এত লোক লইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলে সুখ পাইবেন না।" তবে নিত্যানন্দ প্রভুকে গোপনে বলিলেন, "যদিও প্রভু স্বয়ং ভগবান সকলের কর্ত্তা, কিন্তু আমরা ক্ষুদ্র জীব, আমাদের ভয় যায় না। প্রভুকে এ স্বেচ্ছাচারী রাজার নিকটে থাকিতে দেওয়া ভাল নয়। তাঁহাকে এস্থান হইতে অগ্রে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।"

প্রভাতে প্রভু আপনি বলিলেন, "কল্য নিশিযোগে সনাতনের মুখে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ভালরূপ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে যদি যাই তবে, একা যাইব। কিন্তু আমি যেন বাজী পাতাইয়া লক্ষ লোক সঙ্গে লইয়া চলিতেছি। শ্রীবৃন্দাবন অতি গুপ্ত ও পবিত্র স্থান। সেখানে কলরব শোভা পায় না। যাহারা আমার সঙ্গে চলিতেছেন, আমি ইহাদের নিবারণ করিতে পারিব না। আমি এখান হইতে নীলাচলে ফিরিব। আর সেখান হইতে বৃন্দাবনে যাইব।" ইহাই বলিয়া প্রভু পূর্ব্বদিকে অর্থাৎ দেশাভিমুখে ফিরিলেন।

ভবভূতি বলেন, মহাজনের মন যদিও শিরীষ কুসুমের ন্যায় কোমল, কিন্তু প্রয়োজন মত উহা বজ্রের ন্যায় কঠিন হয়। তাহার প্রমাণ এই দেখ। কোথা নীলাচল, আর কোথা গৌড়। যে বৃন্দাবনের নামে প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত হয়েন, সেই বৃন্দাবনে যাইবার জন্য, দুই মাস হাঁটিয়া বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া, প্রায় অৰ্দ্ধ পথ আসিয়াছেন। একটী কথা, যাহা তোমার আমার কাছে সামান্য, প্রভু তাহা দ্বারা চালিত হইয়া, এ সমুদয় পরিশ্রম ও কষ্টের ফল ত্যাগ করিলেন। প্রভু যে পথে আসিয়াছেন সেই পথে ফিরিয়া চলিলেন!

প্রভু ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় গঙ্গার পরপারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে "নরোত্তম দাস" বলিয়া কয়েক বার ডাক দিলেন, দিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

যদি প্রভু শুধু 'নরোত্তম" বলিয়া উক্তি করিতেন, তবে ভক্তগণ ভাবিতে পারিতেন যে, প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেছেন, কারণ তাঁহার এক নাম নরোত্তম। কিন্তু 'নরোত্তম দাস' বলিয়া, কেহ কিছু ঠাহরিতে পারিলেন না। তাহার বহু বৎসর পরে, সেইস্থানে যখন শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় উদয় হইলেন, তখনই সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, সর্ব্বশক্তিমান প্রভু নরোত্তম দাস বলিয়া ডাকিয়া, ইঁহাকেই আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

প্রভু পথে ভক্তগণকে, যাহার যেখানে বাড়ী, সেখানে রাখিয়া আসিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীখণ্ডের পরে অগ্রদ্বীপে আইলেন। সেখান হইতে নদীয়ায় না যাইয়া, দ্রুতপদে একেবারে শান্তিপুরে চলিলেন। তাঁহার সঙ্গী ভক্তগণ, প্রভুর প্রত্যাগমন সংবাদ, পথ হইতে শ্রীনবদ্বীপে প্রেরণ করিলেন। শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণ শুনিলেন যে, প্রভু শান্তিপুরে যাইতেছেন ও সেখানে শচীমাতার নিমিত্ত কিছু দিন থাকিবেন। প্রভু যে গৌড় হইতেই দেশে প্রত্যাগমন করিবেন, একথা কেহ কেহ কোন প্রকারে পূর্ব্বে জানিতেন।

সে বড় রহস্যের কথা। বৃন্দাবনে প্রভু হাঁটিয়া যাইতেছেন, এই নিমিত্ত পরম শক্তিসম্পন্ন নৃসিংহনন্দ ব্রহ্মচারী, প্রভুর গমন সুলভের নিমিত্ত, মনে মনে একটি জাঙ্গাল প্রস্তুত করিতে লাগিলেন! এই মানসিক পথের দুই ধারে সুগন্ধি কুসুম-শোভিত বৃক্ষ সমুদায় রোপণ করিলেন, তাহার উপর কোকিল ও ময়ূর বসাইলেন। এইরূপে মনে মনে প্রভুকে প্রত্যহ লইয়া যাইতেছেন। প্রভুর প্রত্যেক শ্রীপদের নিম্নে একটি পদ্মফুল রাখিতেছেন, যেন পদে ব্যাথা না লাগে। ব্রহ্মচারী এইরূপে প্রভুকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। কানাই নাটশালা পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন। কিন্তু আর এই জঙ্গাল বান্ধিতে পারেন না। বহুকষ্টেও জাঙ্গাল বান্ধিতে নাপারিয়া বুঝিলেন যে প্রভু আর অগ্রবর্ত্তী হইবেন না। তখন তিনি একথা প্রকাশ করিলেন, করিয়া বলিলেন যে, প্রভু এবার বৃন্দাবন যাইবেন না। কানাই নাটশালা হইতে ফিরিবেন।

উপরে ব্রহ্মচারীর যে রঙ্গ বলিলাম, ইহাকে বলে মানসিক সেবা, ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অতিশীঘ্র লাভ করা যায়, এইরূপ করিয়া শ্রীভগবানের সঙ্গ করাই প্রকৃত ভজন।

শচীমাতার নিকট বিদায় লইয়া প্রভু বৃন্দাবন গমন করিয়াছেন! পুত্রকে বিদায় দিয়া শচী সাধারণের চক্ষে বড় দুঃখে দিন কাটাইতেন। কিন্তু প্রভুর কৃপায় তাঁহার অন্তরে কোন দুঃখ ছিল না। যেহেতু প্রভু যেই প্রভুর নিকট বিদায় লইতেন, অমনি তিনি কৃষ্ণ বিরহে বিহ্বল হইয়া সংসারের সব কথা ভুলিয়া যাইতেন। শচীর মনের ভাব যে, তিনি যশোদা। মনের ভাবত বটেই, প্রকৃতও তিনি তাহাই। আর তাঁহার যে পুত্র কৃষ্ণ তিনি মথুরায় গিয়াছেন। যে কোন ভাবেই হউক, কৃষ্ণ সম্বন্ধ থাকিলেই, তাহা আনন্দময় হয়। বিরহ বড় দুঃখের বস্তু, কিন্তু কৃষ্ণবিরহ বড় সুখের সামগ্রী। সুতরাং যদিও শচীর ভাব দেখিয়া লোকের হৃদয় বিদীর্ণ হইত,

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি আনন্দে বিহ্বল থাকিতেন। তাঁহার বাড়ীতে কোন লোক আসিল। শচী ভাবিলেন, ইনি বিদেশী, অবশ্য মথুরার সংবাদ রাখেন। শচী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, তুমি কি মথুরা হইতে আসিতেছ, আমার কৃষ্ণের সংবাদ বলিতে পার?" একথা শুনিয়া কেবল তাহার কেন, যে কেহ শুনিত সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইত। কখন বা শচী যশোদা যেরূপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ করিয়া কৃষ্ণকে বাঁধিতে চলিলেন; কখন বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এ সমুদায় আর কিছুই নয়, কেবল শ্রীকৃষ্ণ শচীর সহিত এইরূপে খেলা করিতেন। তুমি আমি যাহাই ভাবি না কেন, ভাগ্যবতী শচী শ্রীভগবৎ সংসর্গে অতি আনন্দে দিন কাটাইতেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থাও ঠিক শচীর ন্যায়।

শচী শুনিলেন, নিমাই শান্তিপুরে যাইতেছেন, সেখানে তাহার নিমিত্ত কিছু দিন অপেক্ষা করিবেন। অমনি শচীর আবার জগতের কথা মনে পড়িল, আর তিনি "নিমাই" "নিমাই" বলিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। গঙ্গাদাস, মুরারি এবং অন্যান্য নদীয়ার ভক্তগণ শচী মাতাকে লইয়া শান্তিপুরে চলিলেন। এ দিকে প্রভু সাঙ্গোপাঙ্গ সহিত হঠাৎ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মন্দিরে উদয় হইলেন। হঠাৎ প্রভুর উদয় দেখিয়া অদ্বৈত আনন্দে হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। এদিক হইতে শচী দোলায় চড়িয়া শান্তিপুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শচী দোলা হইতে বাহির হইলে প্রভু অমনি দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন।

তাহার পর প্রভু উঠিয়া তাঁহাকে শ্লোক পড়িতে পড়িতে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "তুমি যশোদা, তুমি দেবকী, তুমি জীবের বন্ধু, তুমি কৃপাময়ী স্নেহময়ী। আমার এ দেহ তোমার, তুমি এক তিলে আমাকে যে সেবা করিয়াছ, বহু যুগে আমি তাহা শোধ দিতে পারিব না।" প্রভু জননীকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন, স্তুতি করিতেছেন, আর রোদন

করিতেছেন, শচী হা করিয়া পুত্রমুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। শচী পূর্ব্বে একবার যাহা বলিয়াছেন, আবার সেই কথা বলিলেন। বলিলেন, "নিমাই, তুমি আমাকে প্রণাম কর, তাহাতে আমার ভয় করে।" প্রভু বলিলেন, "মা, আমি কৃষ্ণভক্তির কাঙ্গাল। যদি আমার কিছু কৃষ্ণভক্তি হইয়া থাকে সে কেবল তোমা হইতে, ইহা আমি সত্য সত্য বলিতেছি।"

শচী অভ্যন্তরে গমন করিলেন, আর অমনি রন্ধনের ভার লইলেন। রন্ধন হইল, নিতাই ও গৌর দুই জনে ভোজনে বসিলেন। প্রভু কি কি ভালবাসেন, শচী তাহা জানেন, তাহাই সেই সমুদায় সামগ্রী সংগ্রহ করা হইয়াছে। সে সমুদায় সামগ্রীও যে বড় দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান, তাহা নহে। প্রভুর শাকে বড় রুচি, তাই শচী বিংশতি প্রকারের শাক রন্ধন করিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস প্রভুকে বড় ভালবাসেন, আর প্রভু যাহাকে বা যে দ্রব্য ভালবাসেন, তিনিও তাহাকে ও সেই দ্রব্যকে ভক্তি করেন এবং ভালবাসেন। প্রভু শাক ভালবাসেন, তাহাই ঠাকুর বৃন্দাবন দাস আর শাককে শাক বলেন না, শাককে বলেন "শ্রীশাক।" প্রভুদ্বয় ভোজনে বসিলেন, ভক্তগণ তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া বসিলেন, শচী একটু আড়ালে বসিয়া ভোজন দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রভুর আনন্দের সীমা নাই, কাজেই নানাবিধ রহস্য কথা বলিতে লাগিলেন। সম্মুখে নানাবিধ শাক দেখিয়া "শ্রীশাক"গণের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "আমি শাকের পক্ষপাতী বলিয়া তোমরা আমাকে অন্তরে অন্তরে বিদ্রূপ কর, কিন্তু শাকের কি মহিমা তাহা শ্রবণ কর। এই যে হেলেঞ্চা শাক, ইনি দেহরক্ষা করেন, আর পরোক্ষে কৃষ্ণভক্তি দান করেন।" এ কথা শুনিয়া সকলে হাস্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভু ইহাতে নিরস্ত হইলেন না, গম্ভীর ও নিরপেক্ষ ভাবে অন্যান্য শ্রীশাকের গুণ বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "বাস্তু শাক ভোজনে রাধারাণীর কৃপা হয়।" হায়! যদি বাস্তু শাক ভোজনে রাধা-কৃষ্ণের কৃপা হইত, তবে দুবেলা

এই শাক খাইতাম। সে যাহা হউক, এইরূপ হাস্যকৌতুকে ভোজন সমাপ্ত হইল। তখন সকলে সেবার পাত্র লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করিলেন।

প্রভু যদিও সত্বর যাইতে মন, কিন্তু মাধবেন্দ্রনির্য্যাণ তিথি সম্মুখে। মাধবেন্দ্র, অদ্বৈত প্রভুর গুরু। তাই আচার্য্য তাঁহার বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। প্রভু সেই মহোৎসবের অনুরোধে আর কয়েক দিবস শান্তিপুরে রহিলেন। এই অবকাশে প্রভু গৌরীদাসের স্থানে শান্তিপুরের ওপারে কালনায় গমন করিলেন। তখন শীতকাল প্রায় গিয়াছে. ভক্তগণ সকলে রবির তাপে কষ্ট পাইতেছেন। প্রভু তখন কালনায় এই অদ্ভুত কথা বলিয়াছিলেন, "বড় গ্রীষ্ম হইতেছে, একবার নাম-কীর্ত্তন কর, শরীর জুড়াইয়া যাউক।" তাহাই এই গীতের সৃষ্টি হইল, "হরি বল জুড়াক্ হিয়া রে।" বড় গ্রীষ্ম হইতেছে. হরিনাম কর শরীর শীতল হইবে. এই কথা বলিবার অধিকারী একমাত্র কেবল আমার প্রভু। গৌরীদাসের ওখানে মহামহোৎসব হইল। গৌরীদাস নিতাইগৌরের চরণে পড়িয়া বর মাগিলেন যে. তাঁহারা দুই জনে তাঁহার বাড়ীতে থাকুন। যেহেতু তাঁহারা না থাকিলে তিনি প্রাণে মরিবেন। প্রভু বলিলেন, তথাস্তু। তাই দুই ভাই ঠাকুর ঘরে রহিলেন। পাছে প্রভু পলায়ন করেন, এই ভয়ে গৌরীদাস ঠাকুর ঘরে শিকল দিয়া বাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখেন যে. গৌর নিতাই দুই ভাই বাহিরে দাঁড়াইয়া। তখন তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন, করিয়া দেখেন যে. যে জীবন্ত ঠাকুর ঘরে রাখিয়া গিয়াছিলেন. তাঁহারা বিগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তখন গৌরীদাস বলিলেন, "ও হইল না, যাঁহারা ঘরে আছেন, তাঁহারা যাউন, তোমরা আইস।" ইহাই বলিয়া বাহিরের সেই জীবন্ত ঠাকুরদ্বয়কে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ইহাতে বাহিরের দুই ভাই ঘরে আসিয়া বিগ্রহ হইলেন, আর পূর্ব্বে যাঁহারা বিগ্রহ-রূপে ছিলেন, তাঁহারা জীবন্ত হইয়া বাহিরে চলিলেন! এইরূপ বার বার

হইতে লাগিল, কাজেই নিরুপায় হইয়া গৌরীদাস যা পাইলেন তাহাই রাখিলেন,—ভালই পাইলেন। জনশ্রুতিতে যেরূপ কাহিনী শুনা যায়, তদ্রূপ বলিলাম। কিন্তু পদকল্পতরুতে এই সম্বন্ধে দীন কৃষ্ণদাস বা শ্যামানন্দ (যিনি উৎকল উদ্ধার করেন) রচিত এই তিনটি পদ আছে ঃ—

ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি,
নিত্যানন্দ বলে হরি হরি।
কান্দি গৌরীদাস বোলে, পড়ি প্রভুর পদতলে,
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী॥
আমার বচন রাখ, অম্বিকা নগরে থাক,
এই নিবেদন তুয়া পায়।
যদি ছাড়ি যাবে তুমি, নিশ্চয় মরিব আমি,
রহিব সে নিরখিয়া কায়॥
তোমরা যে দুটি ভাই, থাক মোর এই ঠাঞি,
তবে সভার হয়ে পরিত্রাণ।
পুন নিবেদন করি, না ছাড়িহ গৌরহরি,
তবে জানি পতিত-পাবন॥
প্রভু কহে গৌরীদাস, ছাড়হ এমত আশ,
প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছিয়ে আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি,
সত্য মোর এই বাক্য রাখ॥
এত শুনি গৌরীদাস, ছাড়ি দীর্ঘ নিশ্বাস,
ফুকরি ফুকরি পুন কান্দে।
পুন সেই দুই ভাই, প্রবোধ করয়ে তায়,
তবু হিয়া থির নাহি বান্ধে॥

কহে দীন কৃষ্ণদাস চৈতন্য চরণে আশ,
দুই ভাই রহিল তথায়।
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হৈলা দুই জনে,
ভকত-বৎসল গৌরায় ॥

---

(২)

আকুল দেখিয়া তারে, কহে গোর ধীরে ধীরে
'আমরা থাকিলাম তোর ঠাঞি।
নিশ্চয় জানিহ তুমি, তোমার এ ঘরে আমি,
রহিলাম এই দুই ভাই ॥
এতেক প্রবোধ দিয়া, দুই মূর্ত্তি মূর্ত্তি লৈয়া,
আইলা পণ্ডিত বিদ্যমান।
চারি জনে দাঁড়াইল, পণ্ডিত বিস্ময় ভেল,
ভাবে অশ্রু বহয়ে বয়ান ॥
পুনঃ প্রভু কহে তারে, তোর ইচ্ছা হয় যারে,
সেই দুই রাখ নিজ ঘরে।
তোমার প্রতীতি লাগি, তোর ঠাঞি খাব মাগি,
সত্য সত্য জানিহ অন্তরে ॥
শুনিয়া পণ্ডিতরাজ, করিলা রন্ধন কাজ,
চারিজনে ভোজন করিলা।
পুষ্প মাল্য বস্ত্র দিয়া, তাম্বুলাদি সমর্পিয়া,
সর্ব্ব অঙ্গে চন্দন লেপিলা ॥
নানামতে পরতীত, করাইয়া ফিরাইল চিত,
দোঁহারে রাখিয়া নিজ ঘরে।

পণ্ডিতের প্রেম লাগি, দুই ভাই খায় মাগি,
দোঁহে গেলা নীলাচল পুরে ॥
পণ্ডিত করয়ে সেবা, যখন যে ইচ্ছা যেবা,
সেই মত করয়ে বিলাস।
হেন প্রভু গৌরীদাস, তার পদ করি আশ,
কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস ॥

(১)

শ্রীবৃন্দাবন নাম, রত্ন চিন্তামণি ধাম,
তাহে কৃষ্ণ বলরাম পাশ।
সুবলচন্দ্র নাম ছিল, এবে গৌরীদাস হৈল,
অম্বিকা নগরে যার বাস ॥
নিতাই চৈতন্য যার, সেবা কৈল, অঙ্গীকার,
চারি মূর্ত্তে ভোজন করিলা।
পূরুবে সুবল যেন, বশ কৈল রাম কানু
পরতেক এখন রহিলা ॥
নিতাই চৈতন্য বিনে, আর কিছু নাহি জানে,
কে কহিবে প্রেমের বড়াই।
সাক্ষাতে রাখিল ঘরে, হেন কে করিতে পারে,
নিতাই চৈতন্য দুই ভাই ॥
প্রেমে লম্ফ ঝম্ফ যার, পুলকিত হুহুঙ্কার,
ক্ষেণেকে রোদন ক্ষেণে হাস।
তাঁর পাদপদ্ম রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস ॥

প্রভু শান্তিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাধবেন্দ্রপুরীর মহোৎসব পর্য্যন্ত রহিলেন। এই মহোৎসবের রন্ধনের ভার সমুদায় শচীদেবীর উপর পড়িল। এই মহোৎসবের সঙ্গে প্রভুর নদীয়া-বিহার ফুরাইল। প্রভু জননীর নিকট বিদায় লইলেন। শচী বুঝিলেন, এই শেষ দেখা, অর্থাৎ চর্ম্মচক্ষের এই শেষ দেখা। যেহেতু শচী ইচ্ছা করিলেই দিব্যচক্ষে প্রভুকে সর্ব্বদা আপন ঘরে দেখিতে পাইতেন।

এই সময়ে রঘুনাথ দাস শান্তিপুরে আসিয়া প্রভুর শ্রীচরণে পড়িলেন। সপ্তগ্রামের অধিপতি হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দুই ভাই কায়স্থ, ইহারা বারো লক্ষ কাহনের অধিকারী। সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ। প্রভু সন্ন্যাস করিয়া যখন শান্তিপুরে আইসেন, তখন রঘুনাথ বালক; প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ৫।৭ দিন প্রভুকে দর্শন করিয়া তাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল এবং সংসারে বাস অসহ্য হইয়া পড়িল। প্রভু সেখান হইতে নীলাচল গমন করিলেন, রঘুনাথ বারংবার সেখানে পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করেন, আর ধরা পড়েন। এবার প্রভু শান্তিপুরে আসিলে রঘুনাথ পিতার নিকট অনেক মিনতি পূর্ব্বক আজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। প্রভু তাহাকে অনেক কৃপা করিয়া উপদেশ দিলেন। বলিলেন, "তুমি বাড়ী যাও, স্থির হইয়া অন্তর নিষ্ঠা কর। সংসারের কাজ সমুদায় করিও, কিন্তু উহাতে অনাসক্ত থাকিও, আর লোক দেখাইবা কপট বৈরাগ্য করিও না। অনায়াসে যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করিও, কিন্তু উহাতে মুগ্ধ হইও না। লোক একেবারে সাধু হয় না; তুমি এইরূপ ব্যবহার কর, উপযুক্ত সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবেন।" ইহাই বলিয়া প্রভু তাঁহাকে গৃহে বিদায় করিয়া দিলেন। হে গৃহী পাঠক মহাশয়গণ! প্রভুর এই শিক্ষাগুলি পালন করিতে চেষ্টা করুন।

প্রভু সেখান হইতে কুমারহট্টে আসিলেন। শ্রীবাস তখন তাঁহার কুমারহট্টস্থ আলয়ে বাস করিতেছিলেন। শ্রীবাস, শিবানন্দ সেন ও বাসুদেব দত্ত প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর সহিত নিজ গ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রভু অবশ্য শ্রীবাসের বাড়ী ভিক্ষা করিলেন। প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কিরূপে সংসার সমাধা করেন, যেহেতু তাঁহার পরিবার বৃহৎ ও তিনি কিছুই করেন না। শ্রীবাস ইহাতে হাতে তিন তালি দিয়া বলিলেন, "এই আমার সঙ্কল্প।" শ্রীবাস এই সঙ্কেত দ্বারা ইহাই বলিলেন যে, "একদিন, দুই দিন, তিন দিন পর্য্যন্ত উপবাস করিব, ইহাতে যদি কৃষ্ণ অন্ন না দেন, তবে গঙ্গায় প্রবেশ করিব।" প্রভু ইহাতে হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "তোমার শ্রীভগবানে এত বিশ্বাস? আচ্ছা আমার বর শ্রবণ কর। আমি তোমাকে বর দিতেছি যে, যদি লক্ষ্মী স্বয়ং কখনও উপবাস করেন, তবু তুমি কখনও অন্নকষ্ট পাইবে না।"

শ্রীবৃন্দাবনদাস শ্রীবাসের দৌহিত্র। তিনি তাঁহার গ্রন্থে এই কাহিনী বলিয়া গৌরব করিয়া বলিতেছেন; "তাই, সেই বরে আমার দাদার ঘরে অন্ন কষ্ট নাই।" প্রভু সেখান হইতে তাঁহার মাসী ও তাঁহার মাসীপতি চন্দ্রশেখরের বাড়ী গমন করিলেন। প্রভু তাঁহাদের ঘরের ছেলে, অন্তঃ অভ্যন্তরে গমন করিলেন, এমন সময় একটি অবগুণ্ঠনবতী যুবতী স্ত্রী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রভু আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তুমি পুত্রবতী হও।" একথা শুনিয়া সেই যুবতী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। প্রভু ইহাতে একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "কেন, কি হইল?" তখন শুনিলেন সেই যুবতী শ্রীখণ্ড ভগবান আচার্য্যের স্ত্রী।

শ্রীভগবান আচার্য্য "প্রভুকে না দেখিলে মরেন।" এই নিমিত্ত বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে শ্রীবাসের বাড়ী ফেলিয়া নীলাচলে প্রভুর নিকট বাস করেন। তাহার পরে ভগবানের স্ত্রী চন্দ্রশেখরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রভু এই

সমুদয় কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। পরে বলিলেন, 'আমার আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইবার নয়। তুমি সত্যই পুত্রবতী হইবে।" ইহার পর প্রভু নীলাচলে গমন করিয়া ভগবানকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন। বলিলেন "তুমি গৃহে গমন কর। তোমার পুত্র সন্তান হইলে তখন তুমি আমার নিকট আগমন করিও।" এই আজ্ঞায় শ্রীভগবান দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তাঁহার দুইটী মহাতেজস্বী পুত্র হইল।

প্রভু নীলাচলাভিমুখে দ্রুত চলিলেন. পানিহাটী রাঘবের বাড়ীতে দুই এক দিবস রহিলেন। সেখান হইতে বরাহনগরে শ্রীভগবতাচার্য্যের নিকট শ্রীভাগবত শুনিয়া অনেক নৃত্য করিলেন। পরে দ্রুতগতিতে নীলাচলে আগমন করিলেন। ধ্বনি হইল প্রভু আসিতেছেন, আর শ্রীক্ষেত্রের লোকে প্রভুকে দর্শন করিতে ধাবিত হইলেন। গদাধরও আইলেন। গদাধর প্রভুর শ্রীমুখ দর্শন করিয়া আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যাঁহার শ্রীমুখ দেখিয়া কেহ আনন্দে মূর্চ্ছিত হয়েন তিনি ধন্য. আর যিনি মূর্চ্ছিত হয়েন তিনিও ধন্য। তাই শ্রীগৌরাঙ্গের আর এক নাম 'গদাধরের প্রাণনাথ'

ভক্তগণ আসিয়াছেন। প্রভু ও ভক্ত সকলে বসিলেন। প্রভু আসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে একটুও আরাম পাই নাই। দিবানিশি লোকের কলরব। লক্ষ লক্ষ লোক সঙ্গে চলিল। কানাই নাটশালা গ্রামে সনাতন আমাকে উপদেশ দিলেন যে. এত লোক লইয়া বৃন্দাবনে যাওয়ায় সুখ পাইবেন না। আমি বুঝিলাম, শ্রীকৃষ্ণ সনাতনের মুখে আমাকে উপদেশ করিলেন। কারণ এত লোক লইয়া বৃন্দাবনে গেলে লোকে ভাবিবে যে, আমি বাজীকর সাজিয়া, হৈ হৈ করিয়া, বৃন্দাবনে গমন করিতেছি। সে অতি নিভৃত পবিত্র স্থান, সেখানে একা থাকিব, না হয় একজন সঙ্গে থাকিবে। আমি কাজেই সেখান হইতে নিবৃত্ত হইলাম।

আমি তখন বুঝিলাম যে, আমি গদাধরের নিকট অপরাধ করিয়াছি, তাই আমার যাওয়া হইল না। গদাধরকে দুঃখ দিয়া গমন করিলাম, আর তাহার ফল এই হইল যে, আমায় ফিরিয়া আসিতে হইল।"

ইহাতে গদাধর কৃতার্থ হইয়া গলায় বসন দিয়া চরণে পড়িলেন; পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু, তোমার বৃন্দাবনে যাওয়া কেবল লোক-শিক্ষার নিমিত্ত। বৃন্দাবন আর কোথা? যেখানে তুমি সেখানেই বৃন্দাবন। বৃন্দাবনে যাইবে তাহাতে বাধা কি? সম্মুখে চারি মাস বর্ষা আসিতেছে, ইহার অন্তে আপনি সচ্ছন্দে গমন করিবেন।" সকলে ইহাতে বলিলেন, পণ্ডিতের যে মত ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত। তখন প্রভু গদাধরকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। সে দিবস প্রভু গদাধরের স্থানে সেবা করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রচার কার্য্যের জন্য গৌড়ে রহিলেন। প্রভু গৌড়ীয় ভক্তগণকে বলিয়া আসিয়াছেন, আমার সঙ্গে এই দেখা হইল, তাঁহারা এবার যেন আর নীলাচলে গমন না করেন। সুতরাং এবার রথ-যাত্রার সময় প্রভু কেবল নীলাচল-ভক্তগণকে লইয়া এই শুভ কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আমায় বল্ রে, কত দূর বৃন্দাবন।
আমায় দিবেন কি কৃষ্ণ দরশন॥
গৌর-উক্তি—প্রাচীন গীত।

প্রভু যখন শান্তিপুর শচী মাতার নিকট বিদায় হয়েন, তখন বৃন্দাবন যাইবার অনুমতি ভিক্ষা মাগিলেন। বলিলেন, "মা, বার বার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বৃন্দাবনে যাইতে পারিলাম না। তুমি সচ্ছন্দ মনে আমাকে অনুমতি দাও।" শচী ধীরে ধীরে বলিলেন, "দিলাম"; ইহা বলিয়া জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কাঙ্গালিনীর ন্যায় পুত্রের মুখপানে চাহিলেন। প্রভু সে দর্শনে মর্ম্মাহত হইয়া আপনার বদন হেট করিলেন, করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার পরে প্রভু শান্ত হইয়া, একথা ওকথা বলিয়া জননীর নিকট বিদায় লইয়া গমন করিলেন। প্রভু গমন করিলেন, কিন্তু শচীর মনে একটী কথা বারংবার উদয় হইতে লাগিল। "নিমাই কান্দিল কেন?" "যাইবার সময় নিমাই কান্দিল কেন" শচী আপনা আপনি এই কথা প্রথমে ভাবিতে লাগিলেন। পরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে, ক্রমে মুরারিকে, শ্রীবাসকে, এইরূপে জনে জনে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "নিমাই যাইবার বেলা এরূপ কান্দিল কেন?" তাঁহারা ইহাই বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে, কান্দিবার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না। ঠাকুর জননীবৎসল, তাই বিদায় কালে কান্দিয়া ছিলেন। শচী প্রবোধ মানিলেন না। তিনি উত্তরে বলিলেন, তাহা নয় তোমরা নিমাইয়ের কি বুঝ? নিমাইয়ের সঙ্গে বিদায়ের বেলা যখন আমার চক্ষে চক্ষে মিলন হইল, তখন সে

আমাকে অন্তরে অন্তরে একটী কথা বলিয়াছিল। তাহার অর্থ যে, "মা, এই জন্মের মত দেখা, আর দেখা হইবে না। তা না হইলে, যাইবার বেলা কান্দিবে কেন?' শচী "যাইবার বেলা কেন কান্দিল" বলিতে বলিতে নবদ্বীপে গমন করিলেন, সেখানে যাইয়াও উহাই বলিতে বলিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে প্রভু নীলাচলে কি করিতে লাগিলেন, শ্রবণ কর।

প্রভুর মুখে এক কথা; আর মনেও সেই ভাব যে, কবে বৃন্দাবন যাই? কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা নিধুবন, কাঁহা কৃষ্ণ-বিহারের স্থান? কবে আমার বৃন্দাবন দর্শন হইবে? কবে আমি রাসস্থলীতে গড়াগড়ি দিব? যমুনায় স্নান করিব? প্রভুর এইরূপ আক্ষেপ উক্তিতে ভক্তগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

প্রভুর ছল ছল আঁখি, ম্লান বদন। সরূপকে নিকটে ডাকিতেছেন; সরূপ আইলেন, অমনি প্রভু তাঁহার হাত দু'খানি ধরিলেন, ধরিয়া অতি কাতরে বলিতেছেন "স্বরূপ, আমাকে বৃন্দাবনে যাওয়ার সাহায্য কর, তোমায় মিনতি করি।" সরূপ আশ্বাস বাক্য বলিতে লাগিলেন। রামরায় আইলেন, তাঁহাকেও নিকটে লইয়া বসিলেন। তাঁহার নিকটেও ঐ কথা, যথা,—'আমার ভাগ্যে কি বৃন্দাবন দর্শন হবে?' রামরায়ও আশ্বাস বাক্য বলিলেন। প্রভুকে যে কেহ দর্শন করিতে যাইতেছেন, প্রভু তাঁহাকে কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি সত্য করিয়া বল, আমার কি শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়া হইবে?' এইরূপে প্রভু দিবানিশি কাটাইতে লাগিলেন। ভক্তগণ দেখিলেন যে, প্রভু বৃন্দাবন না দেখিলে প্রাণে মরিবেন। "বৃন্দাবন, বৃন্দাবন," করিয়া প্রভু রোদন করেন, আর সেই সঙ্গে ভক্তগণও রোদন করেন। জীবশিক্ষার নিমিত্ত প্রভুর অবতার, কিরূপে বৃন্দাবন যাইতে হয়, প্রভু তাহাই শিক্ষা দিলেন।

তখন সকলে যুক্তি করিয়া প্রভুকে বৃন্দাবন পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, একজন ব্রাহ্মণ ভৃত্য সঙ্গে করিয়া তীর্থ পর্য্যটন আশয়ে নীলাচল আগমন করিয়াছেন। ভৃত্যের সহিত তাঁহাকে প্রভুর সঙ্গে দেওয়া হইল। প্রভু বনপথে যাইবেন এই স্থির হইল। দিন স্থির হইল, প্রভু আবার বিজয়া দশমী দিনে অতি প্রত্যুষে বৃন্দাবন চলিলেন। লোক সংঘটন ভয়ে প্রভুর গমনবার্ত্তা দুই চারিজন মর্ম্মী-ভক্ত ব্যতীত আর কেহ জানিতে পারিলেন না। প্রভু কটক ডাহিনে রাখিয়া নিবিড় বনপথে, ঝারিখণ্ড দিয়া, চলিলেন।

প্রভুর সঙ্গী দুইজনের সহিত এই সাব্যস্থ হইয়াছে যে, তাঁহারা বড় একটা কথা বলিবেন না। প্রভু আপন মনে যাইবেন। তাই প্রভু আপনার মনে চলিয়াছেন। অগ্রে বলভদ্র পথ দেখাইয়া চলিতেছেন, প্রভু বিহ্বল অবস্থায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ আবিষ্ট চিত্তে চলিতে চলিতে গমন করিতেছেন। মধ্যাহ্ন সময় হইলে সঙ্গিগণ প্রভুকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, প্রভু পুত্তলিকার ন্যায় সেখানে বসিলেন। প্রভু আবিষ্ট চিত্তে স্নান করিলেন, ভোজন করিলেন, বিশ্রাম করিলেন; আবার আবিষ্ট চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। রজনী আসিল, আশ্রয় স্থান নাই। অমনি বনে বসিয়া গেলেন। শীত উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু বনে কাষ্ঠের অভাব নাই। অগ্নি সম্মুখে রাখিয়া সকলে নিশিযাপন করিলেন।

যে ঝারিখণ্ডে এখনও বন্যপশু ভয়ে দিবাভাগে বিচরণ করা যায় না, তখন সেখানকার কি অবস্থা ছিল, মনে করুন। প্রভু যে পথে চলিলেন, সে পথে কেহ কখন যান নাই, কাহারও যাইতে সাহস হয় না। প্রভু নিবিড় বনে প্রবেশ করিলেন, ১০।১৫ দিনের পথের মধ্যে লোকালয় নাই। অবশ্য ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার তাঁহাদিগকে ঘিরিল। বলভদ্রের ভয় হইল, কিন্তু প্রভুর হিংস্র জন্তুগণের প্রতি লক্ষ্যও নাই। জন্তুগণ আসিল, আর

প্রভুকে দর্শন করিয়া হয় ফিরিয়া গেল, না হয় মোহিত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। প্রভু স্নান করিতেছেন, এমন সময় হস্তিযুথ জলপান করিতে আসিল। প্রভুকে দর্শন করিয়া তাহাদের হিংসাবৃত্তি অন্তর্হিত হইল। প্রভু গমন করিতেছেন, পথে ব্যাঘ্র শয়ন করিয়া রহিয়াছে। প্রভুর চরণ তাহার গাত্র স্পর্শ করিল। সে কৃতার্থ হইয়া, অতি নম্রভাবে পথ ছাড়িয়া দিল। কখন কখন বা ব্যাঘ্র আকৃষ্ট হইয়া প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আবার মৃগ প্রভৃতি ঐরূপ আকৃষ্ট হইয়া প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। এই রূপ ব্যাঘ্র ও মৃগে দেখা সাক্ষাৎ হইতেছে, এমন কি এক সঙ্গে চলিয়াছে। অতি হিংস্র জন্তুগণের মনেও কোমল ভাব আছে। দেখ না, ব্যাঘ্র পর্য্যন্তও আপন শাবককে লইয়া পালন করিতেছে, শাবকগণের নিমিত্ত প্রাণ দিতেছে। বন্য কুকুরের হিংস্র ভাব দেখ, আর পালিত কুকুরের প্রভু-ভক্তি দেখ। অবশ্য বন্য কুকুরের হৃদয়ে এই কোমল ভাবের অঙ্কুর ছিল, আর উহা, মনুষ্য সহবাসে ক্রমে পালিত হইয়া সদ্গুণ বিশিষ্ট হইয়াছে। যদি ভারি বন্যা হয়, আর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত এক স্থানে ব্যাঘ্র হরিণ প্রভৃতি সমবেত হয়, তবে কেহ কাহার হিংসা করে না। সাধারণ বিপদে তাহা-দের হিংস্রভাব দূরীভূত হয়। সেইরূপ প্রভুর দর্শনে তাহাদের হিংস্রভাব বিলুপ্ত হইয়া কোমল ভাব উদ্দীপ্ত হইয়াছে। কাজেই ব্যাঘ ও মৃগ মুখ শুঁকাশুঁকি করিতে লাগিল। এই মনোহর দৃশ্য দর্শন করিয়া প্রভুর সঙ্গি-গণ অবাক হইলেন এবং প্রভুও সুখী হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

প্রভু গীত ধরিলেন, আর সমস্ত জগত সুশীতল হইল। পক্ষী সকল আনন্দে সেই সঙ্গে সাঙ্গে ধ্বনি করিয়া উঠিল। প্রভু উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিলেন, আর যেন সমস্ত জগৎ এই নামে প্রতিধ্বনিত হইল। বৃক্ষ লতা কুসুমিত হইল, পুষ্প হইতে মধু ঝরিতে লাগিল। প্রভু আপনি একদিন সহজ অবস্থায় বলভদ্রকে বলিলেন, "কৃষ্ণ কৃপাময়, এই বনপথে আমাকে

আনিয়া বড় সুখ দিলেন।" প্রত্যহ বন্য-ভোজন, সর্ব্বদা জনশূন্যতা, পক্ষীর কোলাহল, ময়ূরের নৃত্য, পশুগণের স্বাভাবিক জীবন, বনের শোভা, এই সমুদায় প্রভুকে মোহিত করিল।

প্রভু কখন কখন বন ত্যাগ করিয়া গ্রাম পাইতেছেন। কিন্তু লোক-সমাজ অতি অসভ্য। তাহারাও তাহাদের সঙ্গী ব্যাঘ্র ভল্লুকের ন্যায় হিংস্র। কিন্তু তবু প্রভুকে দর্শন করিয়া তাহারা পরিশেষে ভক্তিতে উন্মত্ত হইতেছে। এমন কি, গ্রাম সমেত বৈষ্ণব হইতেছে। এইরূপে প্রভু বারাণসীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটে অনেকে স্নান করিতেছেন। হঠাৎ সকলে দেখিলেন যে, একটী অতি দীর্ঘকায়, পরম সুন্দর, পরম মধুর ও পরম স্নিগ্ধ বস্তু, প্রেমে টলিতে টলিতে আসিতেছেন। তিনি বয়সে যুবক, তাঁহার বর্ণ কাঁচা সোণার ন্যায়, তাঁহার বাহু আজানুলম্বিত, তাঁহার চক্ষু কমলদলের ন্যায় করুণা-মকরন্দ পূর্ণ, তাঁহার বদন পূর্ণচন্দ্র হইতেও সুখকর। সকলে দেখিলেন যে, তিনি মস্তক অবনত করিয়া, বিহ্বল অবস্থায়, কৃষ্ণ-নাম জপিতে জপিতে, তাঁহাদের মধ্যে উদিত হইলেন। সেই পরম শুভদর্শন সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিলেন। এই সমুদায় লোকের নয়ন অন্য দিকে আর গেল না, প্রভুর শ্রীমুখে আকৃষ্ট হইয়া রহিল। কেহ বা আকৃষ্ট হইয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সকলে ভাবিতে লাগিলেন যে ইনি যিনি হউন, আমাদের জাতীয় মনুষ্য নহেন।

এই সমুদায় লোকের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি ইতিপূর্ব্বে প্রভুকে দেখিয়াছেন। প্রভুর দোসর জগতে নাই, সুতরাং যিনি একবার তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনি আর ভুলিতে পারেন নাই। এই লোকটী ও কাজেই দর্শনমাত্রই প্রভুকে চিনিলেন, তখন তিনি দ্রুতগমনে অগ্রবর্ত্তী হইয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন; বলিলেন, "আমি তপন মিশ্র।"

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, প্রভু যখন অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মাপার গমন করেন, তখন সেই দেশের একজন প্রধান লোক প্রভুকে শ্রীভগবান জানিয়া, তাঁহার শরণাগত হন। আর প্রভু তাঁহাকে বারাণসী গমন করিতে আদেশ করেন; বলিয়াছিলেন যে, "তুমি তথায় গমন কর, তোমার সহিত আমার সেখানে দেখা হইবে।" সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী এখন সম্পূর্ণ হইতেছে। তপন মিশ্র প্রভুকে সমাদর করিয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন। তখন কাশীতে চন্দ্রশেখর নামক বৈদ্য ছিলেন। ইনি শ্রীনবদ্বীপে প্রভুকে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনিও আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন।

কাশী ও নদীয়া ভারতবর্ষে দুই প্রধান স্থান। নদীয়া ন্যায়ের স্থান, কাশী বেদের স্থান। নদীয়ায় তন্ত্র-চর্চ্চা, আর কাশীতে জ্ঞান-চর্চ্চা বহুল পরিমাণে হয়। নদীয়া গৃহি-পণ্ডিতের এবং কাশী সন্ন্যাসি-পণ্ডিতের স্থান। এই সন্ন্যাসিগণের সর্ব্বপ্রধান প্রকাশানন্দ সরস্বতী। পাণ্ডিত্য ও অধ্যাত্মচর্চ্চায় ইনি ভারতবর্ষে অদ্বিতীয়। যদিচ ন্যায়শাস্ত্রে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বড়, কিন্তু সরস্বতী আবার বেদে সার্ব্বভৌম অপেক্ষা বড়। প্রেম ও ভক্তিধর্ম্মের দুই প্রধান কণ্টক—নৈয়ায়িকগণ ও মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ। নৈয়ায়িকের শিরোমণি সার্ব্বভৌম প্রভুর অনুগত হইয়াছেন। এখন মায়াবাদিগণের সর্ব্বপ্রধান, প্রকাশানন্দ বাকী আছেন। এখন যেই মায়াবাদিগণের সর্ব্বপ্রধান, যে প্রকাশানন্দ তাঁহার নিকট প্রভু আপনি আসিয়া উপস্থিত।

প্রভুর অবতারের কথা প্রকাশানন্দ পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন; শুনিয়া প্রথমে কেবল হাস্য করিয়াছিলেন। তাহার পর শুনিলেন যে, প্রবলপ্রতাপান্বিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার অনুগত হইয়াছেন। তখন একটু উত্তেজিত হইলেন; ভাবিলেন এই নব অবতারটীকে

ধ্বংস করিতে হইবে। ইহাই ভাবিয়া একটী তৈর্থিক দ্বারা প্রভুকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। * পত্রখানিতে সৌজন্যের লেশমাত্র নাই, বরং বিস্তর অবজ্ঞাসূচক বাক্য ছিল। সে পত্রখানিতে একটী শ্লোক লেখা ছিল, তাহার অর্থ এই যে, মূঢ় লোকই কাশী ছাড়িয়া নীলাচলে বাস করে। প্রভুও এই পত্র পাইয়া তাহার উত্তরে একটী শ্লোক পাঠাইলেন। প্রভুর পত্র শিষ্টাচার পরিপূর্ণ। এই পত্র পাইয়া প্রকাশানন্দ প্রভুকে কেবল গালি দিয়া আর একটী শ্লোক লিখিলেন। তাঁহার অর্থ এই যে, "যে ব্যক্তি উত্তম আহার করে, সে কিরূপে ইন্দ্রিয় নিবারণ করে?" প্রভু এই শ্লোকের কোন উত্তর দিলেন না।

অতএব প্রভু ও সরস্বতীতে বেশ জানা শুনা আছে। প্রভু কাশীতে আইলে সে কথা প্রকাশ পাইল। সূর্য্যের উদয় হইলে কি লোকের জানিতে বাকী থাকে? সকলে বলিতে লাগিল যে, এক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, যাঁহাকে দেখিলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। ক্রমে এ কথা প্রকাশানন্দের সভায় উঠিল। একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কাশীতে বাস করিতেন। তিনি সন্ন্যাসিগণের সহিত সর্ব্বদা গোষ্ঠী করিতেন। তিনি প্রভুকে দর্শন মাত্র তাঁহাকে চিত্ত সমর্পণ করিয়া দ্রুতগমনে এই শুভসংবাদ কাশীর সর্ব্বপ্রধান যে প্রকাশানন্দ, তাঁহাকে বলিতে চলিলেন। তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন যে, এক মহাপুরুষ আসিয়াছেন। তাঁহার লক্ষণ দেখিলে জানা যায় যে, তিনি মনুষ্য নন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু প্রকাশানন্দ প্রভুকে জানেন ও ঘৃণা করেন। মহারাষ্ট্রীয়ের নিকট তাঁহার গুণবর্ণনা শুনিয়া মাৎসর্য্যে জ্বলিয়া গেলেন,

---

* প্রভু প্রকাশানন্দকে লইয়া যে লীলা করেন, তাহা বিস্তার করিয়া আমি স্বতন্ত্র গ্রন্থে লিখিয়াছি। এই কারণে এখানে সংক্ষেপে কেবল মূল ঘটনা মাত্র লিখিব।

বলিলেন, "জানি জানি, তাহার নাম চৈতন্য। তাহাকে সন্ন্যাসী কে বলে? সে ঘোর ঐন্দ্রজালিক। শুনিয়াছি তাহাকে যে দেখে সেই শ্রীকৃষ্ণ বলে। আরও শুনিয়াছি যে, প্রবল প্রতাপান্বিত পণ্ডিত সার্ব্বভৌম, তিনিও নাকি তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতেছেন। কিন্তু তাহার ভাবকালি এই কাশীতে বিকাইবে না। তুমি সাবধান হও, সেখানে যাইও না। এ সমুদায় লোকের সঙ্গ করিলে দুই কুল নষ্ট হয়।"

মহারাষ্ট্রীয় প্রভুকে দেখিয়াছেন, এবং দেখিয়া তাঁহাতে চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন। তিনি এই কথায় ভুলিবার নয়। প্রভুর কাছে আসিয়া সমুদায় কথা বলিলেন। বলিলেন, "প্রভু, এই গর্ব্বপূর্ণ সন্ন্যাসী বলে কি যে, তোমার ভাবকালি এই কাশীনগরে বিকাইবে না।"

প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "ভারি বোঝা লইয়া আসিয়াছি, যদি না বিকায় অল্প মূল্যে ছাড়িয়া দিব, নতুবা একেবারে বিলাইয়া দিব।"

মহারাষ্ট্রীয়। প্রভু, আর এক তামাসা শুনুন। সে আপনাকে বেশ জানে; দেখিলাম, আপনার উপর ভারি রাগ। এমন কি, আপনার নামটা পর্য্যন্ত করিলে সহ্য হয় না। সে তিনবার আপনার নাম করিল, তিনবারই বলে 'চৈতন্য',—'কৃষ্ণ-চৈতন্য' একবারও বলিল না।

প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "সে রাগের নিমিত্ত নয়। যাহারা কেবল 'আমি ঈশ্বর' 'আমি ঈশ্বর' ইহাই ধ্যান করে, তাহাদের মুখে সহজে কৃষ্ণ-নাম আইসে না।" সে যাহা হউক, প্রভু পরদিন বৃন্দাবনের দিকে ছুটিলেন। তখন, মহারাষ্ট্রীয় ও চন্দ্রশেখর সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, প্রভু কাহাকেও লইলেন না।

প্রয়াগে আসিয়া প্রভু প্রথমে যমুনা দর্শন করিলেন। এবার সত্য যমুনা, সেবারকার ন্যায় নয়। প্রভু জাহ্নবীকে যমুনা বোধ করিয়া পূর্ব্বে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, এবার আর সে ভ্রম নয়। সত্য সত্যই

যমুনা প্রভুর সম্মুখে,—যে যমুনাতীরে কৃষ্ণ বিচরণ করিয়াছেন, গোপীগণ কৃষ্ণের সহিত কেলি করিয়াছেন। প্রভু ছুটিলেন, সম্মুখে যমুনা: প্রভু যমুনা দর্শনে অমনি ঝাঁপ দিলেন। বলভদ্র সঙ্গে দৌড়িয়া আসিয়াছেন। দেখিলেন, প্রভু ঝাঁপ দিলেন। শীতকাল, তিনি সেই সঙ্গে ঝাঁপ দিলেন না। কিন্তু প্রভু ঝাঁপ দিয়াছেন, আর উঠিবেন কেন? বলভদ্র ভয় পাইয়া পশ্চাৎ ঝম্প দিয়া প্রভুকে উঠাইলেন। প্রভু প্রয়াগে তিন দিন রহিলেন, কিন্তু যমুনা দর্শনে একেবারে প্রভুর অঙ্গ প্রেমে এলাইয়া পড়িল। প্রয়াগে কলরব উঠিল। লক্ষ লক্ষ লোক দেখিতে আসিতেছে, আর প্রেমে পাগল হইয়া প্রভুর নিকট থাকিয়া যাইতেছে। প্রভু যে তিন দিন প্রয়াগে রহিলেন, সে তিন দিন কেবল হরিধ্বনি ব্যতীত আর কিছু শুনা যায় নাই। সেখান হইতে প্রভু দ্রুতপদে চলিলেন। ভিক্ষার নিমিত্ত যেখানে রহিতেছেন, সেখানেই প্রভুর চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোক হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে, অর্থাৎ প্রভু দক্ষিণ দেশে যেরূপ লীলা করিয়াছিলেন এখানেও সেইরূপ করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু, যথা চরিতামৃতে—

> পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা দর্শন।
> তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন॥

প্রভু আনন্দে যমুনায় ঝাঁপ দিয়াছেন; আর যদিও শীতকাল, তবু একবার ঝাঁপ দিলে আর উঠেন না। সুতরাং প্রত্যেক বারে তাঁহাকে উঠাইতে হইতেছে। ক্রমে প্রভু সত্যই মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রভুর এক ক্ষোভ তিনি বৃন্দাবন দর্শন করেন নাই। এই ক্ষোভ জ্বলন্ত অঙ্গাররূপে হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল, তাই জনা জনার গলা ধরিয়া রোদন করিয়াছেন, 'আমি কবে বৃন্দাবনে যাবো, কবে বৃন্দাবনের ধূলায়

ভূষিত হইব, কবে কে আমাকে বৃন্দাবনে লইয়া যাইবে।" প্রভু বৃন্দাবন নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠিতেন, বৃন্দাবন চিন্তা করিলে বিহ্বল হইতেন। শ্রীনবদ্বীপে যে দিবস প্রথমে ভক্তি হইতে প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করেন, সে দিবস ইহাই বলিয়া রোদন করিয়াছিলেন, "কাহা বৃন্দাবন, কাঁহা বেহুলাবন, কাঁহা আমার ভাণ্ডীরবন, কাঁহা আমার মধুবন, কাঁহা যমুনা-পুলিন, কাঁহা গোবৰ্দ্ধন, কাঁহা শ্রীদাম সুদাম, কাঁহা নন্দ যশোদা, কাঁহা—"। শ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম আঁর মুখে আসিল না, অমনি ঘোর মূর্চ্ছায় ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। সে ছয় বৎসরের কথা। এই ছয় বৎসর, "কবে বৃন্দাবন যাইব" দিবানিশি এই যুক্তি করিয়াছেন। একবার চারিমাস বৃন্দাবনের পথে ভ্রমণ করিয়াছেন। আজ সত্যই সেই বৃন্দাবনে যাইতেছেন। এখন নিকটে আসিয়াছেন। সঙ্গে ভক্তরূপ কণ্টক কেহ নাই। জগদানন্দ, গদাধর, নিতাই, সরূপ, প্রভৃতি আপদ বালাই সঙ্গে থাকিলে তাঁহাকে নানা কথা বলিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এবার প্রভু একা, আপন মনে যাইতেছেন, সুতরাং বহির্জগতের সঙ্গে তাঁহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই। কেবল বিহ্বল হইয়া নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন। যে বৃন্দাবনের নাম শ্রবণে প্রভু বিহ্বল হইতেন উহা এখন সম্মুখে।

প্রভু শুনিলেন মথুরায় আসিয়াছেন, অমনি দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। ও উঠিয়া হুঙ্কার করিয়া বিশ্রামঘাটে ঝম্পপ্রদান করিলেন। অবগাহনান্তে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর হুঙ্কারে দিক্ সকল কম্পিত হইতে লাগিল। অমনি লোক সংঘট্ট হইতে আরম্ভ করিল। লোক কৌতুক দেখিতে আগমন করিতেছে, আর প্রভুর দর্শনে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কোলাহল করিতেছে। এইরূপে মথুরায় আসিবামাত্র মহা কোলাহল হইয়া উঠিল। যাঁহারা বিজ্ঞ তাঁহারা একেবারে অবাক হইলেন। তাঁহারা

ভাবিতে লাগিলেন যে, যাঁহার দর্শনমাত্রে লোকে প্রেমে উন্মত্ত হয়, সে ত সামান্য জীব নয়! এ বস্তুটী কে? তবে কি আমাদের কৃষ্ণ আবার আসিলেন? কাহার মনে এরূপও উদয় হইল যে, ভক্তিতে নৃত্য, এরূপ ভজন কেবল মাধবেন্দ্রপুরীর গণ ব্যতীত আর কেহ জানেন না। অন্য সকলে হরি হরি বলিয়া কোলাহল করিতেছে, কিন্তু উহার মধ্যে একজন নৃত্য করিতেছেন। প্রভু ঐরূপ নৃত্য করিতে দেখিয়া তাঁহাকে ধরিলেন, ধরিয়া দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দুই প্রহর গেল।

মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত দেখিয়া এই লোকটী প্রভুকে ধরিয়া আপন গৃহে লইয়া আসিলেন। ইনি ব্রাহ্মণ, নাম---কৃষ্ণদাস। তাঁহার গৃহে আসিয়া প্রভু বাহ্যজ্ঞান পাইলেন। তখন প্রেমে গদগদ হইয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই ভক্তি কোথা পাইলে?' তাঁহার উত্তরে বুঝিলেন যে, এই ব্রাহ্মণ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। প্রভু এই কথা শুনিবামাত্র অতি ভক্তি ভাবে তাঁহার চরণে পড়িলেন। ইহাতে সেই ভাল মানুষ ব্রাহ্মণ ভয় পাইয়া প্রভুর হাত ধরিলেন। প্রভু তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি মাধবেন্দ্রের শিষ্য, অতএব তাঁহার পূজ্য। তখন কৃষ্ণদাস বুঝিলেন ও পরে শুনিলেন যে, মাধবেন্দ্রের সহিত প্রভুর সম্বন্ধ আছে। কৃষ্ণদাস জাতিতে সনোড়িয়া ব্রাহ্মণ। সন্ন্যাসিগণ এরূপ ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করেন না। কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহার অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন শুনিয়া, প্রভু তাঁহাকে রন্ধন করিতে অনুমতি করিলেন। ইহাতে কৃষ্ণদাস অতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি সনোড়িয়া, প্রভু যদি তাঁহার অন্ন গ্রহণ করেন, তবে লোকে তাঁহাকে নিন্দা করিবে। প্রভু এ কথা শুনিলেন না; বলিলেন, "ধর্ম্মপথ ভিন্ন ভিন্ন, ইহার নিমিত্ত এক মীমাংসা আছে। মহাজন যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহাই ধর্ম্ম।

পুরী গোসাঞি তোমার অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব সেই আমার ধর্ম্ম।”

প্রভু কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে চলিলেন। প্রভুর বৃন্দাবনদর্শন বর্ণনা করে ত্রিজগতে কাহারও এ সাধ্য নাই। কেবল “শ্রীবৃন্দাবন” এই নাম শ্রবণে প্রভুর যে রসের উদয় হয় তাহাতে জগত ভাসিয়া যায়, সেই প্রভু আপনি সেই শ্রীবৃন্দাবনের মাঝখানে। দূরদেশে থাকিয়া প্রভু শ্রীবৃন্দাবনের একমাত্র রজ পাইলে তাহা লইয়া এক মাস আনন্দে যাপন করিতেন, এখন প্রভু বৃন্দাবন ভূমিতে। শ্রীবৃন্দাবন স্মরণমাত্র প্রভুকে আনন্দে উন্মত্ত করিত; এখন প্রত্যেক বৃক্ষ, প্রত্যেক লতা, প্রত্যেক পাতা প্রভুর চিত্তকে আনন্দ দিতেছে। প্রভু যমুনার নামে মূর্চ্ছিত হইতেন, অদ্য উহা সম্মুখে। প্রভু যমুনার জল পান করিতেছেন। কিন্তু পান করিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। দারুণ শীতকাল, কিন্তু যমুনায় অবতরণ করিয়া আর উঠিতেছেন না। প্রভু বৃক্ষ দেখিয়া উহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন। আলিঙ্গন করিয়া অতি প্রিয়জন আলিঙ্গনে যে সুখ তাহাই অনুভব করিতেছেন; সুতরাং সে বৃক্ষ ছাড়িতেছেন না। কিন্তু প্রভু এইরূপ লক্ষ লক্ষ বৃক্ষের মাঝে। প্রভুর দুঃখ এই যে, তাঁহার মোটে দুই চক্ষু ও দুই কর্ণ, একটী দেহ ও একটী চিত্ত। প্রভু একটী ছিন্ন পত্র লইয়া ব্যথিত হইয়া উহাকে বুকে করিয়া রোদন করিতেছেন। যে নিষ্ঠুর সেই পত্রকে ছিন্ন করিয়াছে তাহাকে নিন্দা করিতেছেন, আর সেই পত্রকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বারংবার চুম্বন করিতেছেন। প্রভুর অন্তরে এক একবার আনন্দের বান আসিতেছে, আর অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। প্রভুর এইরূপ মূর্চ্ছা ঘন ঘন হইতেছে। কখন কখন প্রভুর ঐরূপ ঘোর মূর্চ্ছা হইতেছে যে, সঙ্গিগণ ভীত হইয়া তাঁহার সন্তর্পণ করিতেছেন। প্রভু চলিয়াছেন নাচিয়া নাচিয়া। ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, বৃন্দাবনের সহজ

কথা সঙ্গীত ও সহজ চলন নৃত্য। শ্রীবৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীবৃন্দাদেবী যেন তখন জানিতে পারিলেন যে, বহুদিন পরে তাহার নাথ আসিয়াছেন। নতুবা সমস্ত বৃন্দাবন প্রফুল্লিত হইল কেন? লতা বৃক্ষ সজীব কেন? অকালে কেন বসন্তের উদয় হইল? যথা পদ :—

বৃন্দাবনে উপনীত, তরুলতা কুসুমিত,—ইত্যাদি।

প্রভুর মস্তকে পুষ্প-বৃষ্টি হইতেছে; বহিরঙ্গ লোকে দেখিতেছে যেন বায়ুতে সঞ্চালিত হইয়া পুরাতন কুসুম শাখা হইতে আপনা আপনি মৃত্তিকাতলে পড়িতেছে। কিন্তু তাহা নয়. প্রভুর মস্তকে যে ফুল-বৃষ্টি হইতেছে, তাহার মধ্যে একটীও পুরাতন নয়। প্রভুর মস্তকে বাসী ফুল? তাহা কি হইতে পারে? প্রভুর মস্তকে আবার কুসুমমধু বর্ষিত হইতেছে. আর কোথা হইতে লক্ষ লক্ষ মধুকর আসিয়া প্রভুকে ঘিরিয়া গুন গুন করিতেছে। কথা কি. তিনি সকলের. আর সকলে তাঁহার। আজ না. কা'ল না. চিরদিনের নিমিত্ত। তিনি সকলের প্রাণ. আর সকলে তাঁহার প্রাণ। এমত স্থলে যেরূপ প্রেমের তরঙ্গ সম্ভব তাহাই বৃন্দাবনে হইতে লাগিল। জড় ও জীব বহু বল্লভকে পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইল।

বৃক্ষলতার যখন দশা এরূপ, তখন প্রাণিমাত্রের যে কিরূপ, তাহা অনুভব করা যায়। মৃগপাল আইল. প্রভুকে ছাড়িয়া যাইবে না। ময়ূর ময়ূরী প্রভুর অগ্রে অগ্রে নৃত্য করিয়া চলিল। শুক সারী উড়িয়া প্রভুর হস্তে ও মস্তকে বসিতে লাগিল, উড়িবে না, তাহাদের ভয় নাই। ভৃঙ্গপাল তাঁহাকে ঘিরিয়া তাহাদের ভাষায় তাঁহার গুণ গান করিতে লাগিল। প্রভু, মৃগের গলা ধরিয়া তাহাদের মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। আর অমনি মৃগের নয়নে আনন্দধারার সৃষ্টি হইল। প্রভু শুক. সারীর সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। ময়ূর অগ্রে নৃত্য করিতেছে,—এমন সময় সম্মুখে দেখেন বহুতর গাভী রহিয়াছে।

অমনি যেন সাক্ষাৎ ধবলী, শ্যামলী, অমলী ও বিমলী প্রভৃতি সেখানে আবির্ভূতা হইলেন। প্রভু হুঙ্কার করিলেন, গো-পালও উচ্চপুচ্ছ করিয়া প্রভুর দিকে ছুটিয়া আইল। প্রভু বহুবল্লভ, সমস্ত গো-পাল প্রভুকে ঘিরিয়া নানা উপায়ে তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। মূর্খ গো-রক্ষকগণ এ সমুদায়ের কোন তথ্য জানে না। তাহারা গরু ফিরাইতে গেল, কিন্তু গো-পাল প্রভুকে ছাড়িয়া যাইবে না। প্রভু চলিয়াছেন, সঙ্গে গো-পাল চলিল। প্রভু গো-পালের প্রতি চিরপরিচিতের ন্যায় স্নেহ-দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, আর তাহারাও প্রভুর প্রতি চিরপরিচিতের ন্যায় চাহিতে লাগিল। প্রভুর আনন্দধারা পড়িতেছে, গো-পাল গুলিরও সেইরূপ।

প্রভু এ বৃক্ষতল হইতে ও বৃক্ষতলে, এ বন হইতে ও বনে চলিয়াছেন, প্রভু কেবল নৃত্য করিতেছেন, অবসর নাই ক্লান্তিও নাই। আনন্দে সর্ব্বশরীর তরঙ্গায়মান হইতেছে। কখন রাধা-ভাব, কখন কৃষ্ণ-ভাব। মনানন্দে বলিতেছেন, "কৃষ্ণ-বোল।" বৃন্দাবনে হরি বোল নাই। হরি বড় দূরের সামগ্রী। বৃন্দাবনের বুলি "কৃষ্ণ-বোল।" প্রভু কৃষ্ণ-বোল বলিয়া আনন্দধ্বনি করিতেছেন, আর যেন উহাতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। জড়দেহের প্রাণ—শোণিত, শ্রীবৃন্দাবনের প্রাণ—আনন্দ। শ্রীবৃন্দাবনের যিনি নাগর, তাঁহার নাম শুনিলে আনন্দে অঙ্গ পুলকিত হয়। তাঁহার নাম শ্যামসুন্দর, কানাইয়ালাল, কৃষ্ণ, নটবর, কানু। তিনি কি করেন, না নিধুবন, ভাণ্ডীরবন, মধুবন, তালবন, বেহুল-বন প্রভৃতিতে বিচরণ করেন। তিনি যমুনা-পুলিনে নিজ মনে বসিয়া বেণুগান করেন। বৃন্দাবনের সম্পত্তি—যমুনা-পুলিন, ধীর সমীর, গোচরণ, গোকুল, মালতীর মালা, ময়ূরপুচ্ছ। হে পাঠক মহাশয়, এই শ্রীবৃন্দাবন তোমাতে স্ফূর্ত্তি হউক, আমি বৃন্দাবন বর্ণনা করিতে পারি-

লাম না। এই শ্রীবৃন্দাবনে স্বয়ং বৃন্দাবন-নাথ বিচরণ করিতেছেন। আর অধিক বলিবার ক্ষমতা নাই।

চণ্ডীদাস 'পিরীতি' এই তিনটী আখরের পূজা করিয়াছেন। কারণ এই প্রেম শ্রীভগবানের সর্ব্বপ্রধান সম্পত্তি। আর তিনিই এই ধনের একমাত্র পূর্ণ অধিকারী, এবং অধিকারী হইতে সমর্থ ও উপযুক্ত। সেই তিনি আজ প্রেমে অভিভূত ও বিদগ্ধ, তাঁহার হৃদয় প্রেমে জর জর। এই প্রেমধনে ধনী বলিয়া তিনি পরমানন্দময়, এই প্রেম আস্বাদনের নিমিত্ত তাঁহার এই বৃহৎ সৃষ্টি। তিনি চিরদিন প্রেমে মজিয়া আছেন। আচ্ছা, এই যে শ্রীভগবান, তিনি কি করেন? কেমন করিয়া তিনি তাঁহার চিরদিনের দিবানিশি যাপন করেন? তাঁহার কি বিরক্তি হয় না? এমন কি অবস্থা হয় না, যখন তাঁহার সময় কাটান দুরূহ ব্যাপার হয়?

ইহার উত্তর শ্রবণ করুন। প্রেম আনন্দের প্রস্রবণ। তাহার প্রমাণ এই যে, প্রেমের যে অল্প ছায়া জগতে দেখা যায়, উহা হইতে অজস্র পীযূষ ধারা বহিয়া থাকে। সুতরাং যাহা প্রেমের ছায়ামাত্র, তাহা হইতে যখন এত আনন্দ, তখন তাঁহার সেই অখণ্ড পূর্ণ ও বিমল প্রেম-প্রস্রবণ হইতে কি আনন্দ না উৎপত্তি হয়? এই জগতে প্রেম নাই, প্রেমের ছায়া আছে। সেই ছায়ায় কি কি আছে দেখুন। জননী, শিশুসন্তান লইয়া দিবানিশি যাপন করিতেছেন। দেখিবে যে তাঁহার বিরক্তি নাই, তিনি কেবল সেই শিশু সন্তানটী লইয়া অনন্ত জীবন কাটাইতে প্রস্তুত। যখন কোন কার্য্য নাই, তখন শিশুটী কোলে করিয়া তাহার মুখ দেখিতেছেন, আর তাহাতেই সুখে তাঁহার কাল কাটিয়া যাইতেছে। স্ত্রী, পৃথিবীর সমুদয় ত্যাগ করিয়া, পতিকে লইয়া জগতের এক কোণে থাকিবেন, তাঁহার আর কোন অভাব বোধ থাকিবে না। বিবাহ হইবে এই কথা

শুনিয়া বর কন্যা আনন্দে ডগমগ। গর্ভ হইয়াছে জানিয়া গর্ভধারিণী আহ্লাদে আত্মহারা হইয়াছেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল আর প্রেমের একটী বস্তু পাইয়া জনক জননী আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। প্রেমের অনন্ত মুখ ; এক এক মুখে এক এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উৎপত্তি হয়। এই প্রেমের সহায় পূর্ব্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, উৎকণ্ঠা, মান, মিলন, বিরহ। এই সমুদয় প্রেমের চিরসঙ্গী, ইহারা প্রেমের পুষ্টিসাধন করে, আর এ সমুদয় একটী আনন্দের অকূল সাগর। এই প্রেমধনে শ্রীভগবান সম্পূর্ণরূপে অধিকারী। যাহার যত প্রেমের বস্তু, তাহার ততটী সুখের প্রস্রবণ, তাহার তত সুখ। সুতরাং শ্রীভগবান্ আনন্দময়।

এই যে প্রভু আনন্দে মগ্ন হইয়া শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ করিতেছেন, ইহার মধ্যেও তাঁহার প্রিয় যে জীবগণ তাহাদিগকে বিস্মৃত হয়েন নাই। মুসলমান রাজার অত্যাচারে বৃন্দাবন ছারেখারে গিয়াছে, ভদ্রলোকের বাস উঠিয়াছে, বৃন্দাবন জঙ্গলময় হইয়াছে। যে মাসে প্রভু সন্ন্যাস করেন, তাহার কিছু পূর্ব্বে ভূগর্ভ ও লোকনাথকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়াছেন। উদ্দেশ্য যে, তাঁহারা বৃন্দাবন পুনরুদ্ধার করিবেন। তাঁহারা আসিয়া শুনিলেন যে, প্রভু সন্ন্যাস করিয়া দক্ষিণে গিয়াছেন। প্রভুকে তল্লাস করিতে তাঁহারা সেই দক্ষিণ দেশে গমন করিলেন। এইরূপে তাঁহারা প্রভুকে সমস্ত দক্ষিণ দেশ তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছেন। এই অবকাশে প্রভু বৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের সঙ্গে প্রভুর দেখা হইল না। প্রভু লোকনাথ ও ভূগর্ভকে যে ভার দিয়াছিলেন, আপনি তাহাই করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ বৃন্দাবন উদ্ধার।

প্রভু বনভ্রমণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধনে গমন করিলেন। আর অমনি একটী অপরূপ বালক আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িল। বালকটী পঞ্জাব দেশস্থ লাহোর নগরের এক ব্রাহ্মণকুমার। বয়ঃক্রম যখন ৭

বৎসর, তখন কোন এক রজনীতে সে শয়ন করিয়া আছে, এমন সময় দেখিল যে, একটী পরম সুন্দর গৌরবর্ণ যুবক তাহার প্রতি প্রেমচক্ষে চাহিয়া রোদন করিতে করিতে তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। বালক জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? তাহাতে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার নাম গৌরাঙ্গ, এবং তাঁহার সহিত তাহার অর্থাৎ বালকের বৃন্দাবনে দেখা হইবে। এই কথা শুনিয়া বালক গৌরাঙ্গ বলিয়া কান্দিয়া উঠিল। তাঁহার পিতা মাতা তাহাকে রাখিতে পারিলেন না। বালক গৌরাঙ্গের নাম করিতে করিতে দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিল। সুতরাং ধ্রুবের কাহিনী যে কল্পিত নহে, ইহা সপ্রমাণ হইল। ধ্রুব, পদ্মপলাশ-লোচন বলিয়া ছুটিয়াছিল, এ ব্যক্তি গৌরাঙ্গ বলিয়া ছুটিল। শ্রীমদ্-ভাগবতের কথা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গৌরাঙ্গ অবতার। প্রভু আপনি প্রহ্লাদের লীলা করিয়াছেন। প্রভু তাহার টোলে পাঠ দিতেছেন, কিন্তু পাঠ দিতে পারেন না। কৃষ্ণনাম বিনা তাঁহার মুখে আর কিছু আইসে না। অবশ্য এখানে ষণ্ডামার্ক কেহ ছিলেন না; কিন্তু তাহার থাকিবার প্রয়োজন কি? ষণ্ডামার্কের অভাব কি? অভাব প্রহ্লাদের। প্রহ্লাদের কাহিনী সপ্রমাণ হইল, ধ্রুবের বাকি রহিল; তাই লাহোরে ধ্রুব সৃষ্টি করিলেন। বালক পূর্ব্ব-দক্ষিণে ছুটিল, আর শ্রীভগবান যেরূপ ধ্রুবকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহাকে রক্ষা করিয়া বৃন্দাবনে লইয়া আসিলেন। সেখানে, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকট, সেই বালক বাস করিতে লাগিল।

বালক বলে, আমার গৌরাঙ্গ কোথায়? লোকে বলে, গৌরাঙ্গ কে? এ কৃষ্ণের স্থান, এ গৌরাঙ্গের স্থান নয়। লোকে ভাবে বালকটী অর্দ্ধ ক্ষিপ্ত। কিন্তু সে অতি ভাল মানুষ, আর তাহাকে অতিশয় সন্তুষ্ট দেখিয়া, লোকে তাহাকে স্নেহ করে। এইরূপে তাহার বহু বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল। শ্রীগৌরাঙ্গ যখন নাচিতে নাচিতে গোবর্দ্ধনে আসিলেন, তখন

সেই যুবক (কারণ তখন সে যুবক হইয়াছে) দেখিবামাত্র প্রভুকে চিনিল। বুঝিল যে, এই তাহার প্রাণনাথ. ইঁহারই নিমিত্ত সে দেশান্তরী, ইঁহারই নিমিত্ত সে বৃক্ষতলবাসী, উদাসীন। ইঁনিই তাহাকে পাগল করিয়া দেশ, আত্মীয়-স্বজন, পিতা-মাতা হইতে এত দূর লইয়া আসিয়াছেন। বালক ভাবিতেছে, আমি ত প্রাণনাথ পাইলাম. প্রাণনাথ কি আমাকে চিনিবেন? এইরূপ ভয়ে ভয়ে ব্রাহ্মণযুবক প্রভুর পদতলে পড়িল।

যখন বিদেশিনীরূপে কৃষ্ণ, রাধার সমীপে উদয় হইলেন, এবং তাহার পরে যখন তাঁহার স্ত্রীবেশ ঘুচাইলে দেখা গেল যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ, তখন শ্রীমতী বলিয়াছিলেন—

"এই ত আমার প্রাণনাথ হে।
আমি পেলাম, আমি পেলাম, আমি পেলাম হারাধনে হে।"

আবার যখন বহু বিরহে রাধা-কৃষ্ণ মিলন হইল, তখন শ্রীমতী বলিয়াছিলেন--

"বহু দিন পরে, বঁধু এলে ঘরে।"

উপরে যে দুইটী মিলনের পদ দিলাম, যুবক এই দুই ভাবে বিভাবিত হইয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন।

যুবক প্রণাম করিলে, প্রভু অমনি সমুদায় ভাব সম্বরণ করিলেন, করিয়া মধুর হাসিয়া, তাহাকে চিরপরিচিতের ন্যায় হৃদয়ে ধরিয়া আলিঙ্গন দিলেন। যুবক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

প্রভু যুবককে বলিলেন, "তোমার নাম কৃষ্ণদাস। তুমি যাও, পশ্চিম দেশ উদ্ধার কর।" যুবক প্রভুর সঙ্গ ছাড়িতে চাহিলেন না। ইহাতে প্রভু তাহাকে তিরস্কার করিলেন। তখন কৃষ্ণদাস বলিলেন, "আমি কাঙ্গাল, বিদ্যা বুদ্ধি হীন, আমি কিরূপে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিব।" প্রভু তাঁহার নিজের গলা হইতে গুঞ্জমালা খুলিয়া তাহার গলায় দিলেন। বলিলেন,

"এই ধর মালা ধর, এখন শীঘ্র গমন কর।" ইহাতেই তিনি জীব নিস্তারের শক্তি পাইলেন! কৃষ্ণদাস যেখানে গমন করেন, অমনি লোক আসিয়া তাঁহার চরণে শরণ লইতে লাগিল। আবার তাহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে, তিনি প্রভুকে অল্পক্ষণ মাত্র দর্শন করিলেন, ইহাতেই ভক্তি-ধর্ম্ম কি, সমুদায় তাঁহার হৃদয়ে স্ফুর্ত্তি হইল। প্রভুর গুঞ্জামালা পাইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম হইল "কৃষ্ণদাস গুঞ্জমালী।" তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অন্য দেশে গেলেন। সেখানে কি করিলেন শ্রবণ করুন, যথা ভক্তমালে :—

"বড়ই প্রতাপ হইল লোকে চমৎকার।
অলৌকিক দরশন আকার প্রকার॥
গৌরাঙ্গ ভজয়ে লোক তার উপদেশে।
প্রভুর দোহাই ফিরিল দেশে দেশে॥"

গুঞ্জমালী মালোবারে শ্রীগৌর-নিতাই মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বনোয়ারিচন্দ্রকে আনাইলেন। তাঁহাকে সেই গাদির মহান্ত করিয়া অন্য স্থানে চলিলেন। এইরূপে গুজরাটে যাইয়া আবার গৌর-নিতাই বিগ্রহ স্থাপন করিলেন। গুঞ্জমালী প্রেমানন্দে গুজরাট মাতাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার যশ শুনিয়া সেখানে গৌড়ীয় শ্রীচক্রপাণি যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। দুই জনে পরস্পরে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। এইরূপ সেখানে দুটী গাদি হইল। গুঞ্জমালীর গাদির নাম বড় গৌড়িয়া, ও চক্রপাণির গাদির নাম ছোট গৌড়িয়া হইল। যথা ভক্তমালে :—

"ছোট গৌড়িয়া আর বড় যে গৌড়িয়া।
অদ্যাপি আছয়ে খ্যাতি জগত ব্যাপিয়া॥"

সেখান হইতে গুঞ্জমালী নিজ দেশে আসিয়া ওলম্বা বা ওলয়া নামক

গ্রামে আর এক সেবা প্রকাশ করিলেন। সেখান হইতে সেই তরঙ্গ সিন্ধুদেশে প্রবেশ করিল। যথা ভক্তমালে ঃ—

"পঞ্জাবের পশ্চিমে সিন্ধু নাম দেশ।
উদ্ধার করিতে জীব করিল প্রবেশ॥
হিন্দু যতেক ছিল বৈষ্ণব করিল।
মুসলমান যত ছিল হরিভক্ত হইল॥
গোসাঞির সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া যবন।
বৈষ্ণব আচার করে নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
যবনের আচার ত্যজিল সর্ব্বজন।
হরিনাম জপে মালা তিলক ধারণ॥"

সে কালে ইহা হইয়াছিল, এখন আর তাহা নাই। অন্যত্র দূরের কথা, এখন বাঙ্গালায়ও কি আছে? কিন্তু হে ভক্ত, প্রভুর প্রতাপ একবার স্মরণ করুন।

শ্রীমদ্ভাগবতের আখ্যায়িকার মধ্যে যাঁহাদের কথা উল্লেখ আছে, শ্রীগৌরলীলায় সকলকেই দেখিতেছি। প্রহ্লাদ পাওয়া গেল, ধ্রুব পাওয়া গেল, কৃষ্ণ পাইলাম, বলরাম পাইলাম। এই বলরামের কথা একবার ভাবুন। শ্রীনিতাই ঠিক বলরামের মত। ঠাকুরের দাদা, চঞ্চল, প্রেমে মাতোয়ারা।

ব্রজের নিগূঢ় রস আস্বাদন জীবের চরম সৌভাগ্য। একজন অন্য জনকে নানা উপায়ে বাধ্য করে। কেহ উৎকোচ দেয়, দিয়া বাধ্য করে। যেমন কালীমার ভক্তগণ কালী মাতাকে ছাগ দান করে। কেহ খোসামোদ করিয়া বাধ্য করে। যেমন কোন ভক্ত শ্রীভগবানকে "তুমি দয়াময়" ইত্যাদি বলিয়া ভুলাইয়া শেষে বলেন, "অতএব আমাকে টাকা দাও, ঐশ্বর্য্য দাও" ইত্যাদি। কেহ জীবের উপকার করিয়া ভগবানকে বাধ্য করে।

যেমন লোকে দরিদ্রকে দান অর্থাৎ পুণ্যকার্য্য করিয়া ভাবে যে ভগবানের উপকার করিলাম। আবার কেহ আনুগত্য দেখাইয়াও বাধ্য করে, যেমন প্রভুভক্ত দাস তাহার প্রভুকে, কিম্বা প্রজা রাজাকে বাধ্য করে। ইহাকে বলে ভক্তি। ব্রজলীলার রস আর কিছু নয়, শ্রীভগবানকে নিজজন বলিয়া ভজনা করা। কিন্তু সর্ব্ব জগতে শ্রীভগবান বরদাতা রাজা বলিয়া পূজিত হন। "তিনি আমার, আমি তাঁহার", জীবে ও ভগবানে এই সম্বন্ধ। সুতরাং তাঁহাকে আপন বলিয়া ভজনা করাই শ্রেয়, অন্য ভজন কেবল বিড়ম্বনা, আর তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা মাত্র। কুরুক্ষেত্র যজ্ঞের সভায় শ্রীকৃষ্ণ বলরাম আছেন, এমন সময় যশোদা দূর হইতে "গোপাল' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তখন দুই ভাইয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। "কে ডাকে আমাকে?" শ্রীকৃষ্ণের এই প্রশ্নে বলরাম বলিতেছেন যে, "যে ডাক শুনিতেছি এ যে ব্রজের ডাক, অন্য স্থানের নয়; বোধ হয় জননী যশোদা আসিয়াছেন।" ব্রজের ডাক এখন বুঝিলেন কি? "হে দয়াময়!" মথুরার ডাক, আর "হে গোপাল" ব্রজের ডাক।

কৃষ্ণলীলা-স্থান এই ব্রজরস প্রস্ফুটিত করে। রাসস্থলী-দর্শনে হৃদয়ে রাসরসের উদয় হয়। কিন্তু রাসস্থলী কোথায়? রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড দর্শনে ব্রজলীলার স্ফুর্ত্তি হয়, কিন্তু সে কুণ্ডদ্বয় কোথায় ছিল? সে সমুদায় লুপ্ত হইয়াছিল, কোথা কি ছিল, কেহ তাহা অবগত ছিলেন না। প্রভু এই যে আনন্দে বিচরণ করিতেছেন, ইহার মধ্যে আবার জীবের উপকারের নিমিত্ত তীর্থ উদ্ধার করিতেছেন। এইরূপ তিনি হঠাৎ চেতনা লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড কোথা? কিন্তু কেহ বলিতে পারিল না। তখন আপনি যাইয়া এক ধান্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তাহাই এখন শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড হইয়াছেন!

প্রভু যেখানে যে দেশে গমন করেন, সেখানে এই কথা আপনা আপনি প্রচার হয় যে, কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। বৃন্দাবনেও অবশ্য তাহাই হইল। সকলে বলিতে লাগিল, কৃষ্ণ আবার আসিয়াছেন। যখন কৃষ্ণ আসিয়াছেন জনরব হইল, তখন ভব্য লোকে বুঝিল যে, এই যে কাঞ্চন-বর্ণের সন্ন্যাসী যুবক আসিয়াছেন, ইনিই সে কৃষ্ণ। কিন্তু ইতর লোকে কৃষ্ণকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কৃষ্ণ যে তাহাদের সম্মুখে তাহা তাহারা দেখিল না। বৃন্দাবনে যে শ্রীকৃষ্ণ উদয় হইয়াছেন বলিয়া জনরব উঠে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ একটী কাহিনী শ্রবণ করুন।

জনরব উঠিল যে, কৃষ্ণ উদয় হইয়াছেন আর তিনি প্রত্যহ রজনীতে যমুনায় কালীয় দমন করিয়া থাকেন। এই অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিতে লক্ষ লক্ষ লোক রজনী যোগে যমুনা তীরে দাঁড়াইয়া থাকে। কেহ কিছু কিছু দেখে, কেহ কিছু দেখিতে পায় না। শেষে প্রকাশ পাইল যে, জালিয়াগণ মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত আলো জ্বালিয়া নৌকায় বিচরণ করে। তাহাই দেখিয়া কোন মূর্খ লোকে উপরোক্ত জনবর তুলিয়াছে।

কিন্তু এরূপ দীপ জ্বালিয়া জালিকগণ চিরদিন মৎস্য ধরিতেছে, এরূপ জনরব পূর্ব্বে কখন হয় নাই কেন? কথা এই, শ্রীভগবান আসিয়াছেন তাহা লোকের মনে আপনি উদয় হইয়াছে। শ্রীভগবান ছন্নভাবে আছেন. সুতরাং সকলে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু ভক্ত ব্যতীত আর কেহ, ধরিতে পারিতেছেন না। ভক্তজন প্রভুকে ধরিলেন, সাধারণে তল্লাস করিয়া আর কাহাকে না পাইয়া জালিকের কার্য্য কৃষ্ণের কার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিল।

এদিকে প্রভু ক্রমেই বিহ্বল হইতেছেন। দিবানিশি নৃত্য করিতে-ছেন, ও মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা যাইতেছেন। প্রভু কোথায় আছেন কোথায় যাইবেন, তাহা কেহ জানেন না। প্রত্যহ বহুলোক আসিয়া প্রভুকে

নিমন্ত্রণ করে, ইহার তথ্য প্রভু অবশ্য কিছু জানেন না। এ সমস্ত নিমন্ত্রণের কথা তাহাদের ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে হয়। এই সমস্ত নিমন্ত্রণের মধ্যে ভট্টাচার্য্য একটী মাত্র গ্রহণ করেন। ইহাতে বহুলোক বঞ্চিত হইয়া যায়। এইরূপ প্রত্যহ বহুলোকে প্রভুকে নিমন্ত্রণ লইবার নিমিত্ত, ভট্টাচার্য্যকে অনুনয় বিনয় করে। এদিকে দিবানিশি কোলাহল, কোথা হইতে যেন লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারা একেবারে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য কীর্ত্তন ও হরিধ্বনি করিয়া দেশ তরঙ্গায়মান করিল। প্রভুর কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই, যেহেতু তিনি আপন প্রেমে বিহ্বল। কিন্তু ভট্টাচার্য্য সামান্য জীব। এই অবস্থা ক্রমে ভট্টাচার্য্যের অসহ্য হইয়া উঠিল। আবার প্রভুকে লইয়া সর্ব্বদা তাঁহার ভয়। কখন কোথায় তিনি যমুনায় ঝাঁপ দিবেন তাহার ঠিকানা নাই, আর ঝাঁপ দিয়া উঠিবেন কিনা তাহারও ঠিকানা নাই। একদিন প্রভু এইরূপে যমুনায় ঝম্প দিয়া আর উঠিলেন না। তখন ভট্টাচার্য্য ও প্রভুর অন্যান্য ভক্তগণ হাহাকার করিতে করিতে তাঁহাকে জলে তল্লাস করিতে লাগিলেন। অনেক তল্লাসের পরে তাঁহাকে পাইলেন, ও তাঁহাকে তীরে উঠাইলেন। ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন যে, প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণের কর্ত্তা তিনি; মহামূল্য ধন তাহার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। প্রভু দিব্যোন্মাদে দিবানিশি বিচরণ করিতেছেন, অতএব তাঁহাকে কোন ক্রমে বৃন্দাবনের বাহির করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই।

ইহাই সংকল্প করিয়া অন্যান্য ভক্তগণের সঙ্গে যুক্তি করিয়া একদিন করযোড়ে প্রভুকে নিবেদন করিলেন। প্রভু ভট্টাচার্য্যের আকিঞ্চনে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন, করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চাও কি?" ভট্টাচার্য্য তখন করযোড়ে বলিলেন, "মকর সংক্রান্তি সম্মুখে, এখন যদি গমন করেন তবে সময়ের মধ্যে আমরা প্রয়াগে উপস্থিত হইতে পারি। এখন প্রভুর যেরূপ আজ্ঞা।"

ঠাকুর বলিলেন, "তাহাই হউক। তুমি আমাকে কৃপা করিয়া বৃন্দাবন দর্শন করাইলে, সুতরাং আমার এ দেহ এখন তোমার। তুমি যখন যেখানে আমাকে লইয়া যাইবে, আমি সেখানেই যাইব।" এই মধুর বাক্যে ভট্টাচার্য্যের নয়ন দিয়া ঝর ঝর জল ঝরিতে লাগিল। তখন পরদিন বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া দেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করিবেন ইহাই সাব্যস্ত হইল।

প্রিয়স্থান বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া প্রভু অত্যন্ত বিকল হইলেন; কিন্তু মায়া তাঁহার অধীন। মায়া তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তিনি ইচ্ছা মাত্রে মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া, বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। যেমন নৌকা দক্ষিণাভিমুখে চলিতেছে, কিন্তু কর্ণধার হাল ফিরাইয়া দিবামাত্র উহা আবার যেরূপ উত্তরমুখে চলে; সেইরূপ যেই বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে সংকল্প করিলেন, অমনি প্রভু তাঁহার চিত্তকে নীলাচলচন্দ্রের দিকে প্রয়োগ করিলেন। তখন নীলাচলচন্দ্র বলিয়া পূর্ব্বদিকে ছুটিলেন। প্রভু যে বৃন্দাবন ত্যাগ করিতেছেন, ভট্টাচার্য্য এ কথা গোপন রাখিলেন, যেহেতু উহার প্রচার হইলে লোকের সংঘটে তাঁহাদের যাওয়া হইবে না। তবে পথে সহায়তার নিমিত্ত কৃষ্ণদাসকে ও প্রভুর রাজপুত একটী ভক্তকে সঙ্গে লইলেন। সাকুল্যে তাঁহারা এই পাঁচজন,—যথা, প্রভু, ভট্টাচার্য্য, ভট্টাচার্য্যের ব্রাহ্মণ ভৃত্য, কৃষ্ণদাস ও রাজপুত ভক্ত।

প্রভু আপন মনে চলিয়াছেন। ইহার মধ্যে কোন এক দিন পথে, কোন গোপবালক বেণু বাজাইল। অমনি প্রভু মূচ্ছিত হইয়া বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায় সেই স্থানে পড়িলেন। এমন সময় কি কেহ বাঁশী বাজায়? কিন্তু এই যে বংশীধ্বনি, সেও রাখালের ইচ্ছায় হয় নাই। প্রভু অপরূপ লীলা করিবেন বলিয়া সে এই বংশীধ্বনি করিয়াছিল।

প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন, ভক্তগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া সন্তর্পণ করিতেছেন, এমন সময় একজন পরম সুন্দর পাঠান যুবক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজার পুত্র, নাম বিজলী খাঁ। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মগুরু আছেন। তিনি পরম গম্ভীর ও ধার্ম্মিক ; আর কতকগুলি সৈন্যও আছে, সকলেই অশ্বারোহী। প্রভুর রূপ ও তেজ দেখিয়া তাহারা অবশ্য কৌতূহলী হইয়া তথায় অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। চঞ্চল যুবক মুসলমান রাজপুত্রের মনে সন্দেহ হইল যে, এই সন্ন্যাসীর নিকট ধন ছিল, আর এই সঙ্গিগণ উহা অপহরণ করিবার নিমিত্ত উহাঁকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অচেতন করিয়াছে। ইহাই ভাবিয়া সে তখনি প্রভুর ভক্তগণকে বন্ধন করাইল। অবশ্য তাঁহারা কতরূপ বলিলেন, কিন্তু কিছুতেই অব্যাহতি পাইলেন না। কথা এই, বালকের হস্তে ছুরিকা ও জীবের হস্তে ক্ষমতা, ইহাতে সর্ব্বদা অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া থাকে। পাঠান রাজপুত্রের যথেচ্ছাচার করিবার শক্তি আছে। পথিকগণ দুর্ব্বল, সুতরাং বল প্রয়োগের এমন সুযোগ ছাড়িবে কেন ?

জীব নাকি বড় দুর্ব্বল, তাই বল প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা তাহাদের বড় প্রবল।

ভক্তগণ কত বলিলেন যে, তাঁহারা প্রভুর দাস, ও প্রভু প্রেমে অচেতন হইয়াছেন, কিন্তু পাঠানগণ তাহা শুনিল না। সেখানেই তাঁহাদিগকে বধ করিবে ইহারই উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। কিন্তু ইহা হইতে পারে না যে, প্রভুর সেবা করিতে করিতে তাঁহার দাসগণ প্রাণ হারাইবেন। কাজেই প্রভু চেতন পাইলেন, চেতন পাইয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া হরিধ্বনি ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া তাহারা মুগ্ধ হইল, কিন্তু প্রভুর হুঙ্কারে তাহাদের মনে ভয়ের উদয় হইল। তখন তাহারা বুঝিল যে নৃত্যকারী বস্তুটী মহাপুরুষ, আর ইচ্ছা করিলে তিনি তাঁহাদিগের

সর্ব্বনাশ করিতে পারেন। অতএব তাহারা ভয়ে ভয়ে ভক্তগণের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল, ইহাতে ভক্তের বন্ধন প্রভুর দেখিতে হইল না। তখন নানা উপায়ে প্রভুর শান্তি করিয়া ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বসাইলেন। এ পর্য্যন্ত প্রভু, পাঠানগণকে লক্ষ্য করেন নাই।

পাঠানগণের অবশ্য ভক্তির উদয় হইয়াছে। প্রভু বসিলে তাহারা এরূপ আকৃষ্ট হইল যে. সকলে আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিল। পাঠান রাজপুত্র বলিতে লাগিলেন, "ইহারা কয়েক জন তোমাকে ধুতুরা খাওয়াইয়া অচেতন করিয়াছিল। ইহারা চোর, তোমার ধন-লোভে তোমাকে প্রাণে মারিতেছিল।" প্রভু বলিলেন, "তাহা নয়, ইহাঁরা আমার সঙ্গী; আমি কাঙ্গাল. আমার ধন নাই। আমার মূর্চ্ছার পীড়া আছে, আর ইঁহারা কৃপা করিয়া আমাকে সন্তর্পণ করিয়া থাকেন।"

বিজলী খান তখন অপ্রতিভ হইলেন। তাঁহার গুরু তখন ধর্ম্মের কথা তুলিলেন। প্রভু কৃপা করিয়া তাহার সহিত কথা কহিলেন। তাহার পরে যাহা হইবার তাহাই হইল। রাজকুমার, তাঁহার গুরু, আর তাঁহাদের সৈন্যগণ সকলে প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। স্থূল কথা এই. ভাগ্যবান পাঠানগুলিকে কৃপা করিবেন বলিয়া প্রভু তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই মুসলমান ধর্ম্মগুরু তখন "কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া বিহ্বল হইলেন, প্রভু তাঁহার নাম রাখিলেন রামদাস। যথা চরিতামৃতে ঃ—

"তা সভারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা।
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা॥
পাঠান-বৈষ্ণব বলি হইল তার খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাইয়ে বেড়ায় মহাপ্রভুর কীর্ত্তি॥
সেই বিজলী খান হৈল মহাভাগবত।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তাহার পরম মহত্ত্ব॥"

এরূপ শক্তি সম্পন্ন অবতার জগতে কে কোথা দেখিয়াছেন ? এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে ব্যক্তি অস্ত্র দ্বারা নিরপরাধ তৈর্থিক বধ করিতেছিল, এক ঘণ্টা পরে সে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নৃত্য করিতেছে ! ইহারা কাহারা ? ইহারা মুসলমান, হিন্দুধর্ম্মের পরম বিদ্বেষী !

প্রভু তাঁহার বৃন্দাবনের সঙ্গিগণকে বিদায় দিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, প্রয়াগ পর্য্যন্ত অবশ্য প্রভুর সহিত আসিবেন। প্রভুর সহিত তাঁহারা চলিলেন। ক্রমে সকলে নির্ব্বিঘ্নে প্রয়াগে আসিলেন ; সেখানে, প্রভুর যমুনার নিকট বিদায় লইতে হইবে। কাজেই হঠাৎ প্রয়াগ ত্যাগ করিতে না পারিয়া প্রভু কিছুকাল সেখানে রহিয়া গেলেন। ইহাতে এই হইল যে, বৃন্দাবনে যেরূপ কলরব হইয়াছিল, প্রয়াগেও সেইরূপ হইল। কোথা হইতে লক্ষ লক্ষ লোক আসিল, আসিয়া ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য ও হরিধ্বনি করিতে লাগিল। প্রয়াগ লোকারণ্য হইল। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত বলেন :—

"গঙ্গা যমুনা নারিল প্রয়াগ ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণ-প্রেমের বন্যাতে ॥"

প্রেমকে বন্যার সহিত তুলনা কেবল প্রভুর অবতারে হইয়াছিল। এমন সময় রূপ গোস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, দবির খাস ও সাকর মল্লিক উপাধিধারী দুই ভাই, গৌড়-রাজ্যেশ্বরের মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহারা দক্ষিণের ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালা দেশে বাস করেন। স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি বলে মুসলমান রাজার মন্ত্রী ও মহা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন। তাঁহাদের আর এক ভাই ছিলেন, তাঁহার নাম অনুপম, তিনি বাড়ী থাকিতেন। বাড়ী রামকেলী গ্রাম, গৌড়ের নিকট, যাহা কানাইর নাটশালা বলিয়া অভিহিত। মুসলমান রাজার কার্য্য করেন বলিয়া তাঁহাদের জাতি গিয়াছে, অর্দ্ধেক মুসলমান হইয়াছেন। যখন মুসলমানগণ হিন্দুগণের

দেব-দেবী কি মন্দির ভগ্ন করেন, তখন তাহার মধ্যে তাঁহাদের থাকিতে হয়। না থাকিলে চাকুরি থাকে না। কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত টান হিন্দু-ধর্ম্মে, তবু ঐশ্বর্য্যলোভে চাকুরী ত্যাগ করিতে পারেন না। করেন কি, না. এদিকে যদিও তাঁহারা সমাজে স্থগিত, তবু নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লইয়া সর্ব্বদা গোষ্ঠী করেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও এরূপ লোকের সহিত সঙ্গ করিতে আপত্তি করেন না। প্রথম কারণ, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী, জলের ন্যায় অর্থ বিতরণ করেন; দ্বিতীয় কারণ, তাঁহারা প্রকৃত হিন্দু, অথচ পরম জ্ঞানী। বাড়ীতে বারমাসে তের পার্ব্বণ, দিবানিশি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেলা; এমন কি, সেকালে রামকেলী গ্রাম একটী অতি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত।

এমন সময়ে প্রভুর প্রকাশ হইল। এই দবির খাস ও সাকর মল্লিক এক প্রকার বৈষ্ণব, অর্থাৎ রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, এই সমুদয় দেবতা মানেন। প্রভু অবতীর্ণ হইবামাত্র তাঁহাদের প্রভুতে অনেকটা বিশ্বাস হইল, আর তখন প্রভুকে গোপনে পত্র লিখিতে লাগিলেন। পত্রের তাৎপর্য্য এই, "প্রভু, তুমি পতিত উদ্ধার করিতে আগমন করিয়াছ, আমাদের ন্যায় পতিত আর পাইবে না, আমাদিগকে উদ্ধার কর।"

প্রভু এ সমুদায় পত্রের উত্তর দিলেন না, তবে করিলেন কি না, তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে একেবারে রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন! প্রভুর সহিত তাঁহাদের মিলন পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। ইঁহারা সনাতন ও রূপ নামে পরিচিত হইলেন। সনাতন, প্রভুকে বলিলেন যে, "বৃন্দাবনে যাইতে হইলে একা গমন করিলে ভাল হয়।" প্রভু বলিলেন, "রামকেলি গ্রামে আমার আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, কেবল তোমাদের সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছি।" তাহার

পরে প্রভু আবার বলিলেন, "তোমরা গৃহে যাও. কৃষ্ণ অচিরাৎ তোমা-দিগকে কৃপা করিবেন।" ইহা বলিয়া প্রভু বৃন্দাবনে না যাইয়া সেখান হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন. ও তাহার পরে শ্রীবৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া এই প্রয়াগে আসিয়াছেন।

এদিকে এই দুই ভাই, যদিও পূর্ব্বে প্রভুর কথা মাত্র শুনিয়া, তাঁহাকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এখন প্রভুর দর্শনে তাঁহাদের সেই বিশ্বাস শতগুণ বদ্ধমূল হইল। শুধু তাহা নয়. তাঁহা-দের ঘোর বৈরাগ্যের উদয় হইল। আর চাকুরী করিতে পারেন না. এমন কি ঘরে থাকিতেও পারেন না। তবে রাজার ভয়ে দুই ভাই একেবারে চাকুরী ছাড়িতে সাহসী হইলেন না। রূপ কনিষ্ঠ, তিনি গৃহে আসিলেন. আসিয়া রহিয়া গেলেন, রাজ-সভায় গমন করেন না। সনাতন গৌড়ে রহিলেন, কিন্তু রাজকার্য্য আর করেন না, বাসায় বসিয়া থাকেন। রাজা সনাতনকে বারবার ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু তিনি পীড়ার ভাণ করিয়া রাজসভায় আইসেন না। রাজা তাহার পরে চিকিৎসক পাঠাইলেন। তিনি যাইয়া বলিয়া দিলেন যে, সনাতনের পীড়া নহে। রাজা তখন স্বয়ং সনাতনের নিকট আসিয়া উপস্থিত। রাজা বলিলেন, "তোমাদের দুই ভাইকে লইয়া আমার সকল কার্য্য, এক ভাই দরবেশ হইল, তুমি কার্য্য করিবে না, আমার কার্য্য চলে কিরূপে?" সেদিন সনাতন একরূপ রাজাকে বুঝাইয়া বিদায় করিয়া দিলেন। এমন সময় রাজা উড়িষ্যা আক্রমণ করিতে চলিলেন. আর সনাতনকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। তখন প্রভুর কৃপায় সনাতন বলিলেন যে, তিনি যাইবেন না। এরূপ দুঃসাহসের কার্য্য সহজ জ্ঞান থাকিতে কেহ করে না, কারণ এরূপ কার্য্যের ফল তখনি প্রাণদণ্ড! কিন্তু সনাতনের তখন প্রাণের মমতা ছিল না, যেহেতু প্রভুর সহিত

মিলনে তাঁহার ঘোরতর বিরাগ ও অনুতাপ হইয়াছে। তখন সনাতনের আপনাকে করিয়া এরূপ ঘৃণা হইয়াছে যে, প্রাণবধ যে একটা দণ্ড, তাহা তাঁহার আর বোধ নাই। তখন তাঁহার হৃদয় কেবল অনুতাপানলে দিবানিশি দগ্ধ করিতেছে, যেন মরিলেই বাঁচেন। যেরূপ শূলরোগী কি মহাব্যাধিগ্রস্ত লোক ভাবে যে, "মরিলেই বাঁচি," সেইরূপ সনাতনের তখন অন্তরে শূলরোগের ও মহাব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রভুর কৃপায় রাজা সনাতনকে বধ করিলেন না, তবে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া, যুদ্ধ করিতে নগর ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। সনাতন সেই ঘোর নরকসদৃশ স্থানে কেবল মহাপ্রভুর চরণ ধ্যান করিয়া প্রাণে বাঁচিয়া রহিলেন। একে কারাগার, তাহাতে আবার সে কালের, সুতরাং ঐশ্বর্য্যশালী সনাতনের অবস্থা মনে করুন।

রূপ পূর্ব্বেই গৌড় ত্যাগ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি আর কারাবদ্ধ হইলেন না। তিনি পূর্ব্বে বাড়ী আসিয়া, তাঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য লইয়া কি করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। যে ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত লোকে অনায়াসে পরকাল নষ্ট করে, এখন ইঁহারা কয়েক ভাই কিরূপে সেই ঐশ্বর্য্যের হাত হইতে উদ্ধার পাইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। রূপ ও সনাতনের সন্তান নাই, তবে কনিষ্ঠ অনুপমের একটী পুত্র আছেন, নাম শ্রীজীব। তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য দিয়া গদিতে বসাইলেন। আর যত ধন ছিল, তাহা বিলাইয়া দিবেন মনস্থ করিলেন। ইঁহারা জানিতেন যে, প্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবেন। কবে যাইবেন তাহা জানিবার নিমিত্ত সেখানে দুইজন চর পাঠাইয়াছিলেন। প্রভু যেই নীলাচল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন চলিলেন, অমনি তাহারা আসিয়া বলিল যে, প্রভু বৃন্দাবনে যাত্রা

করিয়াছেন। তখন তাঁহারা দুই ভাই, রূপ ও অনুপম, কারাগারে সনাতনকে লিখিলেন যে, তাঁহারা দুই ভাই প্রভুর উদ্দেশ্যে বৃন্দাবন চলিলেন, তিনি অর্থাৎ সনাতন, যে গতিকে পারেন খালাস হইয়া পশ্চাৎ আসিতে থাকুন। তাঁহার খালাসের নিমিত্ত দশ সহস্র মুদ্রা মুদিখানায় গচ্ছিত রহিল। এইরূপ পত্র লিখিয়া তাঁহারা দুই ভাই, রূপ ও অনুপম, বৃন্দাবনাভিমুখে যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

তাঁহারা তাঁহাদের বহুমূল্য বসন-ভূষণ পরিত্যাগ করিলেন, করিয়া ছেঁড়া কান্থা ও কৌপীন অবলম্বন করিয়া, কাঙ্গালের কাঙ্গাল হইয়া, প্রভুর চরণ ধ্যান করিতে করিতে বৃন্দাবনাভিমুখে চলিলেন। মনে কেবল এক ভাব, প্রভুকে কিরূপে দর্শন করিবেন। শয়নে স্বপনে কেবল এই এক কথা ভাবেন। সুতরাং যাঁহারা কখনও কষ্ট পান নাই, তাঁহারা যে পথে পথে, অনিদ্রায়, অনাহারে, রৌদ্রে বৃষ্টিতে কষ্ট পাইতেছেন, ইহাতে তাঁহাদের কোন দুঃখ হয় নাই। এত যে অতুল ঐশ্বর্য্য, উহা বিলাইয়া দিয়াছেন। সঙ্গে কপর্দ্দক মাত্র নাই। যাহা আপনি আইসে, তাহাই ভোজন করিয়া জীবন রক্ষা করেন। উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য এক, আশা এক,—প্রভুর চরণ দর্শন করিবেন। তাঁহাদের পাপ বৃহৎ, প্রভু ব্যতীত তাঁহাদের উপায় আর নাই। প্রভুকে ধ্যান করিতে করিতে পাগলের স্তায় চলিয়াছেন। প্রয়াগে যাইয়া দেখিলেন কি হইতেছে, না লক্ষ লক্ষ লোকে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতেছে। প্রয়াগে প্রভুর যে কাণ্ড তাহা বর্ণনা করা জীবের অসাধ্য।

শ্রীরূপ ও অনুপম এই কাণ্ড দেখিয়া বুঝিলেন যে, প্রভু এখানে আছেন, নতুবা এ বন্যা কেন? নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, ধূম দেখিলে অগ্নি নির্দ্দেশ করা যায়। সেইরূপ যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক হরি বলিয়া প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নাচিতেছে, অতএব নিশ্চয় প্রভু সেখানে

আছেন। ইহাই ভাবিয়া অনুসন্ধানে জানিলেন যে, প্রকৃতই প্রভু সেখানে। মধ্যাহ্নের সময় প্রভু নিভৃতে উপবেশন করিলে, দুই ভাই অতি দীনভাবে, দশনে তৃণ ধরিয়া, জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীনের ন্যায়, কাঁপিতে কাঁপিতে, কান্দিতে কান্দিতে, পড়িতে উঠিতে, উঠিতে পড়িতে, প্রভুর নিকটস্থ হইলেন। বলিলেন, "হে দীন-দয়াময়, হে পতিতপাবন, তোমা ব্যতীত আমাদের ন্যায় পতিতকে আর কে আশ্রয় দিবে ?"

প্রভু রূপকে রজনীতে একবারমাত্র দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ-নাথ তাঁহাকে দর্শন মাত্র চিনিলেন। তখন সহাস্যে বলিলেন, "উঠ রূপ! দৈন্য কেন কর? কৃষ্ণের কৃপা অপার। তিনি তোমাদিগকে বিষয় কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" ইহাই বলিয়া বলদ্বারা দুই ভাইকে হৃদয়ে আনিয়া আলিঙ্গন করিলেন। পরে তাঁহাদিগকে নিকটে বসাইয়া তাঁহাদের বৃত্তান্ত সমুদায় শুনিলেন। রূপ যখন বলিলেন যে, সনাতন বন্দী আছেন, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু বলিলেন যে, 'না, তিনি আর বন্দী নাই। তিনি আমার এখানে আসিতেছেন।" প্রভু রূপকে পাইয়া কিছুকাল প্রয়াগে বাস করিতে বাধ্য হইলেন, যেহেতু রূপের সহিত তাঁহার অনেক কার্য্য ছিল।

প্রভু ভুবনবন্ধু, যত প্রেম-পাগলামি করুন না কেন, জীবের প্রতি মমতা, জীবের মঙ্গল কামনা, বরাবর তিনি হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়াছেন। বৃন্দাবন যাইবেন ছল করিয়া পদব্রজে নীলাচল হইতে গৌড়ের নিকট রামকেলী গ্রামে গিয়াছিলেন। কেন না, দুই ভাই রূপ সনাতনকে আপনার রূপ ও গুণ দেখাইয়া ভুলাইয়া কুলের (ঘরের) বাহির করিবেন। কারণ, তাঁহাদের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত তাঁহার নিজের কার্য্য উদ্ধার করে এমন আর কেহ তখন ছিলেন

না। কার্য্য কি? না, বৃন্দাবনের কর্তৃত্ব ভার এবং পশ্চিমে পতিত জীবগণের উদ্ধার।

মনে ভাবুন, বৃন্দাবন কৃষ্ণ-লীলার স্থান। শ্রীপ্রভু জীব-হৃদয়ে, সেই শ্রীবৃন্দাবনের কৃষ্ণকে, চেতন করাইতেছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত যে ধর্ম্ম, তাহার প্রধান অঙ্গ কাজেই বৃন্দাবন। সেখানে এইরূপ শক্তি-সম্পন্ন সেনাপতিগণের প্রয়োজন যে, তাঁহারা সেইস্থান বিপক্ষগণ হইতে রক্ষা করিতে পারেন। প্রভুর ভক্তের মধ্যে যাঁহারা বৃন্দাবন শাসন করিবেন, তাঁহাদের কার্য্য পশ্চিম দেশে প্রভুর ধর্ম্ম প্রচার, ও জঙ্গলময় শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার। আর কার্য্য বলিতেছি। বৃন্দাবন ভারতের যত সাধু ও জ্ঞানীর বিচরণের স্থান। এই সেনাপতিগণকে এইরূপ হইতে হইবে যে, যে কোন সাধু কি জ্ঞানী সেখানে গমন করুন না কেন, তাঁহাদের সেই গৌর-ভক্তগণের নিকট মস্তক নত করিতে হইবে। এইরূপ দুরূহ কার্য্য করে কে? এ সমুদয় কার্য্য যিনি করিবেন, তাঁহাকে প্রভূত শক্তিসম্পন্ন হওয়া চাই।

এই বৃন্দাবনবাসী প্রভু-ভক্তগণের আর এক প্রধান কার্য্য ছিল। প্রভুর শক্তিতে তখন দেশে প্রবল এক বৈষ্ণবদলের সৃষ্টি হইয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীবাস যে প্রার্থনা করেন, "আমাদের গোষ্ঠী বৃদ্ধি পাউক," তাহা হইয়াছে। তাঁহাদের শাসনের নিমিত্ত নিয়মাবলীর প্রয়োজন। নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ও ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অবতারের ধর্ম্ম। ইহা নূতন কাণ্ড, ইহার ঘোর বিরোধী অদ্বৈতবাদী ও জ্ঞানি-পণ্ডিতগণ, আর তাঁহারাই হিন্দুগণের নেতা। অতএব ভক্তি বলিয়া একটী নূতন শাস্ত্র করিতে হইবে। তাহার পরে নূতন সমাজ করিতে হইলে যেরূপ নিয়মাবলীর প্রয়োজন তাহা করিতে হইবে। এ সমুদায় করে কে? এমন শক্তি কাহার? করিলেই বা জগতে মানিবে কেন?

তাই প্রভু স্বয়ং রূপ সনাতন, দুই ভাইকে আনিতে রামকেলীতে গিয়াছিলেন। এখন তাঁহার এক ভাই সম্মুখে, সুতরাং তাঁহাকে লইয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শ্রীরূপসনাতনকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে শিক্ষা দিয়া প্রভু তাঁহাদের দুই ভাইকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। সেখানে দুই ভাই যাইয়া যে সমুদয় অদ্ভুত কাণ্ড করেন. তাহাতে আবার প্রতিপন্ন হইবে যে, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু লোক চিনিতেন। 'আবার" বলি কেন, না প্রভুর লীলা মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে জানা যায়, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। কোথা কোন ভক্তি-আচার্য্য গোপন ভাবে বাস করিতেছেন, তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনিতেন, যেমন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। আবার কাহার নিকটে আপনি যাইতেন, যেমন রূপসনাতন।

এই প্রয়াগে দুইজন মহাজনের সহিত প্রভুর সাক্ষাৎ হয়। ইহাদের একজন বল্লভভট্ট। এক শ্রেণীর বৈষ্ণব আছেন, ইনি তাঁহাদের নেতা। ইনি কয়েকখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ লিখিয়াছেন। শ্রীধর স্বামীকে অবজ্ঞা করিয়া ভাগবতের টীকা করিয়াছেন। তিনি বাল-গোপাল উপাসক। বল্লভভট্টকে অদ্যাপি তাঁহার দলস্থগণ পূজা করিয়া থাকেন। ইহার বাড়ী প্রয়াগের নিকট আম্বুলি বা আউলি গ্রামে। মহাপ্রভুর আগমনে প্রয়াগের নিকটস্থ দেশ সমূহ তরঙ্গায়মান হইয়াছে, সুতরাং বল্লভভট্ট ভাবিলেন এই গৌড়ের বস্তুটী কি একবার দেখিয়া আসি। তাই প্রয়াগে আসিলেন, আসিয়া শ্রীপ্রভুকে দর্শন করিবামাত্র ভক্তিতে গদ গদ হইলেন। তখন অনেক মিনতি করিয়া, প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাড়ী লইয়া চলিলেন। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু বেশ জানেন যে, ভট্টের মনে গর্ব্ব রহিয়াছে, আর তিনি মনে মনে প্রভুকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেন। কিন্তু প্রভুর, জীবের প্রতি স্নেহ ও প্রেম ব্যতীত, দ্বেষ কি হিংসা সম্ভব হয় না। প্রভু ভট্টের বাড়ী চলিলেন, আর ভট্ট তাঁহাকে নৌকায় করিয়া লইয়া চলিলেন।

ভট্টের বাড়ী যমুনার তীরে; সুতরাং যমুনা দিয়া নৌকা চলিল। বোধ হয় সেই লোভেই বা প্রভু ভট্টের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যমুনা দেখিয়া প্রভু হুঙ্কার করিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন, সকলে ধরিয়া উঠাইলেন। তাহাতেই বা রক্ষা কি? কারণ প্রভুকে নৌকায় উঠাইলে তিনি নৃত্য আরম্ভ করিলেন! তাহাতে নৌকায় ঝলকে ঝলকে জল উঠিতে লাগিল। এই যে প্রভু প্রেমের তরঙ্গে নানাবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছেন, তবু ভট্টের নিকট বলিয়া প্রভু অনেক ধৈর্য্য ধরিয়াছেন। কারণ ভট্ট বহিরঙ্গ লোক, বহিরঙ্গ সঙ্গে প্রেম প্রস্ফুটিত হয় না। যথা চরিতামৃতে ঃ—

"যদ্যপি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য মন।
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ॥"

শ্রীরূপ গোস্বামী যখন প্রভুকে প্রথমে দর্শন করেন, তখনই প্রভুতে বিশ্বাস হইয়াছে; কিন্তু একটু বাকি আছে। তখন ভাবিতেছেন, "কি আশ্চর্য্য! শ্রীকৃষ্ণের চরণজ্যোতি ধ্যান করিবেন আশা করিয়া যোগিগণ সহস্র সহস্র বৎসর যাপন করেন, অথচ কৃতকার্য্য হয়েন না। কিন্তু এই ব্রাহ্মণকুমার, যাহাকে বালক বলিলেও হয়, তাঁহাকে দেখিতেছি কি না, তিনি প্রাণপণে শ্রীকৃষ্ণের হাতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না।" শ্রীমতী শাশুড়ী-ননদীর নিকট আছেন। এমন সময় বংশীধ্বনি হইল, রাধাঠাকুরাণীর অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইল। মনে মনে বলিতেছেন, "বন্ধু, অসময় বাঁশী বাজাইয়া আমাকে লজ্জা কেন দাও?" আর নানা চেষ্টা করিয়া শাশুড়ী ননদীর নিকট প্রেম গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু "দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে নিবারণ।" প্রভু যত্ন করিয়া ধৈর্য্য ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু অবাধ্যপ্রেম কথা শুনে না।

প্রভুর সঙ্গে ভট্টের বাড়ী চলিয়াছেন—কৃষ্ণদাস প্রভৃতি, যাঁহারা বৃন্দা

বন হইতে তাঁহার সহিত আসিয়াছেন, আর রূপও অনুপম। প্রভু আউলি গ্রামে গমন করিলে, অনেকে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন, কিন্তু ভট্ট তাহা শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, আমি গোসাঞিকে আনিয়া অকার্য্য করিয়াছি। ইনি যমুনা দেখিলে জলে ঝাঁপ দেন আর উঠেন না। আমি প্রয়াগ হইতে উহাঁকে আনিয়াছি সেখানে রাখিয়া আসিব, তোমাদের যাহার ইচ্ছা হয়, সেখান হইতে তাঁহাকে আনিও। ভট্ট নিমন্ত্রিতগণকে সেবা করাইয়া আবার নৌকায় করিয়া তাঁহাদিগকে প্রয়াগে রাখিয়া গেলেন। ভট্ট ইহার কিছুকাল পরে নীলাচলে প্রভুকে দর্শন করিতে গমন করেন ও সেখানে গদাধরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন, কিন্তু সে পরের কথা।

ভট্টের ওখানে প্রভুর নিকট রঘুপতি উপাধ্যায় আগমন করিলেন। ইনি ত্রিহুতের পণ্ডিত, পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত। ইহাঁর কৃত কবিতা পদাবলীতে উদ্ধৃত আছে। প্রভু প্রয়াগে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রূপকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। যদিও সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার লুকাইতে যাওয়া বিফল চেষ্টা, তথাপি দশাশ্বমেধ ঘাটে একটী নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রহিবার চেষ্টা করিলেন এবং এইরূপে দশ দিবস শ্রীরূপকে শিক্ষা দিলেন। প্রভু রূপকে যে শিক্ষা দিলেন, তাহার সংক্ষেপ বর্ণনা শ্রীচরিতামৃতে আছে। প্রভু বারাণসী চলিলেন, রূপ সঙ্গে যাইতে চাহিলেন, আর বলিলেন "তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিব না।" ইহাতে প্রভু কিছুমাত্র কোমল হইলেন না। রূপ যেমন বলিলেন, "প্রভু, তোমার সঙ্গ ছাড়া হইলে আমি বাঁচিব না।" প্রভু অমনি সন্তুষ্ট না হইয়া বরং রুক্ষভাবে বলিলেন, "সে কি? বৃন্দাবনে যাও, আমার আজ্ঞা পালন কর, কাজ কর, জীবের মঙ্গল সাধন কর, আপনার সুখ-আশা বিসর্জ্জন দিয়া বৃন্দাবনে যাও। তাহার পরে ইচ্ছা হয় আমার সহিত নীলাচলে দেখা করিও।" ইহা বলিয়া প্রভু তাঁহাকে ফেলিয়া চলিলেন, আর—

"মূর্চ্ছিত হইয়া রূপ রহিল পড়িয়া ॥— চরিতামৃতে।"

শ্রীরূপের কথা আর একটু বলি। রূপ ও অনুপম শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া দেখেন যে সেখানে সুবুদ্ধি রায়! প্রভুর কি ভঙ্গী! এই শ্রীরূপ গৌড়ীয় পাতসার মন্ত্রী। সুবুদ্ধি স্বয়ং গৌড়ের পাতসাহ। রূপ হোসেন সাহার চাকুরী করিতেন, আবার হোসেন সাহা তাহার পূর্ব্বে স্বয়ং সুবুদ্ধি রায়ের চাকুরী করিতেন। কারণ সুবুদ্ধি গৌড়ের রাজা ছিলেন। রূপ প্রভুর কৃপায় রাজ্য ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে, আর সুবুদ্ধি রায়ও প্রভুর কৃপায় বৃন্দাবনে। হোসেন যখন গৌড়ের রাজা সুবুদ্ধি রায়ের ভৃত্য ছিলেন, তখন তিনি দিঘী খনন করিবার ভার প্রাপ্ত হয়েন। তাহাতে অপরাধ পাইয়া রাজা সুবুদ্ধি হোসেনকে চাবুক মারেন, আর তাহার দাগ হোসেনের অঙ্গে রহিয়া যায়।

কিছুকাল পরে এই হোসেন সুবুদ্ধিকে বিতাড়িত করিয়া আপনি রাজা হইলেন। কিন্তু সুবুদ্ধিকে [illegible] বধ না করিয়া বরং তাঁহাকে অতি আদরের সহিত রাখিলেন। দৈবাৎ হোসেনের স্ত্রী জানিতে পারিল যে, তাহার স্বামীর গাত্রে যে চাবুকের দাগ ইহা সুবুদ্ধি রায় কর্ত্তৃক হইয়াছে। তখন সে তাহার স্বামীকে বাধ্য করিয়া, সুবুদ্ধির মুখের মধ্যে বল দ্বারা জল ঢালিয়া দেওয়াইয়াছিল।

এইজন্য সুবুদ্ধি রায়ের জাতি গেল। তিনি কিছু ইচ্ছা করিয়া এই জল পান করেন নাই। কিন্তু সমাজ তাহা শুনিলেন না, তাঁহাকে অস্পৃশ্য বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তিনি প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আনিতে বারাণসী নগরীতে গেলেন। সেখানে পণ্ডিতগণ বলিলেন যে, তাঁহার তপ্তঘৃত পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। অবশ্য সুবুদ্ধি ইহাতে সম্মত হইলেন না। সেই সময় প্রভু বৃন্দাবন যাইতে সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। সুবুদ্ধি, প্রভুর কথা শুনিয়া, তাঁহার নিকট যাইয়া আশ্রয় লইলেন ও তাঁহার

নিকট প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলেন। প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণনাম সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত।" সুবুদ্ধি সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন. রূপ যাইয়া তাঁহাকে পাইলেন। তাই প্রভুর কৃপায় গৌড়ের বাদসাহ ও মন্ত্রী উভয়ে এক সময়ে বৃন্দাবনে।

এদিকে প্রভু, প্রয়াগ ত্যাগ করিয়া, বারাণসী আসিলেন। পথে দেখেন চন্দ্রশেখর দাঁড়াইয়া, তাঁহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। চন্দ্রশেখর প্রভুর চরণে পড়িয়া বলিলেন যে, তিনি পূর্ব্ব রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, প্রভু আসিতেছেন, তাই তিনি পথে তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। প্রভু তাঁহার পুরাতন বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। তপন মিশ্রের বাড়ী ভিক্ষা করেন, চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে বাস করেন। ইহার দুই এক দিন পরেই একদিন সহসা মহাপ্রভু, চন্দ্রশেখরকে বলিতেছেন, 'দ্বারে যে বৈষ্ণব বসিয়া আছেন তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া আইস।" চন্দ্রশেখর প্রভুর আজ্ঞানুসারে গমন করিলেন, কিন্তু কোন বৈষ্ণব না পাইয়া প্রভুকে যাইয়া বলিলেন, "কৈ, দ্বারে কোন বৈষ্ণব পাইলাম না।" প্রভু বলিলেন, 'তুমি দ্বারে কি কাহাকেও দেখিলে না?' তাহাতে চন্দ্রশেখর বলিলেন, "দ্বারে একজন দরবেশকে দেখিলাম।" তখন প্রভু বলিলেন, 'তাহাকেই লইয়া আইস।" এই দরবেশই—সনাতন।

ইনি কারাগারে, তাঁহার কনিষ্ঠ রূপের পত্র পাইয়া কারা-রক্ষককে উৎকোচ দিয়া বহির হইলেন। সে ব্যক্তি সপ্ত সহস্র মুদ্রা পাইয়া তাঁহাকে লইয়া রজনীতে গঙ্গা পার করিয়া দিল। সনাতন, ঈশান নামক ভৃত্যের সহিত, গঙ্গা পার হইলেন। পার হইয়াই বৃন্দাবনাভিমুখে ছুটিলেন। সম্বল মাত্র নাই, পরিধান একবস্ত্র। কিন্তু আহার কি আরামের ভাবনা আর তখন তাঁহার নাই। সনাতন কিরূপে প্রভুর নিকট যাইবেন ইহাই ভাবিয়া চলিতেছেন। দিবানিশি চলিয়া চলিয়া পাতড়া পর্ব্বতে আসি-

লেন। কোন ভূমিকের সাহায্যে সেই পর্ব্বত পার হইয়া আবার চলিলেন। তাঁহার সঙ্গী ঈশানের নিকট অষ্ট মোহর ছিল, তাহা সনাতন জানিতেন না। সেই স্থানে জানিতে পারিলেন। ভূমিক তাহার সপ্ত মোহর লই-লেন, আর একটী মোহর লইয়া সনাতন ঈশানকে দিলেন, দিয়া বাড়ী ফিরাইয়া দিলেন। ঈশান বাড়ী ফিরিলেন, ফিরিয়া একজন মহাতেজস্বী প্রচারক হইলেন। ঈশানের বংশগণ, এখনও আছেন। প্রভুকে কেবল একবার দর্শন করিয়াছেন, সনাতনের এই শক্তি। আর সনাতনের সঙ্গে কেবল দুই দিবস ভ্রমণ করিয়াছেন, ঈশানের এই শক্তি। আর ইহাঁরা এত তেজস্কর হইল যে, তাঁহার পশ্চাৎ শত শত শিষ্য গুরু বলিয়া তাঁহাকে প্রাণ সমর্পণ করিলেন।

সনাতন দিবানিশি চলিতেছেন, এইরূপে হাজিপুরে আসিলেন। সেখানে সন্ধ্যার সময় বিশ্রাম করিতেছেন, আর উচ্চৈঃস্বরে হরেকৃষ্ণ-নাম জপিতে-ছেন। এ জগতে কে কাহার তল্লাস লয়? এক শ্রীভগবান আমার, আর আমি তাঁহার। তিনি ছাড়া কে জানে যে সেখানে সনাতনের ন্যায় জীব বিরাজ করিতেছেন? সেই সময় সনাতনের ধর্ম্ম-ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত, সেই হাজিপুরে, গৌড়ের বাদসাহের নিমিত্ত, ঘোড়া কিনিতে বাস করিতেছি-লেন। তিনি উচ্চ টুঙ্গির উপর বসিয়া, আরাম করিতেছিলেন। যে ব্যক্তি নাম জপিতেছিলেন, তাঁহার গলার স্বর শুনিয়া সনাতনের স্বরের মত বোধ হইল। তখন শ্রীকান্ত সন্দিগ্ধ হইয়া টুঙ্গি হইতে নামিয়া, সেই ব্যক্তির নিকট আসিয়া, দেখেন সনাতনই বটে, তবে মুখে দাড়ি, ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র পরিধান, দেহ জীর্ণ শীর্ণ, আর বদনে উদাস ও বৈরাগ্য! ইহাতে শ্রীকান্ত একেবারে অবাক হইলেন! একটু স্থির হইয়া বলিলেন, "একি, তুমি এখানে?" তিনি গৌড়ের সংবাদ কিছুই জানিতেন না। তখন সনাতন সংক্ষেপে আপনার কাহিনী বলিলেন। শ্রীকান্ত বলিলেন, 'বাড়ী

চল।" সনাতন বলিলেন, "আমার বাড়ী কোথা? আমার বাড়ী আমি যাইতেছি।" শ্রীকান্ত বুঝাইতে গেলেন, কিন্তু মুখে উপদেশ আসিল না। যেখানে ঘোর বৈরাগ্যের তরঙ্গ, সেখানে বিষয়-রূপ কুটা স্থান পাইবে কেন? শ্রীকান্তের কথা সনাতনের হৃদয়ে স্থান পাইল না, ভাসিয়া গেল। শ্রীকান্ত বুঝিলেন, সনাতন যাইবেন, ফিরিবেন না। শ্রীকান্ত অর্থ দিলেন, সনাতন লইলেন না। দারুণ শীত দেখিয়া শ্রীকান্ত একখানা শাল দিলেন, তাহাও তিনি লইলেন না। শ্রীকান্ত কান্দিতে লাগিলেন। পরে একখানা ভোট কম্বল দিলেন। নিতান্ত অনুরোধও শ্রীকান্তের দুঃখ হইবে ভাবিয়া সনাতন তাহা লইলেন, লইয়া আবারা অনন্ত পথে চলিলেন। শ্রীকান্ত হা করিয়া সাশ্রুনয়নে দাঁড়াইয়া কান্দিতে লাগিলেন।

একটী গীতের কিয়দংশ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। সেটী শচীমাতার উক্তি যথা:—

"তোমরা কেউ দেখেছ যেতে,
আমার সোণার বরণ গৌর-হরি জনৈক সন্ন্যাসী সাথে। ধ্রু।
তাহার ছেড়া কাঁথা গায়, প্রেমে ঢুলে পড়ে গায়ে, যেন পাগলের প্রায়,
মুখে হরেকৃষ্ণ বলে দণ্ড করোয়া হাতে।"

শচীমাতা ইহাই বলিয়া নিমাইয়ের সন্ন্যাসের পরে নদীয়া নগরে, তাঁহার পুত্রকে তল্লাস করিতেছেন। এই গেল গানের ভাব। গৌড় হইতে বৃন্দাবন চারি মাসের পথ। গৌড় হইতে বৃন্দাবনে যাইবার নানাবিধ পথ। সনাতন কি প্রভুকে ইহাই বলিয়া তল্লাস করিতে করিতে যাইতেছিলেন? যথা:—'তোমরা কি এই পথে একজন সন্ন্যাসী যাইতে দেখিয়াছ? তাঁহার কচি বয়স, তাঁহার বর্ণ কাঁচা সোণার ন্যায়? তিনি প্রেমে উন্মত্ত, তাই পাগলের মত ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার পরিধান কৌপীন, ও গাত্রে ছেঁড়া কাঁথা, আর তাঁহার মুখে কেবল হরেকৃষ্ণ নাম?" সনাতন তাহার

কিছুই করেন নাই। সনাতন একমনে গিয়াছিলেন। লোকের নিকট এক বারও প্রভুর সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন নাই। কারণ সনাতন জানিতেন যে. সূর্য্য উদয় হইলে লোকে আপনি জানিতে পায়। প্রভু যেখানে আছেন সেখানে লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিতেছে. সেখানে লোকে তাঁহার কথা ব্যতীত অন্য কোন কথা বলিবে না। কোথাও যদি বৃহৎ ঝড় হয়. তাহার নিদর্শন বহুদূর হইতে পাওয়া যায়। প্রভু যেখানে উদয় হইয়াছেন, সে দেশ আর এক আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং সনাতন জানিতেন যে, প্রভুর অবস্থিতির বহুদূরে থাকিতে তিনি জানিতে পারিবেন যে. প্রভু অগ্রে জীবের প্রতি কৃপা করিয়া, নৃত্য করিতেছেন! প্রভু যে গ্রাম দিয়া গমন করেন সেখানে ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে তাঁহার গমনের সাক্ষী থাকে। তিনি যে পথ দিয়া গিয়াছেন, তাহার দুধারে তাঁহার গমনের সাক্ষী রাখিয়া যান প্রভু যে-মুখে যাইতেছেন. যে দিকে তিনি আসিতেছেন. এই সংবাদ. তাহার বহু অগ্রে চলিয়া যায়!

সনাতন যেই মাত্র বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন. সেই শুনিলেন যে প্রভু ঐ নগরে আছেন। তাঁহার কি বাড়ীর নম্বর অনুসন্ধান করিতে হইল? তাহা নয়। প্রভু কোথা আছেন. না চন্দ্রশেখরের বাড়ী। চন্দ্রশেখরের বাড়ী কোথা? যে দিকে লক্ষ লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিতেছে! সনাতন এই সংবাদে অতি আশ্বাসিত ও পুলকিত হইলেন, হইয়া আস্তে আস্তে চন্দ্রশেখরের বাড়ীর দ্বারে বসিলেন। অভ্যন্তরে প্রভু, দ্বারে সনাতন। সনাতন প্রভুর চরণ ধ্যান করিতেছেন। সনাতন প্রভুর চরণ ধ্যান করিতে করিতে. এই দুই এক মাস হাঁটিয়া আসিয়াছেন। সনাতন, প্রভুকে সম্মুখে পাইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতে আশ্বাসিত হয়েন নাই। কারণ তাঁহার হৃদয়ে যে অনুতাপ তাহাতে বিন্দুমাত্র কপটতা নাই। ভাবিতেছেন, প্রভু কি তাঁহাকে কৃপা করিবেন? তিনি না ঘোর নারকী? এই যে সনাতন

আপনাকে ঘোর নারকী ভাবিতেছেন, ইহা তাঁহার অটল বিশ্বাস। তাঁহার যে হৃদয়ের অনুতাপ সে কাল্পনিক নয়, সে প্রকৃত; তাই প্রভুর নিকট যাইতে ভয় হইতেছে। অনুতাপ কাল্পনিক হইলে সে অনুতাপে বিশেষ কোন লাভ নাই। শ্রীভগবানকে বঞ্চনা করা যায় না।

ওদিকে সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানিয়াছেন যে, সনাতন আসিয়াছেন, জানিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিতেছেন, দ্বারে যে বৈষ্ণব আছেন তাঁহাকে ডাকিয়া আনো। চন্দ্রশেখর আজ্ঞা শুনিয়া বাহিরে যাইয়া দেখিলেন, দ্বারে কোন বৈষ্ণব নাই। তবে একজন অতি মলিন, জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় বসিয়া আছেন; মুখে দাড়ি, বেশ ঠিক দরবেশের ন্যায়। তাই প্রভুর কাছে বলিলেন যে, কোন বৈষ্ণবকে দেখিতে পাইলেন না, কেবল একজন দরবেশ আছেন। প্রভু বলিলেন, "তাহাকেই লইয়া আইস।"

চন্দ্রশেখর অবাক! যাহারা দরবেশ, তাহাদের উপর সাধারণতঃ লোকের কি বৈষ্ণবগণের বড় শ্রদ্ধা নাই। তাহাদের যে সমুদায় ক্রিয়া আছে, তাহা অনুমোদনীয় নহে। প্রভুকে রাজরাজেশ্বরগণ চেষ্টা করিয়া দর্শন পায় না। আজি প্রভু এই দরবেশকে আপনি ডাকিতেছেন! দরবেশের উপর চন্দ্রশেখরের বড় ভক্তি হইয়াছে। বলিতেছেন, "কে গা আপনি, আপনাকে প্রভু ডাকিতেছেন।" প্রভু ডাকিতেছেন, ইহাতে সেই দরবেশ চন্দ্রশেখরের নিকট "আপনি" হইয়াছেন।

তখন হর্ষে, আশায়, চিন্তায়, ভয়ে, ভক্তিতে, সনাতনের অঙ্গ তরঙ্গায়মান হইল। তিনি চন্দ্রশেখরকে বলিতেছেন, "প্রভু ডাকিতেছেন? সত্যই ডাকিতেছেন? আমাকে ডাকিতেছেন?" চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হাঁগা মহাশয়, প্রভু কি আমাকে ডাকিতেছেন? আপনার ভুল হয়েছে, প্রভু আমাকে ডাকিবেন কেন? প্রভু আর কাহাকে ডাকিতেছেন।" চন্দ্রশেখর বলিলেন, "হাঁ আপনাকেই ডাকিতেছেন।" সনাতনের

সন্দেহ গেল না। প্রভু তাঁহাকে চকিতের ন্যায় একবার মাত্র দেখিয়াছেন। লক্ষ ভুবনপাবন ভক্তে প্রভুর সেবা করিতেছেন, তিনি (সনাতন) অস্পৃশ্য পামর; প্রভুর তাঁহার কথা মনে থাকিবে কেন? থাকিলেই এমন নরাধমকে তিনি ডাকিবেন কেন? চন্দ্রশেখরকে বলিতেছেন, 'ঠাকুর, আপনার ভ্রম হইয়াছে, আপনি ভিতরে গমন করুন, আবার জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন যে, প্রভু কাহাকে ডাকিতেছেন।" সনাতন আবার ভাবিতেছেন যে তিনি যে আসিয়াছেন এ সংবাদ ত প্রভুর নিকট তিনি পাঠান নাই।

এই সমুদায় প্রলাপ শুনিয়া চন্দ্রশেখর বলিলেন: 'আপনাকেই ডাকিতেছেন, অতএব চলুন।"

তখন সনাতন (যথা ভক্তমালে)—

"দুই গোচ্ছা তৃণ করে এক গোচ্ছা দন্তে ধরে
পড়িলা গৌরাঙ্গ-রাঙ্গাপায়।
দুনয়নে শতধারা রাজদণ্ড-জন পারা
অপরাধী আপনা মানয়॥
'তোমার চরণ নাহি ভজি মোর গতি এহি
সংসার ভ্রমণে সদা ফিরি।
কদর্য্য বিষয় ভোগ কামাদি ষড়্‌বর্গ রোগ
তাহে ভ্রমি সুখ বুদ্ধি করি॥
নীচ সঙ্গে সদাস্থিতি নীচ ব্যবহারে মতি
নীচকর্ম্মে সদাই উল্লাস।
এহেন দুর্ল্লভ জন্ম পাইয়া কি কৈনু কর্ম্ম
কেবল হইল উপহাস॥
শরণ লইনু প্রভু হে নাথ গৌরাঙ্গ বিভু
করুণা কটাক্ষ মোরে কর।

ও রাঙ্গাচরণে মতি ত্রৈলোক্যের সারগতি
এ অধম জনারে বিচার ॥"
সনাতনের আর্ত্তনাদ শুনিয়া দৈন্য বিষাদ
ছল ছল প্রভুর নয়ন।
আলিঙ্গন দিতে চায় সনাতন পাছে ধায়
কহে 'মোরে না কর স্পর্শন ॥
তোমা স্পর্শ যোগ্য প্রভু মুঞি ছার নহি কভু
ঘৃণাস্পদময় এই দেহ।
পাপময় সুকদর্য্য সাধুর সভায় বর্জ্জ্য
মোরে স্পর্শ প্রভু না করহ ॥"
প্রভু কহে; "সনাতন দৈন্য কর সম্বরণ
তোর দৈন্যে ফাটে মোর বুক।
কৃষ্ণ যে দয়াল হয় ভাল মন্দ না গণয়
হইল যে তোমার সম্মুখ ॥
কৃষ্ণ কৃপা তোমা পরি যতেক কহিতে নারি
উদ্ধারিলা বিষয় কূপ হতে।
নিষ্পাপ তোমার দেহ কৃষ্ণভক্তি মতি অহো
তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে ॥"

প্রভু কাশীতে রহিলেন, কারণ সনাতনকে শিক্ষা দিতে হইবে। পূর্ব্বে প্রয়াগে রূপকে শিক্ষা দিয়াছেন, এখন সনাতনকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। দুই ভাইকে বৃন্দাবনে রাখিয়া তাঁহাদের দ্বারা জীবকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের তত্ত্ব শিক্ষা দিবেন। এই শিক্ষাকার্য্য সমাধা করিতে প্রভুর দুই মাস লাগিয়াছিল, শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে এ সমুদয় তত্ত্ব বিবৃরিত আছে।

প্রভু যখন বৃন্দাবন যাইতে যাইতে কাশী ত্যাগ করেন, তখন প্রকা-

শানন্দ বড় খুসি হইলেন। তখন তিনি যেখানে সেখানে যখন তখন বলিতে লাগিলেন যে, কৃষ্ণচৈতন্য মূর্খ সন্ন্যাসী, আপনার ধর্ম্ম জানে না, বেদ বেদান্ত পাঠ ত্যাগ করিয়া নৃত্যগীত করে, ভাবকালী দ্বারা ইতর লোককে ভুলায়। আবার সে ব্যক্তি মহা ঐন্দ্রজালিক, নানারূপ আশ্চর্য্য দেখাইয়া বড় বড় লোককেও মুগ্ধ করে। বাসুদেব সার্ব্বভৌম নাকি তাহাকে কৃষ্ণ বলিয়া নিদ্ধারণ করিয়াছেন। এমন কি, তাহাকে নাকি যে দেখে সেই কৃষ্ণ বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু এ সমুদায় ভাবকালী কাশীনগরীতে চলিবে না।

যখনই প্রভুর প্রভাব শুনিতেন, তখনই প্রকাশানন্দ উল্লিখিত ভাবে প্রভুকে নিন্দা করিতেন। কাশী ত্যাগ করিয়া প্রভু বৃন্দাবন গমন করিলে, প্রকাশানন্দ বলিলেন, "আমি যাহা বলিয়াছি ঠিক তাহাই হইয়াছে। ভয়ে চৈতন্য আমাদের নিকটে আসে নাই, পলাইয়া গিয়াছে। দেখিও এ নগরে সে আর আসিবে না।" কিন্তু প্রভু যখন ফিরিয়া আসিলেন, এবং নগরে আবার কোলাহল হইল, তখন প্রকাশানন্দের পূর্ব্বকার কথা রহিল না। তখন সে কথা একটু পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, "চৈতন্য আবার আসিয়াছে? তা আসুক, দেখিও সে দূরে দূরে থাকিবে, আমাদের এদিকে কখনও আসিবে না। তবে দেখিও, তোমরা তাহার নিকট যাইও না। তাহার বড় শক্তি, সার্ব্বভৌমের ন্যায় প্রচণ্ড লোককে ভুলায়, তোমাদের ভুলাইবে বিচিত্র কি? তাহার যে মত তাহা পালন করিলে ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট হয়।"

প্রকৃত কথা প্রকাশানন্দের যে বিশ্বাস, তাহাতে তিনি বৈষ্ণবগণের মতে এক প্রকার নাস্তিক। কাজেই প্রভুর ধর্ম্মে ও প্রকাশানন্দের ধর্ম্মে সম্প্রীতির সম্ভাবনা নাই। প্রকাশানন্দের নিকট এই নিন্দা শুনিয়া যে প্রভুকে কখন দেখে নাই সে প্রভুর দর্শনে নিরস্ত হইতে পারিত, কিন্তু

যে একবার সে চাঁদমুখ দেখিয়াছে, সে আর তাহা শুনিবে কেন? যাহা হউক, প্রকাশানন্দ প্রভুর এই উপকার করিলেন যে, তাঁহাকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে নির্জ্জনে সনাতনকে শিক্ষা দিবার অবকাশ করাইয়া দিলেন। প্রকাশানন্দের উত্তেজনায় অনেকে প্রভুর নিকট যাইতে বিরত হইল, তাহাতে প্রভু একটু আরাম করিবার অবকাশ পাইলেন।

এদিকে প্রভুর ভক্তগণ মহাক্লেশে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানেন যে, তাঁহাদের প্রভু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহারা প্রভুকে প্রকৃতই প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসেন, সুতরাং প্রভুর নিন্দা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের দুঃখ প্রভুর নিকট জানাইতে লাগিলেন। প্রভু শুনিতেন আর ঈষৎ হাস্য করিতেন, কিছু বলিতেন না। তখন ভক্তগণ এক পরামর্শ করিলেন। সেখানে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি বড় লোক। তিনি প্রভুকে দর্শন মাত্রে তাঁহার চরণে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন। প্রকাশানন্দ এক প্রকার কাশীর রাজা। তাঁহার প্রতি এই ব্রাহ্মণের বড় ভক্তি ছিল, কিন্তু প্রভুকে দর্শন করা অবধি তিনি প্রভুর চরণ আশ্রয় করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে প্রকাশানন্দও তাহাই করেন। তাই তাঁহাকে প্রভুর চরণে আনিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রভুর গুণানুবাদ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন সুফল হয় নাই। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন যে, প্রকাশানন্দ সরল-চিত্ত সাধু। প্রভুকে যে তিনি নিন্দা করেন তাহার কারণ প্রভুকে কখনও দেখেন নাই। একবার যদি তিনি প্রভুকে দেখেন তবে তাঁহার দুর্ম্মতি ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু প্রকাশানন্দ প্রভুর নিকট আসিবেন না, প্রভুকেও তাঁহার নিকট যাইতে বলিতে পারেন না। ইহার উপায় কি? তখন তিনি প্রভুর ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া এক পরামর্শ সাব্যস্ত করিলেন। ভাবিলেন যে কাশীর

সমুদায় সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিবেন, করিয়া প্রভুকে মিনতি করিয়া সেখানে লইয়া যাইবেন। এই পরামর্শ সাব্যস্ত হইলে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ দশসহস্র সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ করিলেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত প্রকাণ্ড আয়োজন করিলেন। তাহার পর সকল ভক্তগণ জুটিয়া প্রভুর নিকট গমন করিয়া নিমন্ত্রণের কথা বলিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রভুর চরণে পড়িলেন; পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু, আমরা জানি যে সন্ন্যাসী-সমাজে আপনি গমন করেন না। কিন্তু আমার বাড়ী আপনার পবিত্র করিতে হইবে।"

প্রভু সর্ব্বজ্ঞ, তাই এ সমুদয় ষড়যন্ত্রের মর্ম্ম বুঝিলেন। দেখিলেন যে, তাঁহার ভক্তগণ সকলে পরামর্শ করিয়া, তাঁহাকে নিমন্ত্রণে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসিগণের উদ্ধার সকলের উদ্দেশ্য। প্রভু ঈষৎ হাস্য করিলেন; করিয়া বলিলেন, "তোমাদের যাহা অভিরুচি।"

তখন সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন!

প্রকাশানন্দ শুনিলেন যে, "চৈতন্য" নিমন্ত্রণে আসিতেছেন, আর এ কথা এই দশসহস্র নিমন্ত্রিত সন্ন্যাসী শুনিলেন। অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ বড় কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন, কিন্তু প্রকাশানন্দ সম্ভবতঃ একটু চিন্তিত হইলেন। এই "চৈতন্য", যাহাকে তিনি প্রকাশ্যে বার বার নিন্দা করিয়াছেন, এখন অনায়াসে তাঁহার স্থানে,—তিনি যেখানে সর্ব্ববলে বলীয়ান, সেখানে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আসিতেছে! ইহার মানে কি? সার্ব্বভৌমের ন্যায় তাঁহাকেও ভুলাইবে নাকি?

সন্ন্যাসিগণ সভায় বসিয়া প্রভুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা দেখিবেন, যাঁহাকে লোকে শ্রীভগবান বলিয়া পূজা করে, সে সন্ন্যাসী না জানি কেমন। এমন সময় প্রভু, সনাতন প্রভৃতি চারিজন ভক্ত

সঙ্গে করিয়া ধীরে ধীরে নাম জপিতে জপিতে উপস্থিত হইলেন। এখানে আমি আমার "প্রবোধানন্দের জীবন-চরিত" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিব।

প্রভু আসিলে, সন্ন্যাসি সভায়, "ঐ চৈতন্য আসিতেছেন" বলিয়া একটী ধ্বনি হইল। সকলে উকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতেছেন যে, সাড়ে চারি হস্ত প্রমাণ দীর্ঘ, কাঁচাকাঞ্চন বর্ণের একটি যুবা পুরুষ, অতি মন্থর গতিতে, অবনত মুখে আগমন করিতেছেন। মুখের এরূপ কমনীয় ভাব যে, স্ত্রীলোকের মুখ বলিয়া ভ্রম হয়। প্রসন্ন বদন, উন্নত ললাট ও কমল নয়ন। প্রভু মস্তক অবনত করিয়া যেন সশঙ্ক ও সলজ্জ হইয়া ধীরে ধীরে আসিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার চারিজন ভক্ত। সন্ন্যাসিগণ বৃহৎ চন্দ্রাতপতলে বসিয়া আছেন। প্রভু অগ্রে আসিয়া মুখ উঠাইয়া যোড়করে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিলেন। পরে বাহিরে পাদ প্রক্ষালনের যে স্থান ছিল, সেখানে পাদ প্রক্ষালন করিলেন; করিয়া—সেইখানেই বসিলেন!

সন্ন্যাসিগণ এ পর্য্যন্ত তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতেছেন; দেখিতেছেন তাঁহার বয়ঃক্রম অতি অল্প, এমন কি বালক বলিলেও হয়। প্রভুর বয়ঃক্রম তখন একত্রিশ, কিন্তু দেখিতে তদপেক্ষা অল্প বয়স্ক বলিয়া বোধ হইত। মুখে ঔদ্ধত্যের চিহ্নও নাই। বরং দেখিলে বোধ হয় এরূপ সরল নিরীহ ভাল মানুষ ত্রিজগতে কেহ নাই। বদন মলিন অথচ প্রফুল্ল, যেন অন্তরে দুঃখময় আনন্দ রহিয়াছে।

প্রভুর মুখ দেখিয়া প্রকাশানন্দের চিরকালের শত্রুতা মুহূর্ত্ত মধ্যে বিলুপ্ত প্রায় হইল। বরং সেই মুখ যেন তাঁহার প্রাণকে টানিতে লাগিল। প্রকাশানন্দ সদাশয়, মহাজন। তাঁহার সভাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আসিয়া অপবিত্র স্থানে বসিলেন, ইহা সামান্যত তিনি করিতে দিতেন

না। তাহার পরে প্রভুর উপর যত রাগ থাকুক, তিনি যে একজন প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা তিনি তখন বেশ বুঝিয়াছেন।

আবার প্রভুর বদন দর্শনে ও তাঁহার দীনতায় মুগ্ধ হইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার সঙ্গে সেই সহস্রাধিক সন্ন্যাসী সকলেই দাঁড়াইলেন। তখন প্রকাশানন্দ প্রভুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "শ্রীপাদ! সভার মধ্যে আগমন করুন। অপবিত্র স্থানে বসিয়া কেন আমাদিগকে ক্লেশ দিতেছেন?"

ইহাতে প্রভু করযোড় করিয়া বলিলেন, "আমার সম্প্রদায় অতি হীন, আপনার সম্প্রদায় অতি উচ্চ। আপনাদের সভার মধ্যে আমার বসা কর্ত্তব্য নয়।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রভু ভারতী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে যত সম্প্রদায় আছে, তাহার মধ্যে সরস্বতী, তীর্থ, পুরী প্রভৃতি উচ্চ এবং ভারতী নীচ। এ কথা শুনিয়া ও প্রভুর দৈন্যে মুগ্ধ হইয়া, সরস্বতী আপনি উঠিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া একেবারে সভার মধ্যস্থানে লইয়া বসাইলেন।

মহামহোপাধ্যায় সরস্বতীর তখন শত্রুতা প্রায় গিয়াছে, বরং সেই স্থানে বাৎসল্য ভাবের উদয় হইয়াছে। প্রভুর সরল ও সুন্দর মুখ, দীনভাব ও চরিত্র দেখিয়া সরস্বতী বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার প্রভুর প্রতি ক্রোধ ছিল বটে, কিন্তু প্রভুর তাঁহার প্রতি ক্রোধ মাত্র নাই। ইহাতে মনে একটু অনুতাপের উদয় হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "শ্রীপাদ! আমি শুনিয়াছি আপনার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এবং আপনি শ্রীকেশব ভারতীর শিষ্য। কিন্তু আমাদের মনে একটি দুঃখ আছে। আপনি এইস্থানে থাকেন, আমরা আপনার এক আশ্রমের, অথচ আমাদিগকে দর্শন দেন নাই কেন?"

প্রভু এ কথার কোন উত্তর না দিয়া, নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় অবনত মুখে রহিলেন।

তখন সরস্বতী ঠাকুর সরল ভাবে তাঁহাকে সমুদয় মনের কথা বলিতে লাগিলেন বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনার তেজ ও ভাব দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া বোধ হয়। আপনাকে সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাদের সম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী হইয়া আমাদের সহিত মিলিত হয়েন না কেন? শুনিতে পাই সন্ন্যাসীর যে প্রধান ধর্ম্ম বেদ পাঠ তাহা আপনি করেন না। আবার সন্ন্যাসীর পক্ষে নিতান্ত দূষণীয় কার্য্য, নৃত্য গীত প্রভৃতি ভাবকালিতে আপনি নিমগ্ন থাকেন। আপনি সুবোধ, আমাদের সম্প্রদায় মধ্যে শীর্ষ-গণনীয় ব্যক্তি। আপনি এ সমস্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য ও হীনাচার কি কারণে করেন, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।"

সরস্বতীর প্রকৃতই তখন বিদ্বেষ ভাব গিয়াছিল। আবার, প্রভুর নিকটে বসিয়া ইহা বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি যাহা পূর্ব্বে ভাবিয়া-ছিলেন, এ ব্যক্তি নিতান্ত তাহা নয়। এইজন্য, আপনি যে পূর্ব্বে প্রভুকে নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই দোষ খণ্ডন করিবার নিমিত্ত, ও কতক কৌতূহল তৃপ্তি করিবার নিমিত্ত, আত্মীয়তা ভাবে, প্রণয় বিরক্তির সহিত, উপরোক্ত কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রভু কি উত্তর করেন ইহা শুনিবার নিমিত্ত সভাস্থ লোকে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

কথা এই, প্রভুকে দেখিয়া সরস্বতী ও তাঁহার সহস্রাধিক শিষ্যের মন বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াই সকলে বুঝিলেন যে, এ বস্তুটি হয় সিদ্ধপুরুষ, নয় কোন দেবতা, ছলনা করিয়া মনুষ্য সমাজে বেড়াইতেছেন।

যেরূপ সরস্বতী বাৎসল্য ভাবে বলিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ সেইরূপ গুরু-বুদ্ধিতে উত্তর দিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মস্তক অবনত করিয়া বলিতে

লাগিলেন, "শ্রীপাদ! আমি আমার কথা আমূল আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি। আমি যখন গুরুর আশ্রয় লইলাম, তখন তিনি দেখিলেন যে, আমি মূর্খ। ইহাতে তিনি বলিলেন, 'বাপু, তুমি মূর্খ, তুমি বেদান্ত পড়িতে পারিবে না। কিন্তু তাহাতে তুমি দুঃখিত হইও না। তাহার পরিবর্ত্তে আমি তোমাকে অতি উত্তম দ্রব্যই দিতেছি। 'ইহা বলিয়া তিনি বলিলেন, "বাপু এই শ্লোকটি তুমি কণ্ঠস্থ কর :—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর গলার স্বর সঙ্গীত হইতে মধুর। তিনি যখন মলিন মুখে ধীরে ধীরে আপনার কাহিনী বলিতে লাগিলেন, তখন সকলে নীরব হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

প্রভু যে শুদ্ধ এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন তাহা নয়, উহার ব্যাখ্যাও করিলেন। ব্যাখ্যা অদ্ভুত। এ ক্ষুদ্র শ্লোকের মধ্যে এত অর্থ আছে জগতে পূর্ব্বে কেহ তাহা জানিতেন না। প্রভু শ্লোকের অর্থ করিয়া পরে বলিতেছেন,—

"গুরুদেব আমাকে বলিতে লাগিলেন, এই দেখ বাপু কলিকালে নাম ব্যতীত আর গতি নাই; অতএব তুমি শুদ্ধ কৃষ্ণ-নাম জপ কর, তোমার আর কোন কার্য্য করিতে হইবে না; ইহাতে তোমার কর্ম্মবন্ধ ক্ষয় পাইবে, অধিকন্তু ব্রহ্মা প্রভৃতির যে দুর্ল্লভ ধন কৃষ্ণপ্রেম, তাহাও লভ্য হইবে।"

সন্ন্যাসীরা ও প্রকাশানন্দ নানা কারণে প্রভুর কথা শুনিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। প্রভুর নিকট হরের্নাম শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিয়া বুঝিলেন যে, বালক সন্ন্যাসী একজন প্রবল পণ্ডিত।

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতে লাগিলেন, "আমি গুরুদেবের এই আজ্ঞা পাইয়া

মন দৃঢ় করিয়া কৃষ্ণনাম জপিতে লাগিলাম। কিন্তু নাম জপিতে জপিতে, আমার মন ভ্রান্ত হইল। ক্রমে আমার সব প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গেল। আমি শেষে কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন নৃত্য, কখন গান করিতে লাগিলাম, তনু ও মন এলাইয়া গেল ও এক প্রকার পাগল হইলাম। তখন আমি ভীত হইয়া আপনার অবস্থার কথা বিচার করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম, আমার এ কি দশা হইল? এ ত উন্মত্ত জনের অবস্থা। তবে কি আমি সত্যই পাগল হইলাম? এই সমস্ত ভাবিয়া ব্যস্ত ও ভীত হইয়া আবার, গুরুর শরণাপন্ন হইলাম; এবং তাঁহার চরণে এই নিবেদন করিলাম যে, 'প্রভু, আপনি আমাকে কি মন্ত্র দিলেন, ইহার এ কি প্রকার শক্তি? আপনার আজ্ঞাক্রমে আমি কৃষ্ণনাম জপিতে-ছিলাম, জপিতে জপিতে আমার বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়া গেল, এখন আমি হাসি কাঁদি নাচি গাই, এমন কি, আমি নাম জপিয়া এক প্রকার পাগল হইয়াছি। এখন আমি এ দায় হইতে কি করিয়া উদ্ধার হই, আপনি তাহার বিহিত আজ্ঞা করিয়া দিউন।'

আমার গুরুদেব এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন, 'তোমার এ বিপদ নয়, এ তোমার সম্পদ। তোমার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে। কৃষ্ণনামের শক্তিই ঐরূপ। উহাতে ঐরূপ হৃদয় চঞ্চল করে, শ্রীকৃষ্ণের চরণে রতি উৎপাদন করে। জীবের যে পরম পুরুষার্থ, যাহা হইতে জীবের আর সৌভাগ্য হইতে পারে না, তাহাই, অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম, তুমি পাইয়াছ।'

গুরুদেব ইহাই বলিয়া আমাকে কয়েকটি শ্লোক শুনাইলেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্তউচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

"এই প্রকারে যিনি অনুরাগ-বিগলিত চিত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আপনা প্রিয় শ্রীকৃষ্ণনাম লইয়া হাস্য, রোদন, হুংকার, গীত ও নৃত্য করেন, তিনি সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া জীবগণকে রক্ষা করেন।"

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসংফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপিপরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

"যে কেহ হউক না কেন, যদি পরম মধুর মঙ্গলের মঙ্গলকর সকল নিগমের সুফল-স্বরূপ চিন্ময় কৃষ্ণনাম একবার হেলায় অথবা শ্রদ্ধায় গান করে, তাহা হইলে, হে ভৃগুবর, সেই কৃষ্ণের নাম তাহাকে উদ্ধার করেন।"

তৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তোমহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনোঃকৃচ্ছ্রং চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমং॥

"যে কৃতি ব্যক্তিরা মহানন্দে কৃষ্ণকথামৃত-সাগরে বিহার করেন, তাঁহারা কৃচ্ছ্র লভ্য চতুর্ব্বর্গকে অনায়াসে তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারেন।"

তদনন্তর গুরুদেব বলিলেন, 'তুমি কৃষ্ণপ্রেম পাইয়াছ, আমি তোমার গুরু, তোমার নিমিত্ত আমিও কৃতার্থ হইলাম।' গুরুর এই আজ্ঞা শুনিয়া আমার শঙ্কা দূর হইল। আমি তাঁহার আজ্ঞা দৃঢ় করিয়া কৃষ্ণনাম জপিয়া থাকি। ইহাতে আমি যে ক্রন্দন ও হাস্য প্রভৃতি করি তাহাতে আমার হাত নাই। ইহা আমি নামের শক্তিতে করিয়া থাকি, ইচ্ছা করিয়া করি না।"

শ্রীগৌরাঙ্গ দৈন্যের সহিত যখন কথা কহিতে লাগিলেন, তখন যেন মধু বরিষণ হইতে লাগিল। তাঁহার বাক্য শুনিয়া সন্ন্যাসিগণের চিত্ত কোমল হইল।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশানন্দের কয়েকটী প্রশ্নের ক্রমে উত্তর দিলেন।

তাঁহার তিনটী প্রশ্ন। প্রথম বেদান্ত পড় না কেন? দ্বিতীয়, নৃত্য গীত কর কেন? তৃতীয়, আমাদের, অর্থাৎ সন্ন্যাসিগণের, সহিত ইষ্ট গোষ্ঠি কর না কেন? প্রভু ইহার উত্তরে বলিলেন, বেদান্ত না পড়িলে চলে, হরিনামই যথেষ্ট। আবার বলিলেন, বেদান্ত পড়িলে কোন ফল নাই। কলিকালে হরিনাম ব্যতীত অন্য গতি নাই, নাই, নাই। নৃত্য গীত সম্বন্ধে বলিলেন, তিনি যে নৃত্য গীত করেন, সে আপন ইচ্ছায় নহে; নামের শক্তিতে প্রেমোদয় হয়, প্রেমোদয় হইলে নৃত্য গীত আপনিই আইসে। তিনি যে সন্ন্যাসিগণের সহিত কেন মিলিতে যান না, তাহার বিশেষ কোন উত্তর দিলেন না।

প্রকাশানন্দের চিত্ত তখন প্রভুকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তখনও তাঁহার অভিমান আছে। তখনও তিনি ভাবিতেছেন, যে, এ একটী সুন্দর বস্তু, ইহার কথা অতি মিষ্ট, এ যুবক সুবোধ, তবে একটু চঞ্চল যদি আমার কাছে কিছুকাল থাকে, তবে এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য একটী অপূর্ব্ব সামগ্রী হইবে। ইহার কৃষ্ণপ্রেম হইয়াছে, ইহা বড় মঙ্গল; কিন্তু ইহার বেদান্তের প্রতি ভক্তি নাই, সে বড় দোষের কথা।

প্রভু চুপ করিলে, প্রকাশানন্দ একটু চিন্তা করিয়া পরে বলিতেছেন, "এ অতি উত্তম কথা। ইহাতে কাহার আপত্তি হইতে পারে না। কৃষ্ণ-নাম লও, ইহাতে সকলের সন্তোষ। কৃষ্ণপ্রেম হওয়া বড় ভাগ্যের কথা তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বেদান্ত পড় না কেন? বেদান্তের উপর তোমার অশ্রদ্ধা কেন?"

প্রভু বলিলেন, "শ্রীপাদ আমাকে যে প্রশ্ন করিলেন, তাহার যদি উত্তর না দিই, তবে আমার অপরাধ হইবে। উত্তর দিলেও যদি আপনা-দের তুষ্টিকর না হয়, তাহা হইলে আপনারা বিরক্ত হইতে পারেন। তাহা হইলেও আমার অপকার হইবে। অতএব আপনারা যদি আমার অপরাধ

না লয়েন. তবে আমি সরল ভাবে বলিতেছি যে, আমি কেন বেদান্ত পাঠ করি না।"

ইহাতে প্রকাশানন্দ ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনি কি বলিতেছেন? আপনার কথা শুনিয়া আমরা বিরক্ত হইব ইহা কি হইতে পারে? আপনার মুখে মধু ক্ষরিত হইতেছে। আপনার মাধুরীপূর্ণ বিগ্রহ দেখিলে আপনাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া প্রতীতি হয়। আপনি অন্যায় বলিবেন ইহা কখনও সম্ভাবনা হইতে পারে না, আপনি স্বচ্ছন্দে আমাদিগকে বলুন, বলিয়া আমাদের কর্ণ তৃপ্ত করুন।"

প্রভু বলিলেন, "বেদান্ত ঈশ্বরের বচন। ইহাতে ভ্রম প্রমাদ সম্ভবে না। এই বেদান্তের সূত্রের যে মুখ্য অর্থ তাহা অবশ্য মানিব। শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন তাহা শঙ্করের বাক্য, ঈশ্বর বাক্য নহে। সূত্রের প্রকৃত অর্থ কি তাহা পরিস্কার লেখা রহিয়াছে। সে সূত্র থাকিতে ভাষ্যে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। ব্যাখ্যার তখনি প্রয়োজন, যখন সূত্র বুঝিতে কষ্টকর হয়। আমরা দেখিতেছি সূত্রের অর্থ সরল, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যে অর্থ করিয়াছেন তাহা বুঝা কষ্ট। আপনারা দেখিবেন যে, সূত্রের অর্থ একরূপ, এবং শঙ্করাচার্য্য কোন উদ্দেশ্য সাধন নিমিত্ত তাহার অর্থ আর একরূপ করিয়াছেন। স্থূল কথা, সূত্র অতি সরল তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যেরূপ করিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন তাহা তাঁহার মনঃকল্পিত, সূত্রের অর্থের সহিত উহা মিলে না।"

সন্ন্যাসীরা ইহাতে একটু বিরক্ত ও চকিত হইলেন। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যে যে বিপরীত অর্থ থাকিতে পারে, ইহা তাঁহাদের মনে স্বপ্নেও উদিত হয় নাই। শঙ্করাচার্য্যকে তাঁহারা জগদ্গুরু বলিয়া মান্য করেন তাঁহার ভাষ্যে দোষারোপ করাতে তাঁহারা উহা প্রমাণ করিতে বলিলেন

তাঁহারা বলিলেন, "শ্রীপাদ, আপনার এত বড় কথা বলিবার কি হেতু আছে? শঙ্করাচার্য্য জগতের নমস্য, তাঁহাকে সকলেই গুরু বলিয়া মান্য করিয়া থাকে, আপনি যে তাঁহার ভাষ্যে দোষারোপ করিতেছেন, ইহা বড় সাহসিকতার কথা।"

প্রভু বলিলেন, "শঙ্করাচার্য্য জগতের গুরু সন্দেহ নাই। কিন্তু ঈশ্বর সকল অপেক্ষা বড়, বেদ তাঁহার শ্রীমুখের আজ্ঞা। এ সূত্রের যে সরল অর্থ তাহা ঈশ্বরের বাক্য। শঙ্কর যে অর্থ করিয়াছেন উহা সরল নহে। আপনাদের আজ্ঞাক্রমে আমি দেখাইতেছি যে, শঙ্করাচার্য্যের উদ্দেশ্য নিজ মত স্থাপন ও তাঁহার ভাষ্য মনঃকল্পিত।"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের দোষ দেখাইতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, আর সন্ন্যাসিগণ স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কিরূপ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আছে। শ্রীসনাতন গোস্বামী সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই বিচারের কথা তাঁহার মুখে বৃন্দাবনের ভক্তগণ শ্রবণ করেন, তাঁহাদের কাহারও কাছে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী শ্রবণ করিয়া চৈতন্যচরিতামৃতে সেই বিচারের সার সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

সন্ন্যাসীরা শ্রীগৌরাঙ্গের অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা কেবল পড়িয়া যাইতেন, তাঁহাদের গুরু যেরূপ বুঝাইতেন তাঁহারা সেইরূপ বুঝিতেন। এখন প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলের যেন চক্ষু ফুটিল। তখন পরস্পরে এই ভাবে মুখ চাওয়া-চাই করিতে লাগিলেন যে, কৃষ্ণ-চৈতন্য সুধু পরম সুন্দর ও পরম ভক্ত নন, পরম পণ্ডিতও বটেন। প্রকাশানন্দের অভিমান ছিল যে, জগতে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত আর নাই। তাঁহার যত অনর্থের মূল এই পাণ্ডিত্য অভিমান। এখন শ্রীগৌরাঙ্গ সেই অভিমান হরণ করিতেছেন।

প্রকাশানন্দ মায়াবাদী, সোঽহং ধর্ম্ম মানেন। তিনি ঘোর অদ্বৈত-বাদী, সুতরাং ভক্তির বিরোধী। তাঁহার মতে, আমিও যেই, ঈশ্বরও সেই। ভক্তি আর কাহাকে করিব? কিন্তু হিন্দুগণ বেদের অধীন। বেদ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা যাইতে পারেন না। শঙ্করাচার্য্য আপন মত চালাইবার জন্য সূত্রের মনঃকল্পিত অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার মত চালাইবার নিমিত্ত তাঁহার দেখাইতে হইয়াছে যে, সূত্র তাঁহার মতের পোষণ করিতেছেন। তাই তিনি আপনার মনের মত সূত্রের অর্থ করিয়াছেন। সাধারণ লোকে, সূত্রের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা আপনারা চেষ্টা করিয়া না বুঝিয়া, শঙ্কর যেরূপ বুঝাইয়া আসিয়াছেন সেইরূপ বুঝিয়া আসিতেছেন।

প্রভু এইরূপে দেখাইলেন যে, বেদের অর্থ অতি সরল, তাহার টীকার আবশ্যক করে না। সেই সরল অর্থের সহিত শঙ্করের মতের কিছুমাত্র মিল নাই, বরং সম্পূর্ণ অমিল।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, "শ্রীপাদ! আপনি যেরূপ ভাষ্যের দোষ দিলেন তাহা শুনিলাম। আপনার কথার প্রতিবাদ করিতেও আমার ইচ্ছা হই-তেছে না, কারণ আপনি ন্যায্য কথাই বলিতেছেন। আপনি পরম পণ্ডিত তাহাও জানিলাম। শঙ্করাচার্য্যের মত খণ্ডন করিলেন এ আপনার অসীম শক্তির পরিচয়। এখন আর কিছু শক্তির পরিচয় দিউন। সূত্রের মুখ্য অর্থ করুন, দেখি আপনি কিরূপ বুঝিয়াছেন।"

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ সূত্রের মুখ্যার্থ করিতে লাগিলেন। একটি একটি সূত্র বলিতে লাগিলেন, আর অর্থ করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে অর্থ করিলেন যে, ভগবান ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। ভক্তি ও প্রেম দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়। ভগবানে প্রেম, জীবের পরম পুরুষার্থ। অর্থাৎ বেদ বৈষ্ণব ধর্ম্মের পোষকতা করিতেছে।

অগ্রে প্রভু শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য দুষিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার তাঁহার বদনে সূত্রের অর্থ শুনিয়া সন্ন্যাসিগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শুদ্ধ ভাবুক সন্ন্যাসী নহেন. বয়সে যদিচ বালক, কিন্তু ক্ষমতায় শঙ্করাচার্য্য অপেক্ষা বড়।

প্রকাশানন্দের তখন এক প্রকার পুনর্জ্জন্ম হইল। প্রথমে প্রভুর উপর সম্পূর্ণ ক্রোধ, দ্বেষ ও ঘৃণা ছিল। ঘৃণা ইহা বলিয়া—যে তিনি মূর্খ ও বঞ্চক। ক্রোধ ইহা বলিয়া—যে তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল ভটকে কুপথে লইয়াছেন। দ্বেষ ইহা বলিয়া—যে কৃষ্ণচৈতন্য জগতে. অনেকের নিকট তাঁহা অপেক্ষা পূজিত। এখন দেখিলেন, কৃষ্ণচৈতন্য পরম ভক্ত, পরম পণ্ডিত, সর্ব্বপ্রকারে পরম সুন্দর। দেখিলেন, তাঁহার প্রকৃতি মধুর। আর দেখিলেন যে, ভক্তি বলিয়া যে দ্রব্য উহা অতি সুস্বাদু, আর এই মহাতত্ত্ব সেই বালক সন্ন্যাসীর নিকট তিনি শিখিলেন। এই সমস্ত কারণে প্রভুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় মমতা ও শ্রদ্ধার উদয় হইল। তখন মনে হইল যে তিনি এই সুন্দর প্রকাণ্ড বস্তুটীকে অন্যায় করিয়া নিন্দা করিয়াছেন। তাহা মনে হওয়াতে তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

প্রকাশানন্দ. মহাশয় ব্যক্তি। তিনি তখন অতি কাতর হইয়া প্রভুকে বলিলেন. "শ্রীপাদ! আপনি জানেন, আপনাকে আমি বরাবর নিন্দা ও ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, আমি দম্ভে উন্মত্ত ছিলাম ও আপনাকে জানিতাম না। এখন আপনাকে জানিলাম; দেখিলাম আপনি স্বয়ং বেদ ও নারায়ণ। আপনার নিকট এতদিনে বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিলাম। ভক্তি যে কি পদার্থ তাহা পূর্ব্বে বুঝিতাম না, পরন্তু ঘৃণা করিতাম। অদ্য আপনার শ্রীমুখে উহা যে তাহা কি বুঝিলাম। আপনিই আমার প্রকৃত গুরু। অদ্য বুঝিলাম শ্রীকৃষ্ণই

সত্য, সর্ব্ব জীবের প্রাণ; তাঁহার চরণসেবাই জীবের চরম ধর্ম্ম। আপনার সহিত শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।

তখন সন্ন্যাসিগণ ভক্তিতে গদগদ হইয়াছেন। তাঁহাদের গুরু প্রকাশানন্দের নিকট ভক্তিসম্বন্ধে উপরি উক্ত সুললিত বক্তৃতা শ্রবণ মাত্র সকলে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিলেন।

পাঠকগণ, প্রভু হরের্নাম শ্লোকের কিরূপ অর্থ করিলেন একবার অনুভব করুন। শ্লোকের অর্থ এই। এই কলিকালে হরিনাম ব্যতীত অন্য গতি নাই। হরিনাম ব্যতীত, অর্থাৎ কেবল হরিনাম ব্যতীত, গতি আর নাই, আর নাই, আর নাই। অর্থাৎ যোগ, যাগ, তপস্যা, পূজা, অর্চ্চনা, ইহার কিছুতেই গতি হইবে না, কেবল হরিনামে হইবে। অন্য কোন সাধনের প্রয়োজন নাই, দেবদেবী পূজা পর্য্যন্ত বিফল।

সন্ন্যাসিগণ পরে ভোজনে বসিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গকে আদর করিয়া বসাইলেন। ভিক্ষা অন্তে প্রভু বাসায় চলিয়া আসিলেন। তখন, সন্ন্যাসীদের মধ্যে, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু যাহা বলিলেন, তাহা লইয়া মহা আন্দোলন হইতে লাগিল। প্রকাশানন্দের প্রধান প্রধান শিষ্যেরা বলিতে লাগিলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখে অমৃত বৃষ্টি হইল। এতদিন পরে বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম। কলিকালে সন্ন্যাস করিয়া সংসার জয় করা যায় না। সংসার জিনিবার একমাত্র উপায় হরিনাম। অতএব এতদিন যে পণ্ডশ্রম করা গিয়াছে, আর তাহাতে প্রয়োজন নাই, এখন ভাই সকলে হরি হরি বল। শঙ্করাচার্য্যই হউন, আর যিনিই হউন, কাহারও উপরোধে পরকাল নষ্ট করা যায় না।

তখন প্রকাশানন্দ কহিলেন, "শঙ্করাচার্য্যের ইচ্ছা অদ্বৈত মত স্থাপন করা। এই সংকল্প করিয়া তিনি তাঁহার মনের মত সূত্রের বিকৃত অর্থ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অর্থ যখন পড়িতাম, তখন মুখে হয়

হয় বলিতাম, মনে প্রতীত হইত না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সরল অর্থ করিলেন, অমনি সেই অর্থ হৃদয়ে প্রতীত হইল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মুখ দিয়া সার তত্ত্ব নির্গত হইয়াছে। আমি সব জানিয়াছি, আর আমার জানিবার কিছু নাই।"

প্রকাশানন্দের সভায় এইরূপ গোল হওয়াতে সমস্ত কাশী নগরীতে এই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। তখন নানা দেশীয় পণ্ডিত আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। বারাণসী পরিত্যাগ করিবার পাচ দিন থাকিতে প্রভু প্রকাশানন্দের সহিত মিলিতে ও ভিক্ষা করিতে সম্মত হয়েন।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃগণ, কাশীর অন্যান্য সাধু ও পণ্ডিতগণ, সকলে প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। প্রকাশানন্দ, গৌড়ীয় নবীন সন্ন্যাসীর মত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে সে দেশে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। তখন প্রভুর বিশ্রামের মুহূর্ত্তও সময় রহিল না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রভুর কাছে আসিয়া, কেহবা দর্শনে, কেহবা স্পর্শনে, কেহবা বচনে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণনাম করিতে করিতে প্রভুর কাছে বিদায় লইলেন। সমস্ত বারাণসী নগরে কৃষ্ণ-নামের কোলাহল, হরিবোল ধ্বনি ও নাম সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল, ও লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া প্রভুর দ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

প্রকাশানন্দের সঙ্গে প্রভুর সাক্ষাৎ হইলে, প্রকাশানন্দের বজ্রের ন্যায় দৃঢ় মন নম্রীভূত হইল। যদি বয়োজ্যেষ্ঠা কোন নারী প্রেমে আবদ্ধ হয়েন, তবে তিনি একেবারে পাগলিনী হইয়া থাকেন। যিনি শিক্ষা দ্বারা হৃদয় কঠিন করিয়াছেন, তাঁহার যদি কোন কারণে উহা দ্রবীভূত হয়, তবে তাঁহার প্রস্তরবৎ হৃদয় হইতে হুহু করিয়া জল উঠিতে থাকে। প্রকাশানন্দ স্বভাবতঃ সহৃদয় লোক। তিনি স্বভাবতঃ

রাধার গণ, অর্থাৎ—প্রেম উৎকর্ষই তাঁহার প্রকৃতির অনুমোদনীয়। দৈব বশতঃ তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন। যেমন লোকে বাঁধ দ্বারা নদীর স্রোত বন্ধ করে, তিনি সেইরূপে তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনে তাঁহার সেই বাঁধ অল্প ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তাঁহার হৃদয়, যাহা তিনি শুখাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা আর্দ্র হইল। তখন শ্রীভগবানের সৌরভ তাঁহার ইন্দ্রিয়গোচর হওয়ায় তিনি অভিনব এক অতি সুস্বাদু আনন্দ ভোগ করিতে পারিলেন। তিনি শেষে ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভক্তবৎসল ভগবানকে ভক্তি করা শুধ বেদের উপদেশ নয়, মনুষ্যের পরম পুরুষার্থও বটে।

কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে আর একটি চিন্তার উদয় হইল, চিন্তাটি তিনি তাঁহার নিজ কৃত শ্লোকের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। সে শ্লোকটী এই—

সান্দ্রানন্দোজ্জ্বলরসময়প্রেমপীযূষসিন্ধোঃ
কোটিং বর্ষৎ কিমপিকরুণাস্নিগ্ধনেত্রাঞ্চলেন।
কোঽয়ং দেবঃ কনককদলীগর্ভগৌরাঙ্গ যষ্টি
শ্চেতঃ কস্মান্মম নিজপদে গাঢ়যুক্তশ্চকার॥

অন্বয়ার্থ।—যাঁহার অঙ্গযষ্টি কনককদলীর গর্ভের ন্যায় গৌরবর্ণ এবং যিনি করুণরস-সিক্ত অঞ্চলপূর্ণ নেত্র দ্বারা নিবিড় উজ্জ্বল রসময় প্রেমরূপ সুধাসিন্ধুকোটিকে বর্ষণ করিতেছেন, ইনি কে এবং কেনই বা আমার চিত্তকে নিজ চরণারবিন্দে দৃঢ়রূপে নিযুক্ত করিলেন?

সরস্বতী ঠাকুর ভক্তি হইতে উত্থিত অভিনব সুখ অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতেছেন, তিনি যে কঠোর জীবন যাপন করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে এরূপ আনন্দ তাঁহাকে কে আনিয়া দিল? সে এই নবীন সন্ন্যাসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! ভাবিতেছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট তাঁহার যে ঋণ ইহা শুধিবার নহে।

যাঁহারা মহাসন্ন্যাসী কি মহানাস্তিক, তাঁহারাও ভক্তিরূপ সুধা আস্বাদন মাত্র মুক্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ একটী সাধুর কথা আমি শ্রীঅমিয়নিমাই-চরিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছি। তিনি আকাশ ভজন করিতেন, কিন্তু যেই একটি পূর্ব্বরাগের কীর্ত্তন শুনিলেন, অমনি অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভুর কথা ভাবিতে ভাবিতে অমনি গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি সরস্বতীর হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইল, তাই মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া উপরের লিখিত শ্লোকটী রচনা করিলেন। সরস্বতী ঠাকুর তখন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন,—এই যে স্বর্ণকান্তিবিশিষ্ট নবীন পুরুষটি, ইনি কে? ইনি প্রেমপূর্ণ নয়নে আমার পানে চাহিলেন কেন? ইনি আমার কাছে চান কি? ইনি আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছেন কেন? আর চিত্ত আমার কথা না শুনিয়া উহাঁর চরণমুখে কেন ধাবিত হইতেছে? এ বস্তুটি কে? এটি কি মনুষ্য, কি কোন অনির্ব্বচনীয় দেবতা?

এই যে সরস্বতী ঠাকুরের মনের ভাব ইহাকে রতি বলে, ইহাই প্রেমের বীজ। কৃষ্ণপ্রেমে ও সামান্য প্রেমে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। কোন স্ত্রী, কোন পুরুষকে দেখিয়া তাঁহাকে চিত্ত অর্পণ করেন। সেই স্ত্রীলোকটীর নিকট তাঁহার প্রিয়জন একটি অনির্ব্বচনীয় দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হন। তিনি তাঁহার নিমিত্ত জাতি, কুল, সমুদায় বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন।

সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের উদয় হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ আপনার দেহ দ্বারা জীবকে এ সমুদায় শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের গয়াধামে কৃষ্ণে রতি হইল, তাহার পরে গৌড়ের নিকট কানাই নাটশালায় শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে প্রেমের উদয় হইল। এইরূপ শ্রীবিগ্রহের চিত্রপট দর্শনে, কি স্বপ্নে, কি সাক্ষাদ্দর্শনে, প্রেমের উদয় হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাদ্দর্শনে প্রকাশানন্দের রতি হইয়াছে। আপনি বেশ বুঝিতেছেন যে, তিনি প্রকৃতিস্থ নাই, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার চিত্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত আর কিছু ভাবিতে পারিতেছেন না। কেবল তাঁহাকে ভাবিতেছেন,—ভাবিতেছেন তিনি কে? কখন আপনার উপর, কখন তাঁহার উপর ক্রোধ হইতেছে; ভাবিতেছেন, তিনি কেন আমার মাথা খাইতেছেন, আমি এখন কি করিব? তাঁহার কাছে কি যাইব? না যাইয়া থাকিতে পারি না, কিন্তু যাইতে লজ্জা করে, লোকে কি বলিবে? সরস্বতীর হৃদয়ে এই আন্দোলন চলিতেছে, এমন সময় তিনি কোলাহল শুনিতে পাইলেন।

যে দিবস প্রভু প্রকাশানন্দের সহিত মিলিত হন, সেই দিন অবধি প্রভুর বাসায় লোকের সংঘট্ট হইতে আরম্ভ হয়, ইহা উপরে বলিয়াছি। তিনি যখন স্নান করিতে গমন করিতেন, তখন পথের দুই ধারে লক্ষ লোক দাঁড়াইয়া রহিত। তিনি যখন আসিতেন, তখনও দুই ধারে লক্ষ লোক থাকিত, সকলে হরিধ্বনি করিত ও তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মিলনের পরে প্রভু মোটে চারি পাঁচ দিন কাশীতে ছিলেন। সুতরাং এ সমুদায় ঘটনা এই চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই হয়। সেই মিলনের দুই তিন দিন পরে প্রভু এক দিন পঞ্চনদে স্নান করিয়া ঐ পথে বিন্দুমাধব হরি দর্শন করিতে গমন করিলেন। তিনি প্রত্যহ স্নান করিয়া এইরূপ বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া বাসায় আসিতেন।

প্রভুর সঙ্গে ভক্ত চারিজন ছিলেন,—চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র, পরমানন্দ ও সনাতন। শ্রীগৌরাঙ্গ বারাণসী নগরীতে তাঁহার প্রেমভাব গোপন করিয়া রাখিতেন। অন্য দিন বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া আপনার অনিবার্য্য প্রেম সম্বরণ করিয়া চুপে চুপে গৃহে যাইতেন। কিন্তু সে দিবস সাম-

লাইতে পারিলেন না। বিন্দুমাধবকে দর্শন করিয়াই প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণও উন্মত্ত হইলেন, তাঁহারা চারিজন হাতে তালি দিয়া এই পদ গাইতে লাগিলেন :—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥

প্রভুর সঙ্গে সহস্র সহস্র লোক পূর্ব্ব হইতেই ছিল। তাহারা কলরব করিতে ছিল। আবার প্রভুর প্রেমভাব ও নৃত্য দেখিয়া সেই কলরব শতগুণে বৃদ্ধি পাইল।

এই যে অদ্যকার কাণ্ড বর্ণনা করিতেছি, ইহা হইবার দুই তিন মাস পূর্ব্ব হইতে, অর্থাৎ প্রভুর আগমনাবধি, কাশীধামে লোকের মন কর্ষিত হইতেছিল। সেখানকার আধ্যাত্মিক রাজ্যের নেতৃগণ ভক্তি মানেন না। তাঁহারা জানেন, বেদাভ্যাস যোগসাধন প্রভৃতি বড়লোকের ধর্ম্ম। তাই যাঁহারা বড়লোক বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা সেইরূপ সাধন ভজন করেন। শ্রীভগবদ্ভক্তি বলিয়া যে বস্তু, উহার নাম মাত্র শুনিয়াছেন, উহা ব্যাপার কি তাহা জানেন না। এরূপ ভক্তিবিমুখ স্থানে হঠাৎ ভক্তিবীজ বপন করিলে অঙ্কুরিত হইবে না, কি অঙ্কুরিত হইলে তাহা জীবিত থাকিবে না, শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা প্রভু জানিতেন। আর প্রভুর কৃপায় এখন তাঁহার ভক্তগণ এই তত্ত্ব বেশ জানিয়াছেন। তাই বোধ হয় প্রভু পূর্ব্বে কাহারও সহিত মিশেন নাই।

কিন্তু যদিও তিনি কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠ সঙ্গ করেন নাই, তবু শুদ্ধ তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নগরে ভক্তির উদয় হইয়াছে। তাঁহার দর্শনে, হাব ভাব কটাক্ষে, তাঁহার ভক্তগণের চরিত্রে, নগরে একটী কলরব হইয়াছে যে, একটী অলৌকিক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। কেহ বলিতে লাগিলেন যে, ইনি বড় মহাজন, কেহ বলিতেছেন, ইনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ!

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর লীলায় এই একটী অদ্ভুত ঘটনা বরাবর লক্ষিত হয়। তিনি যখন যেখানে উপস্থিত হইতেন, সেখানে তখনই শ্রীভগবান আসিতেছেন কি আসিয়াছেন এইরূপ লোকের মনে হইত। শ্রীনবদ্বীপে তাঁহার প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে লোকে তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দক্ষিণ দেশে যখন যেখানে যাইতেন, তখনই সেখানে ঐরূপ লোকের মনের ভাব হইত। যখন বৃন্দাবনে গমন করেন, তখন সেখানে জনরব হয় যে শ্রীকৃষ্ণ উদয় হইয়াছেন। বারাণসীতেও ঠিক সেইরূপ লোকের মনে উদয় হইয়াছিল যে, সেই নগরে কি একটা বৃহৎ কাণ্ড ঘটিবে তাহার উদ্যোগ হইতেছে। তাহার পরে যখন সন্ন্যাসিসভায় প্রভু জয়লাভ করিয়া আসিলেন, তখন সমুদায় বারাণসী প্রভুকে লইয়া উন্মত্ত হইল।

এইরূপ যখন সর্ব্ব সাধারণের মনের ভাব,—যখন কাশীবাসিগণের মন কর্ষিত ও দ্রবীভূত করা হইল,—তখন ভক্তিবীজ রোপণ করিবার সময় হইল, আর তাই প্রভু উহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই নিমিত্ত প্রকাশানন্দের সহিত তিনি সভায় মিলিলেন।

প্রভু প্রেমে উন্মত্ত হইয়া যেই নৃত্য আরম্ভ করিলেন, আর অমনি তরঙ্গ উঠিল। সেই তরঙ্গে প্রথমে ভক্তগণ, পরে দর্শক লক্ষ লোকে প্লাবিত হইলেন। সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন একথা মুখে মুখে নগরময় প্রকাশ হইয়া গেল। সহস্র সহস্র লোক নৃত্য দেখিতে আসিল, ও সেস্থান লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। প্রভু নৃত্যকালে মুখে হরি হরিধ্বনি করিতেছিলেন, আর সহস্র সহস্র লোক গগন ভেদ করিয়া সেই সঙ্গে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। ইহাতে অতিশয় কলরব হইল। প্রকাশানন্দ যখন বাসায় বসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, কৃষ্ণ-চৈতন্য বস্তুটি কি, তখন তিনি এই কলরব শুনিতে পাইলেন। এমন সময় একজন লোক দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার

সভায় সংবাদ দিল যে, কৃষ্ণ-চৈতন্য নৃত্য করিতেছেন, তাহাই দেখিয়া লক্ষ লোকে হরিধ্বনি করিতেছে।

এই কথা শুনিয়া প্রকাশানন্দ সরস্বতী ব্যগ্র হইয়া সভা সমেত উঠিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নৃত্য দর্শন করিতে ধাইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের বচন শুনিয়াছেন, রূপও দর্শন করিয়াছেন ও তাঁহার নয়নবাণের শক্তিও অনুভব করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রেমভাব, কি নৃত্য কখনও দর্শন করেন নাই। আজ বিধি সেই শুভ দিন মিলাইয়া দিলেন। যে নৃত্য দর্শনে সার্ব্বভৌম প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ বিগলিত হইয়াছেন, আজ শ্রীগৌরাঙ্গের সেই ভুবনমোহন নৃত্য দর্শন করিতে যাইতেছেন। জগৎমান্য, গম্ভীর প্রকৃতি, বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানময়, কৌপীনধারী সন্ন্যাসীঠাকুর, ধৈর্য্যহারা হইয়া, বালকের মত, দণ্ড কমণ্ডলু ফেলিয়া, সন্ন্যাসীদিগের ঘৃণার সামগ্রী নৃত্য দেখিতে দৌড়িলেন!

প্রকৃত কথা কি শ্রবণ করুন। সরস্বতী তখন ভিতরে বাহিরে কেবল গৌরময় দেখিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা তিনি প্রভুর নিকট গমন করেন, তাঁহার নিকট উপবেশন করেন, কি তাঁহার কথা শুনেন, অন্ততঃ একবার উঁকি মারিয়া মুখ খানি দেখিয়া আইসেন: কিন্তু প্রভুর সহিত মিলন হইতেছে না। প্রভু আইসেন না, তিনিও অভিমানে যাইতে পারেন না। তিনি কাশীর একরূপ রাজা, ভারতের সর্ব্বপ্রধান সন্ন্যাসী। তিনি এখন চঞ্চল বালকের ন্যায় বালক-চৈতন্যকে দেখিতে যাইবেন, ইহা কিরূপে হয়? "দারুণ কুলের দায়," তাই উহা পারিতেছেন না। এখন একটী সুযোগ পাইলেন, আর অমনি প্রাণনাথকে দেখিতে দৌড়িলেন।

তাঁহাকে ও তাঁহার সভাসদ্‌গণকে দেখিয়া সকলে পথ ছাড়িয়া দিল, তিনি ও তাঁহার শিষ্যবর্গ নৃত্যকারী শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। প্রকাশানন্দ যাইয়া কিরূপ দেখিলেন, তাহা তাঁহার নিজ কৃত শ্লোকে ব্য-

করিয়াছেন। সে শ্লোকটি এই ঃ—

উচ্চৈরাস্ফালয়ন্তং করচরণমহো হেমদণ্ডৌপ্রকাণ্ডৌ
বাহু প্রোদ্ধৃত্য সত্তাণ্ডবতরলতনুং পুণ্ডরীকায়তাক্ষম্।
বিশ্বশ্যামঙ্গলঘ্নং কিমপি হরিহরীত্যুন্মদানন্দনাদৈ-
র্ব্বন্দে তং দেবচূড়ামণিমতুলরসাবিষ্টচৈতন্যচন্দ্রম্॥

অর্থাৎ—"যিনি নৃত্য করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে করচরণকে আস্ফালন করাইতেছেন, যিনি সুবর্ণদণ্ড সদৃশ বাহুদ্বয় উর্দ্ধ করিয়া আপনার শরীরকে তরঙ্গায়মান করিতেছেন, এবং যিনি উন্মত্তের ন্যায় হরি হরি এই আনন্দ-জনক ধ্বনি দ্বারা জগতের অশুভ ধ্বংস করিতেছেন, সেই দেবশ্রেষ্ঠ অতুল রসমুগ্ধ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে বন্দনা করি।"

প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভুকে দেখিলেন যেন সোণার পুত্তলি ইতস্ততঃ নৃত্য করিয়া বিচরণ করিতেছেন। প্রেমে অঙ্গ গলিয়া পড়িতেছে। আনন্দে চন্দ্রমুখ প্রফুল্ল হইয়াছে। কমললোচন দিয়া পিচকারীর ন্যায় ধারা ছুটি-তেছে ও সেই নয়নের জল দ্বারা চতুঃপার্শ্বস্থ সমুদায় লোকের অঙ্গ বিধৌত হইতেছে। সরস্বতী, সম্মুখে এক অপরূপ অনির্ব্বচনীয় ছবি দর্শন করি-লেন! দর্শনে প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন, যেন মূর্চ্ছিত হয়েন।

পরে একটু সম্বিৎ পাইয়া তিনি কোথায়, কি দেখিতেছেন, ইহা অনু-ভব করিলেন। এইরূপ একটু নৃত্যমাধুরী দর্শন করিয়া প্রকাশানন্দের হৃদয় দ্রবীভূত হইল ও বহুকাল পরে নয়ন হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও সেই ধারা নিবারণ করিতে পারিলেন না।

বিজ্ঞ লোকের পক্ষে নয়নবারি-নিক্ষেপ বড় লজ্জার কথা, সরস্বতীর পক্ষে ত বটেই। সেই শত সহস্র লোক মধ্যে সরস্বতী রোদন করিবেন, ইহা কিরূপে হইবে? কিন্তু তিনি দুর্ব্বার নয়নধারা নিবারণ করিতে

পারিতেছেন না। আনন্দধারার সৃষ্টি হইল ও উহা মুখ বুক বহিয়া পড়িতে লাগিল। ধারা পড়িতে পড়িতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান অন্তর্হিত হইল, তখন দেখিতেছেন কি না, যেন একটি তেজোমণ্ডিত সুবর্ণের পুত্তলি নৃত্য করিতেছেন। হয় জ্ঞান হইতে ভক্তি, নতুবা ভক্তি হইতে জ্ঞানের উদয় হইল। তখন দেখিলেন যে, যে নবীন সন্ন্যাসীটী নৃত্য করিতেছেন, তিনি সন্ন্যাসী নহেন, স্বয়ং শ্রীহরি, সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া লোকের নিকট লুকাইয়া আছেন। সরস্বতী প্রভুকে চিনিতে পারিলেন! বুঝিলেন যে, শ্রীহরি কপটসন্ন্যাসী রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। তিনি তখন কিরূপ দেখিতেছেন তাহাও তাঁহার নিজ কৃত আর একটী শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। সে শ্লোকটি এই :—

প্রবাহৈরশ্রূণাং নবজলদকোটী ইব দৃশৌ
দধানং প্রেমর্দ্ধ্যা পরমপদকোটীঃ প্রহসনম্।
বমন্তং মাধুর্য্যৈরমৃতনিধিকোটী রিব তনু
চ্ছটাভিস্তং বন্দে হরিমহহ সন্ন্যাসকপটম্ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থ।—"যিনি কোটী নবমেঘসদৃশ অশ্রুধারাপূর্ণ নয়নযুগল ধারণ করিতেছেন, যিনি প্রেম-সম্পত্তি দ্বারা কোটী বৈকুণ্ঠাদি অবজ্ঞা করিতেছেন এবং যিনি অঙ্গলাবণ্য ও মাধুর্য্য দ্বারা কোটী অমৃতসিন্ধু উদ্গার করিতেছেন, অহো! আমি সেই কপট সন্ন্যাস শ্রীহরিকে বন্দনা করি।"

সরস্বতীর নয়নধারা বহিতেছে, আর অন্তরে আনন্দের তরঙ্গ উঠিতেছে। দেখিতেছেন জগৎ একেবারে সুখময়। দুঃখের লেশ মাত্র এখানে নাই। অন্তরে এত আনন্দ উথলিয়া উঠিতেছে যে, বৈকুণ্ঠে গমন পর্য্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইতেছে। গৌরাঙ্গের রূপ চুমকে চুমকে পান করিতেছেন। আর যেন ক্রমে উন্মত্ত হইতেছেন।

নয়নের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া তৃপ্তি হইতেছে না। ইচ্ছা

হইতেছে, ধরিয়া আলিঙ্গন করেন, আর মনে মনে যেরূপ ইচ্ছা হইতেছে বাহ্য জ্ঞানশূন্য হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা সেইরূপ অভিনয় করিতেছেন। তখন তাঁহার পঞ্চেন্দ্রিয় প্রভুতে লীন হইয়া গেল। প্রভু নৃত্য করিতেছেন, তাঁহারও পদ সেইরূপ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। প্রভুর অঙ্গ তরঙ্গায়মান হইতেছে, তাঁহারও সেইরূপ হইতে লাগিল।

সরস্বতী ঠাকুর ভুবনমোহন নৃত্য দেখিয়া কিরূপ মুগ্ধ হয়েন তাহা তিনি নিজে বর্ণনা করিয়াছেন। উহা অবলম্বন করিয়া আমি এই গীতটি করিয়াছিলাম, যথা :—

প্রেমেতে বিবশ অঙ্গ, কি ক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গ,
নাচিলেন কটি দোলাইয়া।
কি ক্ষণে ও নয়নে, চাহিলেন মোর পানে,
অঙ্গ মোর উঠিল কাঁপিয়া॥
আহা আহা মরি মরি, হরি হরি বোল বলি,
গলিয়া গলিয়া যেন পড়ে।
কঠিন হইয়া ছিনু, নিবারিতে না পারিনু,
প্রবেশিল হৃদয় মাঝারে॥
আমি চির কুলবালা, নাহি জানি প্রেম জ্বালা,
আজ একি দায় হ'ল মোরে।
গৌর বর্ণ চোর এলো, যাহা ছিল সব নিল,
নিয়ে গেল কুলের বাহিরে॥
নিরমল কুলখানি সন্ন্যাসীর শিরোমণি,
কলঙ্ক ভরিল ত্রিজগতে।
বলরাম বলে শুন, সন্ন্যাসে কি প্রয়োজন,
পরম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রীতে॥

প্রভু দুই বাহু তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন, বাহ্য জ্ঞান মাত্র নাই। লোকে যে কলরব করিতেছে তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। প্রকাশানন্দ যে আসিয়াছেন, আর তাঁহার নৃত্য দর্শন করিতেছেন, তাহাও প্রভু জানেন না।

লোকের অতিশয় কলরবে পরিশেষে প্রভুর চৈতন্য হইল ও তখনি নৃত্য সম্বরণ করিলেন। দেখেন, প্রকাশানন্দ সম্মুখে দাঁড়াইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার নৃত্য দেখিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশানন্দকে দেখিয়া লজ্জা পাইয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তখনি প্রকাশানন্দ প্রভুর দুটি পদ ধরিয়া ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যস্ত ব্যস্ত প্রকাশানন্দকে উঠাইলেন। উঠাইয়া কহিলেন, হে শ্রীপাদ! কেন আমাকে অপরাধী করেন? আপনি জগদ্গুরু, আমি আপনার শিষ্যের উপযুক্ত নহি। অবশ্য আপনার কাছে ছোট বড় সমান, আর লোক শিক্ষার নিমিত্ত আপনি আমাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু আপনার এই কার্য্যে আমি বড় ক্লেশ পাইলাম।

প্রভু যে তাঁহাকে প্রণাম করিবেন ইহা সরস্বতী জানিতে পারিলে করিতে দিতেন না। তাঁহার মনোমধ্যে প্রতীত হইয়াছে যে প্রভু স্বয়ং তিনি। এমন বস্তুকে তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিতে দিতেন না। প্রকাশানন্দ অত্যন্ত অভিমানী, কিন্তু ভগবানের কাছে তাঁহার আর অভিমান রহিল না। প্রকাশানন্দ বলিলেন, শ্রীভগবন্! আপনি আমাকে বঞ্চনা করিবেন না। আপনার চরণ আমি কেন ধরিলাম তাহার শাস্ত্র আপনাকে বলিতেছি। যথা শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে—

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শ হতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপু হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতং॥

পূর্ব্বে আমি আপনার নিন্দা করিয়া আপনার চরণে অপরাধী হই-

য়াছি, কিন্তু শাস্ত্রে জানি যে ভগবানে অপরাধ ভগবানের চরণ স্পর্শ করিলেই ক্ষয় হয়। আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিলাম, এক্ষণে আমাকে কৃপা করুন।

তখন শ্রীগৌরাঙ্গ জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন, শ্রীবিষ্ণু! শ্রীপাদ বলেন কি? আমি ক্ষুদ্র জীব। ক্ষুদ্র জীবকে ভগবান্ বোধ করেন, ইহাতে আমারও অপরাধ আপনারও অপরাধ। আমি ভগবানের দাস বই নহি। এরূপ বাক্য আর মুখে আনিবেন না।

সরস্বতী বলিলেন, আমি জানিয়াছি আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্। কিন্তু যদি আপনাকে গোপন করিবার নিমিত্ত আপনাকে ভগবানের দাস বলিয়া পরিচয় দেন, তবু আমি পাষণ্ড, আপনি ভক্ত, আমার পূজ্য। আপনার কৃপা পাইলে আমি কৃতার্থ হই।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু উঠিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন। যেরূপ কথা হইতে লাগিল উহা বহুলোকের শুনিবার উপযুক্ত নহে বলিয়া প্রভু চুপ করিলেন। প্রকাশানন্দও তখন ধীরে ধীরে বাসায় গমন করিলেন।

জীবকে দুই রূপে বিভক্ত করা যায়,—যাঁহারা পরকাল মানেন ও যাঁহারা মুখে বলেন পরকাল মানেন না। যাঁহারা পরকাল মানেন, তাঁহারা পাঁচটি রসের, কি তাহার একটি কি কতকটীর, আশ্রয় করিয়া মহাপথের "সম্বল" করিয়া থাকেন। সেই পাঁচটি রস, যথা—শান্ত, দাস্ত, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর।

শান্ত কাহারা, না যাঁহাদের হৃদয়ে উদ্বেগ নাই। তাঁহারা নানা রূপ সাধনে আপনার আত্মাকে পবিত্র করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা তাঁহাদের নিজের, অপর কাহারও বস্তু নন। যতগুলি ইন্দ্রিয় ও বাসনাতে মনকে দুঃখ দিতে সক্ষম, সে গুলি তাঁহারা উৎপাটন করিবার চেষ্টা করেন। সুতরাং ইন্দ্রিয় ও বাসনা হইতে যে সুখোৎপত্তি তাহাতে যদিও বঞ্চিত

থাকেন, কিন্তু ইন্দ্রিয় ও বাসনাজনিত দুঃখ হইতেও অব্যাহতি পান। শান্ত রস আশ্রয় করিয়া যে যে সম্প্রদায় সাধন করেন, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি, যথা—বৌদ্ধ, যোগী, মায়াবাদী, ইত্যাদি। তাঁহারা নানা কথা বলেন, যথা—শ্রীভগবানও যে, আমিও সে। কেহ বলেন, শ্রীভগবান থাকিতে পারেন, কিন্তু আমাকে ভাল কি মন্দ করিতে পারেন না, আমি নিজেই আমার ভাল মন্দের কর্ত্তা, অর্থাৎ আমি আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিব। কাজেই ইহাঁরা স্বভাবতঃ ভগবদ্ভক্তিকে তত শ্রদ্ধা করেন না।

যাহারা দাস্য রসের সাধনা করেন, তাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীভগবান হইতে পৃথক বস্তু ভাবনা করেন। তাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট আধ্যাত্মিক কি বিষয় ঘটিত বর প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যথা—'হে আমার সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা, আমি দরিদ্র ও অক্ষম, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে ইহা দাও।" এই প্রার্থনা তাঁহাদের সাধনা। এই দাস্য রস দ্বারা হিন্দুগণের মধ্যে শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় ও অন্যান্য ধর্ম্মের মধ্যে খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানগণ ভজনা করিয়া থাকেন। দাস্য রস ও ভগবদ্ভক্তি এক জাতীয় বস্তু। যাঁহারা দেবীকে মা বলিয়া ও শঙ্করকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন, তাঁহাদের ভজন দাস্য ভক্তির অনুগত। দাস্যের পরে আর তিনটি রস,—যথা সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—ইহা ভক্তির বাহিরে, ইহা প্রেমের অন্তর্গত। এই রস ভগবদ্ভক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শ্রীভগবানকে আত্মীয় জ্ঞান ব্যতীত তাঁহাকে সখা, পতি, কি পুত্র বলা যায় না। শ্রীভগবান ঐশ্বর্য্যময়, এই জ্ঞান থাকিতে এইরূপ আত্মীয়তা হয় না। এই তিনটি রস দ্বারা বৈষ্ণবগণ ভজনা করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত এই রস অন্য কোন ধর্ম্মে নাই।

অনেকে ভাবিয়া থাকেন যে, শ্রীভগবানকে সখা, কি পুত্র, কি প্রাণনাথ ভাবে ভজনা করা মনুষ্যের অসাধ্য; অতএব যাঁহারা এ সব কথা

বলেন, তাঁহারা কেবল কতকগুলি বাক্য ব্যয় করেন। যাঁহারা এ কথা বলেন তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বিচার করেন নাই। সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীভগবানকে সখা, কি পুত্র, কি প্রাণনাথ বলা যায় না, ইহা সত্য ও বৈষ্ণবগণ তাহা স্বীকার করেন। তবে তাঁহারা গোপী অনুগত হইয়া এ সমুদায় রসের পুষ্টি করেন। সে কিরূপ, না, বৈষ্ণব স্বয়ং শ্রীভগবানকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিবেন না, তবে যশোমতীর কি শচীর দ্বারা সম্বোধন করাইবেন। তিনি আপনি শ্রীভগবানকে প্রাণনাথ কি বন্ধু বলিয়া ডাকিবেন না, কিন্তু শ্রীমতীর দ্বারা ডাকাইবেন। যথা গোপী-অনুগত-শ্রীবৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন শ্রবণ করুন—

বধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
অনেক পুণ্যফলে গৌরী আরাধিয়ে
পেয়েছি কামনা করি।
না জানি কি ক্ষণে দেখা তব সনে
তেঞিঃ সে পরাণে মরি॥
বড় শুভক্ষণে তোমা হেন ধনে
বিধি মিলাওল আনি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
অধিক করিয়া মানি॥
গুরু গরবেতে তারা বলে কত
সে সব গরল বাসি।
তোমার কারণে গোকুল নগরে
দুকুলে হইল হাসি॥

চণ্ডীদাস বলে শুনহ নাগর
রাধার মিনতি রাখ।
পিরীতি রসের চূড়ামণি হয়ে
সদা অন্তরেতে থাক॥

এই যে উপরে শ্রীভগবানকে অতি মধুর সম্বোধন, ইহা চিত্তকে আনন্দে পরিপ্লুত করে! কিন্তু কোন্ জীব শ্রীভগবানকে এরূপ সম্বোধন করিবার শক্তি ধরেন? যদি কোন জীব শ্রীভগবানকে এরূপ সম্বোধন করেন, তবে তিনি হয় দাম্ভিক, নয় বাতুল। তাই বৈষ্ণবগণ শ্রীমতী রাধার দ্বারা শ্রীভগবানকে এরূপ নিবেদন করিতেছেন।

প্রকাশানন্দ বাসায় আসিলেন। তিনি এক প্রকার ছিলেন, দুই তিন দিবস মধ্যে তাহার ঠিক বিপরীত হইলেন। পূর্ব্বে ছিলেন মায়াবাদি-সন্ন্যাসী, এখন হইলেন কুলটা প্রেমপাগলিনী। কয়েক দিনের মধ্যে ভজন পথের এক সীমা হইতে অন্য এক সীমায় আসিয়াছেন। পূর্ব্বে ছিলেন তেজস্বর স্বাধীন পুরুষ, এখন হইলেন যেন প্রেমভিখারিণী অবলা। সৌভাগ্যের মধ্যে তাহার মনের মধ্যে যে সমুদায় ভাব-তরঙ্গের খেলা খেলিয়াছিল, তাহা তিনি জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত, তাঁহার নিজ গ্রন্থে অতি জীবন্তরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রথমে প্রকাশানন্দ অনুভব করিলেন তিনি নিষ্পাপ হইয়াছেন। তিনি মনে মনে বুঝিলেন তাঁহার হৃদয়ে মলা মাত্র নাই, উহা পবিত্র হইয়া গিয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইলেন। ফল কথা, পাপ দুই প্রকারে ধ্বংস করা যায়, এক অনুতাপ দ্বারা দগ্ধ করিয়া, আর এক, ভগবৎপ্রেম ও ভক্তি দ্বারা ধৌত, কি উহার গুণ পরিবর্ত্তিত করিয়া। অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া কেহ পবিত্র হয়েন, কেহ তাঁহার পাপরূপ যে অঙ্গার, একটু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দ্বারা তাহার মলিনত্ব ঘুচাইয়া থাকেন।

এইরূপে অন্তরের অতি কুপ্রবৃত্তি, ভক্তি কর্তৃক শোধিত হইলে উহা সুন্দর আকার ধরে। তখন সেই কুপ্রবৃত্তি মহা উপকারী ও প্রার্থনীয় বস্তু হয়। যেমন আলকাতরা হইতে ম্যাজেন্টা হয়, সেইরূপ পাপকে ভক্তির শক্তিতে মহা উপকারী কোন বস্তুরূপে পরিণত করা যাইতে পারে।

যাঁহারা অনুতাপানলে আপনাদিগকে পরিশুদ্ধ করেন, তাঁহারা শ্রীভগবানকে বিচারপতি ভাবে ভজনা করেন। যাঁহারা তাঁহাতে ভক্তি অর্পণ দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হয়েন, তাঁহারা শ্রীভগবানকে স্পর্শমণিরূপে ভজনা করেন।

প্রকাশানন্দ তাঁহার চৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে শ্রীভগবানকে বন্দনা করিয়া দ্বিতীয় শ্লোকে বলিতেছেন—

ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ সততপরমাবিষ্ট এবাত্যধর্ম্মে
দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং সৃষ্টিষু কাপি নো সন
যদ্দত্তশ্রীহরিরসসুধাস্বাদমত্তঃ প্রনৃত্য-
ত্যুচ্চৈর্গায়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কম্পিদীশং॥

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তিকে ধর্ম্ম কখন স্পর্শ করে নাই, যে সর্ব্বদা অধর্ম্মে আবিষ্ট, যে কখন পাপপুঞ্জ-নাশক সাধুজনের দৃষ্টিপথে ও সজ্জন রচিত স্থানে গমন করে নাই, সে ব্যক্তিও যদ্দত্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস-সুধার আস্বাদনে মত্ত হইয়া নৃত্য, গীত ও ভূমিতে বিলুণ্ঠন করে, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার।"

আবার বলিতেছেন, যথা ৭৬ শ্লোকে—"অতি পাতকী, নীচজাতি, দুরাত্মা, দুষ্কর্ম্মশালী, চণ্ডাল, সতত দুর্ব্বাসনারত, কুস্থান জাত, কুদেশবাসী অর্থাৎ কুসংসর্গী ইত্যাদি সমস্ত নষ্ট ব্যক্তিদিগকে যিনি কৃপা করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীগৌরহরির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।"

আবার ১১১ শ্লোকে—"অকস্মাৎ সহৃদয় শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলে যাহাদিগের যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, দান, ব্রত, বেদাধ্যয়ন, সদাচার প্রভৃতি কিছু মাত্র ছিল না, পাপকর্ম্মের নিবৃত্তির কথা আর কি বলিব, এই সংসারে তাঁহারাও হৃষ্টচিত্ত হইয়া পরম পুরুষার্থ-শিরোভূষণ প্রেমানন্দ লাভ করিতেছেন, যাহা আর কোন অবতারে নাই।"

সরস্বতী বলিতেছেন যে, এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক জীবগণ অনায়াসে উদ্ধার পাইতেছে। কিরূপে এরূপ মহাপাপী পবিত্রীকৃত হইতেছে? যথা চতুর্থ শ্লোক—

দৃষ্টঃ স্পৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতো বা-
দূরস্থৈরপ্যানতো বাদৃতো বা।
প্রেম্ণঃ সারং দাতুমীশো য একঃ
শ্রীচৈতন্যং নৌমি দেবং দয়ালুং॥

অর্থাৎ—'যিনি একমাত্র দৃষ্ট, আলিঙ্গিত, বা কীর্ত্তিত অথবা রূপলাবণ্যাদি দ্বারা বশীভূত হইলে কিম্বা দূরস্থ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক নমস্কৃত বা আদৃত হইলেই প্রেমের গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেন, সেই পরম দয়ালু শ্রীচৈতন্যদেবকে নমস্কার করি।"

সরস্বতী ভাবিতেছেন, তিনি যে নিষ্পাপ হইয়াছেন, নির্ম্মল হইয়াছেন, অর্থাৎ শীতল হইয়াছেন, তাহার ত আর কোন কারণ নাই, কেবল প্রভু গৌরাঙ্গ তাঁহার দিকে একবার চাহিয়াছিলেন, আর একবার তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন। যদি এখানে কেহ বলেন যে, সরস্বতী কি পূর্ব্বে নির্ম্মল ছিলেন না? তাহার উত্তরে বলিব যে, না; যেহেতু তখন তাঁহার ঈর্ষা, ক্রোধ, নীচত্ব, অভিমান প্রভৃতি নানা দোষ অধিক পরিমাণে ছিল। এ সমুদায় থাকিতে পবিত্র হওয়া যায় না। এখন শীতল হইয়াছেন, জ্বালা মাত্র নাই, তাই বুঝিতেছেন যে

নীরোগ অর্থাৎ নির্ম্মল হইয়াছেন। যে রোগী ও যে সুস্থ সে আপনাপনি বুঝিতে পারে।

পূর্ব্বরাগ উদয় হইবা মাত্র প্রথমেই কিরূপ বোধ হয় তাহা শ্রীমতীর উক্তি এই পদে ব্যক্ত। যথা—

"সখি! বন্ধুয়া পরশমণি। ধ্রু।

সে অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার, সোণার বরণ খানি।"

অতএব পাপ মোচনের নিকৃষ্ট উপায় আত্মগ্লানি, উৎকৃষ্ট উপায় শ্রীভগবানের নাম কি গুণ সুধা রসে হৃদয়কে ধৌত কি সিক্ত করা।

এখানে সরস্বতী ঠাকুর প্রভু গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ এক অপরূপ সাক্ষ্য দিতেছেন, অর্থাৎ তাঁহার এরূপ অমানুষিক শক্তি ছিল যে, তাঁহাকে শুদ্ধ দর্শনে, এমন কি দূর দর্শনে অতি যে মহাপাপী সেও নির্ম্মল হইত এবং অতি উপাদেয় ব্রজের নিগূঢ় রস পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিত। এরূপ শক্তি কোন জীব, কি কোন অবতারের কখন প্রকাশ করিতে পারেন নাই, তাই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান বলিয়া পূজিত।

তাহার পরে সরস্বতী দেখিতেছেন যে, তাঁহার প্রকৃতি, রুচি, বিশ্বাস ও জ্ঞান, সমুদায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কি হইয়াছে, না, যাহার উপর ঘৃণা ছিল তাহাতে রুচি, যাহাতে রুচি ছিল তাহার উপর ঘৃণা হইয়াছে। এখনকার তাঁহার মনের ভাব শ্রবণ করুন। যথা তাঁহার শ্লোক—

ধিগস্তু ব্রহ্মাহং বদনপরিফুল্লান্ জড়মতীন
ক্রিয়াসক্তান্ ধিগ্ ধিগ্ বিকটতপসো ধিক্ চ যমিনঃ।
কিমেতান্ শোচামো বিষয়রসমত্তান্নরপশূ-
ন্ন কেষাঞ্চিল্লেশোঽপ্যহহ মিলিতো গৌর মধুনঃ॥

"আমি ব্রহ্ম এই মাত্র তত্ত্ব জ্ঞানে প্রফুল্লবদন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে

ধিক্, নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সকলে সর্ব্বদা আগ্রহযুক্ত ব্যক্তিগণকে ধিক্, উৎকট তপস্যাকারি ব্যক্তিদিগকে ধিক্, এবং যে সকল ব্যক্তি সমুদায় ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে বশীভূত করিয়াছে সেই সকল সংযমিগণকেও ধিক্, অর্থাৎ এই সকল বিষয় রসে প্রমত্ত নরপশুগণ আমাদের শোচনীয়, যেহেতু ইহাদিগের মধ্যে কেহই শ্রীগৌরপদাম্ভোজের মধু-লেশও প্রাপ্ত হয় নাই।

তিনি যাহা চিরদিন করিয়া আসিয়াছেন, এখন তাহা যাহারা করে তাহাদিগকে তিনি "নর-পশু" বলিতেছেন। উপরের শ্লোকে প্রকারান্তরে তিনি স্বীকার করিতেছেন যে, পূর্ব্বে তিনি নর-পশু ছিলেন। আবার বলিতেছেন, যথা ২৬ শ্লোক—

আস্তাং বৈরাগ্যকোটি র্ভবতু শমদমক্ষান্তিমৈত্র্যাদিকোটি
স্তত্ত্বানুধ্যানকোটি র্ভবতু ভবতু বা বৈষ্ণবী ভক্তিকোটিঃ।
কোট্যংশোঽপ্যস্য ন স্যাত্তদপি গুণ গণো যঃ স্বতঃ সিদ্ধ আস্তে
শ্রীমচ্চৈতন্যচন্দ্রপ্রিয়চরণনখজ্যোতিরামোদভাজাং॥

"বৈরাগ্য কোটিতেই বা কি হইবে, শম দম ক্ষান্তি ও মৈত্র্যাদি অর্থাৎ শুচিত্বাদি কোটিতেই বা কি হইবে, নিরন্তর "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার ঐক্য বিষয়ক চিন্তা কোটিতেই বা কি হইবে, আর বিষ্ণু সম্বন্ধীয় ভক্তি কোটিতেই বা কি হইবে, শ্রীমচ্চৈতন্য-চন্দ্রপ্রিয়-ভক্তগণের চরণনখ-জ্যোতি দ্বারা হর্ষপ্রাপ্ত মানবদিগের যে স্বভাবসিদ্ধ গুণ সমূহ বর্ত্তমান আছে, তাহার কোটাংশের একাংশও অন্যেতে নাই।"

যাঁহারা নিরাকারবাদী, শ্রীভগবান্‌কে জ্যোতিঃস্বরূপ ভাবিয়া যোগ-সাধন করেন, তাঁহাদের ফল ব্রহ্মানন্দ। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম পাইয়া-ছেন, তাঁহাদের ফল প্রেমানন্দ। সরস্বতী ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে-

ছিলেন। যাঁহারা যোগ করেন তাঁহারা এই আনন্দের আস্বাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু এখন প্রেমানন্দের আস্বাদ পাইয়া, সরস্বতী বলিতেছেন যে, প্রেমানন্দে যে হর্ষ আছে, ব্রহ্মানন্দে তাহার কোটী অংশের এক অংশও নাই।

সরস্বতী ঠাকুর তাহার গ্রন্থে বলিতেছেন যে (সপ্তম শ্লোক) অবতার শিরোমণি নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণ। কপিলদেবও অবতার, যিনি জীবকে যোগ শিক্ষা দেন। কিন্তু ইহাঁরা যে কার্য্য করিয়াছেন, ইহার সহিত, শ্রীগৌরাঙ্গের যে মহৎ কার্য্য অর্থাৎ জীবকে প্রেম-ভক্তি শিক্ষা দেওয়া, তাহার তুলনাই হয় না। জীব-রক্ষার নিমিত্ত দৈত্যনাশ। যোগ-শিক্ষা দেওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, উহা দ্বারা জীব উন্নতি করিবে। কিন্তু প্রেমধন যিনি দান করিলেন, তিনি জীবকে শ্রীভগবানের নিজ জন করিলেন। সে জীবের যোগের প্রয়োজন নাই, তাহার দৈত্যের কি অন্য কাহারও ভয় নাই। যে ব্যক্তি ভগবৎ প্রেম পাইল সে শ্রীভগবানের নিজ জন হইল, তাহার আর শ্রীরামের কি শ্রীনৃসিংহের দত্ত আশীর্ব্বাদে প্রয়োজন নাই।

সরস্বতী মনে বিচার করিতেছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ অবশ্য সেই শ্রীহরি, সামান্য জীব নহেন। যেহেতু যাঁহার দর্শনমাত্রে মহাপাপী মহাপ্রেমী হয়, তিনি যে সামান্য জীব, ইহা হইতে পারে না, তিনি অবশ্যই সেই শ্রীভগবান।

কখন সরস্বতী ইহাও ভাবিতেছেন যে, তিনি না হয় মূর্খ, নির্ব্বোধ, কি মুগ্ধ, কিন্তু বাসুদেব সার্ব্বভৌম, যিনি ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও পণ্ডিত, তিনি ত আর মূর্খ কি নির্ব্বোধ নহেন? সার্ব্বভৌম যখন শ্রীপ্রভুকে শ্রীভগবান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন সেই যথেষ্ট প্রমাণ যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কপটবেশ শ্রীহরি, সামান্য জীব নহেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে জীব কি সম্পত্তি পাইয়াছে, তাহা সরস্বতী ঠাকুর,—যিনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী,—নানা স্থানে বিচার করিয়াছেন। পাঠক মহাশয়! এখানে আপনাকে একটী নিবেদন। যোগ ভাল, কি প্রভুর মত অর্থাৎ ভক্তি ভাল, তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই. যেহেতু যোগ সাধন করা তোমার সাধ্যাতীত। সেখানে প্রভুর চরণাশ্রয় ব্যতীত আর তোমার গতি কি আছে? যদি বল তিনি কে, তাঁহার পদে অবনত হইলে যদি আমার সর্ব্বনাশ হয়? কিন্তু সরস্বতীর ন্যায় মহাজন, যিনি যোগী, পরম জ্ঞানী, সন্ন্যাসীর শিরোমণি—তিনি যোগের পথ পরিত্যাগ করিয়া যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তুমি নিঃশঙ্ক-চিত্তে তাহা করিতে পার।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে আমরা দর্শন করি নাই, তাঁহার সহিত সহবাস করি নাই। কিন্তু তিনি শ্রীভগবান বলিয়া পূজিত, অতএব তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি বিচারে অবশ্য লাভ আছে। অতএব সূক্ষ্মদর্শী সরস্বতী তাঁহার সহিত সহবাস করিয়া তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি কিরূপ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার পর্য্যালোচনা করিব। সরস্বতী বলিতেছেন, প্রভুর "প্রকাণ্ড বাহুদ্বয় হেমদণ্ডের ন্যায়; তাঁহার "হাস্য চন্দ্রকিরণের ন্যায় মনোহর"; তাঁহার "কপোল-দেশের প্রান্তভাগে মধুর মধুর হাস্যসমন্বিত"; তাঁহার "শ্রীমুখ প্রণয়াকুল"; তাঁহার "শ্রীমুখ ঈষৎ হাস্য শোভিত"; তাঁহার "স্নিগ্ধ দৃষ্টি"; তাঁহার "করুণাসিন্ধু, অশ্রুপূর্ণ নেত্র"; তাঁহার "নয়নপদ্ম হইতে নিঃসৃত মনোহর মুক্তাফল সদৃশ অশ্রুবিন্দু এবং উদ্গত রোমাঞ্চ দ্বারা অলঙ্কৃত শ্রীঅঙ্গ"; তাঁহার "মুখসৌন্দর্য্য কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও সুদৃশ্য"; তিনি "প্রফুল্ল কনককমলের কেশর অপেক্ষাও সুদৃশ্য"; তিনি "প্রফুল্ল কনককমলের কেশর অপেক্ষা মনোহর কান্তিধারী"; যাঁহার "জপমালা শোভিত প্রেমে কম্পিত কর";

তাঁহার "শ্রীমূর্ত্তি লাবণ্য দ্বারা কোটী অমৃত সমুদ্রকে উদ্গার করিতেছেন।"

সরস্বতী প্রভুর ভাব কিরূপ বর্ণনা করিতেছেন, এখন শ্রবণ করুন। তিনি "করতলে বদর ফলের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ কপোলদেশ অর্পণ করিয়া নয়নজলে সম্মুখস্থ ভূমি পঙ্কিল করিতেছেন"; তিনি "নয়ন-বারিধারায় পৃথীতল পঙ্কিল করিতেছেন"; "যিনি নবীন মেঘ দেখিয়া উন্মত্ত হয়েন, ময়ূর চন্দ্রিকা দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হয়েন, গুঞ্জাবলী দর্শনে কম্পিত-কলেবর হয়েন, যিনি শ্যামকিশোর পুরুষ দর্শনে ব্যথিত হয়েন।"

সরস্বতী, প্রভুর রূপ ও গুণ চিন্তা করিতে করিতে যেমন মনে একটি ভাবের উদয় হইত, অমনি উহা শ্লোকরূপে প্রকাশ করিতেন। কোন একদিন প্রভুর রূপ কি গুণ লিখিতে আপরগ হইলেন, হইয়া এই শ্লোকটী করিলেন, যথা ১০১ শ্লোক ঃ—

সৌন্দর্য্যে কামকোটিঃ সকলজনসমাহ্লাদনে চন্দ্রকোটি
র্বাৎসল্যে মাতৃকোটি স্ত্রিদশবিটপিনাং কোটিরৌদার্য্যসারে।
গাম্ভীর্য্যেঽম্ভোধিকোটি র্মধুরিমনি সুধাক্ষীরমাধ্বীক কোটি
র্গৌরোদেবঃ সজীয়াৎ প্রণয়রসপদে দর্শিতাশ্চর্য্যকোটিঃ॥

"যিনি কোটি কন্দর্পের ন্যায় পরম সুন্দর, কোটি চন্দ্রের ন্যায় সকলের আহ্লাদজনক, কোটি মাতৃসদৃশ স্নেহবান, কোটি কল্পবৃক্ষসদৃশ দাতা, কোটি সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর-স্বভাব, অমৃতের ন্যায় মধুর এবং কোটি কোটি বিচিত্র প্রণয় রসের প্রদর্শক, সেই শ্রীগৌরদেব জয়যুক্ত হউন।"

বিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া দেখিলেন ভাষায় কুলায় না, তাই লিখিলেন "মধুরং মধুরং মধুরং" ইত্যাদি এইরূপ মধুরং মধুরং বলিয়া শ্লোক সাঙ্গ করিলেন। সেইরূপ সরস্বতী ঠাকুর প্রভুর রূপ ও

গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া ভাষায় উহা না পারিয়া "কোটি" "কোটি" "কোটি" বলিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিলেন।

সরস্বতীর তখন পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। তিনি যাহা ছিলেন, এখন আর তাহা নাই। তাঁহার যে সমস্ত বিষয়ে রুচি ছিল তাহাতে অরুচি হইয়াছে, কাশী নগরীতে বাস পর্য্যন্ত। কাশীবাসে আর বাসনা নাই। যে সমস্ত সঙ্গী ও শিষ্যগণকে সহচর ভাবিয়া শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিতেন, তাহাদের সহিত এক প্রকার সম্বন্ধ রোধ হইয়া গিয়াছে। শিষ্যগণ পড়িতে আসিলে পড়ান না, পলায়ন করেন। লোকে দেখিতে আসিলে লুকাইয়া থাকেন, কি তাহাদের সহিত আলাপ করেন না। কাশীবাসিগণ তাঁহাকে কেহ শ্রদ্ধা করেন কি না সে বিষয়ে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই।

এ যাবৎ বহুতর কঠোর নিয়ম পালন করিয়া আসিয়াছেন। অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান, আর অধিক নিশিতে শয়ন করেন। এ পর্য্যন্ত নানা নিয়ম পালন বহুদিন হইতে করিয়া আসিয়াছেন, এখন সে সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। বেদ পাঠ করিতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে সমস্ত বিধি পালন করিয়াছিলেন সে সকল নিয়ম পালন করিতে আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা হইতেছে না; তবে করিতেছেন কি, তাহা বলিতেছি: তাঁহার গ্রন্থেই, তাঁহার হৃদয় তরঙ্গের পরিস্ফুট বর্ণনা আছে।

তিনি করিতেছেন কি, না একটু একটু গীত গাইতেছেন, আর প্রভু যেমন করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহারই অনুকরণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার চেতনা হইতেছে, আর তিনি আপনার মনকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতেছেন; মনকে পাইতেছেন না। আর যে স্থানে তাঁহার মন ছিল সে স্থানে দেখিতেছেন সোণার বরণ নৃত্যকারী গৌরাঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। আর সরস্বতী বলিতেছেন,—কি সুন্দর মুখশ্রী, কি মধুর নৃত্য! আবার বলিতেছেন, হে মন-চোর, তুমি আমার

সমুদায় হরণ করিলে? সরস্বতী বলিতেছেন:—

নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ব্যবহৃতিততি র্লৌকিকী বৈদিকী যা
যা বা লজ্জা প্রহসনসমুদ্গান নাট্যোৎসবেষু।
যে বা ভূবন্নহহ সহজপ্রাণদেহার্থ ধর্ম্মা,
গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোঽপি মে তীব্রবীর্য্যঃ॥

"অতিশয় বলবান কোন গৌরবর্ণ চোর আসিয়া আমার নিষ্ঠা প্রাপ্ত লৌকিকী, আর বৈদিকী যে ব্যবহারশ্রেণী, আর প্রহসন উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন নাট্যাদি বিষয়ক যে লজ্জা, আর প্রাণ ও দেহের কারণ স্বরূপ যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম, এই সমস্ত অপহরণ করিল।"

এখন দেখুন শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও সামান্যপ্রেম এক জাতীয় দ্রব্য। কুলটাগণ কাহারো প্রেমে আবদ্ধ হইয়া কুল, শীল, স্বামী, সন্তান সমুদায় বর্জ্জন করে। তাহারা অবশ্য কুল রাখিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। সরস্বতীর ঠিক সেই দশা হইয়াছে। তিনি দেখিতেছেন তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভু তাঁহার চিত্ত অপহরণ করিতেছেন।

তিনি যে জপ, তপ, প্রাণায়াম প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম করিতেন, তাহা গিয়াছে, আহার নিদ্রা প্রভৃতি দেহ-ধর্ম্ম গিয়াছে, নৃত্য গীত প্রভৃতিতে যে ঘৃণা তাহা গিয়াছে। কেন না, একজন বলবন্ত গৌরবর্ণ চোর তাহা সমুদায় হরণ করিয়া লইয়াছেন!

প্রকাশানন্দ ভাবিতেছেন, ঐ নবীন সন্ন্যাসী কি শক্তিধর পুরুষ! তখন আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে প্রকাশানন্দ! তুমি না বড় তেজস্বর পুরুষ ছিলে? একটি গৌরবর্ণ যুবা আসিয়া তোমার দশা কি করিল?' ইহাই বলিয়া হো হো করিয়া পাগলের ন্যায় হাস্য করিতেছেন। আবার ভাবিতেছেন:—

"আমি প্রকাশানন্দ, আমি নৃত্য করিতেছি, আমার লজ্জা হইতেছে না?

হে গৌরবর্ণ কৃষ্ণ, আমি এমন গম্ভীর অটল ছিলাম, আমাকে পাগল করিলে? আমার নৃত্য দেখিয়া কাশীবাসিগণ আমাকে কি বলিবে? ছি! আমি যে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি!"

রজনীযোগে প্রকাশানন্দ প্রভুর নিকট গমন করিলেন। যাইয়া তাঁহার চরণে পড়িতে গেলেন। কিন্তু প্রভু বাহু প্রসারিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিলেন, ধরিয়া দুজনে অচেতন হইয়া পড়িলেন। এই অবসরে প্রভু প্রকাশানন্দের হৃদয় একেবারে অধিকার করিলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী চেতন পাইলে আবার চরণে পড়িলেন।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, "জীবের এইরূপ পদে পদে বিপদ, এ সময় যদি তুমি এইরূপ করুণা না করিবে তবে তোমার জীবের আর কি উপায় আছে? প্রভু, এখন আমাকে সঙ্গে লইয়া চলুন।"

প্রভু বলিলেন, "তুমি বৃন্দাবন যাও, সেই তোমার বাসের উপযুক্ত স্থান।"

ইহাতে প্রকাশানন্দ কাতর হইয়া বলিলেন, "প্রভু, আমি তোমার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব না।"

প্রকাশানন্দ তাঁহার গ্রন্থে আপন মনের ভাব যেরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আশ্রয় করিয়া আমি এই গানটী করিয়াছিলাম :--

কি হলো কি হলো প্রাণনাথ একি করিলে। ধ্রু।
চিত্ত হরে নিলে, বাউল করিলে,
এখন তুমি আমায় ফেলি চলিলে॥
ছিলাম প্রবীণ, অটল গম্ভীর,
টলিত না মন কোন কালে।
নাথ, করিলে কি কাজ, গেল ভয় লাজ,
বালকের মত চপল করিলে॥

সংসার বন্ধন, করিয়া ছেদন,
সকল তেজে সন্ন্যাসী হইলাম।
আমি, কাটিলাম বন্ধন, একি বিড়ম্বন,
আবার তুমি প্রেম ফাঁদে ফেলিলে ॥

প্রভু অনেক প্রবোধ দিলেন। পরিশেষে বলিলেন যে বৃন্দাবনেই তুমি আমাকে দর্শন করিতে পারিবে।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, তুমি ত আমাকে বৃথা প্রবোধ দিতেছ না?

প্রভু কহিলেন, সত্যই, স্মরণ করিলে তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে।

সরস্বতী কহিলেন, আপনার প্রবোধে আমি আনন্দিত হইলাম। প্রভু কহিলেন, এই আনন্দ তোমার ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকুক, আর অদ্যাবধি তোমার নাম "প্রবোধানন্দ" হইল।

প্রভু এক পথে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন, প্রবোধানন্দ অন্য পথে বৃন্দাবনে গমন করিলেন।

প্রবোধানন্দ, পূর্ব্বে যদিও সন্ন্যাসী ছিলেন, তবু দশ সহস্র শিষ্য সহিত নানাবাস ও জগতের পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ, তর্ক, বিচার করিতেন। এখন অন্য এক আকার ধরিলেন। এখন বৃন্দাবনে নন্দরূপে একাকী বাস করিতে লাগিলেন। অগ্রে মহাপ্রভুকে পত্রে লিখিয়াছিলেন যে মূঢ় জনেই কাশীত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে বাস করে। এখন আপনিই কাশী-ত্যাগ করিলেন। পূর্ব্বে ভক্তি ও প্রেমধর্ম্ম কাপুরুষের আশ্রয় ভাবিতেন, এখন অন্য ধ্যান, অন্য চিন্তা, ছাড়িয়া দিয়া কেবল শ্রীগৌরাঙ্গের উপাসনা করিতে লাগিলেন। এই হৃদয়ের তরঙ্গে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন।

এই অমূল্য গ্রন্থ খানির দ্বারা জীবগণ এই কয়েকটী মহা উপকার পাইতেছে। প্রথমত, আমরা প্রকাশানন্দের ন্যায় সূক্ষ্ম ও দূরদর্শীর নিকট

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু কিরূপ বস্তু ছিলেন জানিতে পারিতেছি। মনে থাকে যেন, মহাপ্রভু সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন ইহা তাঁহার স্বচক্ষে, প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া লেখা।

দ্বিতীয়ত, শ্রীভগবানের অবতারে বিশ্বাস লোকের সহজে হয় না, প্রকাশানন্দের কাহিনী শ্রবণে সে বিশ্বাস সুলভ হইতে পারে।

তৃতীয়ত, ইহা আমরা জানিতেছি যে, প্রকাশানন্দের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসী, যিনি চিরদিন প্রেম ও ভক্তিকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি প্রেম ও ভক্তির আস্বাদন করিয়া, পূর্ব্বে যে ব্রহ্মানন্দ (অর্থাৎ জ্ঞান হইতে যে আনন্দ উত্থিত হয়) ভোগ করিতেন, তাহাতে ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলতঃ সেই পর্য্যন্তই জ্ঞান-যোগে শ্রদ্ধা থাকে, যে পর্য্যন্ত তুলসী ও চন্দনের গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ না করে। অর্থাৎ অহেতুকী ভক্তির সুধা যিনি পান করিয়াছেন তিনি আর জ্ঞান-যোগে মুগ্ধ হয়েন না।

কথা এই, অনেক যোগী ও জ্ঞানী আপনাদিগের ভাগ্য, ভক্তের ভাগ্য অপেক্ষা বড় ভাবেন। তাঁহারা ভাবেন যে, যে সামান্য ভক্ত তাহার কোন অলৌকিকী শক্তি নাই; তাঁহার অপেক্ষা, যাঁহার মস্তকে পীপিড়ার ঢিবি হইয়াছে তিনিই বড় লোক। কিন্তু সরস্বতী শেষোক্ত, তাঁহার পরীক্ষিত পদ্ধতি ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করিলেন, করিয়া ভক্তের যে প্রেমানন্দ তাহাই লইলেন।

প্রবোধানন্দকে বৃন্দাবনে বিদায় করিয়া দিয়া, প্রভু দেশাভিমুখে চলিলেন। সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণ সঙ্গে আসিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রভু অনুমতি দিলেন না। প্রভু চলিলেন, আর ভক্তগণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

প্রভু যে পথে গিয়াছিলেন সেই পথে, আবার সেইরূপ পূর্ব্বকার ন্যায় বন্যপশুগণের সহিত খেলা করিতে করিতে, চলিলেন। শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে,

মুরারীর কড়চা অনুসারে, এই সময়কার একটী বড় মধুর কাহিনী বর্ণিত আছে। প্রভু একটু অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গী দুই জন, বলভদ্র ও তাঁহার ভৃত্য একটু পশ্চাতে। একটী গোপযুবক ঘোলের কলস লইয়া বিক্রয় করিতে চলিয়াছে। প্রভু তৃষ্ণার্ত্ত, গোয়ালার নিকট সেই তক্র চাহিলেন। সরল গোয়ালা প্রভুর সম্মুখে কলস রাখিল, আর প্রভু কলসস্থ সমুদায় ঘোল পান করিলেন। গোপযুবক প্রভুকে বলিল, ঠাকুর ইহার মূল্য দিতে আজ্ঞা হয়। তখন প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এ মূল্য লইয়া কি করিবে? গোপ বলিল যে, তাহার স্ত্রী আছে ও বৃদ্ধ মাতা আছে, তাহাদিগকে পালন করিবে। প্রভু তখন, বলভদ্র ও তাঁহার ভৃত্য, যাঁহারা পশ্চাতে আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন যে, উহাদের নিকট তক্রের উচিত মূল্য পাইবে। গোপযুবক তাই বলভদ্রের অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল, প্রভু ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। প্রভু ভাবিতেছেন গোপযুবকের স্ত্রী ও বৃদ্ধ মাতা আছে। আমারও ত স্ত্রী ও মাতা আছেন। কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে ভুলিয়া রহিয়াছি, ভাল করিতেছি না। এই ভাবিয়া প্রভু তাঁহাদের নিমিত্ত ব্যাকুল হইলেন, ও তখনি অন্তরীক্ষে এক দেহ লইয়া নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন, হইয়া জননী ও ঘরণীর সহিত মিলিত হইলেন। এই বলিয়া ঠাকুর লোচন দাস তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল গীত সমাপন করিলেন।

ওদিকে গোপযুবকের কথা শ্রবণ করুন। বলভদ্র আসিলে গোপ ঘোলের মূল্য চাহিল। বলিল, ঐ যে আগের ঠাকুর যাইতেছেন, তিনি আমার এক কলস ঘোল সমুদায় পান করিয়াছেন, মূল্য চাহিলে বলিলেন, আপনারা দিবেন। বলভদ্র প্রভুর ভঙ্গী দেখিয়া অবাক! গোপকে মিনতি করিয়া বলিলেন, "গোপ! যিনি তোমার ঘোল পান করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসী তাঁহার অর্থ কোথা? আর আমরা তাঁহার ভৃত্য আমা-

দেরও অর্থ স্পর্শ করিতে নাই। ঠাকুর তোমার ঘোল পান করিয়াছেন, তোমার খুব ভাল হইবে।"

গোপ একথা শুনিয়া সুখীই হউক কি দুঃখীই হউক, আর কিছু বলিল না, ঘোলের কলস লইয়া বাড়ী যাইবে ভাবিল। কিন্তু কলস তুলিতে গিয়া দেখে উহা এত ভারি যে তাহা তুলিতে পারে না। তখন উকি মারিয়া দেখে যে কলস স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ! গোয়ালার উহা দর্শন মাত্র জ্ঞানোদয় হইল। তখন কলস ফেলিয়া দৌড়িল, দৌড়িয়া প্রভুর লাগ পাইয়া তাঁহার চরণে পড়িল। বলিল "প্রভু, আমি মূর্খ গোয়ালা, আমাকে ভুলান কি আপনার কর্ত্তব্য? আমি বৃথা ধন চাই না, আপনার শ্রীচরণে আমার মতি দান করুন।" প্রভু তাহাকে আশ্বাস বাক্য বলিয়া বিদায় করিলেন। গোপযুবক সামান্য অর্থ চাহিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভুর নিকটে অর্থ ও পরমার্থ দুই পাইলেন।

মুরারি গুপ্তের কড়চায় প্রভুর তক্রপান লীলা এইরূপ বর্ণিত আছে—

এবং স ভগবান্ কৃষ্ণঃ পথিগচ্ছন্ কৃপানিধিঃ।
দৃষ্ট্বা গোপমুবাচেদং সতক্রংকলসং প্রভুঃ॥
পিপাসিতোঽহং তক্রং মে দেহি গোপ যথাসুখং।
শ্রুত্বা পরমহর্ষেণ সম্পূর্ণকলসং দদৌ॥
হস্তাভ্যাং কলসংধৃত্বা সতক্রং ভক্তবৎসলঃ।
পিত্বাগোপকুমারায় বরং দত্ত্বাযযৌ হরিঃ॥

"এই প্রকার প্রভু পথে গমন করিতেছেন, জনৈক গোপ তক্র-কলস সহ যাইতেছে, দেখিয়া তাহাকে বলিলেন, অহে গোপ, আমি পিপাসিত হইয়াছি, আমাকে তক্র প্রদান কর। গোপ তাহা শুনিয়া অতিশয় হর্ষভাবে সেই তক্র-কলস প্রভুকে প্রদান করিল। ভক্তবৎসল প্রভু দুই হস্ত দ্বারা

সেই তক্র-কলস ধারণ পূর্ব্বক পান করিলেন এবং সেই গোপকুমারকে বরদান করিয়া যথা স্থানে গমন করিলেন।"

প্রভু দ্রুতগতিতে বন্যপশুদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশেষে পুরী নগরীতে পৌছিলেন, ও সেখানে আঠারনালা হইতে ভক্তগণের নিকটে তাঁহার আসিবার সংবাদ পাঠাইলেন। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার ভক্তগণ আনন্দ-কোলাহল করিতে লাগিলেন। ইহা কিরূপ তাহা বলিতেছি। অতি রৌদ্রে জীবমাত্র হাহাকার করিতেছে, মৎস্যগণ জল না পাইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। এমন সময় এক পশলা অতি শীতল ও প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইল। তখনি সফরি মৎস্যগণ পুনর্জীবন পাইয়া দিগ্বিদিগ জ্ঞান শূন্য হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। সেইরূপ ভক্তগণ মরিয়া ছিলেন, প্রাণ পাইয়া প্রভুর নিকট দৌড়িলেন। সকলে গমন করিয়া দেখেন যে, প্রভু ধীরে ধীরে আগমন করিতেছেন। পুরী ও ভারতীকে প্রভু প্রণাম করিলেন, সরূপ প্রভৃতি অন্যান্য সন্যাসী ও গৃহি-ভক্তগণ সকলে প্রভুকে প্রণাম করিলেন, সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া প্রভুকে লইয়া জগন্নাথমন্দিরে শ্রীমুখ দর্শনে চলিলেন। সে দিবস সার্ব্বভৌম প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু বলিলেন, অদ্য তিনি কোথায়ও যাইবেন না, সকলের সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করিবেন। বহুদিনের পরে ভক্তগণ ও প্রভু একত্রে বসিয়া মহানন্দে ভোজন করিলেন। আসুন ভক্তগণ, আমরা এই প্রভুভক্তে মিলন ও ভোজন অন্তরে দাঁড়াইয়া দর্শন করি।

প্রভুর সন্যাসের পরে এই ছয় বৎসর গত হইল। নবীন যুবাকালে অর্থাৎ যখন ঊনবিংশতি বৎসরের তখন পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন; করিয়া সেখানে "হরিনামের নৌকা সাজাইয়া জীবগণকে পার করিয়াছিলেন।" সন্যাসের কিছু পূর্ব্বে প্রভু নদে হইতে মন্দার দিয়া গয়াধামে গমন

করেন। সন্ন্যাসের পরে রাঢ় দেশে তিন দিবস ভ্রমণ করেন, তাহার পরে নীলাচলে. এবং নীলাচল হইতে সমস্ত দক্ষিণ দেশ শ্রীপদ দ্বারা পবিত্র করেন। নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, বৃন্দাবন যাইবেন উপলক্ষ করিয়া, গৌড়দেশ দিয়া গৌড়নগর পর্য্যন্ত গমন করেন। আবার সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নীলাচলে পুনরাগমন করেন। শেষে বনপথে বারাণসী হইয়া বৃন্দাবন গমন করেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আবার নীলাচলে আইসেন। এইরূপ ভ্রমণে প্রভুর সন্ন্যাসের পরে ছয় বৎসর গেল। প্রভুর বয়স তখন ৩০ বৎসর। প্রভু তাহার পরে অষ্টাদশ বৎসর প্রকট থাকেন। এই ১৮ বৎসর প্রভু বরাবর নীলাচলে বাস করেন, আর কোথায়ও গমন করেন না।

প্রভু এই অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে বাস করেন, ইহার মধ্যে যে কয়েকটি প্রধান ঘটনা তাহাই মাত্র বর্ণন করিব। প্রভু বনপথে বৃন্দাবন হইতে আসিবা মাত্র স্বরূপ অমনি শ্রীনবদ্বীপে সংবাদ পাঠাই-লেন। তখন ভক্তগণ প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলাভিমুখে ধাবিত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈত দিন স্থির করিলেন, শিবানন্দ সেন পথের ব্যয়ের ভার লইলেন।

ভক্তগণ আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় চারি মাস প্রভুর নিকট বাস করিলেন ; পূর্ব্বের ন্যায় দিন দিন মহোৎসব, জলক্রীড়া ও কীর্ত্তন হইতে লাগিল ; পূর্ব্বের ন্যায় মন্দিরমার্জ্জন, রথাগ্রে নৃত্য, বন্যভোজন ইত্যাদি হইল ; পূর্ব্বের ন্যায় নন্দোৎসব হইল, ও পরে চারি মাস থাকিয়া ভক্তগণ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

হরিদাসের কাহিনী পূর্ব্বে কিছু কিছু বলিয়াছি। তিনি এখন অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। প্রভুর ঘরের নিকট বাসা, প্রভু প্রত্যহ স্নান করিয়া একবার তাঁহাকে দেখা দিয়া যান, আর প্রত্যহ গোবিন্দ তাঁহার প্রসাদ তাঁহাকে দিয়া আইসেন। প্রভুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কিছুকাল পরে শ্রীরূপ নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনিও জাতি ভ্রষ্ট। তাই আর কোথায় যাইবেন, হরিদাসের বাসায় যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। হরিদাস তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। রূপ শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন যে, প্রভুর তখনি সেখানে আসিবার কথা। এই কথা হইতে হইতে চন্দ্রবদন হরেকৃষ্ণ নাম জপ করিতে করিতে আগমন করিলেন। তখন প্রভু হরিদাসকে আলিঙ্গন করিলেন এবং হরিদাস ও রূপ উভয়ে প্রভুকে প্রণাম করিলেন।

হরিদাস বলিলেন, প্রভু, দেখুন রূপ আপনাকে প্রণাম করিতেছেন। প্রভু তখন সহর্ষে শ্রীরূপকে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে রূপ হরিদাসের বাসায় থাকিয়া গেলেন। ভক্তগণ নীলাচল হইতে বিদায় হইয়া গেলেন, রূপ তখনও রহিলেন। বলিতে কি, প্রভু তাঁহাকে যত্ন করিয়া কাছে রাখিলেন। কেন? ক্রমে ক্রমে রূপকে তাঁহার কার্য্যের উপযোগী করিবার নিমিত্ত। প্রভুর কৃপায় শ্রীরূপ ক্রমে ক্রমে শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। সে বৎসর প্রভু যখন রথাগ্রে নৃত্য করেন, তখন একটী শ্লোক বলেন। শ্লোকটী কাহার

রচিত, তাহার ঠিকানা নাই, কিন্তু কাব্য প্রকাশে উদ্ধৃত আছে। শ্লোকটী এই ঃ—

যঃ কৌমারহরঃ স এবহি বর স্তাএব চৈত্রক্ষপা
স্তেচোন্মীলিত মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে॥

শ্লোকটীর অর্থ এই। কোন নাগরী তাঁহার পতিকে বলিতেছেন, "হে নাথ! সেই তুমি সেই আমি। সেই আমরা মিলিত হইয়াছি। কিন্তু তবু আমাদের সেই যে প্রথম নিভৃত স্থানে মিলন হয়, তাহাতে যে সুখ হইয়াছিল, তাহা আর এখন পাইতেছি না।"

এ শ্লোকটী যে অদ্ভুত তাহা রসজ্ঞ মাত্রে বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু জগন্নাথ রথে চড়িয়া সুন্দরাচলে চলিয়াছেন, প্রভু সেই রথাগ্রে নৃত্য করিতেছেন। সে অবস্থার সহিত এ শ্লোকের সম্পর্ক কি? শ্লোকটী আদিরস ঘটিত নায়িকার উক্তি, ইহাতে কি আছে যে প্রভু রথাগ্রে নৃত্যের সময় উহা আস্বাদন করিবেন? প্রভু ঐ শ্লোক পড়িতেছেন, আর কেবলমাত্র স্বরূপ উহার ভাব বুঝিয়া আস্বাদ করিতেছেন, অপর সকলে কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না! কিন্তু ভাগ্যবান রূপ ইহা বুঝিলেন, বুঝিয়া আপনি ঐ ভাবের একটী শ্লোক করিলেন। সে শ্লোকটী এই—

প্রিয়ঃ সোঽয়ংকৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

রূপ এই শ্লোকটী তালপত্রে লিখিয়া চালে গুঁজিয়া রাখিয়াছেন।

প্রভু স্নান করিয়া গমনের বেলা প্রত্যহ রূপ ও হরিদাসকে দর্শন দিয়া যান। সেই নিয়মানুসারে এক দিবস সেখানে আসিলেন, কিন্তু তখন রূপ স্নানে গিয়াছেন। প্রভু সেখানে কাহাকে না দেখিয়া বাসায় যাইতে, চালে তালপত্র দেখিলেন; দেখিয়া উহাতে লিখিত শ্লোকটী পড়িলেন। পড়িতেছেন, এমন সময় সমুদ্রস্নান করিয়া রূপ আসিলেন। প্রভু রূপকে দেখিয়া সহর্ষে তাঁহাকে চাপড় মারিয়া বলিলেন, "তুমি আমার মনের কথা কিরূপে জানিলে?" শ্রীরূপ এ কথায় কৃতার্থ হইলেন। প্রভু তাহার কিছু পরে সরূপকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "রূপ আমার মন কিরূপে জানিল?" তাহাতে সরূপ বলিলেন, 'ইহাতে ইহাই বুঝা গেল যে তিনি তোমার কৃপাপাত্র।"

এখন সংক্ষেপে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বলিতেছি যশোদার ভজন— বাৎসল্য রস লইয়া। শ্রীরাধার ভজন—মধুর রস লইয়া। রাধাকৃষ্ণ ভজনের উপকরণ—আদি অর্থাৎ মধুর রস। এসম্বন্ধে অনেক কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আরো পরে বলিব। প্রভুর মনের ভাব কি, তাহা যখন তাঁহার রথাগ্রে নৃত্য বর্ণনা করি, তাহাতে কতক লিখিয়াছি। শ্রীজগন্নাথ রথে, নানা কোলাহল হইতেছে, বাদ্য বাজিতেছে। শ্রীজগন্নাথ রথে, কিন্তু তাঁহার রাধা কোথায়? প্রভু রাধা ভাবে বিভাবিত হইয়া তখন আপনাকে রাধা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি রাধা নীচে দাঁড়াইয়া, আর জগন্নাথ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রথের উপর, ভিন্ন লোকের মধ্যে রহিয়াছেন। তাহা কিরূপে হইবে, রাধার তাহা সহ্য হইবে কেন? প্রভু মনে মনে রথের উপরিস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "বন্ধু, তুমি এখানে কেন? এত লোকের মাঝে কেন? ওরা তোমার কে? চল, তুমি আমি দুইজনে নিভৃত স্থানে গমন করি, করিয়া, প্রাণ জুড়াই।" ফল কথা, প্রভু রথাগ্রে নৃত্য করিতে গিয়াই বাহ্য হারাইয়া-

ছেন। তখন রাধা হইয়াছেন। ভাবিতেছেন, তিনি রাধা, কুরুক্ষেত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে লইতে আসিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যাইতে স্বীকৃত হইয়া রথে উঠিয়াছেন। প্রভু (রাধা) ভাবিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইতেছেন, এই আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। প্রভু আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন লইয়া যাইতেছেন। কাজেই কাব্যপ্রকাশের শ্লোক হৃদয়ে উদয় হইয়াছে, আর সেই শ্লোক শুনিয়া রূপ গোস্বামী বুঝিয়াছিলেন যে, প্রভুর মনের ভাব কি। রূপ কাব্য-প্রকাশের ভাব লইয়া রাধাকৃষ্ণ লীলায় আরোপ করিয়াছেন, করিয়া শ্রীমতী কর্তৃক ইহাই বলাইতেছেন, যথা—"হে কৃষ্ণ, যদিচ তুমি আর আমি দুজনেই এখানে, তবুও আমার সেই বৃন্দাবনের কথা,—যেখানে নিধুবনে তোমায় আমায় প্রথমে দুজনে প্রীতি করি,—মনে পড়িতেছে। এ মিলনে আমি সে মিলনের সুখ পাইতেছি না।"

শ্রীরূপকে দশমাস নিকটে রাখিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ করিয়া প্রভু তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বলিলেন, "একবার সনাতনকে এখানে পাঠাইয়া দিও।" রূপ গৌড়পথে এ জীবনের মত বৃন্দাবন গমন করিলেন!

কিন্তু সনাতনে ও রূপে প্রভুর ইচ্ছায় দেখা শুনা হয় নাই। প্রয়াগে, রূপ ও অনুপমকে বিদায় দিয়া, প্রভু বারাণসী আসিলেন। আসিয়া সনাতনকে পাইলেন। রূপ ও অনুপম বরাবর বৃন্দাবনে গমন করিলেন। করিয়া আবার দেশে প্রত্যবর্ত্তন করিলেন। এদিকে সনাতন প্রভুর নিকট বারাণসীতে বিদায় লইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন। এমত স্থানে রূপ অনুপম ও সনাতনে পথে দেখা হইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা হইল না। যেহেতু, একজন রাজপথে আর একজন নির্জ্জন পথে গিয়াছিলেন। রূপ ও অনুপম বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া গৌড়ে আগমন করিলেন, সেখানে অনুপমের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইল। তখন

রূপ একক প্রভুর ওখানে গমন করিলেন; করিয়া কি কি করিলেন উপরে বলিয়াছি।

এদিকে সনাতন বৃন্দাবনে যাইয়া শুনিলেন যে, রূপ দেশাভিমুখে গমন করিয়াছেন। তখন তিনি ফিরিলেন, কিন্তু আর দেশে গমন করিলেন না। প্রভু যে পথে বৃন্দাবন আসিয়াছিলেন ও নীলাচলে গিয়াছেন সেই পথে, অর্থাৎ সেই ঝারিখণ্ড দিয়া, নীলাচলে গমন করিলেন। পথে যাইতে তাঁহার গাত্রে কণ্ডু হইল। কবিরাজ গোস্বামী বলেন যে, ঝারিখণ্ডের বারি পান করিয়া তাঁহার ব্যাধি হইয়াছিল। তাহাই হউক, কি ইহাও হইতে পারে যে, তিনি পূর্ব্বে নানাবিধ অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই পাপের নিমিত্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইলেন। সে যাহা হউক, সনাতনের ব্যাধি হইলে তাঁহার বিন্দুমাত্রও দুঃখ হইল না। লোকে তাঁহাকে সম্রাটের প্রধান আমাত্য বলিয়া বহু মান্য করিত, এখন ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া সকলে অস্পৃশ্য ভাবিবে, কেহ নিকটে আসিবে না, ইহাতেই সনাতনের মনে মহা আনন্দ। সনাতনের এরূপ মনের ভাবের কারণ বলিতেছি। সনাতনের পূর্ণমাত্রায় চৈতন্যের ও বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে। জগতের আদর ও ঘৃণা তাঁহার নিকট তখন উভয়ই সমান হইয়াছে। যে সমুদায় পাপ করিয়াছেন, সে সমুদায় এখন জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় হৃদয়ে ক্লেশ দিতেছে। কিসে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের চরণ পাইবেন, সেই চিন্তা দিবানিশি করিতেছেন। প্রভুর চরণে আশ্রয় লইয়া নিতান্ত আশান্বিত হইয়াছেন বটে, পরকালে যে উদ্ধার পাইবেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে মনে গৌরবের সৃষ্টি হয় নাই। প্রভু তাঁহাকে বড় আদর করেন বটে, একথাও বলেন যে, তাঁহার স্পর্শ দেবগণও বাঞ্ছা করেন। কিন্তু সনাতনের মনে সে সব কথা ধরে না। তিনি ভাবেন প্রভু করুণাময়, পাপী উদ্ধারের নিমিত্ত গোলোক ত্যাগ করিয়া

ধরাধামে আসিয়াছেন. সুতরাং তাঁহার ন্যায় অধম জীব লইয়াই প্রভুর ঠাকুরালী। অতএব সনাতনকে যে তিনি আদর করিবেন, তাহা বিচিত্র কি? তাহাতে তাঁহার (সনাতনের) কোন গৌরব নাই, প্রভুরই গৌরব। বরং প্রভু যে তাঁহাকে এত আদর করেন. তাহাতে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে. তিনি অতি অধম. কারণ অধম উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভুর অবতার।

আবার ইহাও ভাবেন ও দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, যে পরিমাণে তিনি এ জগতে দণ্ড পাইবেন, সেই পরিমাণে তাঁহার পাপক্ষয় হইবে। যে পরিমাণে লোকে তাঁহাকে ঘৃণা করিবে, সেই পরিমাণে প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিবেন। অতএব তাঁহার এই যে কুষ্ঠ হইয়াছে, ইহাতে সনাতনের মন কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। ভাবিতেছেন; প্রভুকে দর্শন করিয়া রথ-চক্রের নীচে অপবিত্র দেহ নষ্ট করিবেন। ইহাই ভাবিতে ভাবিতে সনাতন নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। আপনি এক প্রকার জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন. আর কাহারও নিকট যাইতে অধিকার নাই, তাই তল্লাস করিয়া হরিদাসের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। সনাতন আসিয়া হরিদাসের চরণ বন্দন করিলেন। হরিদাস উঠিয়া আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর কখন দর্শন পাইবেন. সনাতন এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, স্বয়ং শ্রীপ্রভু ভক্তগণ সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হরিদাস ও সনাতন উভয়ে প্রণাম করিলেন। হরিদাস বলিলেন, "প্রভু দেখিতেছেন না, সনাতন আপনাকে প্রণাম করিতেছেন।" প্রভু সহর্ষে সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে দুই বাহু প্রসারিয়া ধাইলেন। ধাই-লেন কেন. না সনাতন পশ্চাৎ হটিতে লাগিলেন বলিয়া। সনাতন বলিতেছেন. "প্রভু করেন কি? আমাকে ছুঁইবেন না। একে আমি ঘোর পাপী. অস্পৃশ্য পামর, তাহার ফল স্বরূপ সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠ হইয়াছে ও তাহা হইতে ক্লেদ পড়িতেছে।" প্রভু সে সব কিছু শুনিলেন না, বল

দ্বারা তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। আর প্রকৃতই সনাতনের কুষ্ঠের ক্লেদ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিয়া গেল। প্রভু তখন সনাতনকে ভক্তগণের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন, সনাতন সকলের চরণে পড়িলেন। প্রভু ও ভক্তগণ পিঁড়ায় বসিলেন, সনাতন ও হরিদাস দুই জনে পিঁড়ার তলে বসিলেন। তখন সকলে ইষ্ট গোষ্ঠী করিতে লাগিলেন।

প্রভু বলিলেন, "তোমার কনিষ্ঠ রূপ এখানে দশ মাস ছিলেন। কিন্তু অনুপমের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে," ইহাই বলিয়া প্রভু অনুপমের ভক্তির প্রশংসা করিলেন।

সনাতন ভ্রাতৃবিয়োগের কথা পূর্ব্বে শুনেন নাই, এখন শুনিয়া একটু কাতর হইলেন, হইয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রভু যত প্রকার অন্যায় ও অধর্ম্ম, আমাদের কুলধর্ম্ম। ইহা সত্ত্বেও তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছ। সুতরাং আমাদের সমস্তই মঙ্গল। অনুপম ভাই আমার, বড় ভক্ত ছিলেন। প্রভুর শ্রীমুখ হইতে যে তাঁহার ভক্তির প্রশংসাবাদ শুনিলাম তাহার পোষকতায় এক কাহিনী বলিতেছি। আমার ভাই অনুপম রঘুনাথ উপাসক। আমরা দুইজন, আমি আর রূপ, তাঁহাকে বলিলাম, 'যদি রসের ভজন করিতে চাহ, তবে শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর।' অনুপম আমাদের অনুরোধে তাহাই স্বীকার করিলেন। কিন্তু সমস্ত রজনী কাঁদিয়া কাটাইলেন। প্রাতে আমাদের চরণ ধরিয়া বলিলেন যে, রঘুনাথকে ছাড়িতে পারিলাম না। ইহাতে তাঁহার ভজনের দার্ঢ্য দেখিয়া আমরা তাঁহাকে সাধুবাদ দিয়া আলিঙ্গন করিলাম।"

প্রভু বলিলেন, "মুরারিকেও আমি ঐরূপ পরীক্ষা করিতেছিলাম। মুরারি রঘুনাথ ছাড়িয়া কৃষ্ণ ভজন করিবেন স্বীকার করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। শেষে আমার কাছে রঘুনাথ ভজন ভিক্ষা করিলেন।" তাহার পর প্রভু একটী অদ্ভুত কথা বলিলেন। প্রভু বলিতেছেন,

"আমরা এখানে ভক্তের গুণানুবাদ করিতেছি, কিন্তু ভক্তের যে ঠাকুর শ্রীভগবান, তিনিও সেইরূপ মহাশয়,—বন্ধু। ভক্ত-সেবক, ঠাকুরকে ছাড়েন না সত্য. আবার সেবক যদি দৈব দুর্ব্বিপাকে বিপথে, যায়, তবে ঠাকুরও তাহাকে চুলে ধরিয়া সৎপথে আনেন।" * প্রভু বলিলেন, "সনাতন, তুমি এখানে হরিদাসের সহিত কৃষ্ণকথায় যাপন কর। তোমরা দুইজনে কৃষ্ণপ্রেম প্রধান। কৃষ্ণ তোমাদিগকে অচিরাৎ কৃপা করিবেন।"

সনাতন হরিদাসের ওখানে থাকিলেন। গোবিন্দ প্রত্যহ উভয়ের নিমিত্ত প্রসাদ আনয়ন করেন। সনাতন ভয়ে কোথাও যান না, যেহেতু তিনি নীচজাতি, অর্থাৎ তাঁহার জাতি গিয়াছে। দ্বিতীয় তিনি কণ্ডুগ্রস্ত। হরিদাসের ন্যায় তিনি শ্রীজগন্নাথ পর্য্যন্ত দর্শন করিতে গমন করেন না, দূর হইতে চক্র দেখিয়া প্রণাম করেন। সনাতনের মনে সংকল্প রহিয়াছে তিনি রথের চক্রে প্রাণ দিবেন। আবার প্রভু প্রত্যহ আসিয়া তাহাকে দর্শন দেন, আর আলিঙ্গন করেন, ইহাতে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে সেই ক্লেদ লাগিয়া যায়। ইহা সনাতন সহ্য করিতে পারেন না, কাজেই শীঘ্র শীঘ্র প্রাণত্যাগ করিতে পারিলেই যেন অব্যাহতি পান, এইরূপ তাঁহার মনের ভাব হইল।

সনাতনের এরূপ মনের ভাব সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর অবশ্য অগোচর নাই। তিনি এক দিবস আসিয়া বলিতেছেন, "সনাতন, শ্রবণ কর। এক কথা তোমাকে বলিব। যদি দেহত্যাগ করিলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়, তবে আমি এক মুহূর্ত্তে কোটীবার দেহ ত্যাগ করিতে পারি।" এই কথা শুনিয়া সনাতন চমকিত হইলেন। প্রভু বলিতেছেন, "ধর্ম্মের

* প্রভু! এই আশ্বাসবাক্য তোমার শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, অতএব তোমার যেন সে কথা মনে থাকে।

নিমিত্ত প্রাণত্যাগ, সে ধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম নয়, সে তমোধর্ম্ম। যে ব্যক্তি কোন কারণে স্বহস্তে আপনার প্রাণত্যাগ করে, তাহার শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস, ভক্তি, কি প্রীতি অতি অল্প! সে তো নিতান্ত স্বার্থপর। সেরূপ ব্যক্তি মনে ভাবে যে আপনাকে দুঃখ দিয়া কৃষ্ণের কৃপা আহরণ করিবে, কিন্তু কৃষ্ণ ত নিঠুর নহেন। তবে কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রাণ দিতে চাহেন বটে, তাঁহারা কৃষ্ণের বিরহ সহ্য করিতে পারেন না, না পারিয়া মরিতে চাহেন। কিন্তু সেরূপ লোক অতি বিরল, তাঁহাদের পক্ষে নিয়মও অন্যরূপ। যদি কৃষ্ণ-বিরহে কেহ মরিতে চাহেন, কৃষ্ণ অমনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়েন, হইয়া তাঁহাকে মরিতে দেন না। যাঁহারা আপন প্রাণ দিয়া কৃষ্ণকে জব্দ করিতে চাহেন, তাঁহারা কৃষ্ণকে জব্দ করিতে পারেন না। অতএব সনাতন, তোমার আত্মহত্যারূপ এই কুবাঞ্ছা ছাড়, কীর্ত্তন ও ভজন কর, তবে শ্রীকৃষ্ণ পাইবে। শ্রীকৃষ্ণ ভজনে জাতি বিচার নাই, বরং যাহারা হীন জাতি, তাহাদের ভজন সুলভ হয়। যেহেতু, যাঁহারা জাতিতে শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা বড় অভিমানী, আর অভিমানিগণ শ্রীকৃষ্ণ ভজনে অধিকারী নহে।"

প্রভুর শিক্ষাগুলি পাঠক মনে রাখিবেন। শুধু এই দেশে নয়, কিন্তু সর্ব্ব স্থানেই দেখা যায় যে লোকের বিশ্বাস যে আপনাকে দুঃখ দিয়া শ্রীভগবানের কৃপালাভ করা যায়। কিন্তু প্রভু বলিতেছেন যে শরীরের কষ্ট অল্প কথা, আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াও শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করা যায় না। কারণ তিনি মঙ্গলময় বন্ধু, নিঠুর প্রভু নন যে তুমি কষ্ট পাইলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। ইহাতে বুঝা যায় শ্রীভগবানের কৃপা লাভের নিমিত্ত যতই কঠোর কর সে বিফল। প্রবোধানন্দ সরস্বতী সন্ন্যাসীদিগের মাননীয়। এদেশে বিশ্বাস যে সন্ন্যাসের ন্যায় প্রধান আশ্রম আর নাই। কিন্তু প্রবোধানন্দ দ্বারা প্রভু জীবকে শিক্ষা দিলেন যে সন্ন্যাস করিলে

কৃপা লাভ করা যায় না। আপনিও সর্ব্বদা বলিতেন যে প্রেমই জীবের প্রয়োজন, সন্ন্যাস লইয়া আমি কিছু লাভ করি নাই। বেদবিধি ধর্ম্মের দাস এদেশের প্রধান নৈয়ায়িক শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম নিদ্রা হইতে উঠিয়াই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এরূপ কার্য্য করিতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে প্রাণ গেলেও পারেন না। যখন সার্ব্বভৌম প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, তখন প্রভু আনন্দে তাঁহাকে লইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। আর বলিলেন যে তুমি বেদবিধি লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলে, আজ তুমি প্রকৃত কৃষ্ণদাস হইলে। ইহাতে বোধ হইতেছে যে স্মার্থ ভট্টাচার্য্যের মত পালন করিলে, মনকে বিধির অধীন করিয়া জড় করিয়া ফেলে। অতএব এই বেদবিধি গুলি প্রেমভক্তিচর্চ্চার সম্পূর্ণ বিরোধি। এখন পাঠক বুঝিলেন যে শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহার ভজন সাধন পদ্ধতি বালক বৃদ্ধ সকলেই বুঝিতে পারেন।

প্রভুর কথা শুনিয়া সনাতন চমৎকৃত হইলেন। ভাবিলেন, আমার সংকল্প প্রভুর গোচর হইয়াছে! আবার আমার সংকল্প প্রভুর অভিমত নহে। প্রভুর ইচ্ছা নহে যে আমি প্রাণত্যাগ করি। প্রভুর আমার উপর এত স্নেহ কেন? এই সকল কথা মনে উদয় হওয়ায় তিনি দ্রবীভূত হইলেন; হইয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন; পড়িয়া বলিতেছেন, "প্রভু, তুমি অন্তর্যামী ভগবান, কৃপালু, সর্ব্ব জীবের প্রাণ, আমাকে মরিতে দিবে না। প্রভু, তুমি আমাকে বাঁচাইতে চাও কেন? আমার ন্যায় ছারের দ্বারায় তোমার কি লাভ হইবে?"

প্রভুও তখন দ্রবীভূত হইলেন। প্রভু কাহারও চক্ষের জল দেখিতে পারেন না। প্রভু বলিলেন, "সনাতন, বল কি? তোমার দ্বারা আমার কোন কার্য্য হউক না হউক সে আমার বিচারের বিষয়। তোমার তাহাতে কোন কথা কহিবার অধিকার নাই। তুমি তোমার এই দেহ

আমাকে দিয়াছ, সুতরাং ঐ দেহটী তোমার নহে, আমার। তুমি পরের দ্রব্য নষ্ট করিতে চাহ, এ তোমার কি বিচার?"

একটু থাকিয়া প্রভু আবার বলিতেছেন. "তোমার দেহকে তুমি ছার বল, কিন্তু আমি ঐ দেহে অনেক কার্য্য সাধন করিব। বৃন্দাবন ও মথুরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা-স্থান। সেখানে জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত উপযুক্ত ভক্তের প্রয়োজন। আমি তোমাকে সেখানে রাখিব। তুমি বলিতেছ, তোমার দেহ কি কাজে আসিবে? তোমার ঐ দেহ দ্বারা কোটী কোটী জীব উদ্ধার পাইবে।" তাহার পর হরিদাসকে বলিতেছেন, "হরিদাস, অন্যায় দেখ। সনাতন তাঁহার দেহটী আমাকে দান করিয়াছেন, এখন উনি উহা নষ্ট করিতে চাহেন। জীবের উপকারের নিমিত্ত ঐ দেহ দ্বারা আমি নানা কার্য্য সাধন করিব, তাহাই তিনি অতি নিষ্প্রোয়জনীয় বলিয়া ফেলিয়া দিতে চাহেন, আমি ইহা কিরূপে সহ করিব?"

সনাতন গদ গদ হইয়া বলিলেন, 'প্রভু, তোমার হৃদয় আমরা কিছু জানি না। তুমি যাহাকে যেরূপ নাচাও সে সেইরূপ নাচে। যদি তোমার এরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে যে, এই ছার দেহ দ্বারা তুমি কোন কার্য্য করিবে তবে তাহাই হউক। আমার উহাতে কথা কি?" প্রভু ইহাতেও সম্পূর্ণ আশ্বাসিত হইলেন না। সনাতনের হস্ত ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "বল সনাতন, আমার মাথার দিব্য, তুমি আপনার দেহ নষ্ট করিবে না?" সনাতনও তখন অঝোর নয়নে ঝুরিতেছেন। তিনি সম্মত হইলেন। বলিলেন যে, "প্রভু, তোমার যে আজ্ঞা তাহাই পালন করিব।" প্রভু ইহাতে মহা আনন্দিত হইলেন। হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, তুমি মনে কি কর, তাহা আমরা ক্ষুদ্র জীব কিরূপে বুঝিব? ইহারা কয়েক ভ্রাতা কোথায় ছিল, কি ছিল? ইহাদিগকে আনয়ন করিলে

করিয়া এখন বলিতেছ, ইহাদিগের দ্বারা অতি মহৎকার্য্য সাধন করিবে। এ তোমার ভঙ্গী আমরা কিরূপে বুঝিব ?"

সনাতন বৈশাখ মাসে আসিয়াছেন, প্রভুর সঙ্গে আছেন, তাঁহার নিতি নিতি ভক্তি ও প্রেম বাড়িতেছে। প্রভুর সহিত দিনের মধ্যে একবার মাত্র দেখা হয়, আর প্রভু প্রত্যহই তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, আর প্রত্যহই তাঁহার শ্রীঅঙ্গে ক্লেদ লাগিয়া যায়। তাহার পর জ্যৈষ্ঠ মাস আসিল, গৌড়ীয় ভক্তগণ শচী মাতার আজ্ঞা লইয়া প্রভুকে দর্শন-নিমিত্ত নীলাচলে আসিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় প্রত্যহ মহোৎসব হইতে লাগিল। এক দিন যমেশ্বর টোটায় এইরূপ মহোৎসব হইল। প্রভু সেখানে সনাতনকে না দেখিয়া ডাকিতে পাঠাইলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্র, তাহাতে বেলা দুই প্রহরাধিক, সূর্য্যতেজে সকলে ম্রিয়মাণ। সনাতন প্রভুর আহ্বান জানিয়া দৌড়িয়া আসিলেন। তখন তাঁহাকে প্রসাদ দেওয়া হইল, এবং তিনি প্রসাদ পাইয়া প্রভুর নিকটে আসিলেন।

প্রভু বলিলেন, সনাতন, কোন পথে আসিলে ?' সনাতন বলিলেন, "সমুদ্র পথে।" প্রভু বলিলেন, "সেকি ? সমুদ্র পথ বালুকাময়, সে পথে এ রৌদ্রে চলা ফেরা করা যায় না। পায়ে অসংখ্য ব্রণ হইয়াছে। তুমি কেন মন্দিরের শীতল পথে আসিলে না ?"

সনাতন বলিলেন, "কই আমি তো কিছুই দুঃখ পাই নাই।" প্রকৃত কথা এই যে, প্রভু ডাকিতেছেন, এই আনন্দে, তপ্ত বালুকায় পায়ে যে ব্রণ হইয়াছে তাহা সনাতন জানিতে পারেন নাই। পরে সনাতন বলিতে-ছেন, "মন্দির পথে আসিতে আমার সাহস হইল না, যে হেতু আমি নীচ, কি জানি কাহাকে স্পর্শ করিব, করিয়া অপরাধী হইব।" প্রভু ইহাতে গদ গদ হইয়া বলিতেছেন, 'তুমি যে ইহা করিবে তাহা আমি জানি।

মি তোমার স্পর্শদানে ভুবন পবিত্র করিতে পার। তোমার যদি এরূপ দৈন্য না হইবে তবে তোমার এরূপ শক্তি কিরূপে হইবে? আমি এরূপ দৈন্য চিরদিন বড় ভালবাসি। তাহার পরে যে প্রকৃত মহান, তাহার যে দৈন্য সে আরো মধুর। ভক্তগণকে তোমার চরিত্র দেখাইবার নিমিত্ত আমি তোমাকে এই দুই প্রহর বেলায় ডাকিয়াছিলাম। এরূপ সময়ে সমুদ্র পথে কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক আইসে না। কিন্তু তুমি আসিবে তাহা আমি জানিতাম।" ইহাই বলিয়া প্রভু সেই শত শত লোকের সম্মুখে তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ইহাও সকলে দেখিলেন যে, সনাতনের অঙ্গের ক্লেদ প্রভুর অঙ্গে লাগিয়া গেল!

সনাতন যদিও দিন দিন প্রেম ও ভক্তিতে বৃদ্ধি পাইতেছেন, তবু তাঁহার মনে দুটী ক্ষোভ রহিয়াছে। তিনি ব্যাধিগ্রস্থ, তিনি যে মহাপাপী তাহার সাক্ষী তাঁহার সেই রোগ. তাঁহার দ্বারা জগতে কি উপকার হইবার সম্ভব? লোকে তাঁহাকে মানিবে কেন? কুষ্ঠগ্রস্থ বলিয়া সকলে ঘৃণা করিয়া নিকটেও আসিবে না। যে ব্যক্তি মহাপাপী ও সেই নিমিত্ত শ্রীভগবানের দণ্ড পাইয়াছে তাহার নিকট লোকে ভক্তি কেন শিখিবে. তাহাকে লোকে কেন ভক্তি করিবে?

তাহার পর প্রভু তাঁহাকে প্রত্যহ আলিঙ্গন করেন, সেও তাঁহার মহা দুঃখ। পাছে কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করে এই ভয়ে তিনি রাজপথে গমন করেন না; প্রভু তাঁহাকে স্বয়ং বুকে করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করেন. তাঁহার ইহা কিরূপে সহ্য হইবে? ইহাও হইতে পারে যে, প্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া অঙ্গ ক্লেদময় করিতেন. ইহাও তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে কাহারও কাহারও ক্লেশের কারণ হইত। প্রভুর শ্রীঅঙ্গে যে সনাতনের কণ্ডুরস লাগে, ইহা যে ভক্ত দেখিতেন তাঁহারই মনে অবশ্য ক্ষোভ হইত। অবশ্য সনাতনের ইহাতে কোন অপরাধ ছিল না। যে হেতু

প্রভু তাঁহাকে বলদ্বারা আলিঙ্গন করিতেন। তবুও সনাতন আপনাকে ভক্তগণের নিকট অপরাধী ভাবিয়া সর্ব্বদা কুণ্ঠিত থাকিতেন। অন্যান্য সময় প্রভু, সনাতনকে গোপনে আলিঙ্গন করিতেন, কিন্তু সে দিন সর্ব্ব ভক্ত সমীপে আলিঙ্গন করিলেন। পূর্ব্বে সনাতন মরিতে চাহিয়াছিলেন, এখন বুঝিয়াছেন, তাহা হইবে না। যে হেতু সে কার্য্যটা পাপ, আর ইহাতে প্রভুর ইচ্ছা নাই। তবে কি করিবেন, অতএব শীঘ্র শীঘ্র শ্রীবৃন্দাবনে গমন করাই কর্ত্তব্য, ইহাই স্থির করিলেন। সেই নিমিত্ত সনাতন একদিন জগদানন্দকে বলিতেছেন, "পণ্ডিত! এখানে দুঃখ খণ্ডাতেই আসিলাম; ভাবিলাম রথের চাকায় প্রাণ দিব, কিন্তু তাহা হইল না, প্রভু তাহা করিতে দিলেন না। প্রভু আমাকে বলদ্বারা আলিঙ্গন করেন, কত নিষেধ করি, কোন মতে শুনেন না, আমার গাত্রের ক্লেদ তাঁহার অঙ্গে লাগে, ইহা আমার কি কাহার সহ্য হয়? কিন্তু করি কি, প্রভু স্বেচ্ছাময়। এখন আমাকে পরামর্শ বল, আমি কি করিব?"

জগদানন্দ, প্রভু ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। ভাল মানুষ, বুদ্ধি তত সূক্ষ্ম নয়। সনাতনের ক্লেদ যে প্রভুর অঙ্গে লাগে ইহাও তাঁহার ভাল লাগে না। তাই উপদেশ করিতেছেন, "সনাতন, তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, তোমার এখানে আর থাকা উচিত নয়। প্রভু তোমার গোষ্ঠীকে বৃন্দাবন দিয়াছেন, অতএব তুমি এই রথযাত্রা দেখিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যাও।" সনাতন বলিলেন, "এই বেশ যুক্তি, তাহাই আমার করা উচিত।"

জগদানন্দের সঙ্গে আলাপে সনাতন স্পষ্ট বুঝিলেন যে, তাঁহাকে যে প্রভু আলিঙ্গন করেন, ইহা অন্ততঃ কোন কোন ভক্তের সুখকর নহে। ইহাতে তিনি শীঘ্র নীলাচল ত্যাগ করিবার সংকল্প দৃঢ় করিলেন; আর ইহাও সংকল্প করিলেন যে, প্রভুকে আর তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে দিবেন না। জগদানন্দের সহিত এই কথাবার্ত্তা হইবার পরে প্রভু আসি-

লেন। সনাতন আর প্রভুর নিকটে গমন করিলেন না, দূর হইতে প্রণাম করিলেন। প্রভু ডাকিতেছেন, "সনাতন, নিকটে আইস।" সনাতন বলিলেন, 'নিকটে আর না, এখান হইতেই ভাল।" প্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রবর্ত্তী হইলেন, আর সনাতন পশ্চাতে হাটিতে লাগিলেন। প্রভু মহা বিপদে পড়িলেন।

কিন্তু প্রভুর সহিত সনাতন পারিবেন কেন? প্রভু, সনাতনকে দৌড়াইয়া ধরিলেন, ধরিয়া বলদ্বারা হৃদয়ে আনিলেন। হৃদয়ে আনিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পরে হরিদাসকে ও সনাতনকে লইয়া পিড়ায় বসিলেন। যখন প্রভু পার্ষদগণ সহ আসিয়া সনাতনের সহিত মিলিত হয়েন, তখন হরিদাস ও সনাতন পিড়ার তলে বসেন, আর প্রভুর সহিত ভক্তগণ পিড়ার উপরে বসেন। কিন্তু এখন সেখানে অন্য কেহ নাই, সুতরাং মর্য্যাদা রক্ষার আর প্রয়োজন নাই, তাই তিন জনে একত্র হইয়া বসিলেন।

এ কিরূপ শ্রবণ করুন। বহিরঙ্গ সম্মুখে স্ত্রী স্বামীকে সমীহ করেন, স্বামীর অতি নিকটে গমন করেন না। নির্জ্জনে শয়নাগারে তাঁহার সে ভাব কিছুই থাকে না। তাই শ্রীভগবানের সঙ্গে এক সম্বন্ধ, ভক্তের সঙ্গে আর এক সম্বন্ধ। ভক্ত সম্মান চান, যেহেতু তিনি জীব। শ্রীভগবানের সম্মানের প্রয়োজন কি? তিনি না অনন্ত গুণে প্রকাণ্ড? তিনি চান ভালবাসা। যদি স্ত্রী স্বামীর কোলে বসিয়া থাকেন, আর সেখানে কোন বহিরঙ্গ লোক আইসে, তবে তিনি লজ্জা পাইয়া ক্রোড় ত্যাগ করিয়া দূরে বসেন। সেইরূপ যখন শ্রীভগবান হরিদাস ও সনাতনকে লইয়া পিড়ার উপর একত্রে বসিয়া ইষ্ট গোষ্ঠী করিতেছিলেন, তখন যদি কোন ভক্ত সেখানে যাইতেন, তাহা হইলে হয়তো হরিদাস ও সনাতন তখন পিড়ার তলে যাইতেন। শ্রীভগবান নিজ জন, হৃদয়ের ধন। শ্রীভগবান স্ত্রী

ও স্বামী হইতেও অন্তরঙ্গ। আর এই জ্ঞান, কথায় ও কার্য্যে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রভু জগতে আবির্ভূত হয়েন।

সনাতন তখন কাতর হইয়া মনের সমুদায় কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "প্রভু, আমি আমার হিত দেখিতেছি না। আসিলাম উদ্ধারের নিমিত্ত, কিন্তু আমার পদে পদে অপরাধ হইতেছে। একে আমি নানা প্রকারে নীচ, আমাকে কেহ যে স্পর্শ করে সে যোগ্য আমি নই, তাহাতে আবার আমার অঙ্গে কুষ্ঠ। কোথা আমি জীবগণ হইতে দূরে থাকিব, না আমি তোমা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইতেছি। লোকে তোমার শ্রীপাদপদ্মে তুলসী চন্দন দিয়া পূজা করে, কিন্তু আমার অঙ্গের দুর্গন্ধময় ক্লেদ তোমার অঙ্গে লাগে। ভক্তগণ ইহাতে অবশ্য বড় ক্লেশ পারেন, পাইবারই কথা। আবার আমারও কি ইহা ভাল লাগে যে, আমার অঙ্গের ক্লেদ তোমার শ্রীঅঙ্গে লাগিবে? কিন্তু করি কি? তুমি পতিতপাবন, পরম দয়াল, ভাল মন্দ ও চন্দন বিষ্ঠায় তোমার সমান দৃষ্টি, তুমি ঘৃণা না করিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর। প্রভু, তোমার হৃদয় আমি একটু বুঝি। তুমি যে এইরূপ দুর্গন্ধি ক্লেদ পর্য্যন্ত অঙ্গে মাখিতে কুণ্ঠিত হও না, তাহার কারণ এই যে, আমাকে ঐরূপ না করিলে পাছে আমি মনে ক্লেশ পাই। কিন্তু প্রভু স্বরূপ বলিতেছি, তুমি যে আমাকে স্পর্শ কর ইহাতে আমি মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাই। তুমি যদি আমাকে আলিঙ্গন কি স্পর্শ না কর, তাহা হইলেই আমার সুখ। তুমি আমাকে মরিতে দিবে না, তোমার যে আজ্ঞা তাহাই পালন করিব। এখন তুমি আমাকে বিদায় দাও। তুমি আমাকে বৃন্দাবনে যাইতে বলিয়াছ, আমি সেখানে যাই, যাইয়া যে কয়েক দিন বাঁচি, সেইখানেই যাপন করি। এ বিষয়ে আমি পণ্ডিত জগদানন্দের নিকট পরামর্শ চাহিয়াছিলাম, তিনিও বলিলেন যে আমার এস্থান শীঘ্র ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন গমন করাই কর্ত্তব্য।"

সনাতন এইরূপ বলিলে, প্রভু প্রথমে জগদানন্দের প্রতি উগ্র হইলেন; বলিলেন, 'বটে! জগদানন্দ বালক, (বটুয়া) তাহার এত স্পর্দ্ধা হইয়াছে যে তোমাকে উপদেশ দেয়? সেকি তাহার আপনার মূল্য ভুলিয়া গিয়াছে? কি ব্যবহারে, কি পরমার্থে, তুমি তাহার গুরুর তুল্য, তোমাকে সে উপদেশ দেয়, তাহার এত বড় স্পর্দ্ধা হইয়াছে? তুমি প্রবীণ, আমাকে পর্য্যন্ত উপদেশ দিয়া থাক, আর আমি সেই সমুদায় উপদেশ বহুমান্য করি। তোমাকে উপদেশ দিতে তাহার সাহস হইল?"

সনাতনের মনে পূর্ব্ব হইতে ক্ষোভ রহিয়াছে, ক্ষোভের কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি প্রভুর এই গৌরবজনক কথা শুনিয়া কোমল হইলেন না, বরং ব্যথা পাইলেন। তিনি প্রভুর চরণে পড়িলেন, পড়িয়া বলিতেছেন, "আজ আমি কে তাহা জানিলাম, আর পণ্ডিত জগদানন্দের সৌভাগ্য জানিলাম। আমাকে প্রভু তুমি ভিন্ন ভাব, তাই আমাকে সম্মান এবং স্তুতি কর; আর পণ্ডিত তোমার নিজ জন, তাই তাহাকে সেইরূপ ব্যবহার কর। আমার এ বড় দুর্ভাগ্য, আমাকে অদ্যাপি তোমার আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান হইল না। করি কি, তুমি স্বতন্ত্র ভগবান।"

যদিও আমার সরল প্রভুকে এ কথা বলা সনাতনের পক্ষে অন্যায়; যেহেতু প্রভু যে তাঁহাকে স্তুতি করিয়াছিলেন সে তিনি বহিরঙ্গ বলিয়া নয়, প্রকৃতই তিনি স্তুতির উপযুক্ত বলিয়া; তবু পুরাতন রাজমন্ত্রীর বাগ্‌জালে সরল প্রভু একটু অপ্রতিভ হইলেন। তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, "সনাতন, তুমি আমার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিতেছ। আমি যে তোমাকে স্তুতি করি সে তুমি বহিরঙ্গ বলিয়া নহে, তোমার গুণে তোমাকে স্তুতি করায়। জগদানন্দ 'আমার নিকট তোমা অপেক্ষা প্রিয় নহে। কোথা তুমি, আর কোথায় জগদানন্দ! তুমি শাস্ত্রে ও সাধনে সর্ব্বাংশে প্রবীণ, আর জগদানন্দ বালক।' তুমি আমার উপদেষ্টা, কত সময় উপ-

দেশ দিয়াছ, আর উহা আমি পালন করিয়াছি। সেই বালক তোমাকে উপদেশ দিতে চাহে, ইহা আমি কিরূপে সহ্য করি? মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি সহ্য করিতে পারি না। তাহার পরে সনাতন, তোমার দেহ তুমি বিভৎস জ্ঞান কর, কিন্তু সরল কথা শুনিবে? আমার কাছে তোমার দেহ অমৃত সমান লাগে। তুমি বল, তোমার গাত্রে দুর্গন্ধ, কিন্তু কই আমার কাছে তাহাতো বোধ হয় না? আমার নাসিকায় তোমার গাত্রের গন্ধ যেন চন্দনের গন্ধ বলিয়া বোধ হয়।"

এ কথা ঠিক। যে দিন প্রভু সনাতনকে প্রথম আলিঙ্গন করেন, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে সনাতনের অঙ্গের দুর্গন্ধ দুরীকৃত হইয়া সুগন্ধির সৃষ্টি হয়। কিন্তু সনাতন তাহা জানিতে পারেন নাই। অন্য সকলে উহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

প্রভু বলিতেছেন, "সনাতন, আরো শুন। তোমার দেহ তুমি মনে ভাব অতি ঘৃণার দ্রব্য, কিন্তু উহা প্রাকৃত নহে, অপ্রাকৃত। ওরূপ পবিত্র দেহে মন্দ স্পর্শ করিতে পারে না। আমি সন্ন্যাসী, আমার এখন বিষ্ঠা চন্দনে সমান দৃষ্টি হওয়া উচিত; আমি কিরূপে তোমার দেহকে ঘৃণা করিব। তোমার দেহকে ঘৃণা করিলেই আমি কৃষ্ণের স্থানে অপরাধী হইব।" সনাতন তখন একটু কোমল হইয়াছেন, হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু, তাহা নয়। তুমি যত কিছু বলিতেছ এ সমুদায় বাহ্য প্রতারণা, উহা আমি মানিব না। তুমি যে আমাকে ঘৃণা না করিয়া গ্রহণ করিয়াছ তাহার কারণ এই যে, তুমি দীন দয়াল। তোমার কার্য্য আমাদের ন্যায় অধমগণকে কৃপা করা। তোমার ঠাকুরালী কেবল আমাদের ন্যায় পতিতগণকে লইয়া।"

প্রভু হাসিয়া বলিলেন, 'যদি স্বরূপ কথা শুনিতে চাও, তবে তাহা বলিতেছি। আমি আমাকে তোমাদের লালকরূপ অভিমান করিয়া থাকি।

যেন আমি তোমাদের মাতা। এমত স্থলে মাতা কি সন্তানের কোন মন্দ, মন্দ বলিয়া দেখে? বালকের লালা প্রভৃতি মাতার সর্ব্বাঙ্গে লাগে, তাহাতে কি তাহার দুঃখ কি ঘৃণা হয়? বরং মহা সুখ হয়।"

হরিদাস বলিতেছেন, "সে যাহা হউক, প্রভু তোমার গম্ভীর হৃদয় আমরা কিছুই বুঝি না। কাহাকে, কি নিমিত্ত, কিরূপ কৃপা কর, তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত! বাসুদেব তোমার অপরিচিত, অপিচ তাহার গাত্রে যে কুষ্ঠ তাহাও অতি ভয়ঙ্কর। তাহার গলৎকুষ্ঠে তাহার অঙ্গে কীড়াময় হইয়াছিল। তাহাকে একবার মাত্র দর্শন দিলে ও আলিঙ্গন করিলে, করিয়া তাহাকে পরম সুন্দর করিলে। অথচ সনাতন তোমার"— ইহা বলিয়া হরিদাস নীরব হইলেন।

এই হরিদাস ভঙ্গীতে, এত দিনে, তাঁহার মনের ভাব বলিলেন। প্রভু স্বয়ং ভগবান, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিলে করিতে পারেন। সনাতন তাঁহার প্রিয়, এমন কি সনাতনের দেহ তাঁহার নিজের, ইহা বরাবর বলিয়াছেন। আরো বলিয়াছেন, উহার দ্বারা তিনি অনেক কার্য্য করিবেন। সে দেহ তিনি অনায়াসে ভাল করিলেই পারেন, অথচ ইহা করেন না, কেন? এই সকল কথা হরিদাস পূর্ব্বে মনে মনে ভাবিতেন, এখন সাহস করিয়া প্রকারান্তরে প্রভুকে উহা জানাইলেন। হরিদাস যদিচ এ কথা বলিলেন, কিন্তু সনাতন আপনার পীড়ার আরোগ্য সম্বন্ধে কোন কথা ভাবে কি ভঙ্গীতে প্রভুকে এ পর্য্যন্ত একবারও বলেন নাই। তুমি আমি এই কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলে, শ্রীভগবানকে সম্মুখে পাইলে প্রথমেই বলিতাম, "প্রভু, আগে আমার রোগটি আরাম করিয়া দেও, পরে আর কথা।"

যখন হরিদাস এইরূপ স্পষ্টাক্ষরে প্রভুর নিকটে সনাতনের নিমিত্ত বলিলেন, প্রভুর উহা বুঝা উচিত ছিল; কিন্তু তিনি যেন মোটে বুঝিলেন

না। বাসুদেব বলিয়া কোন এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার গলৎকুষ্ঠ ছিল, তাহাকে তিনি আলিঙ্গন মাত্র আরোগ্য করিয়াছিলেন, তিনি অপরিচিত বাসুদেবকে আরাম করিলেন, অথচ পরিচিত সনাতনকে সে কৃপা করেন না, এ সমুদায় কথা তিনি যে বুঝিয়াছেন কি শুনিয়াছেন, তাহা কি সনাতন কি হরিদাসকে বুঝিতে দিলেন না। তিনি পূর্ব্বকার কথা লইয়া কথা বলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "যে ব্যক্তি ভক্ত তাহার দেহ অপ্রাকৃত, উহাতে মন্দ স্পর্শ করিতে পারে না। শুন হরিদাস, সনাতনের দেহে এই যে ব্যাধি ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পরীক্ষা করিলেন। যদি আমি এই ব্যাধি দেখিয়া ঘৃণা করিতাম, তবে শ্রীকৃষ্ণের স্থানে অপরাধী হইতাম। সনাতন, তুমি দুঃখ করিও না। আমি যে তোমাকে আলিঙ্গন করি, তাহার কারণ এই যে, উহাতে আমি বড় সুখ পাইয়া থাকি। এ বৎসর তুমি আমার এখানে থাকো। বৎসরান্তে তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইব।"

এত বলি পুন তারে কৈল আলিঙ্গন।
কণ্ডু গেল, অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম॥
চরিতামৃত।

এখন ভক্তগণ, আপনারা বিচার করুন, প্রভু কেন কয়েক মাস সনাতনকে এরূপ দুঃখ দিলেন? তিনিতো অনায়াসে দর্শনমাত্র সনাতনকে আরাম করিতে পারিতেন? কারণ বাসুদেবকে ঐরূপ আরাম করিয়াছিলেন। সনাতনের মনে যেটুকু দুঃখ হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি। তাহার ব্যাধি হয়েছে বেশ, তিনি মহাপাপী অবশ্য তাহার উপযুক্ত দণ্ড পাইয়াছেন, কিন্তু প্রভু তাঁহাকে মরিতে দিবেন না, অথচ ব্যাধি আরাম করিবেন না। অধিকন্তু, প্রভু তাঁহাকে সর্ব্ব সমক্ষে মহা সম্মান করিবেন, এমন কি তাহার অঙ্গের ক্লেদ লক্ষ্য না করিয়া আলিঙ্গন পর্য্যন্ত করি-

বেন, ইহাতে ভক্তগণ প্রভুকে কিছুই না বলিয়া, নিরপরাধ সনাতনকে নিন্দা করেন। অতএব সনাতন সংকল্প করিলেন, এখানে তিনি থাকিবেন না, শীঘ্র বৃন্দাবনে যাইবেন। তাঁহার মনে এ দুঃখ উদয় না হইলে তিনি প্রভুকে ছাড়িয়া ওরূপ করিয়া বৃন্দাবনে যাইতে চাহিতেন না। কিন্তু ইহা তিনি কখনও মুখে বলেন নাই যে, "প্রভু আমার ব্যাধিটী ভাল করিয়া দাও!"

প্রভু, সনাতনের দ্বারা জীবকে অনেকগুলি উপদেশ শিক্ষা দিলেন। প্রথম, কুকর্ম্ম করিলে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। দ্বিতীয়, তিনি জীবগণকে দেখাইলেন যে, ভক্ত কখন নীচ হইতে পারে না, তাঁহার অঙ্গে যদি কুষ্ঠও হয়, তবু তিনি পূজার পাত্র। প্রভু যেমন করিয়া সনাতনকে আলিঙ্গন করিতেন, তুমি আমি কি সেরূপ ভাবে কোন ব্যাধিগ্রস্ত ভক্তকে করিতে পারি? প্রভু আরও দেখাইলেন যে, যদিও তিনি সনাতনকে অতীব সম্মান করিতেন, তবু তাহাতে সনাতনের দৈন্য হ্রাস না হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছিল।

আর সনাতনের দ্বারা প্রভু দেখাইলেন যে, যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা জানেন যে শ্রীভগবান জীবের মঙ্গলময় পিতা, তাঁহার নিকট কোন বিষয় চাহিতে নাই, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। তাই সনাতন, স্বয়ং শ্রীভগবানকে সম্মুখে পাইয়া, এক দিনও প্রভুর নিকট আপনার রোগের কথা বলেন নাই। এ সমুদয় দেখাইবার নিমিত্ত প্রভু সনাতনকে দর্শন মাত্র আরোগ্য করেন নাই। সনাতনের আর এখন কোন কষ্ট নাই, এখন আর প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাইতে ইচ্ছা নাই। কিন্তু প্রভুর গণের আপনার সুখ অনুসন্ধানের অনুমতি এই। বৃন্দাবনে যাও, যাইয়া জীব উদ্ধার কর, আপনার আরামের নিমিত্ত এখানে থাকিবে না, ইহা প্রভুর আজ্ঞা। সনাতন আর কিছু কাল থাকিয়া বৃন্দাবনে চলি-

লেন; কোন পথে না, যে পথে প্রভু গিয়াছিলেন। সে পথ ও যেখানে তিনি যে লীলা করিয়াছেন প্রভুর সঙ্গী বলভদ্রের নিকট লিখিয়া লইলেন। বিদায়ের সময় হইল, গলাগলি হইয়া প্রভু ও সনাতন রোদন করিতে লাগিলেন।

"দুই জনের বিচ্ছেদ দশা ন যায় বর্ণনা।"

এই বিচ্ছেদে প্রাণ বিকল হইয়াছে, তবু প্রভুর ক্ষমতা নাই যে সনাতনকে রাখেন। সনাতনেরও ক্ষমতা নাই যে থাকেন। কারণ তাহা হইলে জীবের উদ্ধার হয় না। অতএব গৌরভক্তের কর্ত্তব্য জীবের সুখ বর্দ্ধনের নিমিত্ত জীবন যাপন করা। সনাতন বৃন্দাবনে গেলেন, তাহার পরে শ্রীরূপ, যিনি গৌড়ে ছিলেন, তিনিও গেলেন। তাহার অনেক দিন পরে, তাঁহাদের কনিষ্ঠ অনুপমের পুত্র, যাঁহাকে তাঁহারা রাজপাটে রাখিয়াছিলেন, আর দেশে থাকিতে না পারিয়া তিনিও গিয়াছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, তিনিও বৃন্দাবনে দৌড়িলেন। তাঁহার নাম শ্রীজীব। পূর্ব্বে সনাতন, সনাতনের পরে রূপ, রূপের পর জীব বৃন্দাবনের কর্ত্তা হইলেন। এই গোষ্ঠী বৃন্দাবন পুনরুদ্ধার করিলেন। যে বৃন্দাবন কেবল জঙ্গলময় ছিল, যেখানে প্রভুর চর লোকনাথ ভূগর্ভ প্রথমে যাইয়া কোথা রাসস্থলী খুজিয়া পান নাই, সে স্থল সাধুময় হইল। ইহার এক একজন সাধু ভুবন পবিত্র করিতে সক্ষম।

এখানে এই তিন গোস্বামীর কার্য্য বর্ণনা করিয়া শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিব। যথা:—

"দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দুঁহে সব নির্ব্বাহিল॥
নানাশাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলা॥

সনাতন গ্রন্থ কৈল ভাগবতামৃতে।
ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে ॥
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈল দশম টিপ্পনী।
কৃষ্ণলীলা প্রেমরস যাহা হৈতে জানি ॥
হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাঁহা পাইয়ে পার ॥
আর যত গ্রন্থ কৈল তাহা কে করে গণন।
মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রকাশন ॥
রূপ গোঁসাই কৈল রসামৃতসিন্ধুসার।
কৃষ্ণভক্তি রসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার ॥
উজ্জ্বলনীলমণি নাম গ্রন্থ আর।
কৃষ্ণরাধা লীলারস তাঁহা পাইয়ে পার ॥
দানকেলি-কৌমুদী আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল।
সেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিল ॥
তাঁর লঘু ভ্রাতা শ্রীবল্লভ অনুপম।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীব নাম ॥
সর্ব্বত্যাগী তিঁহ পাছে আইলা বৃন্দাবন।
তিঁহ ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ ॥
ভাগবত সন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থ সার।
ভাগবতসিদ্ধান্তের তাহে পাইয়ে পার ॥
গোপালচম্পূ নাম আর গ্রন্থ কৈল।
ব্রজপ্রেম-লীলারস সার দেখাইল ॥
ষট সন্দর্ভ কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্ব প্রকাশিল।
চারি লক্ষ গ্রন্থ তুঁহে বিস্তার করিল ॥"

দুই ভাই কাঁথা ও করঙ্গ সম্বল করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে যাইয়া দেখেন যে, বৃন্দাবনের স্থান ব্যতীত আর কিছু নাই। মুসলমান দস্যুর উৎপাতে পবিত্র স্থান উজাড় হইয়া গিয়াছে। ভদ্রলোক মাত্র নাই, কোন দেবালয় নাই, কোন তীর্থস্থানের চিহ্ন নাই, থাকিবার মধ্যে আছে কেবল অসভ্য বনবাসিগণ, যাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি ধন ধর্ম্ম কিছুই নাই। এই উজাড় বৃন্দাবন উদ্ধার করা প্রভুর আজ্ঞা। সেই আজ্ঞা তাহারা পালন করেন এরূপ ধন জন কিছুই তাঁহাদের নাই। থাকিবার মধ্যে ছিল কিনা প্রভুদত্ত শক্তি। সেই শক্তিই তাঁহাদের ধন জন হইতে অধিক সহায়তা করিল।

তাঁহাদের বৈরাগ্য এরূপ যে, পাছে মায়ায় অনুবদ্ধ হন তাই দুই ভাই এক স্থানে থাকিবেন না; এক বৃক্ষতলে দুই রাত্রি বাস করিবেন না, পাছে সে বৃক্ষের উপর মমতা হয়। শীতে বৃষ্টিতে বৃক্ষতলে বাস, উপবাস করেন তবু ভিক্ষা করিতে যান না। কিন্তু গীতার শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়াছেন, তাহা ত জানেন? তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, আমি তাহার অন্ন আপন স্কন্ধে করিয়া বহিয়া লইয়া যাই। অর্জ্জুন মিশ্র পাকামী করিয়া এই শ্লোক কাটিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, "আমি বহিয়া লইয়া যাইব" একথা কখনো হইতে পারে না। কৃষ্ণ আপনি তাঁহার সুকুমার স্কন্ধে করিয়া অন্ন বহিয়া লইয়া যাইবেন ইহা কি ভাল কথা? ভক্ত একথা কিরূপে লিখিবে? তাই ভক্তপ্রবর অর্জ্জুনমিশ্র শ্লোক কাটিয়া লিখিলেন, "আমি বহাইয়া লইয়া যাই।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন বটে? তুমি বুঝি আমার বড় পদ বাড়াইলে? আমি আমার এমন ভক্ত, যে ব্যক্তি আমার উপর নির্ভর করিয়া উপবাস করে তাহার নিমিত্ত অন্ন লইয়া যাই, তাহাতে যে সুখ তাহা অন্যকে কেন দিব? এরূপ অন্ন বহনে যে

সুখ তাহা হইতে আমি কেন বঞ্চিত হইব? তাই বলিয়া অর্জ্জুন মিশ্রকে দণ্ড করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই স্বভাব। সেখানে রূপ সনাতন কেন অনাহারে থাকিবেন?

দুই ভাই ছেঁড়া কাস্থা স্কন্ধে করিয়া সেই জঙ্গলে গমন করিলেন ক্রমে দুই একজন করিয়া লোক আসিতে লাগিল। ক্রমে উদিত দিবাকরের ন্যায় তাঁহাদের তেজ প্রকাশ হইতে লাগিল। পরিশেষে স্বয়ং সম্রাট আক্‌বর তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে আসিলেন। আক্‌বর আগমন করিলেন, শুধু তাহা নয়, সেই ভারতবর্ষের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত সম্রাট তাঁহাদের চরণে শরণ লইলেন। আক্‌বর ধন দিতে চাহিলেন, সনাতন বলিলেন, "আমরা কৃষ্ণের দাস, আমাদের ধনের অভাব কি?" অমনি আক্‌বর দর্শন করিলেন যে, সমগ্র শ্রীবৃন্দাবন রত্নমাণিক্যে খচিত! আক্‌বর তখন বলিলেন যে, 'অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা করুন, আমি সামান্য রাজা, যিনি রাজার রাজা তিনি তোমাদের অধীন।

যখন এই দুই ভিক্ষুক বৃন্দাবনে গমন করিলেন, তখন সেই জঙ্গলময় স্থানে ব্যাঘ্র ভল্লুক বিচরণ করিত। পরে সেখানে মন্দিরের সৃষ্টি হইতে লাগিল। গোবিন্দদেবের মন্দির হইল, মদনমোহনের মন্দির হইল। গোবিন্দের মন্দিরের ন্যায় সুন্দর দেবস্থান জগতে নাই। এখন উহা করিতে গেলে কোটী টাকা ব্যয় হয়। গোস্বামিগণ বৃক্ষতলে বসিয়া এই টাকা সংগ্রহ করেন। আপনারা বলিতে পারেন, সেই ভিক্ষুকগণ এক কোটী টাকা কোথায় পাইলেন?

অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু আমাদের জাতীয় বস্তু নহেন, তিনি স্বয়ং ভগবান। স্বয়ং তিনি ব্যতীত এ শক্তি কাহার সম্ভবে? তিনি বলিলেন, "সনাতন বৃন্দাবনে যাও—যাইয়া উহা উদ্ধার কর।" সনাতনের গাত্রে এক ভোট কম্বল ছিল, মূল্য ৩৲ টাকা। প্রভু ইঙ্গিতে বলিলেন,

"বৃন্দাবন যাবে, তবে অগ্রে এই তিন মুদ্রার কম্বলখানি পরিত্যাগ কর, তবে বৃন্দাবনে আমার আজ্ঞা পালন করিতে যাইও।" তাই সনাতনের নিঃসম্বল হইয়া যাইতে হইল। রূপ সনাতনের যে অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল, তাহা দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে অনেক মন্দির হইত, কিন্তু তাহা হইবে না। প্রভু সে অতুল ঐশ্বর্য্যের এক কপর্দ্দকও লইয়া যাইতে দিলেন না। কাঙ্গালের কাঙ্গাল করিয়া বলিলেন, 'যাও এখন বৃন্দাবন উদ্ধার কর গিয়া।" আর তাঁহারা সেখানে যাইয়া শত শত মন্দির করিলেন, তার মধ্যে এমন মন্দির ছিল যাহা প্রস্তুত করিতে কোটী মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

কেন এই দুই ভাই অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া রত্নখট্টার স্থানে বৃক্ষতলে শয়ন করেন? কেন ইঁহাদের কথা লোকে ঐরূপ মান্য করিতে লাগিল, তাঁহাদের চরণে যথাসর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত হইল? কেন একজন সাম্রট, যিনি অনায়াসে তাঁহাদিগকে বধ করিতে পারিতেন, তাঁহাদের অধীন হইলেন? কিরূপে এই দুই ব্যক্তি বিনা সম্বলে এক জঙ্গলের মধ্যে মহানগরীর সৃষ্টি করিলেন? কিরূপে ইঁহারা সহস্র সহস্র পণ্ডিত সাধু সন্ন্যাসীকে প্রতীতি করাইয়া দিলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু (যাঁহাকে ঐ সমস্ত লোকে কখনও দেখেন নাই) স্বয়ং শ্রীভগবান? ইহার উত্তর এই যে, আমাদের শ্রীপ্রভু সত্য বস্তু, তাঁহার মধ্যে কিছু ভেল্‌কী নাই, সমুদায় খাঁটী। তাই কেবল তাঁহার ইচ্ছা মাত্রে রূপ সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণ, মনুষ্যে যে শক্তি সম্ভবে না তাহা পাইয়াছিলেন। প্রভুর মধ্যে কিছু ভেল্‌কি থাকিলে, তিনি সনাতনকে সেই কম্বলখানি ফেলিয়া দিতে ইঙ্গিত করিতেন না। তাহা হইলে তিনি রূপ সনাতনকে অতুল ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত করিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইতেন না। তিনি বঞ্চক হইলে রূপ সনাতনের ঐশ্বর্য্য দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে মন্দির স্থাপন করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গদাসের কি শক্তি তাহা অনুভব

করুন। এই দুই কাঙ্গাল দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু বৃন্দাবনের জঙ্গলে এক প্রকাণ্ড নগর সৃষ্টি করাইলেন!

এখন রামানন্দ রায়ের মহিমা কিছু বলিব।

প্রভুর জ্ঞাতি শ্রীহট্টবাসী শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে আগমন করিয়াছেন। ইচ্ছা যে, প্রভু তাঁহার সহিত কথা বলেন, কারণ তিনি কুটুম্ব, প্রভুর উপর তাঁহার অধিকার আছে। প্রভু তো কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য আর কিছু বলেন না, তাই কাজেই প্রভুর কাছে যাইয়া বলিলেন, "প্রভু আমাকে কৃষ্ণ-কথা শুনাও।" প্রভু বলিলেন, 'আমি কৃষ্ণ-কথা বলিতে জানি না, উহা রায় রামানন্দ জানেন, আর আমি তাঁহার কাছে শুনিয়া থাকি। তোমার কৃষ্ণ-কথা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে বড় ভাগ্যের কথা, তাঁহার কাছে যাও।" ইহাই বলিয়া প্রভু সেই সরল পাড়াগেঁয়ে ব্রাহ্মণটিকে বিদায় করিয়া তাঁহার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

প্রদ্যুম্ন করেন কি, রামানন্দ রায়ের নিকট চলিলেন, যাইয়া ভৃত্য মুখে শুনিলেন যে, তিনি ব্যস্ত আছেন, একটু পরে সভায় আসিবেন। ভৃত্য যত্ন করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন, মিশ্র মহাশয় বসিয়া আছেন। একটু পরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "রামানন্দ রায় এখন কি করিতে-ছেন?" ভৃত্য কহিলেন, "তিনি দেবদাসীগণকে অভিনয় শিখাইতে-ছেন।" প্রদ্যুম্ন ইহার কিছুই বুঝিলেন না। তখন ভৃত্য তাঁহাকে সমুদয় বুঝাইয়া দিলেন। ভৃত্য বলিলেন যে, রায়ের নিজকৃত নাট্যগীতি আছে, তাহার নাম জগন্নাথবল্লভ। শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে এই নাটকের অভিনয় হয়। সেই নিমিত্ত, মন্দিরে যে দেবদাসীগণ আছে, তাহাদের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী ও যুবতীগণকে লইয়া, রামরায় তাঁহার নিভৃত নিকুঞ্জে, তাহাদিগকে অভিনয় শিক্ষা দেন। সে দিবস দুইজন

দেবদাসী লইয়া অভিনয় শিক্ষা দিতেছিলেন। তিনি কিরূপ শিক্ষা দিতেছেন তাহা চৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ কথিত আছে :—

"তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইল।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল॥
সঞ্চারী, সাত্ত্বিক, স্থায়ী ভাবের লক্ষণ।
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন॥"

রায় নিভৃত স্থানে এই সমুদয় কাণ্ড করিতেছেন। মিশ্রঠাকুর সভায় বসিয়া এই সমুদায় কথা শুনিলেন, শুনিয়া অবাক হইলেন!

অবশ্য রায়ের প্রতি মনে মনে তাঁহার একটু অশ্রদ্ধা হইল। একটু পরে রামরায় আসিলেন। আসিতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া মিশ্রের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। রামরায়ের কাণ্ড শুনিয়া মিশ্রের আর তাঁহার নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে রুচি হইল না। তিনি দুই চারিটি বাজে কথা বলিয়া পলায়ন করিলেন।

প্রদ্যুম্ন আবার প্রভুর নিকট উপস্থিত। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৃষ্ণ-কথা শুনিলে?"

প্রদ্যুম্ন বলিলেন যে, তাঁহার ভাগ্যে উহা ঘটে নাই। তাহার পরে আস্তে আস্তে প্রকারান্তরে রামরায়ের কুৎসা গাইতে লাগিলেন; বলিলেন "প্রভু, তোমার রামরায়কে তুমি জানো, আমাদের কিন্তু তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সব ভাল লাগে না। বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী যুবতী লইয়া, নির্জ্জনে তাহাদিগকে স্নান করান, অঙ্গ মার্জ্জন করান, আর অভিনয় শিক্ষা দেওয়া, এসব কি বড় ভাল কাজ হইল?" প্রকৃত বলিতে কি, পৃথিবীর মধ্যে প্রভুর কৃপাপাত্র ব্যতীত কেহ বুঝিবে না যে, কিরূপে নাটক অভিনয় করিতে হয়, তাহা দেবদাসীগণকে শিক্ষা দেওয়া শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার একটা কার্য্য! স্থূল কথায় ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছি।

লোকে নাট্যশালা করে, করিয়া উহা হইতে আনন্দ অনুভব করে। সংগীত দ্বারাও উহাই করে। লোকে পুষ্প সঞ্চয় করিয়া তাহা হইতে আনন্দ সংগ্রহ করে। যাঁহারা কৃষ্ণের অধীন, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্নেহ মমতা কি প্রীতি করেন, তাঁহাদের ইচ্ছা করে যে তাঁহাকে এই সমুদায় আনন্দের আস্বাদ করান। যত ভাল ভাল দ্রব্য আছে, স্ত্রী তাহা স্বামীকে দিতে চাহেন। তাই রামরায় কবি, কৃষ্ণ তাঁহার প্রাণ, আপনি নাটক করিয়া নাট্যশালা করিয়া কৃষ্ণকে উহা দেখাইবেন শুনাইবেন,—সেই নিমিত্ত, যেন রসাভাস না হয়, অভিনয় বিশুদ্ধ হয়, তাই দেবদাসীগণকে শিক্ষা দিতেছেন। সুন্দরী ও যুবতী কেন বাছিয়া লইয়াছেন, না—তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া গোপী সাজিতে হইবে। তাঁহাদিগের রূপ না থাকিলে যে রসাভাস হইবে! যিনি কুরূপা, তিনি কি শ্রীমতী রাধিকা সাজিতে পারেন?

রামানন্দের এই যে ভজন, ইহা সর্ব্বোত্তম; ইহা হইতে স্বচ্ছ সুপবিত্র সুধাময় ভজন আর হইতে পারে না। এ ভজন জগতে আর কোথাও নাই, কোথাও ছিল না, কেবল বৈষ্ণবগণের মধ্যে আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে এই কবিতাটী আছে যথা ঃ—

পূর্ণ চাঁদ আলা, বন ফুল মালা,
বাতাবী ফুলের গন্ধ।
শিশির দুর্ব্বার, রস কবিতার,
পদ্ম-ফুল মকরন্দ॥
সুস্বর, সুরাগ, নৃত্য ও সোহাগ,
সতৃষ্ণ নয়ন-বাণ।
প্রেমানন্দ ধার, মধু-হাসি আর,
লজ্জা, আলিঙ্গন, মান॥

এই আয়োজনে, পূজে গোপীগণে,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বরে।
বলরাম দীন, নীরস কঠিন,
কি দিয়া তুষিবে তাঁরে ॥

জীব আপন প্রকৃতি ও শিক্ষা অনুসারে শ্রীভগবানকে ভজন করে। কেহ একটী জীব হত্যা করিয়া তাহার রুধির ভগবানকে দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চান। কেহ তাঁহাকে তোষামোদ করিয়া ভুলাইতে চান, বলেন "তুমি বড় দয়াল, তুমি বড় মহাজন" ইত্যাদি। কেহ বা আপনার পাপের নিমিত্ত কান্দিয়া আকুল হয়েন, মনে ভাবেন তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া ভগবান তাহার দোষ ভুলিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবেন। যেমন ভগবান তেমন তাহার ভজন। যে প্রভু লোভী মাংসাশী তাঁহাকে রুধির দিতে হইবে। যে প্রভু দাম্ভিক, অহঙ্কারী, স্বেচ্ছাচারী ও নির্ব্বোধ তাহাকে তোষামোদ করিয়া নানা রূপ বঞ্চনা করিয়া ভজন করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি আর একরূপ, তিনি কি তাহা বলিতেছি।

আমাদের যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি সরল, সুবোধ, সুরসিক, দয়াল, অক্রোধ, পরমানন্দ, স্নেহশীল, স্বার্থশূন্য। এরূপ বস্তুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা একটু ভাবিলেই স্থির করা যায়, আর সেই ব্যবহারই আমাদের ভজন। গোপীগুণ করেন কিনা, এরূপ ঠাকুরকে কবিতার রসদ্বারা এবং স্নেহ, আলিঙ্গন, মান প্রভৃতি দ্বারা ভজন করেন। তাঁহারা শ্রীভগবানকে গীত শ্রবণ করান, কবিতার রস আস্বাদন করান। সুতরাং রামানন্দ রায় যে শ্রীকৃষ্ণকে নাটকাভিনয় দেখাইবেন তাহার বিচিত্রতা কি? তাই রামানন্দ বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী যুবতী ও রসিকা দেবদাসী সংগ্রহ করিয়াছেন, কেন না তাহাদিগকে ব্রজ-

গোপী, কৃষ্ণের প্রণয়িনী সাজিতে হইবে। যিনি কৃষ্ণের প্রণয়িনী তিনি যদি কুরূপা, কুশীলা কি কঠিনা হয়েন তবে তাহা বড় অস্বাভাবিক হয়। রামরায়ের নিজের কিছু স্বার্থ নাই, তিনি কৃষ্ণসেবা করিতেছেন, তাই সেবাটী যাহাতে ভাল হয় তাহাই করিতেছেন।

প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কথা শুনিয়া প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি কি শুন নাই যে, যাঁহারা বৃন্দাবনের ভজন করেন তাঁহাদের হৃদ্‌রোগ কি কামরোগ থাকে না? রামরায় নির্ব্বিকার, তাঁহার হৃদয়ে বিকার নাই। তুমি আবার যাও, যাইয়া বল যে আমি তোমাকে কৃষ্ণ-কথা শুনিতে পাঠাইয়াছি।"

প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভুর আজ্ঞা শুনিয়া দ্রুতবেগে রামরায়ের নিকট আবার উপস্থিত হইলেন; হইয়া বলিতেছেন যে, "আমি প্রভুর নিকট কৃষ্ণ-কথা শুনিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, আমি উহা জানি না, তবে রামরায়ের কাছে শুনিয়া থাকি। আপনার এত বড় মহিমা আমাকে কৃষ্ণ-কথা শুনিতে আপনার নিকট প্রভু পাঠাইয়া দিলেন।"

রামরায় ঈষৎ হাসিলেন; বলিলেন, "প্রভু আমার নিকট কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করেন বটে, কিন্তু যিনি শ্রবণ করেন তিনি আবার আমার মুখে বক্তা। যাহা হউক, প্রভুর আজ্ঞা পালন করিব, আমি যাহা জানি আপনাকে বলিব। এখন আপনি বলুন আপনি কি কৃষ্ণ-কথা শুনিবেন?"

ব্রাহ্মণ ইহার কি উত্তর করিবেন, কৃষ্ণ-কথা বলিয়া একটা কথা শুনিয়াছেন, বস্তু কি তাহা জানেন না। তাই দীন ভাবে বলিতেছেন, "আমি প্রশ্ন করিতে জানি না। আপনিই প্রশ্ন করুন, আর আপনিই উত্তর করুন।" তখন রামরায় একটু ভাবিয়া কৃষ্ণ-কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। কথায় কথায় রস উঠিল, রামরায় ভাসিয়া চলিলেন, সঙ্গে ব্রাহ্মণ ঠাকুরও চলিলেন। রসপানে উভয়ের বাহ্যজ্ঞান রহিত হইল।

শেষে বেলা যায় দেখিয়া, ভৃত্য আসিয়া রামরায়কে এক প্রকার বল দ্বারা উঠাইয়া লইয়া গেল।

কৃষ্ণ-কথা কি, ব্রাহ্মণ ঠাকুর জানিতেন না। কিন্তু পাঠক, আপনি কি জানেন, উহা কি ? কৃষ্ণ-কথায় এমন কি আছে যে উহা বলিতে কি শুনিতে জীব বিহ্বল হয় ? শ্রীভগবান্ "পুরুষোত্তম," "নরোত্তম", "সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর", তাঁহার সকল গুণ আছে, গুণ আছে পূর্ণ মাত্রায়, অথচ দোষের লেশ মাত্র নাই। এরূপ বস্তু লইয়া আলোচনা করিবার বিষয়ের অভাব নাই। অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখ, যে, চক্ষুর অগোচরে কীট কেমন সুন্দর খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার একটী দেহ আছে, দেশ আছে, ঘর আছে, স্ত্রী পুত্র আছে, অথচ সে বস্তুটী নয়নের অগোচর।* ইহা দেখিলে, যে কারিগর উহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি ভালবাসার ন্যায় অনির্ব্বচ-নীয় একটী ভাবের উদয় হয়। আবার এই জগৎ নিরীক্ষণ কর দেখিবে, তিনি যেমন কীটাণু সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি অননুভবনীয় প্রকাণ্ড বস্তুও সৃষ্টি করিয়াছেন। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, সকলে স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতেছে, কাহার সাধ্য অন্যথা করে। যখন এই সমুদায় মনে চিন্তা কর, তখন এই সমুদয় বৃহৎ বস্তুর স্রষ্টার উপর আর এক প্রকার ভাল-বাসার ন্যায় ভাবের উদয় হয়। আবার কবিকর্ণপূর বলিতেছেন যে, শ্রীভগবানের সৃষ্টি প্রক্রিয়াদি বিচারে তত সুখ নাই, যত তাঁহার হৃদয় বিচারে আছে। অতএব শ্রীভগবান যে খুব ক্ষমতাবান এ তাঁহার বড় মহিমা নহে। তাঁহার বড় মহিমা এই যে তিনি অতি মধুর প্রকৃতি। এক জন দিব্য কারিগর, বেশ পুতুল গড়িতে পারেন। কিন্তু তিনি আবার এমনি দয়ালু যে পরদুঃখ দেখিলে আমার প্রভুর মত উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠেন। এখন বিবেচনা করুন সেই ব্যক্তির কোন্ গুণ বিচারে অধিক সুখ। তাঁহার কারিগরি বিচারে, না তাঁহার হৃদয়

বিচারে? শ্রীকৃষ্ণের কারিগরি আলোচনাকে যদিও কৃষ্ণ-কথা বলে, কিন্তু সে নিকৃষ্ট। প্রকৃত কৃষ্ণ-কথা কি, না শ্রীকৃষ্ণের অন্তর বিচার ও চর্চ্চা করা; কারণ শ্রীকৃষ্ণের অন্তর পবিত্র, সরল ও সমুদয় উচ্চভাবে পরিপূর্ণ।

আমার ভালবাসার অনেকগুলি বস্তু আছে, তাহাদের নিমিত্ত আমি অনেক ক্লেশ সহ্য করিতে পারি। কিন্তু তাহারা সকলে স্বার্থ-পর ও মলিন। আমার শ্রীকৃষ্ণ কেবল নিঃস্বার্থ নিজজন। আমার কৃষ্ণ আমায় প্রতিপালন করেন, অথচ তাঁহার ভাব যেন আমিই তাঁর প্রতিপালক। আমি তাঁহার নিকট সকল বিষয়েই ঋণী, কিন্তু তাহার ভাব যেন তিনিই আমার কত ধার ধারেন। আমার কৃষ্ণকে যদি আমি একবার স্মরণ করিলাম, তবে যেন তিনি কৃতকৃতার্থ হইলেন। অথচ তিনি আমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলেন না। আমি শ্রীকৃষ্ণের একটী চিত্র দেখি-য়াছিলাম। বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে আমার বোধ হইল যেন তিনি অন্যমনস্ক রহিয়াছেন। আমি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছি, তিনি যেন আমার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মনে মনে কি প্রগাঢ় চিন্তা করিতেছেন। আমি স্বার্থপর জীব, আমার মনে একটু কষ্ট হইল। ভাবিলাম যে, আমি তাঁহার শ্রীবদন এক মনে দর্শন করিতেছি, কিন্তু তিনি তাহা লক্ষ্য করিতেছেন না, আপনার মনে কি ভাবিতেছেন? তখন হঠাৎ একটী কথা মনে হইল। তখন আমার মনে উদয় হইল যে, তা বটে, শ্রীকৃষ্ণের অন্যমনস্ক হই-বার কথাই বটে। তাঁহার ঘাড়ে কত বড় সংসার! এ ত্রিজগতকে ত পালন করিতে হইবে? এইরূপে যখন আমার হৃদয়ে 'অন্যমনস্ক কৃষ্ণ' উদয় হয়েন, তখন আমি তাঁহাকে আর বিরক্ত করি না, পাছে তাঁহার বৃহৎ পরিবারের হিত ভাবিবার ব্যাঘাত হয়। আবার

ইহাও কখন বোধহয় যে, যেন শ্রীকৃষ্ণ কি ভাবিতেছেন, ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নয়ন ছল ছল করিতেছে, তখন মন কি করে একবার ভাবিয়া দেখুন।

শ্রীনন্দনন্দনে, ভজিনু কি ক্ষণে, কান্দি কান্দি কান্দি মনু।
তাঁর দুঃখ দেখি, মোর দুঃখ সখি, সকলি ভুলিয়া গেনু॥

মনে ভাবুন, শ্রীকৃষ্ণের নয়নে জল, ইহা কে সহ্য করিতে পারে? ইচ্ছা করিতেছে যে জলপূর্ণ রাঙ্গা আঁখি মুছাইয়া দিই। আবার ভাবি যে, না, তাহাতে রসভঙ্গ হবে। এই যে গোপনে রোদন করিতেছেন, হয় ত আমি কাছে গেলে তিনি লজ্জা পাইবেন। এই ভাবিতে ভাবিতে যেন শ্রীকৃষ্ণ বদন উঠাইলেন, উঠাইয়া দেখিলেন যে আমিও রোরুদ্যমান অবস্থায় তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছি। তখন শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় লজ্জা পাইলেন, পাইয়া পীতাম্বর দিয়া তাড়াতাড়ি নয়ন মুছিলেন, আর আমার দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত বদনে মধুর হাস্য আনিলেন।

কথা কি, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তাঁহার যাহা পর্য্যালোচনা কর তাহাই মধুর। তাঁহার দর্শন মধুর, তাঁহার গন্ধ মধুর, তাঁহার চরিত্র মধুর। তাই কবি বিল্ব মঙ্গল বলিয়াছেনঃ—

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধিমৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

সখীগণ শ্রীরাধার মুখে কৃষ্ণ-কথা শুনিতেন। চণ্ডীদাসের প্রথম পদই এইরূপ কৃষ্ণ-কথা। যথা "কেবা শুনাইল" গীতের অনুবাদে রাধা বলিতেছেন, "সখি! শ্যাম-নাম আমাকে কে শুনাইল? কত কথা কত নাম শুনি, এক কাণে শুনি অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু ঐ শ্যাম-নামের কি অদ্ভুত শক্তি? যেই নামটী শুনিলাম, অমনি আর এক কাণ দিয়া বাহির না হইয়া, হৃদয়ে বসিয়া গেল। না হয় সেই

নাম হৃদয়ে চুপ করিয়া থাকুন। কিন্তু হৃদয়ে যাইয়া আমাকে অস্থির করিলেন। আমার মুখে এখন কেবল কৃষ্ণ-নাম ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। নামে এত মধু যে বদন ছাড়িতে চাহে না।" রাধা এইরূপে কৃষ্ণ-কথা বলিতেছেন আর আনন্দে গলিয়া পড়িতেছেন. আর যাঁহারা শুনিতেছেন, তাঁহারাও ঐরূপ রসে পরিপ্লুত হইতেছেন। ইহাকে বলে প্রকৃত কৃষ্ণ-কথা।।

এই গেল প্রভুর শ্রীরামানন্দ রায়ের প্রতি ব্যবহার। এখন ছোট হরিদাসকে প্রভুর দণ্ড করিবার কথা শ্রবণ করুন। প্রভুর নিকট দুই হরিদাস বাস করেন, ছোট ও বড়। বড় হরিদাসকে সকলে চিনেন। ছোট হরিদাস উদাসীন, কীর্ত্তনীয়া, প্রভুকে কীর্ত্তন শুনাইয়া থাকেন। একদিন শ্রীভগবান্ আচার্য্য প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু ভিক্ষায় বসিলে আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এরূপ সূক্ষ্ম তণ্ডুল কোথায় পাইলে?" আচার্য্য বলিলেন যে, "মাধবী দাসীর নিকট এই তণ্ডুল মাগিয়া আনিয়াছি।" প্রভু বলিলেন, "কে আনিল?" আচার্য্য বলিলেন যে, "ছোট হরিদাস।" প্রভু তখন আর কিছু বলিলেন না। তবে বাসায় আসিয়া গোবিন্দকে বলিলেন যে, "ছোট হরিদাসকে আর আমার নিকট আসিতে দিও না।"

ইহাতে ছোট হরিদাস মর্ম্মাহত হইলেন। অন্য সকলেও ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তখন প্রভুর কাছে সকলে তাঁহার ক্ষমার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। হরিদাস মাধবীদাসীর নিকট তণ্ডুল মাগিয়া আনিয়াছেন, প্রভু সেই উপলক্ষ করিয়া বলিলেন যে, সে উদাসীন, তাহার প্রকৃতি সম্ভাষণ নিষেধ, অতএব সে দণ্ডার্হ। ঠিক কি ঘটনা হয় তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত আমি এখানে শ্রীচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিব :—

"তিন দিন হরিদাস করে উপবাস।
স্বরূপাদি সবে পুছিলেন প্রভু পাশ॥
কোন অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বারমানা করে উপবাস॥
প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কটবৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"

এখন এ পর্য্যন্ত সমুদায় বুঝা গেল, কিন্তু মাধবী দাসীতো প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতি নহেন। তিনি যদিও স্ত্রীজাতি, কিন্তু একে বৃদ্ধা, তাহাতে রমণীর শিরোমণি। এই মাধবীর মহিমা শ্রবণ করুনঃ—

"মাহিতির ভগিনীর নাম মাধবী দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী॥
প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন॥
সরূপ গোসাই আর রায় রামানন্দ।
শিখি মাহিতি তিন, তার ভগিনী অর্দ্ধজন॥"

হরিদাস মাধবীর নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছেন তবে তাঁহার এত কি অপরাধ? মাধবী দাসী যদিও স্ত্রীলোক তবু বৃদ্ধা, আবার এদিকে পরম পণ্ডিতা। এমন কি, লোকে তাঁহাকে এক প্রকার পুরুষ বলিয়া মানিত। তাঁহাদের কাহিনী চতুর্থ খণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। তাঁহার নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা করা এমন কি অপরাধ? অবশ্য, সন্ন্যাসীর প্রকৃতি দর্শন কি সম্ভাষণ নিষেধ, কিন্তু তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে প্রকৃতি দর্শন

ক সম্ভাষণ কোন কুকার্য্য হইতে পারে না। এটী কেবল শাসন বাক্য আর কিছুই নয়। রাম রায় যুবতী স্ত্রীলোক লইয়া নিভৃতে অনেক সময় বাস করেন, তাহাতে দোষ হয় না। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের নিকট ভিক্ষা মাগিয়া হরিদাসের কি এত অপরাধ হইল? বিশেষতঃ প্রভু স্বয়ং প্রকৃতি দর্শন ও সম্ভাষণ যে একেবারেই না করিতেন এরূপ নহে। তাঁহার মাসী কি অদ্বৈতগৃহিণী, ইহাঁদের নিকট এ সমুদায় নিয়ম বড় একটা পালন করিতেন না, সেখানে হরিদাসকে একেবারে ত্যাগ করেন কেন?

প্রভু হরিদাসকে ত্যাগ করিলে সকলে তাঁহার নিমিত্ত অনুনয় বিনয় করিলেন। প্রভু তাঁহাকে আর গ্রহণ করিলেন না। এইরূপে এক বৎসর গেল। তখন হরিদাস নীলাচল ত্যাগ করিয়া প্রয়াগে গমন পূর্ব্বক গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে প্রবেশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। এ সমুদয় কাহিনী পড়িলে একটু মনে মনে বোধ হয় যে, প্রভু ছোট হরিদাসকে যে দণ্ড করেন, উহা একটু অধিক হইয়াছিল।

এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা কি তাহা বলিতেছি। প্রভুর সঙ্গে বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী, ইহাদের ভালমন্দের নিমিত্ত প্রভু দায়ী। ইহাদের মধ্যে যদি কেহ পতিত হয়েন, তবে তাঁহারাই যে শুধু মারা যান এরূপ নহেন, জীব উদ্ধারের ব্যাঘাত হইবে। প্রভুকে লইয়া তখন সমস্ত ভারতবর্ষে চর্চ্চা হইতেছে। প্রভুর ভক্তগণকে লইয়াও সেইরূপ। হরিদাস অল্প বয়স্ক যুবক। ঝোঁকের উপর সন্ন্যাসী হইয়াছেন, অথচ চরিত্র বিষয়ীর মত। প্রভুর উহা সহ্য হয় না, তাই ধর্ম্ম-স্থাপন ও জীব উদ্ধারের নিমিত্ত হরিদাসকে দণ্ড করা কর্ত্তব্য ভাবিলেন। তাঁহার প্রতি দণ্ড কঠিন কি লঘু হইয়াছিল তাহা তাঁহার অপরাধ না জানিলে নির্ণয় করা যায় না। তিনি যে মাধবীর নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা করেন, সে অবশ্য উপলক্ষ মাত্র। অপরাধ

অবশ্য আরও কিছু ছিল। কারণ প্রভুর শ্রীমুখের বাক্যে তাহাই বোধহয়। হরিদাসের বৈরাগ্য "মর্কট বৈরাগ্য", তিনি "ইন্দ্রিয় চরাঞা" বেড়ান. ইত্যাদি ইত্যাদি। সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর কোন বিষয় অগোচর ছিল না। হরিদাস দৌর্ব্বল্যবশত সন্ন্যাসী হইয়াও "ইন্দ্রিয় চরাইতেন" তাই দণ্ড পাইলেন. মাধবীর নিকট যে তণ্ডুল ভিক্ষা উহা উপলক্ষ মাত্র। হরিদাস নিজে তাহ বুঝিয়াছিলেন, আর সেই অনুতাপানলে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এ সম্বন্ধে আমার অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। ছোট হরিদাস সাধু, মহাপ্রভুর পার্ষদ, তাঁহাকে লইয়া আমি বিচার করিতে পারি না। তবে মহাপ্রভুর এই লীলার তাৎপর্য্য বিচার করিতেছি। ঠাকুর দেখিলেন যে, এই যুবক সন্ন্যাসী, তাঁহার এই নিত্য পার্ষদ, তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্য হয় নাই ও তিনি ইন্দ্রিয় সুখভোগাভিলাষী হইয়া উহার চর্চ্চা করিয়া থাকেন। তাই তাঁহাকে দণ্ড করিলেন। আর হরিদাস মনস্তাপে দেহ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু ইহাতে কি হইল? প্রভুর বৈরাগী ভক্ত গণের মধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল যথাঃ—

"দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণে॥"

কথা এই, সংসার ত্যাগ করিতে না পার, করিও না। সংসারে থাকিয়া কৃষ্ণ-ভজন কর। যদি সংসার ত্যাগ করিবে তবে আর মর্কট বৈরাগ্য করিয়া আপনাকে, অন্য জীবকে, ও শ্রীভগবান্‌কে বঞ্চনা করি না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং উদাসীন, প্রভু তাঁহাকে বল পূর্ব্বক সংসারে প্রবেশ করাইলেন। কারণ, দেখিলেন যে, তাহা না হইলে লোকে আর বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবেশ করিবে না। আবার হরিদাস বৈরাগী প্রকৃতি সম্ভাষণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। কারণ দেখিলেন যে, বৈরাগিগণের মধ্যে যে কঠোর নিয়ম তাহা শিথিল হইতে

ছিল। মনে ভাবুন, হরিদাসকে দণ্ড করিলেন; আর শ্রীনিত্যানন্দকে কৌপীন ছাড়াইয়া আবার পট্টবস্ত্র পরিধান করানো, সেও এক প্রকার দণ্ড। এ দুই কার্য্যের এক উদ্দেশ্য, অর্থাৎ জীবের মঙ্গল। শ্রীনিত্যানন্দের সংসার-প্রবেশে জীবে বুঝিল যে, শ্রীকৃষ্ণ ভজনে সংসার-ত্যাগের প্রয়োজন নাই। হরিদাসের দণ্ডে লোকে বুঝিল যে, কৃষ্ণ-ভজনে প্রবঞ্চনা চলিবে না।

এখন হরিদাসের প্রতি প্রভুর প্রকৃত দণ্ড হইল, কি অনুগ্রহ হইল, তাহা শ্রবণ করুন। হরিদাস গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। তাহাতে তাঁহার লাভ বই ক্ষতি হইল না। পাঠক মহাশয়, প্রভুর সহিত ভারতী গোসাঞির প্রথম মিলন স্মরণ করুন। ভারতী গোসাঞি চর্ম্মাম্বর পরিধান করিয়া প্রভুকে প্রথমে দেখিতে আসিলেন। প্রভুর উহা ভাল লাগিল না। কৃষ্ণ-ভজনে এ সমুদায় প্রতারণা কেন? প্রভুর সম্মুখে ভারতী গোঁসাঞি চর্ম্মের অম্বর পরিধান করিয়া দাঁড়াইয়া। প্রভু বলিতেছেন, "কৈ, ভারতী গোসাঞি কোথায়?' ভক্তগণ বলিতেছেন, "ঐ যে তোমার আগে।" প্রভু বলিলেন, "ইনি কখনো ভারতী গোসাঞি হইতে পারেন না। ভারতী গোসাঞি কেন চর্ম্মাম্বর পরিধান করিবেন? কৃষ্ণ-ভজনে বাহ্য প্রতারণা নাই।" এই কথা শুনিয়া ভারতী তাড়াতাড়ি চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান করিলেন। যেরূপ প্রভু ভারতী গোসাঞির চর্ম্মাম্বররূপ বাহ্য প্রতারণা ঘুচাইলেন, সেইরূপ ছোট হরিদাসের বাহ্য প্রতারণা স্বরূপ যে মলিন দেহ, তাহা ঘুচাইলেন, ঘুচাইয়া দিব্য দেহ দিলেন।

ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছি। হরিদাস দেহত্যাগ মাত্রই দিব্য, পবিত্র, [illegible]ময় দেহ পাইলেন। পাইয়া অমনি প্রভুর নিকট আসিলেন। পূর্ব্বের [illegible]য় প্রভুর পার্ষদ হইলেন, হইয়া তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইতে লাগিলেন। [illegible]

হরিদাস প্রভুকে দিব্যদেহে কীর্ত্তন শুনাইতেন, আর উহা ভক্তগণ পর্য্যন্ত শুনিতেন। যথা চরিতামৃতে :—

"হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে।

* * * *

মনুষ্য না দেখে মধুর গীত মাত্র শুনে।

* * * *

আকার না দেখি মাত্র শুনি তার গান।

কথা এই, হরিদাস যে দেহত্যাগ করিয়াছেন, কি কোথা গিয়াছেন, কেহ ইহা জানিতেন না। হঠাৎ ভক্তগণ অন্তরীক্ষে গীত শুনিতে লাগিলেন। স্বর শুনিয়া বুঝিলেন, হরিদাস গাহিতেছেন। দেহ দেখিতে পান না, কেবল তাঁহার গীত শ্রবণ করেন। অতএব প্রভু যেরূপ হরিদাসকে ভক্তগণ সমক্ষে দণ্ড করিলেন, আবার সেই ভক্তগণকে দেখাইলেন যে, তিনি তাঁহাকে মার্জ্জনা করিয়া আবার কৃপাপাত্র করিয়াছেন, করিয়া প্রভুর নিজের গায়করূপ মহাপদ দিয়াছেন। ইহার সম্বন্ধে প্রভু বলিয়াছিলেন, 'ছোট হরিদাস আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিতেছ।"

প্রভু ছোট হরিদাসকে দণ্ড করিলেন। এখন স্বয়ং প্রভুকে দামোদর যে দণ্ড করিলেন তাহা শ্রবণ করুন। ইহাঁরা পঞ্চ ভ্রাতা, সকলেই উদাসীন। তাহার মধ্যে দামোদর ও শঙ্করকে আমরা ভালরূপে জানি। শঙ্কর প্রভুর শেষ লীলায়, প্রভুর পদদ্বয় হৃদয়ে ধরিয়া নিদ্রা যাইতেন। দামোদর প্রভুর অতি নিজজন, এমন কি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অভিভাবক। আবার জীব দামোদরের নিকট যে ঋণে আবদ্ধ তাহা অপরিশোধনীয়। মুরারির কড়চা,—যাহার দ্বারা প্রধানত আমরা প্রভুর লীলা জানিতে পারি,—দামোদরের লেখা। মুরারি মুখে ঘটনাগুলি বলেন, আর দামোদর উহা শ্লোকবদ্ধ করেন। ইহাঁর একগুণ যে, ইনি

স্পষ্টবাদী। প্রভুকে পর্য্যন্ত স্পষ্ট কথা বলিতে ছাড়িতেন না। একটী উড়িয়া ব্রাহ্মণ শিশু প্রভুর নিকট আইসে, তাহার স্বভাব বড় মধুর। প্রভু স্বয়ং চিরদিন বালকের ন্যায়, কাজেই বালকের সঙ্গ বড় ভালবাসেন। সে আসিলে তাহার সঙ্গে দুই একটী মধুর কথা বল্লেন। বালক প্রভুর প্রীতিবাক্য পাইয়া অবকাশ পাইলেই তাঁহার নিকট দৌড়িয়া আসে। কিন্তু দামোদরের ইহা ভাল লাগে না।

ইহার কারণ এই যে, সে বালক পিতৃহীন, ও তাহার মাতা অল্প বয়স্কা। দামোদর চুপে চুপে চোক পাকাইয়া সেই বালককে বলেন, "তুই এখানে প্রত্যহ আসিস্ কেন? আর আসিস্ না।" সে বালক তাহা শুনিবে কেন? প্রভুর মাধুর্য্য ও মধুর বাক্য তাহাকে আকর্ষণ করে। বিশেষতঃ প্রীতি করে যে পিতা, তাহার তাহা নাই। সে কাজেই আসিতে থাকিল। দামোদরের এইরূপ অন্তরে মহাকষ্ট, কিন্তু প্রকাশ করিয়া কিছু বলিতে পারেন না। একদিন আর সহ্য করিতে না পারিয়া সেই বালক উঠিয়া গেলেই বলিতেছেন, "গোঁসাঞিং এই অবধি সমস্ত পুরুষোত্তমে তোমার যশ প্রচার হইবে।" প্রভু দেখেন যে, দামোদর রাগে গর গর। সরল প্রভু বলিতেছেন, "কিহে দামোদর, তুমি রোষ করিয়াছ বোধ হয়। আমার অপরাধ কি?"

তখন দামোদর বলিতেছেন, "তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তোমার আবার বিধি নিষেধ কি? তবে জগত বড় মুখর। এই যে বালকটী উঠিয়া গেল উহার চরিত্র বড় মধুর। উহাকে যে তুমি কৃপা কর ইহাতে তোমার দোষ নাই। কিন্তু বালকের একটী মহৎ দোষ আছে যেহেতু তাহার মাতা বিধবা, যুবতী ও সুন্দরী। আর তোমারও একটি দোষ আছে যে, তুমি যুবা ও পরম সুন্দর। এরূপ কার্য্য করিতে নাই, যাহাতে লোকে কাণা-কাণি করে।"

প্রভু এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, আর মনে মনে আপনার অপরাধ মানিয়া লইলেন। তাহার কিছুকাল পরে, প্রভু দামোদরকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'দামোদর! তোমার ন্যায় নিরপেক্ষ সুহৃদ আমার আর নাই। আমার মাতাকে রক্ষা করার তুমিই উপযুক্ত পাত্র। তুমি নবদ্বীপে যাও, যাইয়া মাতার নিকটে থাকিও, থাকিয়া আমার কথা তাঁহাকে বলিয়া তাঁহাকে শান্ত রাখিও।"

শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দুইজনে প্রভুর বাটীতে থাকেন, তাঁহাদের রক্ষা-কর্তা বংশীবদন ঠাকুর ও ভৃত্য ঈশান। প্রভুর ইচ্ছা যে, আর একজন লোক এরূপ থাকেন যিনি তাঁহার সংবাদ বাড়ীতে ও বাড়ীর সংবাদ তাঁহার নিকট আনিতে পারেন। তখন এরূপ বন্দোবস্ত হইল যে, দামোদর শ্রীনবদ্বীপে প্রভুর বাড়ী যাইবেন। যখন ভক্তগণ রথ উপলক্ষে নীলাচলে আসিবেন তখন তিনি তাঁহাদের সঙ্গে আসিবেন, যখন তাঁহারা প্রত্যাগমন করিবেন তখন তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন। দামোদর যখন চলিলেন, তখন প্রভু জননীর নিমিত্ত প্রসাদ পাঠাইলেন। আর নানা কথা বলিয়া দিলেন। কয়েক মাস পরে আবার যখন দামোদর নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন, তখন শচীমাতা প্রভুর নিমিত্ত নানা সামগ্রী পাঠাইলেন. আর কত কথা বলিয়া দিলেন।

এইরূপে দামোদর দ্বারা প্রভু তাঁহার জননী ও ঘরণীর সহিত সম্পর্ক রাখিতেন। যখন দামোদর আসিতেন, তখন শচী নিমাই আগমনের সুখ পাইতেন। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াও সেইরূপ সুখ পাইতেন। শচী বিষ্ণুপ্রিয়ার অর্থ কড়ির প্রয়োজন ছিল না, বহুতর ভক্ত তাঁহাদের তাহা যথেষ্ট পরিমাণে যোগাইতেন। প্রভু পাঠাইতেন প্রসাদ, প্রসাদী বস্ত্র, ও দেবীর নিমিত্ত সেই রাজদত্ত বহুমূল্য শাড়ী। দামোদর সেই সমুদয় উপঢৌকন লইয়া আসিলে, শচী বিষ্ণুপ্রিয়া সেই

উপঢৌকনের প্রত্যেক বস্তুতে প্রিয়মিলন সুখ পাইতেন। এইরূপে শচী দামোদরকে লইয়া বসিয়া নিমাইয়ের কথা শুনিতেন, আর শ্রীমতী আড়ালে বসিয়া সমুদায় কথা শ্রবণ করিতেন। এই নিমাই-কথায় তাঁহাদের দিবানিশি সুখে যাইত।

আবার যখন দামোদর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, প্রভু তাঁহাকে লইয়া নিভৃতে বসিয়া বাড়ীর সমুদায় কথা শুনিতেন। শ্রীভগবানের নরলীলার মধ্যে সাংসারিকী লীলা সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ পুত্রগণ লইয়া বিব্রত, সকলে কোলে উঠিতে চায়। কেহ ক্রন্দন করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছেন; কাহাকেও কোলে লইয়া বেড়াইতেছেন, বা কোলে ঘুম পাড়াইতেছেন। ইহা স্মরণ করিলে কাহার না বিস্ময় ও আনন্দ হয়? আমাদের প্রভুর যে স্ত্রী ও জননীর সহিত গোষ্ঠী করা, ইহাও সেইরূপ তাঁহার ভক্তগণের বড় সুখকর।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রভুর লীলায় ছয়জন গোস্বামী, তাঁহারা বৃন্দাবনে বাস করেন। রূপ সনাতন ও তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব, এই তিন জনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। আর একজন গোস্বামী কিরূপে হইলেন, তাহা এখন শ্রবণ করুন। রঘুনাথ দাসের পিতা বারলক্ষের অধিকারী, আম্বুয়া পরগণায় কৃষ্ণপুর গ্রামে * বাস। তিনি দেশের প্রকাণ্ড জমিদার, নবদ্বীপস্থ ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক। তাঁহার পুত্র রঘুনাথের যৌবনকাল উপস্থিত না হইতেই প্রভুর অবতারের কথা শুনিয়া তাঁহার বৈরাগ্যের উদয় হয়। পিতা মাতা অনেক যত্ন করিলেন, পুত্রকে অতি সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই রঘুনাথের হৃদয় বিষয়ে মুগ্ধ হইল না। শেষে তাঁহাকে তাঁহার পিতা একবার কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। চারিদিকে প্রহরী, এক পদ পলাইবার যো নাই। রঘুনাথ তবুও সুযোগ পাইয়া বারে বারে পলায়ন করেন, কিন্তু ধরা পড়েন। পরিশেষে একবার আর ধরা পড়িলেন না। প্রথম দিবসে ১৫ ক্রোশ হাঁটিয়া এক গোয়ালার বাথানে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া গোয়ালা দুগ্ধ পান করিতে দিল। রঘুনাথ আবার চলিলেন। আপনার যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রী, ও ১২ লক্ষের জমীদারীতে পাছে তাঁহাকে ধরে বলিয়া উপবাস করিয়া রাজপথ ত্যাগ করিয়া অরণ্য পথে দৌড়িতেছেন! বড় মানুষের ছেলে, পদতল শিরীষ কুসুমের ন্যায় কোমল, হাটিতে পারেন না, তবু ভয়ে ভয়ে দৌড়িয়া

* এই কৃষ্ণপুর বর্ত্তমান হুগলীর নিকটবর্ত্তী।

১৮ দিবসের পথ ১২ দিবসে আসিয়া উড়িয়া দেশে পৌছিলেন। পথে কেবল তিন দিবস আহার জুটিয়াছিল। প্রভু বসিয়া আছেন, এমন সময় রঘুনাথ যাইয়া দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন। মুকুন্দ সেখানে ছিলেন, তিনি প্রভুকে বলিলেন, "প্রভু, ঐ দেখুন, রঘুনাথ আপনাকে প্রণাম করিতেছে।" রঘুনাথ বড় মানুষের ছেলে, সকলে চিনিতেন।

ঠাকুর রঘুনাথকে বড় কৃপা করিলেন, কারণ সেই যুবককে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। সেই যুবক আলিঙ্গন পাইবার উপযুক্ত বটে। যে ব্যক্তি প্রভুর নিমিত্ত জগতের যত সুখ,—পিতা মাতা, স্ত্রী, অতুল ঐশ্বর্য্য,—ত্যাগ করিল, সে অবশ্য কৃপা পাত্র হইবার দাবী রাখে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আমার অনুগত হইয়াছ অতএব আমি তোমাদের নিকট চিরঋণী। রঘুনাথকে প্রভুর কৃপা দেখিয়া অন্যান্য সকল ভক্তও তাহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন। প্রভু বলিতেছেন, "কৃষ্ণ কৃপাময়, তোমাকে এতদিনে বিষয় হইতে উদ্ধার করিলেন। তুমি খুব ভাগ্যবান।" প্রভু দেখেন যে সেই বড়মানুষের ছেলে অনাহারে, পথশ্রমে, অনিদ্রায় অস্থিচর্ম্মাবশেষ হইয়াছেন। তখন কৃপার্দ্র হইয়া সরূপকে বলিতেছেন, "সরূপ, আমার এখানে পূর্ব্বে দুই রঘু ছিলেন, এখন এই তিন রঘু হইল। এই রঘুকে আমি তোমাকে দিলাম। তুমি ইহাকে গ্রহণ কর, আমি এই অবধি এই রঘুকে সরূপের রঘু বলিয়া জানিব।" ইহা বলিয়া প্রভু রঘুনাথের হস্ত ধরিয়া সরূপের হস্তে দিলেন। অমনি রঘু সরূপের চরণে পড়িলেন। সরূপ "তোমার যে আজ্ঞা" বলিয়া রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া আত্মসাৎ করিলেন। প্রভু রঘুকে আবার বলিলেন, "তুমি শীঘ্র যাও, স্নান করিয়া শ্রীমুখ দর্শন করিয়া আইস, গোবিন্দ তোমাকে প্রসাদ দিবে।" তাই রঘুনাথ স্নান করিয়া আসিলেন, আসিয়া প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র পাইলেন।

এখানে প্রিয়দাসের ভক্তমাল হইতে রঘুনাথের সম্বন্ধে একটী কাহিনী বলিব। উপবাসে ও পথশ্রমে রঘুনাথের জ্বর হইল। অষ্টাহ লঙ্ঘন করিয়া জ্বর ত্যাগ হইল। তখন ক্ষুধা হইয়াছে। জ্বরান্তে যেরূপ রোগীর হইয়া থাকে, রঘুনাথের তাহাই হইয়াছে, একটু লোভ হইয়াছে। নানা-রূপ আহারীয় বস্তুর কথা মনে হইতেছে। কিন্তু প্রভুর প্রসাদ ব্যতীত, মনে মনেও কিছু জিহ্বাগ্রে দিতে পারেন না। তাই সেই গভীর রজনীতে মনে মনে প্রভুকে ভুঞ্জাইতে লাগিলেন। মনে মনে অতি সূক্ষ্ম সুগন্ধ চাউল সংগ্রহ করিলেন, আর মনে মনে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ইত্যাদি বিবিধ আহারীয় প্রস্তুত করিয়া, মনে মনে আসন পাতিয়া প্রভুকে বসাইয়া আকণ্ঠ পূরিয়া খাওয়াইলেন। ইহা এক প্রকার সাধনা। পরে আপনিও প্রসাদ পাইলেন।

পরদিন মধ্যাহ্নে প্রভুর ভিক্ষার সময় হইলে প্রভু স্বরূপকে বলিতেছেন, "আমার আহারে রুচি নাই। রঘুনাথ অসময়ে আমাকে এরূপ গুরুতর আহার করাইয়াছে যে, আমি এখন আহার করিতে পারিব না।" এ কথার তাৎপর্য্য স্বরূপ অবশ্য বুঝিলেন না। পরে রঘুনাথকে ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বরূপ জিজ্ঞাসিলেন, "রঘুনাথ, তুমি নাকি প্রভুকে অসময়ে বড় ভোগ দিয়াছ? প্রভু বলিতেছেন, তাঁহার অজীর্ণ হইয়াছে।" রঘুনাথ অবাক্! তখন রঘুনাথ সমুদায় কথা খুলিয়া বলিলেন।

এই রঘুনাথের কথা কিছু বলিতে হইতেছে, কারণ ইঁহার দ্বারা প্রভু অনেক কার্য্য সাধন করেন। প্রথমতঃ ইঁহার দ্বারা দেখাইলেন যে, মনুষ্য কতদূর বৈরাগ্য করিতে পারে। দ্বিতীয় এই যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণও ভক্তিবলে আচার্য্য হইতে পারেন। এখন রঘুনাথের বৈরাগ্য শ্রবণ করুন। রঘুনাথ ১২ লক্ষের অধিকারী, সেই তিনি এখন নীলাচলে প্রভুর অতিথি, প্রভুর প্রসাদ পাইতেছেন। পাঁচ দিন পরে উঁহা ছাড়িয়া

দিলেন। করেন কি, সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া হরেকৃষ্ণ নাম জপ করেন। নিশিযোগে যখন জগন্নাথের মন্দিরের দ্বার বন্ধ হয়, তখন যদি দ্বারে কোন বৈষ্ণব উপবাসী থাকেন, তবে বিষয়ী লোকে কি জগন্নাথের সেবকগণ তাঁহাকে আহার দেন। রঘুনাথ দ্বারে যাহা পান তাহা দ্বারা জীবনধারণ করেন। কিছু দিন পরে উহাও ছাড়িয়া দিলেন। প্রভু রঘুনাথের ব্যবহার সমুদয় শ্রবণ করিতেছেন। যখন শুনিলেন যে, রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িয়াছেন, তখন প্রভু একটী শ্লোক পড়িলেন, যথা, "অয়মাগচ্ছতি অয়ংদাস্যতি"। ইত্যাদি, আর বলিলেন "রঘু বেশ করিয়াছে। সিংহদ্বারে আহারের নিমিত্ত দাঁড়াইয়া থাকা বেশ্যার আচার!" তাহার পরে রঘুনাথ জীবন রক্ষার নিমিত্ত আর এক উপায় করিলেন। দোকানীদিগের প্রসাদান্ন যাহা বিক্রয় না হয়, তাহা পচিয়া গেলে ফেলিয় দেওয়া হয়। রঘুনাথ সেই সমস্ত পরিত্যক্ত অন্ন সংগ্রহ করেন, করিয়া জল দ্বারা ধৌত করেন। এইরূপ মাজিতে মাজিতে মধ্যে যেটুকু মাজি অন্ন পাওয়া যায়, তাহাই রাত্রে লবণ দিয়া ভোজন করেন। প্রভু এই কথা শুনিলেন, শুনিয়া সেই অন্ন দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া, উহার একগ্রাস মুখে দিলেন. আর একগ্রাস লইতে গেলে স্বরূপ হাত ধরিলেন; বলিলেন, "আমাদের সমক্ষে তুমি ইহা বদনে দাও এ তোমার বড় অন্যায়।" প্রভু বলিলেন, "রঘুনাথ, তুমি প্রত্যহ এরূপ উপাদেয় বস্তু খাও! এমন সুস্বাদু প্রসাদ আমি কখনো খাই নাই।"

রঘুনাথের পিতামাতা পুত্রের সংবাদ পাইয়া মুদ্রার সহিত নীলাচলে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু রঘুনাথ উহা লইলেন না। অবশ্য গৃহেও প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। সেইরূপ ঘোর বৈরাগ্য করিতে লাগিলেন ও প্রভুর সহিত অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে যাপন করিলেন। প্রভুর অপ্রকটে রঘুনাথ গৌরশূন্য নীলাচলে তিষ্ঠিতে না পারিয়া ছুটিয়া বৃন্দাবনে পলায়ন করিলেন;

মনের ভাব ভৃগুপাত করিয়া অর্থাৎ পর্ব্বত হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় তাহা ঘটিল না। কিছুকাল পরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ আসিয়া তাঁহার সহিত শ্রীবৃন্দাবনে মিলিত হইলেন। রঘুনাথের প্রমুখাৎ প্রভুর লীলা শুনিয়া তিনি অন্ত্য-লীলার অনেক লিখেন। এই রঘুনাথের প্রতি মুহূর্ত্তের সঙ্গী কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাথরের রেখা॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় শ্রবণে কীর্ত্তনে।
সবে চারিদণ্ড আহার নিদ্রা কোন দিনে॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন॥

এই শ্রীবৃন্দাবনে রঘুনাথ দাস বহুকাল জীবিত থাকেন। প্রভুর কার্য্য করিবার নিমিত্ত যত ভক্ত তাঁহা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়েন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ই সকলে দীর্ঘকাল জগতে বিচরণ করেন। কেহ একশত, কেহ নবতি, কেহ একশত পঞ্চবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন। অদ্বৈত প্রভু এই শেষোক্ত বয়সে ধরাধাম ত্যাগ করেন।

রঘুনাথ ক্রমে অতি বৃদ্ধ হইলেন, চক্ষু কর্ণ গেল, এদিকে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ বিরহে এক প্রকার পাগল হইলেন। চলিতে পারেন না, হামাগুড়ি দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণকে তল্লাস করিয়া বেড়ান। কখনো যমুনা-পুলিনে গমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে "রাধে, রাধে" বলিয়া ডাকেন; কখনো নিকুঞ্জের মধ্যস্থানে তাঁহারা আছেন ভাবিয়া সেখানে নয়ন মুদিয়া বসিয়া থাকেন। তাঁহার শেষ জীবন দর্শন করিয়া অন্যান্য ভক্তগণও উহা বর্ণন করিয়াছেন। দাস গোস্বামীর উক্তি এই গীত, সকলে অবগত

আছেন, যথা —

"রাধে রাধে,
তুমি কোথা লুকাইয়া আছ।"
গোসাঞি, একবার ডাকে যমুনা তটে,
আবার ডাকে বংশী বটে,
রাধে রাধে ইত্যাদি।

কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন, দাস গোস্বামীর যে অতি কষ্টের জীবন, তাহাতে সুখ কোথায়? রাধাকৃষ্ণ ভজনের কি এই ফল? তাহার উত্তর এই যে, তিনি বারলক্ষের অধিকারী, তাঁহার বাটীতে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ও স্ত্রী বর্ত্তমান। কৈ তিনি তো কষ্টের জীবন ত্যাগ করিয়া বাটী গেলেন না? কথা কি, কৃষ্ণ-বিরহে যে সুখ তাহা অন্তরে, বাহিরের লোকে তাহা কিরূপে বুঝিবে?

দাস গোস্বামী যখন নীলাচলে কেবল নূতন আসিয়াছেন, তখন এক দিন তিনি সাহস করিয়া প্রভুর নিকটে একটি নিবেদন করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "প্রভু, আমি কি করিব? আমাকে একটু উপদেশ দিতে কৃপা হয়।" প্রভু বলিলেন, "আমি তোমাকে স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি আমি যত না জানি তিনি তাহা জানেন। তবে যদি আমার কাছে কিছু জানিতে চাও, তবে বলিতেছি। তুমি বৈরাগ্য করিয়াছ, সুতরাং শারীরিক সুখ ত্যাগ কর। গ্রাম্য কথা বলিও না, শুনিও না। দীন ভাবে মানসে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনা কর।" এখনকার লোকে অনেকে বিগ্রহ পূজার বিরোধী, তাঁহারা বলেন, "পুতুল পূজা কেন করিব? মনেই পূজা করিব।" কিন্তু এই যে মহাপুরুষ দাস গোস্বামী, প্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেন যে, তিনি "মানসে" শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন করিবেন, তবু তিনি তাহা পারিলেন না। প্রভুর আজ্ঞা এই যে, তিনি মানসে রাধাকৃষ্ণ ভজন

করিবেন, কিন্তু সে ভজনে তখন তাঁহার অধিকার হয় নাই, সুতরাং প্রভুর আজ্ঞা সত্ত্বেও বিগ্রহ সেবা আরম্ভ করিলেন। অগ্রে বিগ্রহ সেবা করিয়া পরে মানসে সেবা করিতে শিখিলেন, শেষে মানস সেবা ছাড়িয়া দিয়া বিরহে ব্যাকুল হইয়া বৃন্দারণ্যে রাধাকৃষ্ণকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন রাধাকৃষ্ণ তাঁহার সহিত লুকোচুরী খেলা আরম্ভ করিলেন।

রঘুনাথের ন্যায় ভগবান আচার্য্যও বিষয়ত্যাগী। তাঁহার পিতা শতানন্দ খান ধনবান্ লোক, কিন্তু শ্রীভগবান আচার্য্য সে অতুল বিষয় ত্যাগ করিয়া প্রভুর চরণে রহিলেন। প্রভুর কাছে থাকেন, প্রভুকে না দেখিলে মরেন। তাঁহার কনিষ্ঠ গোপাল কাশীতে বেদ পড়িতে গিয়াছেন। পড়িয়া মহা পণ্ডিত হইয়াছেন। তখন আপন বিদ্যা বুদ্ধি দেখাইবার নিমিত্ত নীলাচলে দাদার নিকটে উপস্থিত হইলেন। কথা কি, তখন প্রভুর সঙ্গী যত লোক, সকলে যেমন জগৎ বিজয়ী ভক্ত, তেমনি আবার জগৎ বিজয়ী পণ্ডিত। কেহ পণ্ডিত হইলে প্রভুর সভায় যাইয়া তাঁহার বিদ্যার পরিচয় দিতে অভিলাষ হয়। কিন্তু প্রভু বাজে কথা শুনেন না, পাণ্ডিত্যে মন নাই, যদি ভক্তিবিষয়ক কোন প্রস্তাব হয় তবে নিতান্ত অনুরোধে তাহা শ্রবণ করেন। কিন্তু সেও অগ্রে নয়। যিনি যে কিছু পুস্তক প্রণয়ন করেন, কি শ্লোক লিখেন, তাহা স্বভাবতঃ প্রভুকে শুনাইতে ইচ্ছা হয়। আর প্রভুর যদি এরূপ লোকের গ্রন্থ কি শ্লোক শুনিতে হয়, তবে আর তাঁহার দিবা রাত্রি অবকাশ থাকে না। তাই প্রভুর নিকটে কোন গ্রন্থকার কি কবি অগ্রে যাইতে পারেন না। যদি কেহ প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র হয়েন তবে তিনি অগ্রে সরূপ গোস্বামীর কৃপাপাত্র হয়েন। সরূপ যদি দেখেন যে প্রভুকে পুস্তক কি শ্লোক শুনাইবার উপযুক্ত হইয়াছে, তবে প্রভুর নিকট লইয়া যান। গোপাল বেদান্ত পড়িয়া তাঁহার বিদ্যা দেখাইতে নীলাচলে গিয়াছেন, কিন্তু শ্রোতা পান না। ভগবান গোপা-

লকে প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন, প্রভু ভগবানের সম্বন্ধে তাঁহাকে বিস্তর আদর করিলেন। তাহার পরে ভগবান ছোট ভাই গোপালকে সরূপের কাছে লইয়া গেলেন। সরূপের সহিত তাঁহার অতি সখ্য ভাব। বলিতেছেন "এসো ভাই, গোপাল পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার নিকট বেদান্ত-ভাষ্য শুনা যাউক।"

তখন, "প্রেম-ক্রোধ করি স্বরূপ বলয়ে বচন॥
বুদ্ধি ভ্রষ্ট হইল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হইয়ে শাঙ্করিক ভাষ্য যেবা শুনে।
সেব্য সেবক ছাড়ি, আপনাকে ঈশ্বর করি মানে॥"

সরূপ বলিলেন, "ভাই, তোমার একি কুবুদ্ধি হইল? আমরা এখন কি তাই শুনিব যে, "আমিও যে, কৃষ্ণও সে?' ভগবান আচার্য্য বলিলেন, "আমাদের বেদান্তে করিবে কি? আমরা কৃষ্ণের দাস। আমাদের কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্ত, আমাদের কি বেদান্তে মন ফিরাইতে পারে?' সরূপ বলিলেন, "তবুও বেদান্তে যাহা শ্রবণ কর তাহাতে ভক্তের হৃদয় ফাটে। সমুদায় মায়া, ঈশ্বর কেহ স্বতন্ত্র নাই, মুক্তিই মনুষ্যের চরম ফল, ইত্যাদি কথা শুনিতে পারিব কিরূপে?' অতএব গোপালের বেদান্ত পড়াইয়া শুনান হইল না। তিনি নীলাচল ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে ভক্তগণ নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে আসিয়াছেন, এমন সময় আউলির বল্লভ ভট্ট আসিয়া উপস্থিত। আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে ইনি প্রভুকে প্রয়াগ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। ইনি একজন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ও অন্যান্য গ্রন্থও লিখিয়াছেন। অতি স্বাধীন প্রকৃতি, এমন কি শ্রীধরস্বামীর টীকাকে দোষিতে তাঁহার কোনরূপ আশঙ্কা হয় নাই। প্রভুকে প্রথম দর্শনে চমকিত হয়েন, কিছুকাল সে চমক থাকে, এখন তাহার অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রভুকে প্রয়াগে দর্শন করিয়া বুঝিলেন, ইনিই শ্রীকৃষ্ণ। তখন হৃদয়ে যে ঈর্ষার উদয় হইয়াছিল তাহা লোপ পাইল। প্রভুকে ভট্ট ঠাকুর ঘরে লইয়া গেলেন। বল্লভ সম্প্রদায়ি বৈষ্ণবদিগের একটী নিয়ম আছে। ঠাকুর ঘরে যে সকল দ্রব্য সামগ্রী থাকে, তাহা ঠাকুরসেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে প্রযুক্ত হয় না, তাহা হইলে ঐ দ্রব্যাদি উচ্ছিষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহা ঠাকুরসেবার অযোগ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু তখন প্রভুতে ভট্টের ঈশ্বরবুদ্ধি হইয়াছিল, তাই তিনি সেবার দ্রব্যাদি দ্বারাই প্রভুর ভিক্ষা সম্পন্ন করিলেন। প্রভু নীলাচলে আসিলে ক্রমে ভট্টের পূর্ব্বকার চমক ভাঙ্গিয়া গেল, ঈর্ষার সৃষ্টি হইল, এখন নীলাচলে প্রভুর সহিত এক প্রকার পাল্লা দিতে আসিয়াছেন। "চৈতন্য" একজন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক, তিনিও একজন তাহাই, অধিকন্তু তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, "চৈতন্য" তাহা করেন নাই। প্রভুকে মনে মনে খুব শ্রদ্ধা করেন, তবে আপনাকেও কম শ্রদ্ধা করেন

না। তিনি সংসারী, প্রভু সন্ন্যাসী, কাজেই তাঁহার প্রভুকে প্রণাম করিতে হইল। প্রভু বল্লভ ভট্টকে খুব আদর করিলেন। তখন ভট্ট বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "তোমাকে দর্শন করিবার বড় সাধ ছিল, অদ্য জগন্নাথ তাহা পূর্ণ করিলেন, তোমার দর্শন বড় ভাগ্যের কথা। তোমার স্মরণে লোক পবিত্র হয়। এমন কি, তুমি যেন সাক্ষাৎ ভগবান্। তোমার শক্তিও সেইরূপ প্রবল। জগৎকে তুমি কৃষ্ণনাম লওয়াইয়াছ, প্রেমে ভাসাইয়াছ। এ সমুদায় কি কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত হইতে পারে?" এই যে ভট্ট বক্তৃতা করিতেছেন, ইহার মধ্যে একটী কথাও অন্যায় নয়, কিন্তু তবু অক্ষরে অক্ষরে বুঝা যায় যে, তিনি বক্তৃতা মাত্র করিতেছেন, আর তাঁহার হৃদয় গর্ব্বে পরিপূর্ণ। সে যাহা হউক, প্রভু উত্তরে বলিলেন, "আপনি বলেন কি? আমি মায়াবাদি সন্ন্যাসী, আমি ভক্তির কি বুঝি? তবে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাকে সৎসঙ্গ দিয়াছেন, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি। সেই এক সঙ্গ অদ্বৈত আচার্য্য, তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে কেবল কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা করেন। আর একজন শ্রীনিত্যানন্দ, তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত। আর একজন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, তিনি ন্যায় বেদান্ত প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ। রস কাহাকে বলে তাহা শ্রীরামানন্দ রায় আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন। আর একজন স্বরূপদামোদর, তিনি মূর্ত্তিমান্ ব্রজরস। আর একজন শ্রীহরিদাস, যাঁহার নিকট নামের মহিমা শিখিলাম, তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম লয়েন।"

ভট্ট বলিলেন, "এ সমুদায় ভক্তগণ কোথায়? আমি তাঁহাদিগকে দেখিতে বাসনা করি।" প্রভু বলিলেন তাঁহাদিগকে এখানেই পাইবেন। তাঁহারা রথোপলক্ষে এখানে আসিয়াছেন।

ভট্ট মহাপণ্ডিত লোক, নিজদেশে তাঁহার সমকক্ষ লোক পান নাই। নীলাচলে আপনার পাণ্ডিত্য দেখাইতে আসিয়াছেন। এই যে নীলাচলে

ভক্তির সাগরে পড়িয়া গিয়াছেন, ইহাতেও তাঁহাকে ভক্তি স্পর্শ করিতে পারে নাই। হে দম্ভ! তোমাকে বলিহারি যাই, দম্ভ এইরূপ বিষবৎ সামগ্রী! মহাপ্রভুকে দর্শন করিলেন, তাঁহার সহিত সঙ্গ করিলেন, রথাগ্রে তাঁহার নৃত্য দেখিলেন, ইহাতেও মন দ্রব হইল না। কেবল তর্ক করিবেন, তর্ক করিয়া জয়লাভ করিবেন, এই মনের একমাত্র সাধ। প্রত্যহ প্রভুর সভাতে আগমন করেন, সেখানে শ্রীঅদ্বৈত, সার্ব্বভৌম, সরূপ প্রভৃতি মহাপণ্ডিত পার্ষদগণও থাকেন। ভট্ট আসিয়াই নানা তর্ক উত্থাপন করেন। ভট্ট নানা রাজে কথা বলিয়া প্রভুকে বিরক্ত করেন দেখিয়া প্রভুকে কোন কথা কহিতে অবকাশ না দিয়া, শ্রীঅদ্বৈত আপনি তাঁহার কথার উত্তর দিতেন। কিন্তু ক্রমে তিনিও আর পারেন না। কারণ ভটের যে সমুদায় কথাবার্ত্তা, সে ফল্গু, অর্থাৎ রসশূন্য কি পদার্থশূন্য। তাঁহার একটী প্রশ্ন শুনিলেই বুঝিবেন যে তাঁহার কথা কিরূপ অসার। বলিতেছেন, 'আমি দেখি, তোমারা সকলে কৃষ্ণনাম লও, আবার কৃষ্ণকে প্রাণপতি বল, ইহা কিরূপে হয়? যে পতিব্রতা হয়, তাহার তো পতির নাম লইতে নাই?" এখন যাঁহারা দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে কি বিরহে কি হরিভজনে মুগ্ধ, তাঁহাদের নিকট এ সব কথা ভাল লাগিবে কেন?

ভট্ট বালগোপাল উপাসক, আর প্রভুর গণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাসক অর্থাৎ বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে বাৎসল্য রসে ভজন করেন, আর প্রভুর গণ মধুর রসে। তাই, বল্লভ মধুররসের ভজনাকে দুষিবার নিমিত্ত ছল উঠাইলেন যে, "তোমরা কৃষ্ণকে প্রাণনাথ বল, আবার তাঁহার নাম লও কিরূপে?" যদি সেখানে ঐরূপ কেহ তার্কিক থাকিত তবে সেও বলিতে পারিত "আচ্ছা তুমি তো কৃষ্ণকে আপনার পুত্র বলিয়া ভজনা কর, তবে তাঁহাকে প্রণাম কর কিরূপে?" ভটের জ্বালায় প্রভু ও প্রভুর গণ একেবারে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া গেলেন।

একদিন বল্লভ বলিতেছেন, "শ্রীধর স্বামীর টীকায় অনেক দোষ আছে। আমি সে সমুদায় দেখাইয়া দিয়াছি।" কিন্তু প্রকৃত কথা এই, শ্রীধরস্বামীর নিমিত্ত জীবে শ্রীভাগবত জানিয়াছে, শ্রীধরস্বামী না হইলে শ্রীভাগবত কেহ বুঝিতে পারিত না, সেই শ্রীধরকে ভট্ট বলিতেছেন, 'আমি স্বামীকে মানি না।" এখন ভট্ট নীলাচলে মাসাধিক বাস করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গ কেবল প্রভুর গণ লইয়া, আর কোথাও স্থান নাই; তাঁহার এই সকল তর্কে লোকে অস্থির হইয়া গিয়াছে। প্রভুর সভায় যাইয়া আস্ফালন করেন, প্রথমে শ্রীঅদ্বৈত কিছু কিছু উত্তর করিতেন, এখন তিনিও তাহা ছাড়িয়া দিয়াছেন। প্রভু কখনও কিছু বলেন না, চুপ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, ভট্টের শাসন প্রয়োজন, তাই যখন ভট্ট বলিলেন, আমি স্বামীকে মানি না", তখন প্রভু বলিলেন, "স্বামীকে যে না মানে, স বেশ্যার মধ্যে গণ্য।" প্রভু রহস্য করিয়া বলিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে এ কথা ঘোর দণ্ডের স্বরূপ হইল। ভট্ট অপ্রাতিভ হইয়া ঘরে গেলেন।

ভট্ট তখন রজনীতে ভাবিতেছেন, "পূর্ব্বে গোঁসাই আমার সহিত সস্নেহ ব্যবহার করিতেন। এখানে আসিলেও প্রথমে সেইরূপ ছিল। আমি নিমন্ত্রণ করিলে গ্রহণ করিতেন, এখন ক্রমে ক্রমে আমি সকলের অপ্রিয় হইয়াছি। সকলেই আমাকে দেখিলে আমা হইতে দূরে যায়। প্রভুর সভায় আমার কথা কেহ গ্রাহ্যও করেন না। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোঁসাই আমাকে একটু কৃপা করেন দেখিয়া প্রভু তাঁহাকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার অর্থ কি?' এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সুবুদ্ধি আসিল। তখন আবার ভাবিতেছেন, 'আমি এখানে আইলাম কেন? জয়লাভ করিতে? জয়লাভ করিয়া কি হইবে? এই যে বৈষ্ণবগণ এখানে দেখিলাম, ইঁহারা সকলেই আমা হইতে ভাল, কৃষ্ণপ্রেমে ভাসিতেছেন।

আমি সে ধন হইতে বঞ্চিত, আমি বৃথা জয়ের আশায় সে মহাধন পরিত্যাগ করিয়াছি। প্রভু আমাকে দণ্ড করেন, তাহার কারণ কেবল আমার অভিমান। এই অভিমান গেলেই আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন।"

পরদিন প্রভাতে প্রভুর নিকট যাইয়াই চরণ ধরিয়া পড়িলেন। আর সব কথা সরল ভাবে বলিলেন। বলিলেন, "প্রভু, বুঝিয়াছি। তুমি পরম বন্ধু। তুমি আমার গর্ব্ব দেখিয়া কৃপার্ত্ত হইয়া উহা হইতে আমাকে অব্যাহতি দিবার নিমিত্ত আমাকে দণ্ড করিতেছ। পূর্ব্বে এই দণ্ডে আমার ক্রোধ হইত, এখন বুঝিলাম যে, এ দণ্ড নয়, তোমার মহাকৃপা।"

প্রভু অমনি দ্রবীভূত হইলেন। বলিলেন, "তোমার দুই গুণ আছে, তুমি পণ্ডিত ও তুমি ভাগবত। যাহাদের এই দুই গুণ আছে, তাহাদের গর্ব্ব থাকিতে পারে না। তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, গর্ব্ব ত্যাগ কর, তবে কৃষ্ণ কৃপা করিবেন।"

ভট্ট প্রভুর মুখপানে চাহিয়া দেখেন যে, তাঁহার সেই প্রণয়াকুল নয়ন স্নেহভরে তাঁহার পানে চাহিতেছে। তখন বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রতি প্রভুর আবার কৃপা হইয়াছে। তাই সাহস করিয়া বলিতেছেন, "প্রভু, তুমি যে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর, তাহা না হইলে আমি আর এখানে তিষ্ঠিতে পারি না।" প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া স্বীকার করিলেন। ভট্ট তখনি মহাসমারোহ করিয়া প্রভুকে গণসহ নিমন্ত্রণ করিলেন, নিমন্ত্রণে অনুপস্থিত রহিলেন কেবল শ্রীপণ্ডিত গদাধর গোঁসাই।

পণ্ডিত গোঁসাইর ন্যায় নিরীহ ভাল মানুষ জগতে কেহ নাই, হইবারও নয়। যখন ভট্ট প্রভুর গণের অপ্রিয় হইলেন, তখন তিনি গদাধরের শরণ লইলেন। গদাধর নিষেধ করেন, কিন্তু ভট্ট শুনেন না। ভট্টের তখন

মন ফিরিয়াছে। তিনি এ পর্য্যন্ত বালগোপাল উপাসনা করিয়া আসিয়াছেন, এখন প্রভুর গণের প্রেম দেখিয়া মাধুর্য্য অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাই গদাধরের নিকট বলেন যে তিনি তাঁহাকে যুগল মন্ত্রে দীক্ষিত করুন। গদাধর বলেন, 'তাহা আমা দ্বারা হইতে পারে না। আমি প্রভুর দাসানুদাস, তাঁহার অনুমতি ব্যতীত কিছু করিতে পারি না। প্রভুকে আমি ভয় করি না, কিন্তু তুমি এখানে আইস বলিয়া, তাঁহার গণ আমাকে এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছেন। তুমি প্রভুর শরণ লও তবেই তোমার মঙ্গল।" সম্ভবতঃ গদাধরের উপদেশে ভট্টের প্রথম জ্ঞানোদয় হয়।

এই কথার পরে ভট্ট প্রভুর শরণাগত হয়েন। যে দিন ভট্ট সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন, সে দিবস গদাধর সাহস করিয়া সেখানে যাইতে পারেন নাই। প্রভু সভায় যাইয়া গদাধরকে না দেখিয়া, সরূপ, জগদানন্দ ও গোবিন্দ এই তিনজনকে তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। গদাধর মহাহর্ষে আসিতেছেন, পথে সরূপ তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার কোন অপরাধ নাই, তবে, তুমি কেন প্রভুর নিকট আসিয়া তাঁহাকে সব বলিলে না?" গদাধর বলিলেন, "প্রভুর সহিত হঠ করা ভাল বোধ করি না। প্রভু অন্তর্যামী, আমি যদি নির্দ্দোষ হই, তবে তিনি আমাকে আপনা আপনি কৃপা করিবেন।" তাহার পরে সভায় যাইয়া গদাধর রোদন করিতে করিতে প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। করিয়া বলিতেছেন, "তুমি আমার উপর আদপে ক্রোধ কর না। কিন্তু তোমার ক্রোধ দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা করে, তাই তোমাকে চালাইবার নিমিত্ত আমি তোমার উপর কপট ক্রোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু কোনমতে তোমার ক্রোধ জন্মাইতে পারিলাম না। কাজেই আমি তোমার নিকট বিক্রীত।" প্রভুর বড় সাধ গদাধরের

ক্রোধ দেখিবেন, কিন্তু তাঁহাকে রাগাইতে পারিলেন না, পরে বিক্রীত হইলেন।

ইহার কিছু দিন পরে, প্রভুর অনুমতি লইয়া, গদাধরের নিকট ভট্ট যুগল-ভজনের মন্ত্র লইলেন। এখন ইহার রহস্য শ্রবণ করুন। ভট্ট নিজের দেশে অনেক শিষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বাল-গোপাল উপাসক। এদিকে তাঁহাদের নেতা সে পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া যুগল-ভজন আরম্ভ করিলেন। এই বাল-গোপাল উপাসক ভট্টের গোষ্ঠী এখন ভারতবর্ষের অনেক স্থলে, এমন কি শ্রীবৃন্দাবনে পর্যন্ত বড় প্রবল।

হরিদাস অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তবুও তাঁহার সাধনের অংশ কমে নাই। প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম উচ্চৈঃস্বরে জপ করেন। মনে বিশ্বাস, এই হরিনাম যে শুনিবে, কি স্থাবর কি জঙ্গম, সকলেই উদ্ধার হইয়া যাইবে। বৈষ্ণব-শাস্ত্রবেত্তারা বলেন যে হরিদাসের দ্বারা প্রভু জীবের নিকট নামের মাহাত্ম্য-প্রচার করেন। কিন্তু হরিদাস জীবকে আর একটী প্রধান শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ দীনতা। হরিদাসের ন্যায় দীন ত্রিজগতে হয় নাই ও হইবে না। হরিদাসের দীনতা দেখিলে প্রভু বিকল হইতেন। হরিদাস কোথাও গমন করেন না, পাছে কোন সাধু মহান্তকে স্পর্শ করিয়া অপরাধী হয়েন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার স্পর্শ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত বাঞ্ছা করেন। হরিদাস প্রভুদত্ত কুটীরে দিবানিশি বাস করেন এবং নাম জপ করেন। প্রভু প্রত্যহ সমুদ্র হইতে স্নান করিয়া প্রত্যাগমনকালে একবার হরিদাসকে দর্শন দিয়া যান। কখন বা পার্ষদ সঙ্গে করিয়া তাঁহার কুটীরে গমন করেন, করিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করেন। গোবিন্দ প্রত্যহ আসিয়া তাঁহাকে প্রসাদ দিয়া যান।

এক দিবস গোবিন্দ আসিয়া দেখেন যে, হরিদাস শয়ন করিয়া আছেন, আর মন্দ মন্দ নাম জপ করিতেছেন, উচ্চৈঃস্বরে জপিবার শক্তি নাই। গোবিন্দ আসিয়া বলিলেন, 'উঠ, প্রসাদ গ্রহণ কর।' হরিদাস গাত্রোত্থান করিলেন. করিয়া বলিতেছেন, "অদ্য আমি লঙ্ঘন করিব। যেহেতু আমার সংখ্যা-নাম জপ এখনও হয় নাই।" আবার বলিতেছেন, "মহাপ্রসাদ উপেক্ষা করিতে নাই। সুতরাং কি করিব ভাবিতেছি।" ইহা বলিয়া মহাপ্রসাদকে বন্দনা করিলেন, করিয়া একটী অন্ন বদনে দিলেন। হরিদাসের এইরূপ অবস্থা শুনিয়া প্রভু পর-দিবস তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। হরিদাস অমনি উঠিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। প্রভু বলিলেন. 'হরিদাস, তোমার পীড়া কি?' হরিদাস বলিলেন, 'আমার শারীরিক পীড়া কিছুই নাই। তবে মনই অসুস্থ, আমি আর সংখ্যা-নাম জপ করিয়া উঠিতে পারি না।" প্রভু বলিলেন, "তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, এখন সাধনে এত আগ্রহ কর কেন? সংখ্যা কমাইয়া দাও। তুমি জগতে নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে আসিয়াছ, তোমার কৃপায় জীবে উহা বেশ জানিয়াছে। তোমার দেহ পবিত্র, তুমি আর এরূপ করিয়া শরীরকে অনর্থক দুঃখ দিও না।"

তখন হরিদাস অতি কাতরে ও করজোড়ে বলিতেছেন, "প্রভু ওসব কথা এখন থাকুক। আমাকে একটী বর দিতে হইবে। তুমি অবশ্য লীলাসম্বরণ করিবে বুঝিতেছি। তুমি সেটী আর আমাকে দেখিতে দিও না। যাহাতে আমি এখন শীঘ্র শীঘ্র যাইতে পারি তাহার অনুমতি করিতে আজ্ঞা হয়। দোহাই প্রভু, আমাকে বিদায় দাও।"

এই কথা শুনিয়া প্রভু বুঝিলেন. হরিদাস তাঁহার নিজের মনের একান্ত বাঞ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। প্রভুর আঁখি ছল ছল করিতে

লাগিল। বলিতেছেন, "হরিদাস, তুমি বল কি? তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে, আমি কাহাকে লইয়া এখানে থাকিব? কেন তুমি নির্দ্দয় হইয়া তোমার সঙ্গ সুখ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে চাও? তোমরা ব্যতীত আমার আছে কে?"

হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, আমাকে এ সব কথা বলিয়া ভুলাইও না। কত কোটী মহান্ ব্যক্তি তোমার লীলার সহায় আছেন। আমি ক্ষুদ্র কীট মরিয়া গেলে তোমার অভাব হইবে, এরূপ অন্যায় কথা তুমি কেন বল? আমাকে ছেড়ে দাও প্রভু, আমি যাই।" ইহা বলিয়া রোদন করিতে করিতে হরিদাস একেবারে প্রভুর পায়ে ধরিয়া পড়িলেন। আবার বলিতেছেন, 'আমার স্পর্দ্ধার কথা শ্রবণ করন। আমি যাইব, কিন্তু তোমার শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে রাখিয়া, আর তোমার চন্দ্রবদন দেখিতে দেখিতে, আর তোমার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে। বল প্রভু, আমাকে এই বর দিবে?"

যেমন অল্প মেঘে পূর্ণচন্দ্র আবরণ করে, সেইরূপ দুঃখে প্রভুর বদন আন্ধার হইয়া গেল। প্রভু কিছু উত্তর করিতে পারিলেন না, অনেকক্ষণ মলিন বদনে ও অবনত মস্তকে নীরব হইয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "তুমি যাহা ইচ্ছা কর কৃষ্ণ তাহাই পালন করিবেন তাহার সন্দেহ নাই, তবে আমি তোমা বিহনে কি কষ্টে থাকিব তাহাই ভাবিতেছি।" ইহা বলিয়া বিমর্ষ চিত্তে প্রভু উঠিয়া গেলেন।

পরদিবস প্রাতে প্রভু স্বগণ সহিত হরিদাসের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। বলিতেছেন, "হরিদাস সমাচার বল।" হরিদাস বলিতেছেন, "প্রভু, তোমার যে আজ্ঞা তাহাই হউক!" হরিদাস বুঝিয়াছেন যে, প্রভু তাহার প্রার্থিত বর প্রদান করিয়াছেন। ইহাই বলিতে বলিতে হরিদাস কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া আঙ্গিনায় আসিয়া প্রভুর ও ভক্ত-

গণের চরণে প্রণাম করিলেন। হরিদাস দুর্ব্বল, দাঁড়াইতে পারেন না। তখন প্রভু তাঁহাকে যত্ন করিয়া অঙ্গিনায় বসাইলেন, আর তাঁহাকে বেড়িয়া সকল নাম-সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিদাস মধ্যস্থলে রহিয়াছেন কেন,—না মারিবার নিমিত্ত! ভক্তগণ নৃত্য করিয়া বিচরণ করিতেছেন, আর হরিদাস যখন সুবিধা পাইতেছেন, তাঁহাদের পদধূলী লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিতেছেন। এইরূপে হরিদাস ভক্ত-পদধূলীতে ধূসরিত হইলেন। নৃত্য করিতেছেন সরূপ ও বক্রেশ্বর, আর গাইতেছেন কে, না স্বয়ং প্রভু, সরূপ, রামরায়, সার্ব্বভৌম ইত্যাদি। পরে প্রভু কীর্ত্তন রাখিয়া ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া হরিদাসের গুণ বলিতে লাগিলেন। অদ্য স্বয়ং প্রভু বক্তা, বর্ণনীয় কি, না হরিদাসের গুণ! ভক্তগণ হরিদাসের গুণ শ্রবণ করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া, হরিদাসের চরণে প্রণাম করিতে লাগিলেন

হরিদাস তখন ধীরে ধীরে শয়ন করিলেন। মস্তক ও সর্ব্বাঙ্গ পদধূলায় ভূষিত। মুখে বলিতেছেন, "প্রভু দয়াময়! শ্রীগৌরাঙ্গ! এ দীনকে চরণে স্থান দাও।" পরে প্রভুকে তাঁহার নিকট বসাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রভু বসিলেন। হরিদাস অমনি প্রভুর চরণ ধরিয়া আপনার হৃদয়ে স্থাপিত করিলেন। প্রভু কিছু বলিলেন না। তিনিই না হরিদাসকে বর দিয়াছেন? তাহার পরে হরিদাস তাঁহার নয়নদ্বয় প্রভুর মুখচন্দ্রে অর্পিত করিয়া সুধাপান করিতে লাগিলেন। ইহাতে হইল কি, না তাঁহার নয়নদ্বয় দিয়া প্রেমধারা পড়িতে লাগিল। তখন হরিদাস, প্রভুর নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, আর, যথা চৈতন্যচরিতামৃতে :—

'নামের সহিতে প্রাণ করিল উৎক্রামণ।"

দুই দিবস পূর্ব্বে শরীরে কিছু অসুখ হইয়াছিল, এমন কিছু বেশী

নয়। তাহার পরদিন প্রভুর নিকট বর প্রার্থনা করেন, আর তিন দিনের দিন আপনি কুটীরের বাহিরে আসিলেন, বসিলেন, শয়ন করিলেন, নানারূপে চিরদিনের মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন, করিয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে চলিয়া গেলেন। হরিদাস যাইবেন, ভক্তগণ তাহা মনে ভাবেন নাই। হরিদাসের অসুখ হইয়াছে, তাই তাঁহার বাড়ী কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছেন। হরিদাসের সহিত প্রভুর যে গোপনে কথা হইয়াছে, তাহা ভক্তগণ জানিতেন না এ গোপনীয় কথা ভক্তগণ তখনি জানিলেন, যখন প্রভু হরিদাসের গুণ বর্ণন কালে বলিলেন যে, "হরিদাস যাইতে চাহিলেন আমি রাখিতে পারিলাম না। হরিদাস আমাকে সম্মুখে রাখিয়া গোলোকে যাইবেন এই প্রার্থনা করিলেন, আর কৃষ্ণ তাহাই করিলেন।" ভক্তগণ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। হরিদাস যে গিয়াছেন কেহ ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কিন্তু পরে দেখিলেন হরিদাস প্রকৃতই অন্তর্ধান করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন ভক্তগণ বুঝিলেন যে, হরিদাস গিয়াছেন, তখন সকলে গগন ভেদিয়া হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

প্রভু করিলেন কি, না সেই হরিদাসের মৃতদেহ কোলে করিয়া উঠাইলেন, উঠাইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু আনন্দে বিহ্বল। প্রভুর আনন্দ কেন? হরিদাসের জয় দেখিয়া, আর ভক্তের প্রতাপ দেখিয়া। তখন ভক্তগণও সেই প্রভুর আনন্দের তরঙ্গে পড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীভগবানের পিতামাতা স্ত্রী পুত্র কন্যা নাই, ভক্তই শ্রীভগবানের পরিবার। আপনারা কি এমন কাহাকে দেখিয়াছেন যাহার ত্রিজগতে কেহ নাই, অথচ তাহাতে তাঁহার অভাব বোধ নাই? তাঁহার যদিও নিজের পুত্র নাই, তিনি সকল বালককে আপন পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন। সকল

স্ত্রীলোকই তাহার মা। তাঁহার সম্পত্তিতে সকলের অধিকার আছে। কেহ মরিয়াছে তাহার নিমিত্ত তিনি রোদন করিতেছেন। অন্যের সুখে আপনি সুখী হইতেছেন। শ্রীভগবান সেই প্রকার, তাঁহার কেহ নহে, তিনি সকলের। হরিদাসের মৃতদেহ কোলে করিয়া প্রভু দেখাইলেন যে ভক্তে ও ভগবানে কত প্রীতি। যেমন ঠাকুর আমার শ্রীপ্রভু, তেমনি ভক্ত আমার শ্রীহরিদাস। যেমন ভক্ত হরিদাস, তাঁহার অন্তর্দ্ধানও সেই রূপ।

প্রভু বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেছেন, এমন সময় স্বরূপ তাহাকে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কথা জানাইলেন। তখন একখানা গাড়ী আনা হইল, ও তাহার উপরে সেই মৃতদেহ স্থাপিত করিয়া সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রের দিকে গমন করিলেন। গাড়ী চলিতেছে, প্রভু অগ্রে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছেন, পশ্চাতে ভক্তগণ কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতেছেন। সঙ্গে বহুতর লোক হরিধ্বনি করিতে করিতে চলিয়াছে। তাহার পরে সেই মৃতদেহ গাড়ী হইতে অবতরণ করাইয়া স্নান করান হইল।

প্রভু বলিলেন, "অদ্যাবধি সমুদ্র মহাতীর্থ হইল।"

তখন ভক্তগণ বালুকার মধ্যে সমাধি খনন করিলেন, হরিদাসের অঙ্গে মালা চন্দন দিলেন, আর ভক্তগণ তাঁহার পাদোদক পান করিলেন। পরে সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার দেহকে সেই সমাধিতে শয়ন করাইলেন।

"চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন॥
হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায়।
আপনে শ্রীহস্তে বালু দিলেন তাঁহার গায়॥"—চরিতামৃত।

তাহার পরে কবর পূর্ণ করিয়া তাঁহার উপর দৃঢ় করিয়া বাঁধা হইল।

এই কার্য্য সমাপ্ত হইলে আবার নর্ত্তন কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। তখন সকলে জলে ঝাঁপ দিয়া আনন্দে হরিধ্বনির সহিত জলকেলি করিতে লাগিলেন।

স্নানান্তে সকলে উঠিয়া হরিদাসের কবর প্রদক্ষিণ করিলেন, তাহার পর প্রভু ঐ পথে একেবারে মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। প্রভু যখন আনন্দে বিহ্বল থাকেন, তখন ভক্তগণের সহিত কোন পরামর্শ করেন না। প্রভু স্নান করিয়া চলিলেন, সকলে পশ্চাতে চলিলেন। প্রভু বাসায় না যাইয়া মন্দিরে গমন করিলেন, কাজেই সকলে তাহাই করিলেন। প্রভু মন্দিরে কেন যাইতেছেন কেহ স্বপ্নেও তাহা ভাবেন নাই। সকলে ভাবিতেছেন, প্রভু দর্শনে চলিয়াছেন। কিন্তু তাহা নয়। সেখানে পসারীগণ তাহাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবার নিমিত্ত বসিয়া আছে। প্রভু সেখানে যাইয়া কাপড় পাতিলেন, বলিলেন, "আমার হরিদাসের মহোৎসবের নিমিত্ত আমাকে ভিক্ষা দাও।" তখন ভক্তগণ প্রভুর কথা বুঝিয়া হাহাকার করিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। পসারীগণ সকলে তটস্থ হইয়া ভিক্ষা দিতে অগ্রসর হইল। স্বরূপ তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। আর প্রভুকে নিবেদন করিলেন, 'আপনি বাসায় চলুন। আমরা ভিক্ষা লইয়া যাইতেছি।" প্রভু ভক্তগণের সহিত বাসায় গমন করিলেন, স্বরূপ চারিজন বৈষ্ণব সঙ্গে রাখিয়া ভিক্ষা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "তোমরা প্রত্যেকে এক একটী দ্রব্য দাও।" এইরূপে চারিটী বোঝা করিয়া তিনি বাসায় আসিলেন।

এদিকে নগরে হরিদাসের অপ্রকট সংবাদে মহা কোলাহল হইয়াছে। নগরময় হরিধ্বনি আরম্ভ হইয়াছে। নীলাচলে মুসলমানের আসিতে নিষেধ। যখন প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চলিলেন, তখন হরিদাস রোদন করিয়া বলিলেন যে, তিনি কিরূপে প্রভুকে দর্শন করিবেন, যেহেতু তাঁহার নীলাচলে যাইবার অধিকার নাই। তখন প্রভু প্রতিজ্ঞা করিয়া

বলিয়াছিলেন যে, আমি তোমাকে সেখানে লইয়া যাইব। আজ সেই হরিদাসের অন্তর্দ্ধানে বাল বৃদ্ধ যুবা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলে আনন্দে ও ভক্তিতে গদ গদ হইয়া হরিধ্বনি করিতেছেন। তাই বলি ভক্তি, জাতির উপরে, সকলের উপরে।

স্বরূপ গোঁসাই যে চারি বোঝা ভিক্ষা লইয়া আসিলেন তাহাতে আর মহোৎসব হইত না। কারণ হরিদাসের ক্রিয়াতে প্রসাদ পাইতে নগর সমেত লোকের সাধ হইল। তবে রামানন্দের ভাই বাণীনাথ বহু প্রসাদ আনিলেন, আর আনিলেন কাশীমিশ্র, যিনি মন্দিরের কর্ত্তা।

বৈষ্ণবগণকে প্রভু সারি সারি বসাইলেন, আর চারিজন সহায় লইয়া পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। যেন মহাপ্রভুর পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, তাঁহার সেই ভাব।

> "মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
> এক পাত্রে পঞ্চজনার ভোক্ষ্য পরিবেশে॥"

স্বরূপ প্রভুকে এই কার্য্য হইতে নিরস্ত করিলেন। করিয়া তিনি স্বয়ং, আর বলবান কাশীশ্বর, জগদানন্দ ও শঙ্করকে লইয়া পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। প্রভু ভোজন না করিলে কেহ ভোজন করেন না. কিন্তু সে দিবস কাশীমিশ্রের বাটীতে প্রভুর নিমন্ত্রণ ছিল। এমন কি, হরিদাসের অন্তর্দ্ধানের অতি অল্প পূর্ব্বেও প্রভু ব্যতীত কেহ জানিতেন না যে হরিদাস তখনি নিত্যধামে গমন করিবেন! কাশী-মিশ্র প্রভুর ভিক্ষার সামগ্রী সেখানে লইয়া আসিলেন, প্রভু সন্ন্যাসি-গণ লইয়া বসিলেন প্রভু যত্ন করিয়া সকল বৈষ্ণবকে আকণ্ঠ পূরিয়া ভোজন করাইলেন। কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রভুর যেন এ নিজের কাজ। যেন তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ।

ভোজনান্তে প্রভু সকলকে মাল্য চন্দন পরাইলেন। তার পরে

বলিতেছেন ঃ—

"হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে ইহা নৃত্য কৈল যে কৈল কীর্ত্তন॥
যে তাঁরে বালুকা দিতে কৈল গমন।
তার মধ্যে মহোৎসবে যে করিল ভোজন॥
অচিরে সবাকার হইবে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে হয়ে ঐছে শক্তি॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে॥
ইচ্ছামাত্রে কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ॥
হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্নশূন্যা হইল মেদিনী॥
জয় হরিদাস বলি করে হরিধ্বনি।
ইহা বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥
সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিল।
হর্ষ বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিল॥"

প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সঙ্গ দিয়াছিলেন, কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আবার তাঁহাকে লইয়া গেলেন।" বস্তুতঃ হরিদাসের অন্তর্দ্ধানে প্রভুর প্রাত্যাহিক একটী সুখের কার্য্য কমিয়া গেল। অর্থাৎ প্রত্যহ সমুদ্র

স্নান সময়ে হরিদাসকে দর্শন দেওয়া যে কার্য্য ছিল, তাহা আর রহিল না। হরিদাস যে বর মাগিলেন, তাহা পাইলেন। এই প্রেমের হাট ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। প্রভু যে লীলা সম্বরণ করিবেন, তাহার সূচনা আরম্ভ হইল। হরিদাসের অন্তর্দ্ধান তাহার প্রথম লক্ষণ।

লোকে বলে যে মায়া ত্যাগ কর, করিয়া সাধু হও। কিন্তু মনুষ্য যদি মায়া ত্যাগ করিল, তবে তাহার আর রহিল কি? যাহার মায়া নাই সে তো অসুর। মায়া, মোহ, ইত্যাদি বড় ঘৃণার বস্তু বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মায়ামোহ বলে কারে? স্ত্রীকে ভালবাসা, সন্তানকে স্নেহ করা, পিতামাতাকে কি শ্রীভগবানকে প্রেমভক্তি করা, এ সমুদায় উপরোক্ত শাস্ত্রের হিসাবে "মায়া"। কিন্তু এ সমুদায় যদি পরিত্যাগ করিতে হইল, তবে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কিছুমাত্র থাকিবে না। মায়া শূন্য যে মনুষ্য সে অসুর, রাক্ষস, অপদেবতা, ভূত, পিশাচ ইত্যাদি। আমাদের যিনি ভগবান, তিনি মায়াময়, আমরা কিরূপে ও কেন মায়া ত্যাগ করিব? শ্রীকৃষ্ণের চক্ষে কথায় কথায় জল, শ্রীকৃষ্ণ দীনদয়ার্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ বিরহে কাতর, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে পাগল, তবে মনুষ্য কিরূপে মায়ামোহশূন্য হইবে? এই যে নীলাচলে আমার প্রাণগৌরাঙ্গ প্রেমের হাট বসাইয়াছেন, ইহারা সকলে জুটিয়া এক বৃহৎ পরিবার স্বরূপ বাস করিতেছেন। এই পরিবার মধ্যে গৃহী আছেন, যেমন রামানন্দ; সন্ন্যাসী আছেন, যেমন পুরী, ভারতী; উদাসীন আছেন, যেমন হরিদাস। হরিদাস যখন অন্তর্দ্ধান করিলেন সেই পরিবার মধ্যে একজন অদর্শন হইলেন। হরিদাসের অভাব সকলে অনুভব করিতে লাগিলেন, প্রভু পর্য্যন্ত। "এমন সঙ্গ আমি আর কোথায় পাইব?" হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া প্রভুর এই কথা।

হরিদাসের স্বচ্ছন্দ মরণ, ইহার নিমিত্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইবার কারণ

নাই। ঠাকুর মহাশয়, রসিকানন্দ প্রভৃতি প্রভুর ভক্তগণ ইহা অপেক্ষাও আশ্চর্য্যরূপে অপ্রকট হয়েন। প্রকৃত কথা, ভক্তির চর্চ্চার ন্যায় শক্তি-সম্পন্ন যোগ আর নাই। এই যোগের কথা দ্বিতীয় খণ্ডে প্রভুর রাঢ় ভ্রমণকালীন কিছু বর্ণনা করিয়াছি। শরীররূপ উপপতির সহিত জীবাত্মা-রূপ রমণীর প্রীতি ধ্বংস করিয়া তাহার পরমাত্মারূপ পতির সহিত মিলন সংঘটনের নামই "যোগ"। জীব "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া যতই সাধন করেন, ততই তাঁহার শরীররূপ উপপতির প্রতি প্রীতি লঘু হইতে থাকে। তাহার পরে ভক্তের এরূপ একটী অবস্থা হয় যে তাঁহাদের শরীর ও জীবাত্মার যে বন্ধন, তাহা অতি জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এরূপ অবস্থা হইলে জীব, ভক্তিযোগীই হউন, কি জ্ঞানযোগীই হউন, আপনার শরীর হইতে অতি অনায়াসে আপনার জীবাত্মা নিক্রামণ করিতে পারেন। সুতরাং এরূপ অধিকারী জীব অনায়াসে ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারেন। হরিদাস অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। তাই ভাবিলেন যে, আর এখানে থাকা ভাল নয়। প্রভুর নিকট বর মাগিলেন। প্রভু দেখিলেন যে হরিদাসের এরূপ অবস্থায় যাওয়াই ভাল, তাই বর দিলেন। আর হরিদাস হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

যীশুখ্রীষ্ট অবতার, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিতে রক্তপিপাসু জাতি সমুদায় অনেক পরিমাণে শান্ত হইয়াছে। এই যীশুখৃষ্ট তাঁহার হত্যাকারিগণের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, "প্রভু ইহাদিগকে ক্ষমা করুন।" এ কথা যখন আমরা প্রথম বাইবেল গ্রন্থে পাঠ করিলাম তখন আমাদের বিস্ময়ে আনন্দের উদয় হইল। তখন মনে এই ক্ষোভ হইল যে, আমাদের মধ্যে এরূপ উদাহরণ দেখাইবার কিছু নাই। খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিগণ ঐ কথা লইয়া আমাদিগকে চির-

দিন লজ্জা দিয়া আসিতেছেন; বলিতেছেন, "দেখাও দেখি, এরূপ মহত্ত্ব কোথায়, কোন্ কালে কেহ দেখাইতে পারে কি না?' আমরা মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া থাকিতাম। কেন? কেন না আমরা তখন প্রভুর লীলা জানিতাম না। 'আমরা' মানে—দেশে যাঁহারা ভদ্রলোক বলিয়া অভিহিত। কারণ প্রভুর ধর্ম্ম সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে অপ্রচারিত থাকে, আর নবশাখগণ প্রভৃতি যাঁহাদের মধ্যে প্রচারিত থাকে, তাহারা বিদ্যাচর্চ্চা করে নাই। কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণব গোস্বামী তাঁহারা কেন প্রভুর লীলা জগতে প্রচার করেন নাই? সে কথার উত্তর আমরা কি দিব? তবে এই বলিতে পারি যে, যখন এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের, প্রভুর অপরিসীম কৃপায় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা হইল, তখন সে অনেকের চরণে শরণাগত হইয়াছিল, কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারিলেন না। যাঁহারা গোস্বামী, পণ্ডিত, তাঁহারা শ্রীভাগবত পড়িয়াছেন, গোস্বামিগ্রন্থ পড়িয়াছেন, কিন্তু প্রভুর লীলা কেহ জানেন না। যিনি বড় জানেন, তিনি শ্রীচরিতামৃত পাঠ করিয়াছেন। সেও যেখানে লীলা কথা আছে সেখানে নয়, যেখানে তত্ত্ব কথা আছে, সেখানে। শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিয়া যে একখানা গ্রন্থ আছে প্রায় কেহই তাহার সংবাদ রাখিতেন না। সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি, প্রভু কে, তিনি কি করিয়াছিলেন, ইহা প্রায় কেহ জানিতেন না।

তাহার পরে প্রভুর লীলা পাঠ করিয়া দেখি যে যীশু যেরূপ মহত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন, হরিদাস তাহা অপেক্ষাও মহত্ত্ব দেখান। যীশু তাঁহার হত্যাকারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'পিতা! ইহাদিগকে আমার হত্যারূপ অপরাধ হইতে মার্জ্জনা কর।" হরিদাস বলিলেন, "প্রভু, ইহাদিগকে উদ্ধার কর!" আমার নিতাইয়ের মস্তক দিয়া রুধির পড়িতেছে

আর তিনি মাধাইয়ের নিমিত্ত প্রভুর চরণ ধরিয়া মিনতি করিতেছেন। এ সমুদায় কেবল গৌরাঙ্গ-লীলায় পাওয়া যায়, অন্য কোথাও নয়।

অপর, আমাদের দেশে, সমাজে ও সাধন ভজনে, অনেক বাহ্যক্রিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ইহা দেখিয়া বিদেশী লোকে হাস্য করেন ও আমাদের দেশের বুদ্ধিমান লোকেরা ক্ষুব্ধ হয়েন। মনে করুন, এক জাতির সহিত আর এক জাতির বিবাহ হইবে না। শুধু তাহা নয়, এক জাতির দুই শ্রেণী আছে, তাহার মধ্যে এক শ্রেণীর সহিত অন্য শ্রেণীর বিবাহ হইবে না। যেমন বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, উভয়েই ব্রাহ্মণ, অথচ ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ হইবে না। ইহাতে হিন্দুকুল নির্ম্মূল হইতেছে। কিন্তু মহাপ্রভুর বিচারে জাতি, কি বিদ্যা, কি বুদ্ধি, কি ধন, কি পদ লইয়া ছোট বড় বিচার নয়, কেবল ভক্তি লইয়া। হরিদাস মুসলমান, তাঁহার পাদোদক মহাকুলীন ব্রাহ্মণ কিরূপে পান করিলেন? ইহা সামাজিক নিয়মের ঘোর বিরোধী কার্য্য। কিন্তু প্রভুর ধর্ম্মে এ সমস্ত কিছু নাই। আবার, হরিদাস বৈষ্ণব, তাঁহার দেহ দাহ না করিয়া কবরে প্রোথিত করা হইল কেন? ইহার তাৎপর্য্য এই, বৈষ্ণব ধর্ম্মে এই সমুদায় ছাই মাটীর কথা লইয়া কচকচি নাই। যখন দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইয়া গেল, তখন উহা ভস্মসাৎ কর, কি মৃত্তিকায় প্রোথিত কর, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। বুদ্ধিমান পাঠক একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, এই সমুদায় কতকগুলি অনর্থক সামাজিক নিয়মের নিমিত্ত হিন্দু সমাজে একতা নাই। এই জন্য উহা ছারে খারে গেল।

ভবানন্দের পাঁচ পুত্র, ইঁহারা সকলই প্রভুর দাস। রামানন্দ, প্রভুর বাম বাহু, বিশাখার অবতার। বাণীনাথ, প্রভুর সেবায় নিযুক্ত, গোপীনাথ বিষয় কার্য্য করেন। ইহাদিগের দুই জন, রামানন্দ ও গোপীনাথ, প্রতাপরুদ্রের সাম্রাজ্যের অধীন রাজ্যশাসন করেন। ইঁহাদিগকে অধি-

কারাও বলিত, রাজাও বলিত। ইঁহারা রাজার যে কার্য্য তাহা করিতেন, তবে মাসিক বেতন পাইতেন। এই রাজার রাজা যদি অসন্তুষ্ট হইতেন, তবে চাকুরি যাইত। এইরূপ গোপীনাথ মালজ্যাঠার অধিকারী। তাঁহার নিকট মহারাজের লক্ষ কাহন পাওনা হইয়াছে। গোপীনাথ চিরদিন বড় বাবু লোক, অপব্যয়ে সমুদায় উড়াইয়া দেন। মহারাজ-সরকারে দেনা টাকা দিতে পারেন না, সেই ঋণ শোধের প্রস্তাবে বলিলেন, 'আমার ১০।১২টী ঘোড়া আছে, তাহাই মূল্য করিয়া লও। আর যাহা কিছু বাকি থাকে, অন্যান্য দ্রব্য বেচিয়া দিব।" প্রতাপরুদ্রের কুমার, পুরুষোত্তম জানা, সেই ঘোড়াগুলির মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন, তাঁহার এ বিষয়ে বুৎপত্তি ছিল। তিনি অল্প মূল্য বলিতেছেন দেখিয়া গোপীনাথ ক্রোধ করিয়া বলিলেন, 'আমার ঘোড়া তোমার মতন ঘাড় ফিরাইয়া এদিক ওদিক চাহে না। তবে এত কম মূল্য কেন বল?' সেই রাজপুত্রের রোগ ছিল, তিনি ঐরূপ ঘাড় ফিরাইতেন, ইহাতে তিনি আরও চটিয়া গেলেন। গোপীনাথের ভরসা এই যে, তাঁহারা কয়েক ভাই রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রিয়পাত্র, সেই বলে রাজার পুত্রকে পর্য্যন্ত দুর্ব্বাক্য বলিতে সাহসিক হইয়াছিলেন। রাজপুত্র কাজেই রাজার কাছে গোপীনাথের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিলেন। এইরূপে প্রতাপরুদ্রের নিকট কোনক্রমে অনুমতি লইয়া গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইল। চাঙ্গ মানে এই যে, নিম্নে খড়্গ পাতিয়া উপরে মাচার উপর রাখা হয়। সেখান হইতে অপরাধীকে এরূপ করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় যে, সে দ্বিখণ্ড হইয়া যায়। গোপীনাথকে যখন চাঙ্গে চড়ান হইল, তখন নগরে হাহাকার পড়িয়া গেল। প্রতাপরুদ্রের নীচেই ভবানন্দ-পরিবারের মান। তাঁহার পুত্রকে চাঙ্গে চড়ান হইল, ইহাতে নগরে অবশ্য গোল হইবার কথা। কয়েকজন আসিয়া প্রভুর স্মরণ লইল; বলিল, "প্রভু, রামানন্দের গোষ্ঠী তোমার দাস; তাহাদিগকে রক্ষা কর।"

এখন, রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর দাস। প্রতাপরুদ্র আপনি প্রভুর নাম রাখিয়াছেন, "প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা"। প্রভু একটি কথা বলিলে গোপীনাথের প্রাণরক্ষা হয়। প্রভুর একটী কথা বলাও কর্ত্তব্য, যেহেতু ভবানন্দ গোষ্ঠী-সমেত তাঁহার অনুগত, আর রামানন্দ তাঁহার প্রাণ বলিলেও হয়। কিন্তু প্রভু কোমল হইলেন না; বলিলেন, "গোপীনাথ রাজার নিকট প্রকৃতই ঋণী। সে যে বেতন পায় তাহাতে অনায়াসে সুখে কাল কাটাইতে পারে, তাহা না করিয়া চুরি করিবে, করিয়া কেবল কুকার্য্যে রাজার অর্থ ব্যয় করিবে; সে ত অবশ্য রাজার নিকট দণ্ডার্হ। আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব না।"

প্রভু এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় সংবাদ আসিল যে, গোষ্ঠি-সমেত ভবানন্দকে রাজা বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছেন। পরে জানা গেল যে কথাটী অলীক। যাহা হউক, ভক্তগণ প্রথমে শুনিয়া ব্যথিত হইলেন; এমন কি, স্বরূপ পর্য্যন্ত জুটিয়া আসিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন; বলিলেন, "প্রভু, রামানন্দ সবংশে বিপদে পড়িয়াছেন, তাঁহারা তোমার দাস, তাঁহাদিগকে রক্ষা কর।"

মনে ভাবুন, রাজা প্রতাপরুদ্র স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী রাজা। তাঁহার উপর কেহ কর্ত্তা নাই। তিনি যদি কোন্ আজ্ঞা করেন, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, অবশ্য পালন করিতে হইবে, কাহারও এমন সাধ্য নাই যে, তাহাতে বিরুক্তি করেন। প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশী মিশ্র অবশ্য অনেক ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু বিষয় কার্য্যে গুরুর পরামর্শ, কি আদেশ, সকল সময় শুনিলে রাজ্য-শাসন চলে না। আবার কাশী মিশ্র অন্যের ন্যায় রাজার অধীন, তিনিই বা সাহস করিয়া রাজ্যসংক্রান্ত কোন অনুরোধ রাজাকে কিরূপে করিবেন? তবে তখন পুরীতে কেবল একজন ছিলেন, তাঁহার আজ্ঞা রাজা অবহেলা করিতে পারিতেন না। তিনি আমাদিগের

প্রভু। রাজার ক্ষোভ যে, প্রভু তাঁহাকে কোন আজ্ঞা করেন না। তাই ভবানন্দ পরিবারের কোন বিপদ হইলে, সকলে প্রভুর শরণ লইলেন। যখন স্বরূপ প্রভৃতি এইরূপ অনুরোধ করিলেন, তখন প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমরা বল কি? আমি সন্ন্যাসী হইয়া কি আমার ব্রত ভঙ্গ করিব? তোমরা কি বল যে, আমি এখন রাজার কাছে যাই, যাইয়া আঁচল পাড়িয়া কৌড়ি ভিক্ষা করি? আচ্ছা তাহাই না হয় করিলাম, কিন্তু তাহা হইলে, আমি একজন পাঁচ গণ্ডার সন্ন্যাসী, আমাকে দুই লক্ষ কাহন ভিক্ষা রাজা দিবেন কেন?"

এই কথা হইতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল যে গোপীনাথকে খড়্গের উপর ফেলিতেছে! এইবার দিয়া চারিবার এইরূপ সংবাদ বধ্যস্থল হইতে আসিল। প্রভু তবু প্রতিজ্ঞা ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন, "তোমরা যদি এত ভয় পাইয়া থাক, শ্রীজগন্নাথের আশ্রয় লও, তিনি যাহা ভাল হয় করিবেন।" রামানন্দের ভ্রাতৃগণের মধ্যে প্রকৃত বিষয়ী এই গোপীনাথ। তিনি যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন, বাদসাহী করিয়া তাহা উড়াইয়া দেন। কিন্তু যখন তাহাকে চাঙ্গে চড়ান হইল, তখন তাঁহার জ্ঞান হইল যে, এ পর্য্যন্ত তিনি বিফলে জীবন কাটাইয়াছেন। তখন জগতের সমুদায় মায়া ত্যাগ করিয়া একমনে শ্রীকৃষ্ণের নাম জপিতে লাগিলেন।

যখন মহাপ্রভুর নিকট গোপীনাথের প্রাণদানের নিমিত্ত ভক্তগণ প্রার্থনা করিতেছেন, তখন সেখানে মহাপাত্র হরিচন্দন ছিলেন। তিনি একেবারে রাজার নিকট গমন করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "মহারাজ! গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইয়াছে। তাহার নিকট টাকা পাওয়ানা থাকে, তাহাকে বধ করিলে কি ফল হইবে? বিশেষতঃ ভবানন্দ পরিবার কেবল তোমার কৃপাপাত্র নহে, মহাপ্রভুর কৃপাপাত্রও বটে—"

এই কথা শুনিতে শুনিতে রাজা বলিলেন, "সে কি! আমি তাহাকে বধ করিতে ত বলি নাই। আমাকে সকলে বলিল, ভয় না দেখাইলে টাকা আদায় হইবে না, তাহাই করিতে বলিয়াছিলাম।" রাজা তৎপরে হরিচন্দনকে বলিলেন, "যাও, তুমি শীঘ্র যাও, তাহাকে চাঙ্গ হইতে নামাও গিয়া।" ফল কথা, গোপীনাথ মহাপ্রভুর প্রিয়, এই কথা মনে হওয়ায় রাজা একটু ভীত হইলেন।

ইহার পরে রাজা তাঁহার চিরপ্রথানুসারে, তাঁহার গুরু কাশীমিশ্রের পদসেবা করিতে আসিলেন। তখন কাশী মিশ্র বলিতেছেন, "দেব, আর এক কথা শুনিয়াছেন? মহাপ্রভু আর এখানে থাকিবেন না।" অমনি প্রতাপরুদ্রের মুখ শুখাইয়া গেল; বলিতেছেন, "সে কি? সব খুলিয়া বল।" তখন কাশী মিশ্র বলিলেন যে, "গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইলে, নগর সমেত লোক যাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, আমার নিকট বিষয় কথা কেন?" রাজা ভয় পাইয়া বলিলেন যে, তিনি ইহার কিছুই জানেন না। তখন কাশী মিশ্র রাজার নিকট বলিলেন, "আপনার উপর ঠাকুরের কোন ক্রোধ নাই। তিনি বরং গোপীনাথকে নিন্দা করিলেন; বলিলেন, যে রাজার দ্রব্য অপহরণ করে, সে দণ্ডার্হ, আর তাহাকে দণ্ড করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছেন। মহাপ্রভুর বিরক্তির কারণ এই যে, তাঁহার বিষয় কথা শুনিতে হয়। তাই তিনি সংকল্প করিয়াছেন যে, এস্থান হইতে আলালনাথে গমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবেন।"

রাজা বলিলেন, "কি ভয়ঙ্কর সংবাদ! মহাপ্রভু গেলে আমরা কিরূপে বাঁচিব? আমি গোপীনাথের সমুদায় ঋণ মাপ করিলাম।"

তখন কাশী মিশ্র আবার বলিতেছেন, "আপনি গোপীনাথের ঋণ মার্জ্জনা করিলে যে মহাপ্রভুর সন্তোষ হইবে তাহা বোধহয় না। তাঁহার

এরূপ ইচ্ছা নয় যে, আপনার ন্যায্য যাহা পাওনা, তাহা আপনি পরিত্যাগ করেন। আপনি মহাপ্রভুর জন্য আপনার ন্যায্য পাওনা ত্যাগ করিলেন, ইহা শুনিলে মহাপ্রভু ক্ষুব্ধ ভিন্ন সুখী হইবেন না।" রাজা বলিলেন, 'তবে তুমি তাঁহাকে এ কথা বলিও না। কথা এই যে, ভবানন্দের গোষ্ঠিকে আমি নিজ জন বলিয়া বোধ করি। তাহারা অর্থ অপহরণ করে জানি, কিন্তু আমি কিছু বলি না। তাহার পর তাহারা গোষ্ঠিসমেত এখন মহাপ্রভুর প্রিয়, কাজেই আমার আরও প্রিয় হইয়াছে। আমি তাহাকে আবার মালজ্যাঠার অধিকারী করিয়া পাঠাইতেছি। সে যে অর্থ অপহরণ করিত, তাহার কারণ বোধহয় তাহার বেতন অল্প ছিল। এখন তাহার বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিব, তাহা হইলে আর চুরি করিবে না।"

গোপীনাথ আবার অধিকারী হইলেন। রাজা তাঁহাকে নেতধটী অর্থাৎ অধিকারীর সাঁজ পরাইলেন। তখন গোপীনাথ সেই রাজবেশে ভ্রাতাগণ ও পিতাসহ আসিয়া প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

প্রভুর লীলার মধ্যে এই একটী মাত্র বিষয় কথা আছে। তবু ইহাতে কয়েকটী মহা উপদেশ পাওয়া যায়। মহাপ্রভু একটী কথা বলিলে, গোপীনাথের প্রাণ বাচে, কিন্তু তিনি তাহা বলিলেন না। তিনি সন্ন্যাসী, তাহার পক্ষে রাজার নিকট অনুরোধ করা কর্ত্তব্য কর্ম্মের ক্রটী হইত। যখন গোপীনাথের নিমিত্ত সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন, তখন প্রভু বলিলেন যে, তাঁহারা যদি গোপীনাথের প্রাণভিক্ষা চাহেন তবে তাঁহাদের শ্রীজগন্নাথের শরণ লওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিতের প্রথম খণ্ডে "আমি ও গৌরাঙ্গ" শীর্ষক কবিতায় এই পদটি আছে :—

"(জীব) বিপদে পড়িলে স্বভাব দিয়াছ

ইহার তাৎপর্য্য "হে প্রভু, আমি যে তোমার নিকট দুঃখ পাইয়া আর্ত্তনাদ করি, ইহাতে আমাকে দোষ দিও না। তুমি জীবের যেরূপ স্বভাব দিয়াছ, তাহাতে তাহারা বিপদে পড়িলে সেই স্বভাবানুসারে তোমাকে ডাকিয়া থাকে।"

এখানে এই কথার একটু বিচার করিব। শ্রীভগবান্ মঙ্গলময় ও সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার নিকট আবার প্রার্থনা কি? যাঁহারা বিশুদ্ধ ভক্ত, তাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা জানেন যে, যে শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহার অন্ন তিনি স্বীয় মস্তকে করিয়া বহিয়া তাহার নিকট লইয়া যান। ইহাই যখন ভক্তের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তখন সেখানে স্বয়ং শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ এ কথা কেন বলিলেন যে, যদি তোমরা গোপীনাথের প্রাণভিক্ষা চাও, তবে শ্রীজগন্নাথের নিকট প্রার্থনা কর?

কথা এই, ভক্ত দুই প্রকার আছেন। কেহ শ্রীভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারেন, যেমন শ্রীনিবাস। তিনি মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি অন্ন সংগ্রহের নিমিত্ত কোথাও গমন করেন না, শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ ভক্তের সংখ্যা অতি বিরল। তাহার কারণ উপরের কবিতায় প্রকাশ। অর্থাৎ জীবের স্বভাব এই যে বিপদে পড়িলে শ্রীভগবানকে ডাকে। সামান্য বিপদে পড়িলে লোকে আপনা আপনি উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু যখন একটু গুরুতর রকমের বিপদ হয়, তখন আর তাহা পারে না। তখন বলিয়া উঠে, "হে ভগবান, রক্ষা কর।" কেহ কেহ এমন আছেন, যাঁহারা আপনাদিগকে নাস্তিক বলিয়া অভিমান করেন। নাস্তিক বলিয়া অভিমান করেন, এ কথা বলি কেন, না প্রকৃতপক্ষে ইঁহারাও ভগবানে

গণও বিপৎকালে বলেন, "হে ভগবান, যদি তুমি থাক, তবে রক্ষা কর।"

স্বভাবের ভুল নাই, এ কথা যদি ঠিক হয়, তবে মানুষের বিপদে এই কয়েকটী অতি নিগূঢ় তত্ত্ব জানা যায়। বিপদ হইলে যখন জীব স্বভাবতঃ শ্রীভগবানকে ডাকে, তাহাতে এই সপ্রমাণ হয় যে, (১) শ্রীভগবান আছেন, (২) তিনি সুহৃৎ, ও (৩) তিনি জীবের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করেন। যদি ভবানন্দের গোষ্ঠি শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আর তাঁহারা বিপদে ভীত হইতেন না। তাঁহারা নির্ভর করিতে পারিলেন না, তাই প্রভু বলিলেন, "শ্রীজগন্নাথের নিকট ক্রন্দন কর।"

শ্রীভগবানের নৌকাখণ্ড লীলায় আছে যে, যখন শ্রীভগবান কাণ্ডারী হইয়া গোপীগণকে পার করিতেছেন, তখন তিনি মধ্য নদীতে নৌকা দোলাইতে লাগিলেন। তখন গোপীগণ ভয় পাইয়া তাঁহার নিকট যাইতে লাগিলেন। জীব যখন ভবসাগর পার হয়, তখন শ্রীভগবান নৌকা দোলাইয়া থাকেন, ইহাতে এই মহৎ উপকার হয় যে, তাহারা উহাতে শ্রীভগবানের অভয় পদাশ্রয় করিতে বাধ্য হয়। বিপদ না হইলে তারা তাহা করিতে চাহে না। প্রকৃত কথা, "সদানন্দ রাজ্যে পূর্ণানন্দ সন্তানে" বিপদ সম্ভবে না। যে সমুদায় বিপদ দেখা যায় সে সমুদায় মায়া। পরিণামে সকলে সদানন্দ রাজ্যে বাস করিবে, এই শ্রীভগবানের প্রতিজ্ঞা। শ্রীভগবান আমাদের কি সুহৃৎ, কি নিঃস্বার্থ বন্ধু!

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জগদানন্দ সত্যভামার প্রকাশ। শিবানন্দ সেন কর্ত্তৃক প্রতিপালিত। প্রাণটি একেবারে শ্রীগৌরাঙ্গের পদে অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত এক তিল বাঁচেন না। বুদ্ধি তত প্রখর নহে। কিন্তু অন্তরটী অতিশয় সরল। প্রভুর নিকট নীলাচলে থাকেন, মধ্যে মধ্যে প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীনবদ্বীপে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রভুর সংবাদ দিতে গমন করেন। সেখানে কিছুকাল থাকিয়া আবার প্রত্যাগমন করেন। এবার দেশে আসিয়া মনে মনে একটী সংকল্প স্থির করিয়াছেন। প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ ক্রমেই প্রবল হইতেছে, দিবানিশি হা কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতে-ছেন। তাহা জগদানন্দ দর্শন করেন, আর তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়! মনে ভাবিলেন প্রভুকে কিছু শীতল তৈল মাখাইলে তাঁহার অন্তর শীতল হইবে। মনে সাধ, যদি কিছু শীতল সুগন্ধি তৈল সংগ্রহ করিতে পারেন, তবে আপন হস্তে প্রভুর মস্তকে উহা মাখাইবেন। মস্তিষ্ক শীতল হইলে অন্তরও শীতল হইবে, প্রভুও আর ঐরূপ হা কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিবেন না। মনে মনে এই যুক্তি করিয়া এক কলস অতি উত্তম চন্দনাদি তৈল প্রস্তুত করাইয়া, একটী লোকের মাথায় দিয়া একেবারে কাঁচনাপাড়া হইতে নীলাচলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুর অগ্রে যাইয়া একটু ভয় হইয়াছে, তাই চুপে চুপে সেই তৈলের কলস গোবিন্দের নিকট দিয়া বলিলেন, "তুমি এই তৈলের কলস রাখিয়া দাও, প্রভুকে মাখাইব।"

গোবিন্দ বুঝিলেন যে, জগদানন্দের পণ্ডশ্রম হইয়াছে মাত্র, প্রভু সে

তৈল কখনই ব্যবহার করিবেন না। কিন্তু জগদানন্দের অনুরোধে অতি নম্র হইয়া প্রভুকে বলিতেছেন, "জগদানন্দ অনেক কষ্ট করিয়া এক কলস চন্দনাদি তৈল আনিয়াছেন। সে তৈল অতি উপকারী, বায়ু ও পিত্ত উভয়ই শান্ত করে। তাঁহার ইচ্ছা আপনি ইহা মস্তকে দেন।" প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "সন্ন্যাসীর তৈলে অধিকার নাই। বিশেষতঃ সুগন্ধি তৈল। জগদানন্দ পরিশ্রম করিয়া তৈল আনিয়াছেন, জগন্নাথের মন্দিরে উহা দাও, প্রদীপে জ্বলিবে। তাহা হইলেই তাহার পরিশ্রম সফল হইবে।" গোবিন্দ আবার অনুরোধ করিলেন, প্রভু তবুও শুনিলেন না।

কিছু দিন গত হইলে জগদানন্দ আবার গোবিন্দের শরণ লইলেন; বলিলেন, "তুমি প্রভুকে আবার বল।" গোবিন্দ তাহাই করিলেন, বলিলেন, "পণ্ডিত (জগদানন্দ) বড় দুঃখিত হইবেন, তিনি বড় পরিশ্রম করিয়া বহুদূর হইতে তৈল আনিয়াছেন।" প্রভু ইহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "হইল ভাল, সুগন্ধি তৈল আসিয়াছে এখন তৈল মাখাইবার জন্য একজন ভৃত্য রাখ, তাহা হইলে তোমাদের মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইবে। তোমাদের এ বিবেচনা নাই যে, আমি সুগন্ধি তৈল মাখিলে লোকে আমাকে ও তোমাদিগকে পরিহাস করিবে?" গোবিন্দ চুপ করিলেন।

পর দিবস প্রাতে জগদানন্দ প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। প্রভু বলিতেছেন, "পণ্ডিত, তৈল আনিয়াছ, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী ইহা মাখিতে পারি না। জগন্নাথকে ঐ তৈল দাও, প্রদীপ জ্বলিবে, তোমার শ্রমও সফল হইবে।" জগদানন্দ বলিলেন, "আমি তৈল আনিয়াছি, এ মিথ্যা কথা তোমাকে কে বলিল?" আর সে যে মিথ্যা কথা, ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে ঘর হইতে তৈলের কলস আনিয়া, প্রভুর সম্মুখে বলপূর্ব্বক আছাড় মারিয়া ভগ্ন করিলেন, করিয়া আর

দ্বিরুক্তি না করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন, যাইয়া দ্বারে খিল দিয়া শুইয়া থাকিলেন।

জীব মাত্রেই অজ্ঞ, সুতরাং শ্রীভগবানের চিরদিনই এইরূপ অবুঝ পরিবার লইয়া সংসার। বালক বলিতেছে, "মা, আমাকে চাঁদ ধরিয়া দাও;" আর চাঁদ না পাইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে। বালক বলিতেছে, "আমি ঘোড়ায় চড়িব," জনক সন্তানের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহা করিতে দিতেছেন না, আর সন্তান মহাদুঃখে আর্ত্তনাদ করিতেছে। এইরূপে জীবগণ যদিও কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয়, কিছু বুঝে না, তবু দিবানিশি ইহা দাও, উহা দাও, বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, আর উহা না পাইয়া শ্রীভগবানের উপর রাগ করিতেছে।

জগদানন্দের এইরূপে দুই দিবস গেল, তিনি খিল খুলিলেন না, হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিলেন। প্রভু নিরুপায় হইয়া তিন দিনের দিন প্রাতে জগদানন্দের কুটীরে উপস্থিত হইলেন, এবং দ্বারে আঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "পণ্ডিত, উঠ শীঘ্র উঠ, আমি দর্শনে গেলাম, এখানে আসিয়া মধ্যাহ্নে ভিক্ষা করিব।"

জগদানন্দের অমনি সমুদায় রাগ গেল। তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভিক্ষার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। যেখানে যাহা পাইলেন আনিয়া বিলক্ষণ আয়োজন করিলেন। জগদানন্দ বড় একটী কলার পাতা পাতিলেন, তাহাতে অন্ন দিলেন, ঘৃত ঢালিয়া দিলেন, কলার দোনায় নানাবিধ ব্যঞ্জন পিঠা পানা পূরিলেন, আর সকলের উপর তুলসীর মঞ্জরী দিয়া প্রভুর অগ্রে দাঁড়াইয়া, করজোড়ে আহার করিতে প্রার্থনা করিলেন।

প্রভু বলিলেন, "তাহা হইবে না, আর একখানা পাতা পাত, তোমায় আমায় দুই জনে ভোজন করিব।" ইহা বলিয়া হাত তুলিয়া বসিয়া থাকিলেন।

তখন জগদানন্দের সমুদায় রাগ গিয়াছে. প্রেমে হৃদয় টলমল করিতেছে। গদ গদ হইয়া বলিতেছেন, "প্রভু, আপনি প্রসাদ লউন, আমি পরে বসিব।" প্রভু তাই করিলেন। মুখে অন্ন দিয়াই বলিতেছেন, 'রাগ করিয়া রান্ধিলে এরূপ উত্তম আস্বাদ হয়! কি কৃষ্ণ আপনি ভোজন করিবেন বলিয়া তিনি স্বয়ং তোমার হস্তে এই পাক করিয়াছেন? তাহা না হইলে অন্ন ব্যঞ্জন এরূপ সুস্বাদু কিরূপে হইল?" জগদানন্দের মুখে তখন হাঁসি আসিল। তিনি বলিলেন. "যিনি খাইবেন তিনিই পাক করিয়াছেন তাহার সন্দেহ কি? আমি কেবল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র।" এদিকে যে কোন ব্যঞ্জন ফুরাইতেছে, জগদানন্দ অমনি সেই ব্যঞ্জন আনিয়া ডোঙ্গা পূর্ণ করিতেছেন। প্রভু ভয়ে ভয়ে খাইতেছেন, কি জানি যদি জগদানন্দ আবার রাগ করেন! মধ্যে মধ্যে ভয়ে ভয়ে বলিতেছেন. "আর না," কি "আর পারি না।" কিন্তু জগদানন্দ তাহাতে কর্ণপাতও করিতেছেন না, ব্যঞ্জন ফুরাইলে ব্যঞ্জন, অন্ন ফুরাইলে অন্ন দিতেছেন। শেষে প্রভু কাতর হইয়া বলিলেন, "যাহা ভোজন করি, তাহার দশগুণ খাওয়াইলে, আর পারি না. আমাকে ক্ষমা দাও।" তখন জগদানন্দ নিরস্ত হইলেন।

ইহাকে বলে শ্রীভগবানকে জব্দ করিয়া বাধ্য করা। এরূপ ভজন বেশ সন্দেহ নাই, তবে গোড়ায় প্রেমের প্রয়োজন। জগদানন্দ রাগ করিয়া প্রভুকে জব্দ করিলেন না, করিতে পারিতেন না, প্রেম দ্বারা করিলেন।

ভিক্ষান্তে প্রভু বলিলেন, "পণ্ডিত, এখন তুমি ভোজন কর, আমি বসিয়া দেখি।" জগদানন্দ বলিলেন, "প্রভু, আপনি যাইয়া আরাম করুন. আমি এখনই বসিব। যিনি যিনি আমার সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বলিয়াছি। তাঁহারা আসিলে সকলে একত্রে ভোজনে বসিব।"

জগদানন্দের বড় ইচ্ছা একবার বৃন্দাবনে গমন করিবেন। প্রভুর ইচ্ছা নয় যে, জগদানন্দ গমন করেন। তাহার নানা কারণ। জগদানন্দ সরল, ভাল মানুষ, পথে মারা যাইবেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি প্রভুর পার্ষদ, জগতে ইহা সকলে জানে। কি বলিতে কি বলিবেন, কি করিতে কি করিবেন, শেষে আপনাকে, প্রভুকে ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে হাস্যাস্পদ করিবেন। তাই, যখন জগদানন্দ বলেন, "প্রভু অনুমতি করুন, আমি একবার বৃন্দাবন যাইব," অমনি প্রভু বলেন, "তুমি আমার উপর রাগ করিয়া দেশান্তরি হইবে, আমি তোমায় কিরূপে যাইতে অনুমতি দিই।" প্রকৃত কথা, জগদানন্দের কেবল চেষ্টা প্রভুকে আরামে রাখেন, কিন্তু প্রভু সে সমুদয় অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন না। এই নিমিত্ত সর্ব্বদাই প্রভু ও জগদানন্দে কলহ। জগাই বলেন, "আমাকে প্রভু বৃন্দাবনে যাইতে অনুমতি করুন।" প্রভু বলেন, "জগদানন্দ, আমার কোন অপরাধ হইয়া থাকে আমাকে ক্ষমা কর।" জগদানন্দ কাজেই বৃন্দাবনে যাইতে পারেন না।

জগদানন্দ তখন সরূপের আশ্রয় লইলেন। সরূপ প্রভুকে ধরিলেন, এবং তাঁহাকে সম্মত করাইলেন। প্রভু জগদানন্দকে ডাকাইলেন, এবং বলিলেন, "নিতান্তই যাইবে তবে যাও, কিন্তু সেখানে বিলম্ব করিও না। কাশী পর্য্যন্ত ভয় নাই, তাহার ওদিকে একা গৌড়িয়া পাইলে দস্যুগণ অত্যাচার করে, সুতরাং সেই দেশীয় ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে যাইবে। বৃন্দাবনে যাইয়া সনাতনের সঙ্গে থাকিবে, তাঁহাকে ছাড়িয়া এক পদও যাইবে না। সেখানে যে সমুদয় সাধু আছেন, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইও না, তাঁহাদিগকে দূর হইতে প্রণাম করিবে। আর সনাতনকে বলিবে আমিও সত্বর বৃন্দাবনে যাইতেছি।"

প্রভু বৃন্দাবনে আর গমন করেন নাই, সুতরাং তিনি কি ভাবে কি

বলিয়াছিলেন, হয় জগদানন্দ তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কি বলিতে পারেন নাই।

সে যাহা হউক, প্রভু যে পথ আবিষ্কার করেন, জগদানন্দ সেই বন পথে কাশী গমন করিয়া তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন। সেখান হইতে বরাবর সনাতনের নিকট গমন করিলেন। সনাতন জগদানন্দকে পাইয়া একেবারে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, যেন স্বয়ং প্রভুকে পাইলেন। সনাতন দিবানিশি তাঁহার নিকট প্রভুর কথা শুনেন, আপনি ভিক্ষা করিয়া জগদানন্দকে ভিক্ষা দেন। একদিন সনাতনকে ভিক্ষা দিবেন মনে করিয়া জগদানন্দ দুই জনের পাক চড়াইলেন। সনাতন যমুনায় স্নান করিয়া ভিক্ষার্থে আগমন করিলেন। তাঁহার মাথায় একখানা রাঙ্গা বহির্বাস বান্ধা। জগাই ভাবিলেন সেখানি অবশ্য প্রভুদত্ত, তাই গদ গদ হইয়া সেই বহুমূল্য সামগ্রীটীকে একদৃষ্টে দর্শন করিতেছেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানি প্রভু তোমায় কবে দিলেন?' সনাতন গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এখানি প্রভু-দত্ত ধন নহে; এখানি আমাকে মুকুন্দ সরস্বতী দিয়াছেন।" তখন জগদানন্দ যে হাঁড়িতে পাক চড়াইয়াছিলেন, উহা চুল্লি হইতে উঠাইয়া সনাতনের মস্তকে মারিতে চলিলেন!

সনাতন মৃদু হাসিয়া বলিতেছেন, "পণ্ডিত, যেমন অপরাধ, তাহার উপযুক্ত দণ্ডই এই, সন্দেহ নাই: কিন্তু এবার তুমি আমাকে ক্ষমা কর, এরূপ আর করিব না।" সনাতনের হাসি দেখিয়া, জগদানন্দের চেতনা হইলে, লজ্জা পাইলেন, পাইয়া আবার চুলায় হাঁড়ি রাখিয়া বলিতেছেন, "গোসাঞী, আমি ক্রোধে অন্ধ হইয়া, আপনাকে ভুলিয়া তোমার ন্যায় ভক্তকে মারিতে যাইতেছিলাম, 'আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু ইহা কে সহ্য করিতে পারে? তুমি প্রভুর প্রধান পার্ষদ, তোমার ন্যায় তাঁহার

প্রিয় কয়জন আছে? তুমি কিনা অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র মস্তকে বান্ধ?” সনাতন হাসিয়া বলিলেন, ‘আমরা দূরদেশে থাকি, থাকিয়া জগদানন্দের গৌরাঙ্গপ্রেমের কথা শুনিয়া থাকি, চক্ষে দেখিতে পাই না। তাই দেখিবার জন্য মাথায় অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র বান্ধিয়াছিলাম। যাহা দেখিতে চাহিয়াছিলাম তাহা এখন চক্ষে দেখিলাম। ধন্য তুমি জগদানন্দ!” প্রকৃতই, জগদানন্দের পক্ষে প্রভুর মান্য দ্বিজোত্তম সনাতনকে (যিনি তাঁহার আমন্ত্রিত) মারিতে উদ্যত হওয়া যেমন তেমন প্রেমের কথা নয়। তখন সনাতনের কথা শুনিয়া, জগাই কান্দিয়া উঠিলেন এবং উভয়ে উভয়ের গলা ধরিয়া গুণময় প্রভুর কথা কহিতে কহিতে তাপিত হৃদয় শীতল করিতে লাগিলেন। প্রেমচর্চ্চায় জীবগণকে অর্দ্ধ ক্ষিপ্ত করে, আর সেই ক্ষিপ্ততায় অপরূপ মাধুর্য্য রহিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়।

প্রভুর লীলার সহায় ছয়জন গোস্বামী। চারি জনের নাম উল্লেখ করা গিয়াছে, যথা সনাতন, রূপ, জীব ও রঘুনাথ দাস। এখন রঘুনাথ ভট্টের কথা কিছু বলিব। প্রভু যৌবনের প্রারম্ভে পূর্ব্ব-বঙ্গে গমন করেন, এবং সেখানে তপনমিশ্রকে আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে সস্ত্রীক বারাণসী যাইয়া বাস করিতে বলেন। তপন, সেই অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক শিশু-অধ্যাপকের আজ্ঞায় তপন দেশত্যাগ করিয়া, সস্ত্রীক বারাণসীতে যাইয়া বাস করেন। প্রভু তপনকে বলিয়াছিলেন যে, পরে ঐ স্থানে অর্থাৎ কাশীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এবং সে মিলন যে হইয়াছিল, এ সমুদায় কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তপন মিশ্র কেন যে ঐ বালক অধ্যাপকের কথায় দেশত্যাগ করিয়া বারাণসীতে গমন করেন, তাহার কারণ শাস্ত্রে এই বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। তিনি স্বপ্নে জানিয়াছিলেন যে, এই বালক অধ্যাপক আর কেহ নয়, অখিলব্রহ্মাণ্ডের পতি। কিন্তু প্রভু কেন তপনকে দেশত্যাগ করাইয়া বিদেশে প্রেরণ করেন, ইহার কারণ বুঝা বড় কঠিন। তবে ইহা আমরা জানি যে তপন হইতে রঘুনাথ ভট্ট, এবং রঘুনাথ ভট্ট হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও গোবিন্দদেবের মন্দির। এ কৃষ্ণদাস কবিরাজ হইতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ। আবার এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, বৃন্দাবন ও কাশী এই দুই স্থানই ভারতের প্রধান স্থান। বৃন্দাবনে প্রভু লোকনাথ ও ভূগর্ভকে পাঠাইয়াছিলেন। কাশীতেই বা একজন দূত না পাঠাইবেন কেন?

তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ যৌবনের প্রারম্ভেই প্রভুকে দর্শন করিতে

কাশী হইতে নীলাচল আগমন করিলেন। প্রভু রঘুনাথকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন, রঘুনাথও পিতা মাতার প্রণাম জানাইলেন। প্রভুর নিকট বাস করিয়া রঘুনাথ ক্রমেই প্রেমধনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা মাতা বর্ত্তমান ও বৃদ্ধ, পিতামাতার সেবা ত্যাগ করিয়া রঘুনাথ যে প্রভুর চরণে থাকিবেন, ইহা প্রভুর ইচ্ছা নহে। সেই জন্য প্রভু তাঁহাকে আট মাসের অধিক নিকটে রাখিলেন না। বলিলেন, "কাশী প্রত্যাবর্ত্তন কর ও সেখানে যাইয়া পিতা মাতার সেবা কর।" তাঁহাদের অন্তর্ধানে আবার আসিও।" প্রভু আরও আজ্ঞা করিলেন, "বিদ্যাধ্যয়ন কর এবং বৈষ্ণবের নিকট ভাল করিয়া ভাগবত অভ্যাস কর।" প্রভু আরও একটী আজ্ঞা করিলেন যে, তিনি যেন বিবাহ না করেন।

প্রভু যন্ত্রী, আর সকলেই যন্ত্র। কাহারে কি নিমিত্ত কোথায় নিয়োজিত করিবেন তাহা কেবল তিনিই জানেন। শ্রীনিত্যানন্দ উদাসীন ছিলেন। প্রভু তাঁহাকে বাধ্য করিয়া সংসারী করিলেন। রঘুনাথ ভট্ট যুবক, গৃহী ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন শুনিয়া, রঘুনাথ বুঝিলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধে প্রভুর কিছু বিশেষ অভিপ্রায় আছে, তবে সে যে কি, তাহা অবশ্য তখন বুঝিতে পারিলেন না।

অল্প দিনের মধ্যেই রঘুনাথ স্বাধীন হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার পিতা মাতার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইল। তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া আবার নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রঘুনাথ সর্ব্বদাই প্রভুর সঙ্গে থাকেন, তাঁহার নিতান্ত প্রিয়পাত্র। কখন বা প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন। রঘুনাথ পাকে বড় সুনিপুণ। প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া ফল এই হইতেছে যে, ক্রমে তিনি প্রেমে উন্মত্ত হইতেছেন। এইরূপে আবার আট মাস গত হইল, তখ

জীববন্ধু প্রভু আর তাঁহাকে নিকটে রাখিতে পারিলেন না, কারণ বৃন্দাবনে তাঁহার প্রয়োজন। তাই বলিলেন, "তুমি বৃন্দাবনে গমন কর, সেখানে সনাতন রূপের আশ্রয়ে বাস করিও।" রঘুনাথ অগত্যা তাহাই করিলেন। প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার একটুও ইচ্ছা নাই। কাহারই বা হয়? কিন্তু এই অবতারে জীবগণকে ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া যে এক প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা প্রভুর সমুদায় কার্য্যে বুঝা যায়। প্রভু মহোৎসবে চৌদ্দহাত লম্বা তুলসীর মালা আর ছুটা পানের বীড়া পাইয়াছিলেন, তাহাই রঘুনাথকে দিলেন। রঘুনাথ এই দুই দ্রব্য চিরদিন নিকটে রাখিয়া দিলেন ও পূজা করিতেন।

ভট্ট উপাধিধারী রঘুনাথ বৃন্দাবনে গমন করিয়া সেখানকার প্রধান ভাগবতী হইলেন। একে ভাগবতে অগাধ বিদ্যা, তাহাতে কণ্ঠ অমৃতের ধার, সঙ্গীতে বিশেষ নৈপুণ্য, অন্তর ভাবে দ্রবীভূত। যেখানে শ্রীভগবানের মাধুর্য্য বর্ণনা, সেখানে এলাইয়া পড়েন, প্রেমধারা পড়িতে থাকে, স্বর ভঙ্গ হইয়া অতিশয় মিষ্ট হয়। রঘুনাথের ভাগবত পাঠ শ্রবণ বৃন্দাবনের একটী প্রধান সম্পত্তি হইল। রূপ সনাতনের সভায় ভাগবত পাঠ হইতেছে, জগতের মধ্যে যত শ্রেষ্ঠ ভক্ত সকলেই উপস্থিত। কথা প্রভুর, বর্ণনা ভাগবতের, পাঠ রঘুনাথের, ভাব সুর সঙ্গীত শ্রীল মহাপ্রভু দ্বারা সৃষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত। সে দৃশ্য স্মরণ করিলেও জীব পবিত্র হয়।

এইরূপ বৃন্দাবনে তিন গোসাঞি বিরাজ করিতে লাগিলেন, যথা, সনাতন, রূপ ও রঘুনাথ ভট্ট। তাহার পরে গোপাল ভট্ট, তাহার পরে রঘুনাথ দাস এবং সর্ব্বশেষে শ্রীজীব আসিলেন। এই রঘুনাথ দাসের কাহিনী পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। রূপ ও সনাতন গম্ভীর, অটল, শাস্ত্র লইয়া বিব্রত। তাঁহারা প্রভুর আজ্ঞায় বৈষ্ণব শাস্ত্র লিখিতেছেন, বাহিরের লোকের সহিত আলাপের, এমন কি তাঁহাদের ভজনানন্দের অবসর

পর্য্যন্ত নাই। বাস কুটীরে, বৃক্ষতলায় কি গোফায়। গোফা কি না, একটী গর্ত্ত ভল্লুকের গোফা আছে, তাহাতে ভল্লুক বাস করে। সেই রূপ ভক্তগণ, যেখানে মৃত্তিকার স্তূপ আছে, তাহাতে গহ্বর করিয়া একটু আশ্রয় স্থান করিয়া লইতেন। প্রভুর গণ কান্থা করঙ্গধারী, তাঁহাদের আর সম্পত্তি নাই। বৃন্দাবন জঙ্গলময়, অতি অল্প সংখ্যক অসভ্য লোকের বাস। আর কিসের বাস, না হিংস্র জন্তুর। এখানে আহার্য্য সংগ্রহ করাই দায়। রূপ সনাতন প্রভৃতির আপনাদিগের আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইতেছে, আর যাঁহারা যখন আসিতেছেন, তাঁহাদিগের আহার্য দ্রব্যও ইঁহাদিগকেই সংগ্রহ করিতে হইতেছে। তাঁহাদিগের প্রধান কার্য্য শাস্ত্র প্রচার করা। শাস্ত্র কি না, ভক্তিশাস্ত্র, অর্থাৎ যাহার দ্বা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভক্তির ন্যায় সহজ ও শক্তিশালী ভজন আর নাই।

এ শাস্ত্র তখন ছিল না। শাস্ত্রের মধ্যে এখানে ওখানে ভক্তির মহাত্ম্য মাত্র দেখান হইত বটে, কিন্তু তাহাও পণ্ডিতগণ কূটার্থ দ্বারা অন্যরূপ বুঝাইতেন। বেদ, বেদান্ত, গীতা, এমন কি শ্রীভাগবত পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ জ্ঞানের শাস্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। জগত মায়া, তুমি মায়া, শ্রীকৃষ্ণ মায়া, তিনিও যেই, আমিও সেই, মরিলে আবার জন্মিতে হয়, মোক্ষ অর্থাৎ নাশ জীবের একমাত্র মঙ্গল, ইত্যাদি নাস্তিকের মত তখন ভারতে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রবল ছিল।

আবার যাঁহারা অস অস্ত্র মানেন, তাঁহারা শ্রীভগবানকে পিশাচ সাজাইয়াছেন। তাঁহারা মদ্য মাংস রুধির দিয়া ভগবানকে পূজা করেন। পূজা করেন কেন, না শত্রু দমনের নিমিত্ত, পুত্র লাভের নিমিত্ত, কি ধন ও যশ প্রার্থনা করিয়া। তাঁহারা যে ভগবানের আকৃতি প্রকৃতি রাক্ষস ও পিশাচের ন্যায় করেন, তাঁহারা নিজে কি রাক্ষস ও পিশাচ? শ্রীভগবান্

কি তাহাদিগের হইতে মন্দ? তাঁহারা কি রুধির পান করিতে পারেন? কিন্তু তাঁহারা শ্রীভগবানকে তাহাই দিতেছেন? তাঁহারা না ভগবানকে গাঁজা খাওয়াইতেছেন? যদি শ্রীভগবান জ্ঞানময় হয়েন, তবে তিনি সৌন্দর্য্যময় নয় কেন? সকল বিষয়ে তিনি পুরুষোত্তম, জ্ঞানে ও প্রেমে। দেখিতে তাঁহাকে পিশাচের মত কেন হইবে? সমুদায় শুভের আকর তিনি। সৌন্দর্য্যও একটি শুভ, তবে তিনি কেন সৌন্দর্য্যের আকর না হইবেন? অতএব শ্রীভগবান যেমন গুণে ভুবনমোহন, রূপেও সেইরূপ ভুবনমোহন।

এইরূপে ভারতের বিজ্ঞ জ্ঞানবান্ লোকে কিছু মানেন না। আবার যাঁহারা কিছু মানেন, তাঁহারা শ্রীভগবানকে দৈত্য, অসুর, পিশাচ সাজাইয়া পূজা করেন। এইরূপ যখন সমাজের অবস্থা, তখন প্রভুর নিয়োজিত গোস্বামিগণ সমগ্র শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ইহাই স্থাপিত করিতে লাগিলেন যে, শ্রীভগবান পৃথক বস্তু। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তাঁহাকে প্রেম ও ভক্তিতে পাওয়া যায়, তাঁহাকে ভক্তি করিলে জীবের আর জন্ম হয় না, নাশও হয় না, ভক্ত শ্রীভগবানের নিকট বাস করেন,—এই সমুদয় তত্ত্ব, তাঁহাদিগকে বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পূরাণ প্রভৃতি যত প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতে হইতেছে, তাহা না করিলে তাঁহাদের কথা কেহ মানিবেন না।

কিন্তু এই গোস্বামিগণের কত বাধা দেখ। প্রথমতঃ গৃহে একটী তণ্ডুলও নাই; রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড়ে আশ্রয় নাই; শীতের বস্ত্র নাই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুর্লভ দ্রব্য—গ্রন্থ। এইরূপ লক্ষ গ্রন্থের প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ যে অমূল্য গ্রন্থ "চৈতন্যচরিতামৃত" লিখেন, তাহাতে সাতশত গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থ বৃন্দাবনে বসিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। তখন মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না।

একখানি বড় গ্রন্থ লিখিতে একজনের এক বৎসর লাগে। লিখিতে হইবে এরূপ এক সহস্র গ্রন্থ। সেই হস্তলিখিত গ্রন্থ তন্ন তন্ন করিয়া পড়িতে হইবে, পড়িয়া তাহা হইতে শ্লোক লইয়া মত স্থাপন বা খণ্ডন করিতে হইবে। এখন বুঝিয়া দেখুন গোস্বামীদিগের কার্য্য কতদূর কঠিন ও গুরুতর।

বৃন্দাবন জঙ্গলময়। নিকটে মথুরা নগর আছে বটে, কিন্তু সে নগর ছারেখারে গিয়াছে। মুসলমানগণ মুহুর্মুহু নগর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতেছে, কাজেই ভদ্রলোকে প্রায় ধনোপার্জ্জন ও বিদ্যোপার্জ্জন একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। মথুরার চোবে দোবেগণ লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া কেবল কুস্তী করিয়া গুণ্ডা হইয়াছেন, নহিলে জাতি মান থাকে না। নিকটে আর এক নগর আগ্রা। সেখানে মুসলমান আধিপত্যে রাজকার্য্য হইয়া থাকে। সে দিক হইতেও কোন সাহায্যের প্রত্যাশা নাই। গোস্বামিগণ গ্রন্থ লিখিতেছেন, এমন সময় একজন সাধু কি পণ্ডিত আসিলেন, তাঁহার সহিত বিচার হইতে লাগিল। গোস্বামিগণ বিনয়ের খনি, কেহ যদি প্রণাম করে অমনি তাহাকে প্রতিপ্রণাম করেন। কাহাকেও নিরাশ, অপ্রতিভ, অপদস্থ কি অনাদর করিতে জানিতেন না। এইরূপে এক জন পণ্ডিত আসিয়া অসার শাস্ত্রের বিচার আরম্ভ করিলেন, করিয়া তাঁহাদের দশ দিন সময় নষ্ট করিলেন। গোস্বামী গ্রন্থ লিখিতেছেন, এমন সময় ঝড় আসিল, গ্রন্থ লেখা বন্ধ হইল। তবুও এই গোস্বামিগণ সহস্র সহস্র গ্রন্থ লিখিলেন। ইহার এক এক খানি গ্রন্থ এক একখানি বহুমূল্য ধন। ইহা কি শ্রীভগবানের প্রদত্ত শক্তি ব্যতিরেকে হইতে পারে?

গোস্বামিগণ জঙ্গলময় বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সুযশঃ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইল। কাঙ্গাল ভক্তগণ বৃন্দাবনে চলি-

লেন, অমনি গোস্বামিগণের আশ্রমে রহিয়া গেলেন। চারিদিক হইতে সাধু পণ্ডিত ও সন্ন্যাসিগণ গোস্বামিগণকে দর্শন কি তাঁহাদের সহিত বিচার করিতে গমন করিলেন। ধনি লোক, মহাজন ও রাজগণ এইরূপে গোস্বামিগণের নিকটে যাইয়া আপনাদের দেহ স্বজন-সম্পদের সহিত অর্পণ করিলেন। এমন কি, দিল্লীর বাদসাহ পর্য্যন্ত, যদিও মুসলমান, এইরূপে গোস্বামিগণকে দর্শন করিতে গমন করিতেন।

এইরূপে আকবর কুতূহল তৃপ্তির নিমিত্ত রূপ সনাতনকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন। যখন সনাতনের সম্মুখে ,আকবর জোড়করে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন গোস্বামীর বড় বিপদ হইল। বাদসাহকে নিবারণ করেন এমন সাধ্য নাই। যমুনার তীরে বৃক্ষতলায় একক উপবিষ্ট আছেন, বাদসাহ আসিলে মস্তক নত করিলেন যেহেতু উদাসীনের রাজদর্শন নিষেধ। কিন্তু আকবর বিনয় করিতে লাগিলেন। আকবর মহাশয় লোক, তাঁহার সম্বন্ধে "রাজদর্শন যে নিষেধ' এ কেবল শাসন-বাক্য বই নয়' ইহা বুঝিয়া, সনাতন অগত্যা কথা কহিলেন। যাত্রাকালীন আকবর বলিলেন, "গোসাঞি, আমি আপনাকে কিছু সাহায্য করিতে চাই।" সনাতন কাতর হইয়া বলিলেন যে, তিনি উদাসীন, তাঁহার লইবার কিছুই নাই। কিন্তু আকবর ছাড়েন না। তখন ;—

একান্ত যদ্যপি রাজা পুনঃ পুনঃ কহে।
তবে সনাতন কিছু ভঙ্গি করি চাহে॥
"ওই যে যমুনাতীরে আমার আশ্রয়।
ভাঙ্গিয়া পড়িল জলে অল্প স্থল হয়॥
এই স্থান টুকু মোরে বান্ধাইয়া দেহ।
তব স্থানে মুঞি আর কিছু নাহি চাহ॥"

(ভক্তমাল)

আকবর তখনই স্বীকার করিলেন। তিনি আপনার ভৃত্যগণকে কি কি করিতে হইবে তাহা আজ্ঞা করিতেছেন, এমন সময় বাদসাহের বাহ্যদৃষ্টি গেল, এবং নয়নে আধ্যাত্মিক জগতের উদয় হইল। তখন —

দেখে নানা মণি মুক্তা পরম রতন।
মনোহর অলৌকিক পরম মোহন॥
শোভা দেখি রাজা তবে বিহ্বল হইল।

(ভক্তমাল)

আকবর দেখিলেন যে, যমুনাকূল অমূল্য রত্নে খচিত। তখন চেতন পাইয়া জোড়হাতে সনাতনকে বলিতেছেন ঃ—

"এবে বুঝিলাম তুমি এই ত্রিজগতে।
মহা আঢ্য ধনিগণ নাই তোমা হইতে॥"

(ভক্তমাল)

আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসিয়া এক খানি গ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থখানি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে, সুতরাং উহা প্রামাণিক। ঐ গ্রন্থে তিনি আপনার জীবন কাহিনী লিখেন। তাহাতে বুঝা যায় যে, জাহাঙ্গীর একজন হিন্দু-বিদ্বেষী গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি আপন গ্রন্থে কি বলিতেছেন, শ্রবণ করুন।

তিনি শ্রবণ করিলেন যে, বৃন্দাবনে একজন গোস্বামী আছেন, তিনি যখন পূজা করেন তখন মোহর-বৃষ্টি হয়। অবশ্য ঐ কাহিনী শুনিয়া সমাট হাস্য করিলেন। কিন্তু পরে এই কথা বহুজনের মুখে শুনিলেন, শেষে কৌতূহল তৃপ্তির নিমিত্ত প্রকৃতই গোস্বামীকে দর্শন করিতে গেলেন। মোহর-বৃষ্টি হয় আরতির সময়। সেই সময় পাতসাহ মন্দিরের বাহিরে নিজজন লইয়া দাঁড়াইলেন। দেখেন, গোসাঞী তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া

আরতি করিতেছেন, আর শত শত ভক্ত মন্দিরের বাহিরে ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিতেছেন। আরতি অন্তে প্রকৃতই মোহর-বৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন গোসাঞী উহা ভক্তদের নিকট বিতরণ করিতে দিলেন, আর উহার কতক পাতসাহকে দিতে ইঙ্গিত করিলেন। পাতসাহ ইহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, একেবারে অবাক্ হইয়া, সে স্থান ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার মনে উদয় হইল যে, তিনি প্রণাম না করিয়া সে স্থান ত্যাগ করায় ভাল করেন নাই। ইহাতে ভীত হইয়া যেমন প্রত্যাগমন করিবেন অমনি গোসাঞীর লোক আসিয়া তাঁহাকে বলিল যে, "তিনি যে প্রণাম না করিয়া যাইতেছিলেন, আর তাহাতে তিনি আপনাকে অপরাধী ভাবিতেছিলেন, ইহা গোস্বামি-ঠাকুরের গোচর হইয়াছে। গোস্বামী বলিয়াছেন যে, আর তাঁহার আসিতে হইবে না, তিনি যে মনে মনে অনুতপ্ত হইয়াছেন ইহাতেই সে অপরাধ ক্ষালন হইয়াছে।"

পাতসাহ তখন বলিতেছেন যে, "গোসাঞীকে যাহা দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম তিনি ভগবানের ভক্ত, সেই নিমিত্ত তাঁহার ধনের অভাব নাই, আর তিনি অন্তর্যামী।" তখন পাতসাহ বুঝিলেন যে, শ্রীভগবান কেবল তাঁহাদের নন, তিনি তাঁহারি যিনি তাঁহার ভক্ত।

অতএব গোস্বামীদের পরিণামে এরূপ খ্যাতি হয় যে, হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী মুসলমান সম্রাট পর্য্যন্ত তাঁহাদের চরণে শরণ লইয়া ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দু একটি করিয়া ভক্ত ও সাধু, কেহ কেহ বা বহু চেলা কি বহুজন সঙ্গে আসিতে লাগিলেন। এই সকল লোকের থাকিবার নিমিত্ত কুটীরের প্রয়োজন, কাজেই সেই সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল পরিষ্কৃত হইতেছিল। তাহার পর দুই একটী করিয়া মন্দির হইতে লাগিল। ক্রমে ধনী লোকে বড় বড় মন্দির স্থাপন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বৃন্দাবন একটি প্রকাণ্ড

সহর হইয়া উঠিল। এ সমস্ত করিলেন কে? না, দুই চারিটী কন্থা-করঙ্কধারী গৌরাঙ্গ-ভক্ত! তাঁহারা কি জঙ্গল কাটিতেন? না। তাঁহারা কি নিজ হস্তে কোন কার্য্য করিতেন? না। তাঁহারা কি ধন দ্বারা মনুষ্য বশ করিতেন? না। তাঁহাদের কপর্দ্দকও ছিল না। তাঁহাদের কি নিজজন কেহ ছিল? না। তাঁহারা উদাসীন। তবে কোন্ শক্তিতে তাঁহারা জঙ্গল কাটিয়া প্রকাণ্ড নগর করিলেন, আর সে স্থান সুন্দর প্রকাণ্ড মন্দির ও অট্টালিকা দ্বারা শোভিত করিলেন? তাঁহাদের শক্তি কেবল প্রভুর কৃপা। সেই প্রভু কোথা? তিনি তিন মাসের পথ দূরে কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেছেন!

রঘুনাথ ভট্ট বৃন্দাবনে কিছু আরাম লইয়া গেলেন। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ, ভাবুক, প্রেমে পাগল, সুকণ্ঠ। যিনি তাঁহার ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতেন, তিনিই আনন্দে উন্মত্ত হইতেন। অনেক লোকে তাঁহার চরণাশ্রয় করিলেন। তাহার মধ্যে একজন শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রঘুনাথ ভট্টের দুইটি প্রধান কীর্ত্তি আছে, তাহার মধ্যে একটী কৃষ্ণদাস কবিরাজ। * অনেকের মনে বিশ্বাস, আমাদেরও ছিল, যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজের গুরু রঘুনাথ দাস; কিন্তু একখানি প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিলাম, প্রভু হইতে রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট হইতে কৃষ্ণদাস, ও কৃষ্ণদাস হইতে মুকুন্দদাস।

আর একটী কীর্ত্তি গোবিন্দ দেবের মন্দির। কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, সে অমূল্য ধন। গোবিন্দদেবের মন্দির পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রঘুনাথ ভট্টের বর্ণনা এইরূপ

---

* কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার গ্রন্থের ভণিতায় লিখিয়াছেন ;—

"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥"

করিয়াছেন :—

"রূপ গোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে এলায় তার মন॥
অশ্রু কম্প গদগদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র রোধ করে বাষ্প না পারে পড়িতে॥
পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য যবে পড়ে শুনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় কিছু নাহি জানে॥
গোবিন্দচরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দচরণারবিন্দ যার প্রাণধন॥
নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দমন্দির করাইল।
বংশী মকর কুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল॥
গ্রাম্যবার্ত্তা না কহে না শুনে সেই রায়।
কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্ট প্রহর যায়॥"

রঘুনাথের এ শিষ্যটী কে? ইনি রাজা মানসিংহ, যে মানসিংহ বাঙ্গালা ও বিহার জয় করেন, যিনি আকবরের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহার ন্যায় পদস্থ কি হিন্দু কি মুসলমান আর কেহ ছিলেন না।

গোস্বামিগণের মহিমা আমি কি বর্ণনা করিব। যাঁহারা চক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহাদের জীবন বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহারাই করুন। নিম্ন লিখি এই কয়েকটী প্রাচীন পদ পাঠ করিলে পাঠক মহাশয় কতক বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহারা কি প্রকাণ্ড বস্তু ছিলেন। এ সমুদায় পদকর্ত্তা, গোস্বামিগণ সম্বন্ধে স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন।

রূপের বৈরাগ্য কালে, সনাতন বন্দীশালে,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।
"রূপেরে করুণা করি, ত্রাণ কৈল গৌরহরি,
মো অধমে না কৈল মরণে॥
মোর কর্ম্ম-দোষ ফাঁদে, হাতে পায়ে গলে বান্ধে,
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি।
আপনে করুণা পাশে, দৃঢ করি ধরি কেশে,
চরণ নিকটে লেহ তুলি॥
পশ্চাতে অগাধ জল, দুই পাশে দাবানল,
সম্মুখে সাঁধিল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিনী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে,
এইবার কর পরিত্রাণ॥
জগাই মাধাই হেলে, বাসুদেব অজামীলে,
অনায়াসে করিলা উদ্ধার।
এ দুঃখ সমুদ্র ঘোরে, নিস্তার করহ মোরে,
তোমা বিনে নাহি হেন আর॥"
হেন কালে এক জনে, অলখিতে সনাতনে,
পত্রী দিল রূপের লিখন।
এ রাধাবল্লভ দাসে, মনে হৈল আশ্বাসে,
পত্রী পড়ি করিলা গোপন॥

শ্রীরূপের বড় ভাই, সনাতন গোসাঞিং,
পাতশার উজীর হৈয়াছিলা।
শ্রীরূপের পত্রী পাইয়া, বন্দী হৈতে পলাইয়া,
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিলা॥

ছিঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি, হাতে নখ মাথে চুলি,
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করি, এক গুচ্ছ দন্তে ধরি,
পড়িলা গৌরাঙ্গ পদতলে ॥
দরবেশ রূপ দেখি, প্রভুর সজল আঁখি,
বাহু পসারিয়া আইসে ধাঞা।
সনাতনে করি কোলে, কাতরে গোসাঞি বলে,
"মো অধমে স্পর্শ কি লাগিয়া ॥
অস্পর্শ্য পামর দীন, দুরাচার মন্দ হীন,
নীচ সঙ্গে নীচ ব্যবহার।
এ হেন পামর জনে, স্পর্শ প্রভু কি কারণে,
যোগ্য নহে তোমা স্পর্শিবার ॥"
ভোট কম্বল দেখি গায়, প্রভু পুন পুন চায়,
লজ্জিত হইলা সনাতন।
গৌড়িয়ারে ভোট দিয়া, ছিঁড়া এক কান্থা লৈয়া,
প্রভু স্থানে পুন আগমন ॥
গৌরাঙ্গ করুণা করি, রাধাকৃষ্ণ মাধুরী,
শিক্ষা করাইলা সনাতনে।
প্রভু কহে রূপ সনে, দেখা হবে বৃন্দাবনে,
প্রভু আজ্ঞায় করিলা গমনে ॥
কভু কান্দে কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে,
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস।
ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণগুণ গাথা,
পরিধান ছেঁড়া বহির্ব্বাস ॥

গিয়া গোসাঞিঃ সনাতন, প্রবেশিলা বৃন্দাবন,
রূপ সঙ্গে হইল মিলন।
ঘর্ম্ম অশ্রু নেত্রে পড়ে, সনাতনের পদ ধরে,
কহে রূপ গদ্ গদ্ বচন ॥
গৌরাঙ্গের যত গুণ, কহে রূপ সনাতন,
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে।
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, মাধুকরী ভিক্ষা করে,
এইরূপে কত দিন থাকে ॥
তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে, ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুঞ্জে,
ফল মূল করয়ে ভক্ষণ।
উচ্চস্বরে আর্ত্তনাদে, রাধাকৃষ্ণ বলি কান্দে,
এইরূপে থাকে কত দিন ॥
কতদিন অন্তর্ম্মনা, ছাপান্ন দণ্ড ভাবনা,
চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে, নাম গানে সদা থাকে,
অবসর নাহি এক তিলে ॥
কখন বনের শাক, অলবণে করি পাক,
মুখে দেন দুই এক গ্রাস।
ছাড়ি ভোগ বিলাস, তরু তলে কৈলা বাস,
এক দুই দিন উপবাস ॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে গায়, ধূলায় লোটায় কায়,
কণ্টকে বাজয়ে কভু পাশ।
এ রাধাবল্লভ দাস, বড় মনে অভিলাষ,
কবে হব তাঁর দাসের দাস ॥

জয় সাধু শিরোমণি সনাতন রূপ।
যো দুঁহু প্রেম-ভকতি রসকূপ॥
রাধাকৃষ্ণ ভজনকে লাগি।
শ্রীবৃন্দাবন ধামে বৈরাগী॥
শ্রীগোপালভট্ট রঘুনাথ।
মীলল সকল ভকতগণ সাথ॥
সবে মিলি প্রেম ভকতি পরচারি।
যুগল ভজন ধন জগতে বিথারি॥
অনুখন গৌরচন্দ্র গুণ গান।
ভরল প্রেমে ওর নাহি পান॥
কতিহুঁ না হেরি ঐছে উদাস।
মনোহর সদত চরণে করু আশ॥

জয় ভট্ট রঘুনাথ গোসাঞি।
রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণে, দিবানিশি নাহি জানে,
তুলনা দিবারে নাহি ঠাঞি॥ ধ্রু॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র, তপন মিশ্রের পুত্র,
বারাণসী ছিল যার বাস।
নিজ গৃহে গৌরচন্দ্রে, পাইয়া পরমানন্দে,
চরণ সেবিলা দুই মাস॥
শ্রীচৈতন্য নাম জপি, কত দিন গৃহে থাকি,
করিলেন পিতার সেবনে।
তাঁর অপ্রকট হৈলে, আসি পুন নীলাচলে,
রহিলেন প্রভুর চরণে॥

মহাপ্রভু কৃপা করি, নিজ শক্তি সঞ্চারি,
পাঠাইয়া দিলা বৃন্দাবন।
প্রভুর শিক্ষা হৃদি গণি, আসি বৃন্দাবন ভূমি,
মিলিলেন রূপ সনাতন॥
দুই গোসাঞি তাঁরে পাঞা, পরম আনন্দ হৈয়া,
রাধাকৃষ্ণ প্রেম-রসে ভাসে।
অশ্রু পুলক কম্প, নানা ভাবাবেশ অঙ্গ,
সদা কৃষ্ণ-কথার উল্লাসে॥
সকল বৈষ্ণব সঙ্গে, যমুনা পুলিনে রঙ্গে,
একত্র হইয়া প্রেম-সুখে।
শ্রীভাগবত কথা, অমৃত সমান গাথা,
নিরবধি শুনে যার মুখে॥
পরম বৈরাগ্য সীমা, সুনির্ম্মল কৃষ্ণ-প্রেমা,
সুস্বর অমৃতময় বাণী।
পশু পক্ষী পুলকিত, যার মুখে কথামৃত
শুনিতে পাষাণ হয় পানী॥
শ্রীরূপ সনাতন, সর্ব্বারাধ্য দুই জন,
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ।
এ রাধাবল্লভ বোলে, পড়িলুঁ বিষম ভোলে,
কৃপা করি কর আত্মসাথ॥

শ্রীচৈতন্য কৃপা হৈতে, রঘুনাথ দাস চিত্তে,
পরম বৈরাগ্য উপজিলা।
দারা গৃহ সম্পদ, নিজ রাজ্য অধিপদ,

মল প্রায় সকল ত্যজিলা ॥
পুরশ্চর্য্য কৃষ্ণ-নামে, গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে,
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।
এই মনে অভিলাষ, পুন রঘুনাথ দাস,
নয়ানগোচর কবে হবে ॥

গৌরাঙ্গ দয়াল হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া,
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জাহারে।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে,
সমর্পণ করিল তাঁহারে ॥
চৈতন্তের অগোচরে, নিজ কেশ ছিড়ি করে,
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা।
দেহ ত্যাগ করি মনে, গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে,
দুই গোসাঞি তাঁহারে দেখিলা ॥
ধরি রূপ সনাতন, রাখিল তাঁর জীবন,
দেহত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোসাঞির আজ্ঞা পায়া, রাধাকুণ্ড তটে গিয়া,
বাস করি নিয়ম করিলা ॥
ছেঁড়া কম্বল পরিধান, ব্রজফল গব্য খান,
অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি, স্মরণ কীর্ত্তন করি,
রাধা-পদ ভজন যাহার ॥
ছাপান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে, রাধাকৃষ্ণ গুণ-গানে,
স্মরণেত সদাই গোঙায়।

চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায় ॥
গৌরাঙ্গের পদাম্বুজে, রাখে মনোভৃঙ্গ রাজে,
স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায়।
অভেদ শ্রীরূপ সনে, গতি যার সনাতনে,
ভট্টযুগ প্রিয় মহাশয় ॥
শ্রীরূপের গণ যত, তাঁর পদ আশ্রিত,
অত্যন্ত বাৎসল্য যার জীবে।
সেই আর্ত্তনাদ করি, কাঁদে বলে হরি হরি,
প্রভুর করুণা হবে কবে ॥
"হে রাধার বল্লভ, গান্ধর্ব্বিকা বান্ধব,
রাধিকা-রমণ রাধানাথ।
হে বৃন্দাবনেশ্বর, হাহা কৃষ্ণ দামোদর,
কৃপা করি কর আত্মসাথ ॥"
শ্রীরূপ সনাতন, যবে হৈল অদর্শন,
অন্ধ হৈল এ দুই নয়ন।
বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি, বৃথা প্রাণ দেহে রাখি,
এত বলি করয়ে ক্রন্দন ॥
শ্রীচৈতন্য শচীসুত, তার গণ হয় যত,
অবতার [illegible] নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল, দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব দল,
সভারে [illegible] পরণাম ॥
রাধাকৃষ্ণ বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে,
শুখ রুখ অন্ন মাত্র সার।

গৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দিল আগে,
ফল গব্য করিল আহার ॥
সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি সেই দিনে,
কেবল করয়ে জলপান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি দিল তবে,
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ ॥
শ্রীরূপের অদর্শনে, না দেখি তাহার গণে,
বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কাঁদে।
কৃষ্ণ-কথা আলাপন, না শুনিয়া শ্রবণ,
উচ্চস্বরে ডাকে আর্তনাদে ॥
হাহা রাধাকৃষ্ণ কোথা, কোথা বিশাখা ললিতা,
কৃপা করি দেহ দরশন।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর
হাহা প্রভু রূপ সনাতন ॥
কান্দে গোসাঞি রাত্রিদিনে, পুড়ি যায় তনু মনে,
ক্ষেণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
চক্ষু অন্ধ অনাহার, আপনাকে দেহ ভার,
বিরহে হইল জর জর ॥
রাধাকুণ্ড তটে পড়ি, সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি,
মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
জিহ্বা নড়ে, প্রেম অশ্রু নেত্রে পড়ে,
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ ॥
সেই রঘুনাথ দাস, পূরাহ মনের আশ,
এই মোর বড় আছে সাধ।

এ রাধাবল্লভ দাস, মনে বড় অভিলাষ,
প্রভু মোরে কর পরসাদ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

পাণিহাটী গ্রামে রাঘবের বাস। রাঘব একজন ধনবান্ লোক, প্রভুর একান্ত ভক্ত। শ্রীনিতাই যখন গৌড়ে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন প্রথমে তাঁহার বাটীতেই আড্ডা করেন। যখন নিত্যানন্দ সে স্থান মাতাইয়া তুলিলেন, তখন রঘুনাথ দাস বাটীতে আছেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে কোথাও যাইতে দেন না, কিন্তু তিনি অনেক মিনতি করিয়া পিতার নিকট বিদায় লইয়া শ্রীনিত্যানন্দ দর্শন মানসে পাণিহাটী আসিলেন। নিতাই তাঁহাকে বড় আদর করিলেন, পরে বলিলেন—"রঘুনাথ তুমি ধনী, আমাকে ও আমার সহিত ভক্তগণকে একবার উদরপূর্ত্তি করিয়া ভোজন দাও।" এই আজ্ঞা পাইয়া রঘুনাথ আহ্লাদে পুলকিত হইলেন, ও তাহার মহা উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন দেশময় এ কথা প্রচার হইল ও পাণিহাটীতে যেন কুরুক্ষেত্রের যজ্ঞ আরম্ভ হইল। সবারই নিমন্ত্রণ, যিনি আসিবেন, তিনিই প্রসাদ পাইবেন। যিনি যাহা আনিবেন, তাহাই ক্রয় করা হইবে। এই কথা প্রচার হওয়ায় চিপিটক, দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, আম্র, কাটাল, চাঁপাকলা প্রভৃতি সামগ্রী ভারে ভারে আসিতে লাগিল। আষাঢ় মাস আরম্ভ, সুতরাং ফলের কোন অভাব নাই। যে স্থানে মহোৎসব হইবে, সে স্থানটী অতি মনোহর। বট-বৃক্ষচ্ছায়ায় গঙ্গার ধারে ভক্তগণ বসিলেন। যিনি যে কোন দ্রব্য বিক্রয়

করিতে আনিতেছেন, তাহা ক্রয় করিয়া আবার সেই দ্রব্য দ্বারা তাঁহাকে ভুঞ্জান হইতেছে।

মধ্যস্থলে দুই পাতা পড়িল, এক পাতা স্বয়ং মহাপ্রভুর জন্য, আর একখানা নিতাইয়ের নিমিত্ত। মহাপ্রভু যদিও তখন নীলাচলে, কিন্তু নিতাইয়ের আকর্ষণে তিনি আসিলেন। তখন সহস্র সহস্র লোকের সাক্ষাতে নিতাই মহাপ্রভুকে অতি আদরের সহিত ভুঞ্জাইতে লাগিলেন। লোকে আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। রঘুনাথ কৃতকৃতার্থ হইলেন। অদ্যাপি সেই স্থানে প্রতি বৎসর চিড়া মহোৎসব হইয়া থাকে।

রাঘবের বিধবা ভগ্নী দময়ন্তী, অতি শুদ্ধা পবিত্রা মহাপ্রভুর ভক্ত। তাঁহার এক অধিকার ছিল, তিনি "রাঘবের ঝালী" প্রস্তুত করিতেন। মহাপ্রভু নীলাচলে প্রকট, সুতরাং হৃদয়ে তাঁহাকে পূজা করিয়া ভক্তগণের তৃপ্তি হইত না। তাই নীলাচলের ভক্তগণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, আর দূরের ভক্তগণ ভোগের দ্রব্য সঙ্গে করিয়া সেখানে লইয়া যান। কেবল শচী আর বিষ্ণুপ্রিয়া যে এইরূপ ভোগ পাঠান তাহা নয়, ভক্তমাত্রেই। কিন্তু দময়ন্তীর সেবা আর এক প্রকার। প্রভু সারা বৎসর ভোগ করিবেন, তিনি এইরূপ আহারীয় প্রস্তুত করেন। ইহা করিতে বিস্তর কারিগরির প্রয়োজন। যেহেতু আহারীয় বস্তু মাত্রেই অতি সত্বর পচিয়া যায়। তাই তিনি এইরূপ সমুদায় দ্রব্য প্রস্তুত করেন, যাহা সত্বর নষ্ট না হয়, কি পাকের গুণে এক বৎসর উত্তম অবস্থায় থাকে। এই সমুদায় স্থায়ী স্বাদু দ্রব্য দিয়া ঝালি সাজান হয়। তাহার পরে তাহাতে মোহর মারা হয়, এবং উহা মকরধ্বজ করের হস্তে ন্যস্ত হয়। যখন ভক্তগণ নীলাচলে গমন করেন, সেই সঙ্গে তিনিও গমন করেন। ঝালী মুটিয়াগণের মাথায়

থাকে, আর মকরধ্বজ আপনার প্রাণ দিয়া উহা রক্ষা করেন। ইহাকে বলে "রাঘবের ঝালী।"

শ্রীচরিতামৃতে ঝালীর দ্রব্য এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

আম্র কাসন্দি আদা ঝাল কাসন্দি নাম।
নেম্বু আদা আম্রকলি বিবিধ সন্ধান॥
আমসী আম্রখণ্ড তৈল আম্র আমতা।
যত্ন করি গুণ্ডা করি পুরাণ শুকুতা॥
শুকুতা বলি অবজ্ঞা না করিহ চিতে।
শুক্তায় যে সুখ তাহা নহে পঞ্চামৃতে॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহ মাত্র লয়।
সুক্তাপাতা কাসন্দিতে মহাসুখ হয়॥
ধরিয়া নোরী তণ্ডুল গুণ্ডি করিয়া।
লাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া॥
শুঠিখণ্ড লাড়ু আর আমপিত্ত হর।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রে কুথলী ভিতর॥
কলিশুঁঠি কলিচূর্ণ কলিখণ্ড আর।
কত নাম লব যত প্রকার আছে তার॥
নারিকেল খণ্ড আর লাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃত কর্পূর আদি অনেক প্রকার॥
শালিকা চুটি ধান্যের আতপ চিড়া করি।
নূতন বস্ত্রের পর কুথলী সব ভরি॥

কতক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে লাড়ু কৈলা কর্পূরাদি দিয়া॥
শালি তণ্ডুল ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া॥
কর্পূর মরিচ লবঙ্গ এলাচ রসবাস।
চূর্ণ দিয়া লাড়ু কৈলা পরম সুবাস॥
শালি ধান্যের খৈ ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাক উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া॥
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতেতে ভাজাইল।
চিনি কর্পূর দিয়া তায় লাড়ু কৈল॥
কহিতে না জানিলাম এ জন্মে যাহার॥
ঐছে নানা ভক্ষ্যদ্রব্য সহস্র প্রকার॥
রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী।
দুহার প্রভুতে স্নেহ পরম শকতি॥
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছাঁকিয়া।
পাঁচকুড়ি করিয়া দিল গন্ধ দ্রব্য দিয়া॥
পাতল মৃতপাত্রে সোন্দালি নিল ভরি।
আর সব বস্ত ভরে বস্ত্রের কুথলি॥

জীবের বড় সাধ শ্রীভগবানকে সেবা করেন, আর তাঁহাদের সেই সাধ মিটাইবার নিমিত্ত শ্রীভগবানের মায়া অবলম্বন করিতে হয়। যদি শ্রীভগবান পূর্ণ হইয়া বসিয়া থাকেন, তবে আর জীব তাঁহাকে সেবা করিতে পারে না। তাই সকলের ইচ্ছা প্রভুকে খাওয়াইবেন। রাঘব যে ঝালী সাজাইয়া পাঠাইতেন তাহা সারা বৎসরের নিমিত্ত রাখা হইত। কিন্তু অন্যান্য ভক্তগণও ঐরূপ প্রভুকে উপহার দিতেন। শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া,

মালিনী এবং বহুতর ভক্তগণ প্রভুর নিমিত্ত যে উপহার দিতেন তাহা গোবিন্দের হাতে রাখা হইত। "গোবিন্দ, প্রভুকে দিও," সকলেরই এই কথা। গোবিন্দ বলেন 'আচ্ছা"। কিন্তু প্রভুকে ঐ সমুদায় ভুঞ্জান কঠিন ব্যাপার। প্রথমতঃ ঐ যে সাতশত ভক্ত প্রদত্ত উপহার, ইহা একত্র করিলে প্রকাণ্ড একটী যজ্ঞ হয়। তার পরে ভক্তগণ নীলাচলে আসিলে প্রত্যহ মহোৎসব হয়। প্রভুর কোন কোন দিন বহুবার নিমন্ত্রণে যাইতে হয়। সুতরাং তাঁহার ভক্তপ্রদত্ত দ্রব্য আস্বাদনের সময় থাকে না। সকল ভক্তই জিজ্ঞাসা করেন, "গোবিন্দ, প্রভুকে দিয়াছিলে?" গোবিন্দ উত্তরে বলেন, "না, পারি নাই, অপেক্ষা কর।" এইরূপ প্রত্যহ শত শত ভক্ত আসিতেছেন, এবং জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "গোবিন্দ, আমার দ্রব্য দিয়াছিলে?' গোবিন্দ বলিতেছেন, "না, সুবিধা পাই নাই।" ভক্ত মাত্রেই গোবিন্দকে মিনতি করিয়া বলিতেছেন, "গোবিন্দ, অবশ্য অবশ্য আমার দ্রব্য অগ্রে দিও।" গোবিন্দ করেন কি, বলেন "আচ্ছা"।

এইরূপে প্রত্যহ প্রাতে শত শত ভক্ত গোবিন্দের নিকট আগমন করেন। ভক্ত আসিতেছেন দেখিলে গোবিন্দের মুখ শুখাইয়া যায়। পলাইতে পারিলে পলাইতেন, কিন্তু তাহার সুবিধা নাই। প্রভুর নিকট সর্ব্বদা থাকিতে হয়। পরিশেষে গোবিন্দ প্রভুর শরণ লইলেন; বলিলেন, "প্রভো! দাসকে রক্ষা কর।" প্রভু বলিলেন, "কি? তোমার দুঃখ কি?" গোবিন্দ বলিলেন, "সকলে উপহার দিয়াছেন, সকলের ইচ্ছা তুমি আস্বাদ কর। আমি তোমাকে ভুঞ্জাইতে পারি না। সকলে প্রত্যহ আইসেন, আসিয়া আমাকে মিনতি করেন। যখন শুনেন যে আমা দ্বারা তাঁহাদের কার্য্য হয় নাই, তখন আমার মাথা খায়েন।"

প্রভু হাস্য করিয়া বলিলেন, "এই কথা? লইয়া আইস কে কি উপহার আনিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ

করিয়া জলযোগে বসিলেন। গোবিন্দ আনিতেছেন, বলিতেছেন "ইহা মা জননীর"। প্রভু হাত পাতিয়া বলিলেন, "দাও"। ভোজন করিয়া প্রভু আবার হাত পাতিতেছেন। গোবিন্দ বলিতেছেন, "ইহা শ্রীবাসের।" এইরূপে গোবিন্দ ভক্তের দ্রব্য প্রভুর হাতে দিতেছেন, এবং কাহার দ্রব্য তাহা বলিতেছেন, আর প্রভু আহার করিতেছেন। এইরূপে অল্পক্ষণের মধ্যে সেই এক যজ্ঞের উপযুক্ত সমুদায় সামগ্রী প্রভু আহার করিলেন; করিয়া বলিতেছেন, "আর আছে?" গোবিন্দ বলিলেন, "রাঘবের ঝালী ছাড়া আর নাই।" প্রভু বলিলেন, "তাহা অদ্য থাকুক।" পূর্ব্বে বলিয়াছি ভগবানের কাচ কাচা যায় না,—মনুষ্যে পারে না।

শিবানন্দ সেন, কাঞ্চনপাড়ায় বাড়ী, প্রভুর বড় প্রিয় ভক্ত। যাঁহারা প্রভুকে দর্শন করিতে নীলাচলে গমন করেন, তাঁহাদের পাথেয়াদি দিয়া সঙ্গে লইয়া যান, এমন কি কুক্কুর পর্য্যন্ত। একটী কুক্কুর এইরূপে যাত্রিগণের সঙ্গে চলিয়াছেন। কুক্কুর মহাশয় ভক্তসঙ্গে গমন করিতেছেন, কাজেই এই জন্মে কুকুর হইলেও তিনি ভক্তির পাত্র। শিবানন্দ প্রত্যহ সেই কুক্কুরকে ডাকিয়া আহার দেন। এক নাবিক কুক্কুরকে পার করিতে অস্বীকার করিল। শিবানন্দ অনুনয় বিনয় করিলেন, নাবিক শুনিল না, তখন দশ পণ কড়ি দিয়া কুক্কুরকে পার করিলেন। একদিন প্রভাতে শিবানন্দ কুকুরকে দেখিতে পাইলেন না। তখন সেবকের মুখে শুনিলেন যে, সে গত রজনীতে তাহাকে আহার দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। শিবানন্দ দুঃখিত হইয়া কুক্কুর তল্লাস করিতে দশজন লোক পাঠাইলেন। কুক্কুর পাওয়া গেল না। শিবানন্দ উহাতে আন্তরিক দুঃখিত হইলেন। এমন কি উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিলেন!

কথা এই, শিবানন্দ সেনের মনে বিশ্বাস এই আছে যে এই কুক্কুর সামান্য বস্তু নহেন, কোন মহাজন হইবেন, নতুবা বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া

ভক্তগণের সঙ্গে প্রভুর নিকটে কেন যাইতেছেন? শিবানন্দ সেন শান্ত হইয়া স্নানাহার করিলেন, পরে ভক্তগণ সঙ্গে নীলাচলে প্রভুর ওখানে গমন করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে ভক্তগণ একদিন প্রভুকে দর্শন করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন সেই কুক্কুর প্রভুর অল্প দূরে বসিয়া আছেন, আর প্রভুর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। সে কিরূপে? না, প্রভু নিজ হস্তে তাঁহাকে নারিকেল-শস্যখণ্ড ফেলাইয়া দিতেছেন, আর কুক্কুর তাহা ভক্ষণ করিতেছেন। আবার প্রভু বলিতেছেন, "কৃষ্ণ বল", আর কুক্কুর প্রকৃতই "কৃষ্ণ" বলিতেছেন। শিবানন্দ সেন অমনি কুক্কুরকে প্রণাম করিয়া আপনার শত অপরাধ জানাইলেন। সেই কুক্কুর তাহার পরে অদর্শন হইলেন, সেই দিন হইতে আর তাঁহাকে দেখা গেল না।

শ্রীকান্ত শিবানন্দের ভাগিনা। প্রভুর কৃপাতে তিনি বড় ভাগ্যবান। একবার তিনি প্রভুর নিকট একক গমন করিয়াছিলেন। প্রভু তাঁহাকে দুই মাস নিকটে রাখিয়া ছিলেন। শিবানন্দ তাঁহার নিয়ম মত যাত্রী লইয়া নীলাচলে যাইতেছেন। এবার তাঁহার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী পুত্র ও অন্যান্য বৈষ্ণব গৃহিণীও আছেন। তাঁহার স্ত্রীকে কেন সঙ্গে লইলেন তাহার কারণ বলিতেছি। তিনি ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে প্রভুকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তখন প্রভু শিবানন্দকে বলিয়াছিলেন যে, তোমার এবার একটী পুত্র হইবে, পরমানন্দপুরী গোসাঞির নামে তাহার নাম রাখিব। তাহার স্ত্রী অন্তঃস্বত্বা ছিলেন, শিবানন্দ সেন বাড়ী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন তাঁহার একটী পুত্র হইয়াছে। প্রভুর আজ্ঞাক্রমে এই পুত্রের নাম পরমানন্দ দাস রাখিলেন।

শিবানন্দ সেনের মনের সাধ এই যে, পুত্রটীকে লইয়া তিনি প্রভুকে দেখাইবেন। কিন্তু শিবানন্দ সেনের এই শেষ পুত্র, তাহার গর্ভধারিণী

পুত্রটীকে অত দূরদেশে যাইতে ছাড়িয়া দিতে চাহেন না। কাজেই শিবানন্দ তাঁহার ঘরণীকে সঙ্গে করিয়া আর শিশু পুত্রটীকে কোলে করিয়া নীলাচলে প্রভুর দর্শন করিতে চলিলেন। পথে যাইতে স্থানে স্থানে ঘাটিতে দান দিতে হয়। এক ঘাটিতে কয়টী ভক্ত গণিয়া শিবানন্দ সেন তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া ওপারে গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন, আপনি ঘাটিতে দান বুঝিয়া দিতে জামিন স্বরূপ রহিলেন। তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে সুতরাং ভক্তগণের বাসা হয় নাই। শ্রীনিত্যানন্দ ক্ষুধায় কাতর হইয়া শিবানন্দ সেনের তিনটী পুত্রকে শাপ দিতেছেন। বলিতেছেন, "যেমন শিবা আমাকে ক্ষুধায় ক্লেশ দিতেছে, তেমনি তাহার তিনটী ছেলে ম'রে যাউক।" কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, শিবার কোন অপরাধ নাই। অপরাধের মধ্যে শত শত ভক্তগণকে পালন করিয়া বাঙ্গালা দেশ হইতে পুরী নগরীতে লইয়া যাইয়া থাকেন ও যাইতেছেন। তাহার পরে ভক্তগণকে যে বাসা দিতে বিলম্ব হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার তিলমাত্র দোষ নাই। ঘাটীরক্ষক তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয় নাই, তিনি সকলকে ছাড়াইয়া সেই ব্যক্তির যে প্রাপ্য তাহা দিবার নিমিত্ত আপনি সেখানে ছিলেন। অতএব শিবার কোন অপরাধ নাই। যত অপরাধ সমুদায় আমার ঠাকুর নিতাইয়ের। তাহার পরে শুনুন। নিতাই শিবানন্দের ঘরণীকে শুনাইয়া তাঁহাদের পুত্রকে শাপিয়াছেন। ঘরণী ইহাতে ভয় ও দুঃখে অতি কাতর হইয়াছেন। শিবানন্দ যাত্রিগণ মধ্যে আগমন করিলে তাহার পত্নী ভয় পাইয়া কাঁদিয়া বলিলেন যে, গোসাঞি তিন পুত্র মরুক বলিয়া শাপ দিয়াছেন। শিবানন্দ হাসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "তুমি কাঁদ কেন? আমার তিন পুত্র মরিবে মরুক, গোসাঞির বালাই লইয়া মরিয়া যাউক।" ইহাই বলিয়া নিতাইয়ের নিকট আসিলেন। নিতাই শিবানন্দকে পাইয়া অমনি উঠিয়া এক লাথি মারিলেন! শিবানন্দ লাথি খাইয়া আর কিছু

না বলিয়া, শীঘ্র শীঘ্র বাসা করিয়া ঠাকুরকে সেখানে লইয়া গেলেন। সেখানে স্নানাহার করিয়া সকলে শান্ত হইলেন।

তখন শিবানন্দ সেন গদগদ হইয়া নিতাইকে বলিতে লাগিলেন, "আজ আমার দিন সুপ্রভাত। তোমার চরণরেণু ব্রহ্মার দুর্লভ ধন। আমি তাহা অনায়াসে পাইলাম। আজ আমার জন্ম সার্থক, এ দেহ পবিত্র হইল।" নিত্যানন্দ অগ্রে চঞ্চলতা করিয়াছেন, বাসা পাইয়াই একটু অনুতাপের উদয় হইয়াছে। তাহার পরে শিবানন্দ যখন আবার স্তব আরম্ভ করিলেন, তখন "অভিমান শূন্য, অক্রোধ, পরমানন্দ" নিতাই নিজে উঠিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অবশ্য ঠাকুরের অন্তর, কিন্তু অদ্বৈতের ক্রোধ, কি নিতাইয়ের ক্রোধ কেবল "হাস্যময়" বই নয়! জগতে জানে "নিতাই মারি খাইয়া দয়া করেন।" যে ঠাকুর মারি খাইয়া দয়া করেন, তিনি অবশ্য মারিয়াও দয়া করেন। শিবানন্দ তাহা জানিতেন, আর জানিয়াই লাথি খাইয়া নিত্যানন্দের পায়ে ধরেন। কিন্তু শ্রীকান্ত অল্প বয়স্ক। তাহার মাতুল পিতৃসম্পর্কীয়, মাতুল দেশ মধ্যে গণ্যমান্য! তিনি শত শত ভক্তের সম্মুখে লাথি খাইলেন, ইহাতে তাহার ক্রোধ হইল। তাই বলিলেন, "গোসাঞি যাঁহাকে লাথি মারিলেন, তিনি সামান্য লোক নহেন, তিনিও মহাপ্রভুর একজন পার্ষদ। ঠাকুরালী করিবার বুঝি আর স্থান পাইলেন না? আমি যাই, প্রভুর নিকট এ সমুদায় কথা নিবেদন করিব।" এই ভয় দেখাইয়া শ্রীকান্ত সমস্ত সঙ্গী ছাড়িয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন।

শ্রীকান্ত যাইয়া একবারে প্রভুর নিকট উপস্থিত ও তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। গোবিন্দ দাঁড়াইয়া আছেন, বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন, "তুমি কর কি? গায়ের পেটাঙ্গি না খুলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছ?" কথা এই, অতি বড় গুরুজনকে প্রণাম করিবার আগে যেমন জুতা খুলিতে

হয়, তেমনি অঙ্গরক্ষকও খুলিতে হয়। পেটাঙ্গি মানে অঙ্গরক্ষক (আঙ্গ রাখা)। যেমন পিরাণ কি মেরজাই। এখন যেমন ভদ্রলোকে পিরাণ গায় দেন, তখন পেটাঙ্গি গায়ে দিতেন।

প্রভু বলিলেন, "গোবিন্দ! শ্রীকান্তকে কিছু বলিও না। মনে বড় দুঃখ পাইয়া আসিয়াছে। উহার যাহাতে সুখ হয় তাহাই কর।" এই কথা শুনিয়া শ্রীকান্ত বুঝিলেন যে, সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাঁহার মনের কি দুঃখ তাহা বলিবার অগ্রে আপনি অবগত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি যাহা বলিবেন মনে করিয়া আসিয়াছেন তাহা আর বলিলেন না। বিশেষতঃ অন্তরে যে একটু মলিনতা হইয়াছিল, প্রভুর দর্শনে তাহা তখন অন্তর্হিত হইয়াছে।

প্রভু বলিতেছেন, "শ্রীকান্ত, কে কে আসিতেছেন?" শ্রীকান্ত নাম বলিতেছেন, এমন সময় শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নাম শুনিয়া প্রভু বলিতেছেন "আচার্য্য এখানে কি তামাসা দেখিতে আসিতেছেন?" এ কথা শুনিয়া সকলে চমকিত হইলেন। প্রভুর মুখে কর্কশ বাক্য কেহ কখন শুনিতে পান না। তাহার পরে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে প্রভু যত ভক্তি করেন এমন আর কাহাকেও নহে, এমন কি পুরী ভারতীকেও নহে। স্বরূপ প্রভৃতি যাঁহারা উপস্থিত, তাঁহারা এই কথা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, প্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রভু সম্বন্ধে ঐরূপ কর্কশ কথা কেন বলিলেন। কিন্তু প্রভু আপনিই তাঁহাদের মনের তর্কের মীমাংসা করিলেন। কারণ উপরের কর্কশ বাক্য বলিয়াই আবার বলিতেছেন, "শ্রীকান্ত বলিতে পার, আচার্য্যের এবার রাজার নিকট কিছু প্রাপ্তির আশা আছে কি?" শ্রীকান্ত এ কথার কোন উত্তর না করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। "রাজার নিকট কিছু প্রাপ্তির আশা আছে" প্রভুর এ কথার তাৎপর্য্য ক্রমে বলিব।

শিবানন্দ সেন ইহার পরে পুত্রকে কোলে করিয়া শত শত ভক্তের

সহিত নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। প্রভুও তাঁহার শত শত ভক্তগণ সহ তাঁহাদিগকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া লইতে আসিলেন। যখন দুই দলে দেখাদেখি হইল, তখন মহাকলরব উঠিল। পরমানন্দের বয়স তখন সাত বৎসর। তিনি শুনিয়াছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে দেখিতে যাইতেছেন। আবার পিতার কোলে থাকিয়া শুনিলেন যে, অগ্রে যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রভু আছেন। তখন তিনি ব্যগ্র হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "বাবা, গৌরাঙ্গ কে, আমাকে দেখাইয়া দাও।" তাহাতে শিবানন্দ সেন কি উত্তর দিলেন, তাহা তিনি (পরমানন্দ দাস) পরে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক নামক যে গ্রন্থ লিখেন তাহার একটী শ্লোকে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

বিদ্যুদ্দাম দ্যুতিরতিশয়োৎকণ্ঠকণ্ঠীরবেন্দ্র,
ক্রীড়াগামী কনকপরিঘদ্রাঘিমোদ্দামবাহুঃ।
সিংহগ্রীবো নবদিনকরদ্যোতবিদ্যোতিবাসাঃ,
শ্রীগৌরাঙ্গস্ফুরতিপুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ॥

যখন পরমানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা, গৌরাঙ্গ কই?' তখন শিবানন্দ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখাইয়া ক্রোড়স্থিত পুত্রকে বলিতেছেন, "হে বালক, আমাদের প্রভু কে, তাহা কি দেখাইয়া দিতে হয়? ঐ যে সোণার বরণ, দীর্ঘ তেজোময় বস্তুটী, যাঁহার কমলনয়ন দিয়া অবিরত প্রেমধারা পড়িতেছে, উনিই শ্রীগৌরাঙ্গ। হে পুত্র, উহাঁকে প্রণাম কর।" ইহা বলিয়া কোল হইতে পুত্রকে নামাইলেন, ও পিতা পুত্রে দূর হইতে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম করিলেন।

পুত্রটীকে লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে কিরূপে উপস্থিত করিবেন, শিবানন্দ ইহাই ভাবিতেছেন। যেহেতু প্রভুর বাসায় সর্ব্বদা লোকে পূর্ণ। কয়েক দিন পরে একটী সুযোগ উপস্থিত হইল। যেখানে তিনি তাঁহার

স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া বাসা করিয়াছিলেন, এক দিবস প্রভু তিনটী ভক্ত সমভিব্যাহারে তাহার নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। শিবানন্দ সেন ও তাঁহার ঘরনী ইহা দেখিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া প্রভুর চরণে প্রণাম করিলেন। প্রণাম করিয়া শিবানন্দ করজোড়ে বলিলেন, "ভগবন্! একবার দাসানুদাসের বাটীতে পদধূলি দিয়া যাইতে আজ্ঞা হয়।"

প্রভুকে শিবানন্দ সেন এরূপ নিবেদন করিলে, প্রভু, "তোমার যাহা অভিরুচি" বলিয়া স্বীকার করিলেন। এখানে আর একটী কথা বলা কর্ত্তব্য। প্রভু কখনও স্ত্রীলোকের মুখ দেখিতেন না। কিন্তু যাঁহাদের উপর বাৎসল্যভাব, কি যাঁহারা গুরুজন, এরূপ স্ত্রীলোকের সহিত তিনি এরূপ ব্যবহার করিতেন না। শিবানন্দের পত্নীকে তিনি কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন, এবং শিবানন্দ সেনের বাড়ীতেও পূর্ব্বে গিয়াছেন।

প্রভুকে বাসায় আনিয়া সেন মহাশয় সেই সপ্তমবর্ষীয় পুত্রকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "ভগবন্! এই তোমার সেই বরপুত্র, ইহার নাম আপনার আজ্ঞাক্রমে পরমানন্দ দাস রাখিয়াছি, আর আপনি ইহাকে কৃপা করিবেন বলিয়া এত দূরে শ্রীচরণে আনিয়াছি।" ইহাই বলিয়া পুত্রকে বলিলেন, "পুত্র, শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম কর।" বালক পরমানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলেন। প্রভু বলিলেন, "তোমার দিব্য পুত্র হইয়াছে।" ইহাই বলিয়া স্নেহার্ত্ত হইয়া তাহার মস্তকে চরণ দিতে গেলেন। শিশু পরমানন্দ ইহার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া মস্তক নত করিলেন না, বরং মুখব্যাদন করিলেন। বাল্য স্বভাববশতঃই হউক, বা প্রভুর ইচ্ছাক্রমেই হউক, এইরূপে মুখব্যাদন করিলে, প্রভু তাঁহার চরণাঙ্গুষ্ঠ বালকের মুখে দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বালক ইহাতে বিরক্ত না হইয়া, কি কোনরূপ আপত্তি না করিয়া, যেমন শিশুসন্তানে স্তনপান করে সেইরূপে দুই হস্তে শ্রীপদ ধরিয়া, অতি সতৃষ্ণ মনে সেই অঙ্গুষ্ঠ চুষিতে লাগিলেন!

প্রভু যখন এই চরণাঙ্গুষ্ঠ মুখের মধ্যে দিলেন, তখন কি বলিলেন তাহা এই পরমানন্দ দাসের "বৃন্দাবনচম্পূতে" লিখিত আছে। (স্মরণ থাকে, এই পরমানন্দ প্রভুর বরে দৈববিদ্যা পাইয়া কবিরূপে জগতে বিদিত হইলেন। তিনি চৈতন্যচরিত, বৃন্দাবনচম্পূ ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি কয়েকখানা গ্রন্থ লিখেন। অতএব এই যে কাহিনী বলিতেছি ইহা তিনি স্বয়ং তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।)

বৎসাস্বাদ্য মুহুঃস্বয়া রসনয়া প্রাপয্য সংকাব্যতাং
দেয়ং ভক্ত জনেষু ভাবিষু সুরৈর্দুষ্প্রাপ্যমেতত্ত্বয়া।

"হে বৎস্য, দেব দুর্লভ বস্ত স্বয়ং আস্বাদন করিয়া ভাবি ভক্তগণকে প্রকাশ করিবে।" পরমানন্দ বলিতেছেন" ইহা বলিয়া প্রভু তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ আমার মুখে দিয়াছিলেন।"

পরমানন্দ পদাঙ্গুষ্ঠ চুষিতেছেন, প্রভু উহা বালকের মুখ হইতে আনিয়া বলিলেন, "বৎস্য, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।" পরমানন্দ কিছু বলিলেন না। তখন আবার বলিলেন, "কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।" তবু পরমানন্দ দাস কিছু বলিলেন না। তখন বালকের পিতামাতা ব্যগ্র হইয়া, পুত্রকে কৃষ্ণ বলাইবার নিমিত্ত অনুনয়, তাড়না, ভয় প্রদর্শন প্রভৃতি নানা মত উপায় করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালক কিছুতেই তাহা বলিলেন না। ইহাতে বালকের পিতামাতা মর্ম্মাহত ও যেন প্রভু পর্য্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন।

তখন প্রভু যেন বিস্ময়ভাব দেখাইয়া ক্ষোভ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়! আমি বিশ্ব-সংসারকে কৃষ্ণ-নাম বলাইলাম, কিন্তু এই বালককে পারিলাম না?" প্রভুর সঙ্গে সরূপ দামোদর ছিলেন, তিনি বলিলেন. "প্রভু, আপনি কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র এই বালককে দিলেন, বালক মনে ভাবিতেছে, যে, সে উহা কিরূপে প্রকাশ করিয়া উচ্চারণ করিবে। এই বালক যে নীরব হইয়াছে সে সেই নিমিত্ত, আমার ইহাই নিশ্চয় বোধ হয়।"

তখন প্রভু বলিলেন, "তাই কি হবে? ভাল তাই যদি হয়। হে বৎস! যাহা কিছু হয় তাহা বল।"

• ইহাতে বালক উঠিয়া দাঁড়াইয়া করজোড়ে একটী শ্লোক প্রস্তুত করিয়া বলিল। (মনে থাকে তাহার তখন ক খ পাঠ হইয়াছে কি না তাহা সন্দেহ।) পরমানন্দের শ্লোক যথা ঃ—

শ্রবসোঃ কুবলয় মক্ষোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণি দাম।
বৃন্দাবনতরুণীনামণ্ডনমখিলং হরির্জয়তীতি॥

অর্থাৎ "যিনি ব্রজ যুবতীগণের কর্ণে কর্ণোৎপল, নয়নে সুরস অঞ্জন, বক্ষঃস্থলে নীলকান্তমণিময় হারের স্বরূপ ও তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গের অথবা অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভূষণ, সেই শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন।"

ইহাতে শিবানন্দ, তাঁহার পত্নী ও প্রভুর সঙ্গী যে দুইজন ভক্ত ছিলেন, সকলে আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

তখন প্রভু বলিলেন, "বৎস! তুমি উত্তম কবি হইবে। তুমি এই শ্লোকের প্রথমে ব্রজঙ্গনাদিগের কর্ণভূষণের বর্ণন করিয়াছ বলিয়া তোমার নাম অদ্যাবধি কবি কর্ণপূর হইল।" পূর্ব্বে বলিয়াছি এই কবিকর্ণপূর কৃত পুস্তক এখন বৈষ্ণবজগতে অনন্ত আনন্দ দিতেছে। তাঁহার কৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা বর্ণনা করিয়া পরে তিনি বলিতেছেন,—

শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথা বর্ণিতং
জগ্রন্থে কিয়তী তদীয় কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া।
এতাংতং প্রিয় মণ্ডলে শিবশিব স্মৃত্যৈকশেষং গতে,
কো জানাত শৃণোতু কস্তদনয়া কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রীয়তাং॥

ইহার ভাবার্থ এই, "আমি অজ্ঞান বালক শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা (অর্থাৎ পদাঙ্গুষ্ঠের রজ) পাইয়া যাহা লিখিলাম ইহা সত্য কি মিথ্যা তাহা তাঁহার

ভক্তগণ বলিতে পারেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকলে অন্তর্ধান হইলেন। সুতরং আমি সত্য লিখিলাম কি মিথ্যা লিখিলাম তাঁহারা ব্যতীত আর কে বলিবে? তবে, হে কৃষ্ণ, তুমি অন্তর্যামী, তোমাকে আমি সাক্ষী মানিলাম। আমি যদি সত্য লিখিয়া থাকি, তবে তুমি অবশ্য আমার প্রতি তুষ্ট হইবে, (এবং যদি মিথ্যা লিখিয়া থাকি তবে দণ্ড করিবে।)

জগতে যত অবতারের কথা শুনা যায় তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের লীলায় যে সমুদায় প্রমাণ রহিয়াছে তাহা অকাট্য। সেই প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে তিনি কি বলিয়াছেন ও কি করিয়াছেন।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে মহাপ্রভু যে কর্কশ বাক্য বলেন, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত যখন নীলাচলে উপস্থিত হইলেন তখন প্রভু তাঁহার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহার করিলেন। তিনি যে কোন কারণে শ্রীঅদ্বৈতের উপরে বিরক্ত হইয়াছেন তাহা তাঁহাকে জানিতে দিলেন না। একদিন বাউল বিশ্বাস প্রভুকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি উঠিয়া গেলে প্রভু গোবিন্দকে আজ্ঞা করিলেন যে, "বাউল বিশ্বাসকে আমার এখানে আর আসিতে দিও না।" এই বাউল বিশ্বাস শ্রীঅদ্বৈতের শিষ্য ও তাঁহার বাড়ীর প্রধান কর্ম্মচারী। অদ্বৈত প্রভুর বৃহৎ পরিবার, ছয় পুত্র, দুই স্ত্রী। শ্রীঅদ্বৈতের ভাণ্ডার যেন অক্ষয়, তিনি এইরূপ ভাবে অর্থ ব্যয় করেন। সংসারে সেই নিমিত্ত চিরদিন অনাটন। বিশ্বাস মহাশয় দেখিলেন যে, উড়িষ্যার রাজা গৌড়ীয়গণের নিতান্ত ভক্ত হইয়াছেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অচল সংসার কুলাইবার নিমিত্ত এক উপায় সৃজন করিলেন। তিনি রাজার নিকট এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে লেখা ছিল যে, শ্রীঅদ্বৈত স্বয়ং ঈশ্বর, তবে তাঁহার কিছু ঋণ হইয়াছে, ...জর নিকট প্রার্থনা সেই ঋণ শোধের জন্য সাহায্য। এই পত্র

কেমন করিয়া ঘুরিয়া মহাপ্রভুর হাতে পড়িল। তাহাতে প্রভু ক্ষুব্ধ হইলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে প্রত্যক্ষ কিছুই বলিলেন না, তবে "বাউল বিশ্বাস" মহাশয়কে তাঁহার নিকট আসিতে নিষেধ করিলেন। যখন বিশ্বাস মহাশয়ের উপর ঐ দণ্ড হয়, তখন প্রভু হাসিয়া বলিলেন, "রাজার নিকট বিশ্বাস যে পত্র দিয়াছেন তাহাতে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যকে ঈশ্বর সংবাগু করিয়াছেন। এ ঠিক, যেহেতু তিনি প্রকৃতই ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরের ঋণ হইয়াছে, এ কথা বলা বড় অপরাধের কথা; এই জন্যই তিনি দণ্ডার্হ. অতএব তিনি যেন আমার এখানে আর না আইসেন।"

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ইহার কিছুই জানেন না। এই যে রাজার নিকট পত্র লেখা হইয়াছে, ইহা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অজ্ঞাতসারে। তিনি যখন বিশ্বাসের প্রতি প্রভুর দণ্ডের কথা শুনিলেন, তখন নিতান্ত লজ্জা পাইয়া প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন, "তুমি বিশ্বাসকে দণ্ড করিয়াছ, কিন্তু তাহার অপরাধ কি? আমাকে দণ্ড করা কর্ত্তব্য, যেহেতু সে যাহা করিয়াছে, সে আমারই জন্য।" প্রভু তখনি হাসিয়া বিশ্বাসকে নিকটে ডাকিলেন, ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কার্য্য ভাল কর নাই। ঐরূপ কার্য্য আর করিও না।" প্রকৃত কথা, যদি প্রভু-পার্ষদগণ রাজার দ্বারস্থ হয়েন, তবে প্রভুর ধর্ম্মের প্রতি লোকের অনাদর হয়।

শিবানন্দ সেন শুনিলেন যে, অম্বিকা কালনার নকুল ব্রহ্মচারীর শরীরে মহাপ্রভু প্রকাশ হইয়াছেন। প্রভুর লীলালেখকগণ বলেন যে, প্রভু জীব নিস্তারের বহুবিধ উপায় করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ আচার্য্য সৃষ্টি, যেমন কৃষ্ণদাস গুণমালা। আপনি তিন প্রকারে জীবকে শিক্ষা দিতেন, প্রথমতঃ—সাক্ষাদ্দর্শন দিয়া। শ্রীক্ষেত্রে জগতের লোক গমন করেন, করিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়া ভক্তিলাভ করেন। দ্বিতীয়তঃ—"আবির্ভূত" হইয়া। যেমন শচীর বাড়ীতে জননীপ্রদত্ত অন্ন ব্যঞ্জন আহার। শচী

অন্ন ব্যঞ্জন রান্ধিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, আর বলিতেছেন 'আমার নিমাই বাড়ী নাই, আমি ইহা কাহাকে দিব?" ইহা বলিতে বলিতে বিহ্বল হইলেন, দেখিলেন যেন নিমাই আসিলেন। তখন বসিয়া নিমাইকে যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। পরে চেতন পাইলেন, তখন ভাবিলেন "এই সমুদায় স্বপ্ন হইবে। কারণ নিমাই ত আমার এখানে নাই, নিমাই শ্রীক্ষেত্রে।" ইহাকে বলে "আবির্ভাব।" এইরূপ শচীর গৃহে সর্ব্বদা হইত।

আর এক উপায়ে প্রভু জীব উদ্ধার করিতেন, সে "আবেশ'। প্রভু নকুল ব্রহ্মচারীর শরীরে প্রবেশ করিয়া ভক্তি-ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নকুলের বয়ঃক্রম অল্প, বর্ণ গৌর, অঙ্গের শোভা চমৎকার। প্রভু সেই শরীরে প্রবেশ করাতেই, নবীন ব্রহ্মচারী গ্রহগ্রস্তপ্রায় হইয়া নাচিতে কাঁদিতে ও হাসিতে লাগিলেন। আর সকলকেই বলেন "কৃষ্ণ বল"। দেশে এ কথা প্রচার হইল, নকুলের দেহে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশ হইয়াছে। এ সংবাদ শুনিয়া অবশ্য শিবানন্দ তথা কি জানিবার জন্য সেখানে চলিলেন। শিবানন্দ দেখেন অসংখ্য লোক জুটিয়াছে, ব্রহ্মচারীর দর্শন পাওয়া দুর্ঘট। শিবানন্দ মনে মনে প্রভুকে বলিতেছেন, "যদি সত্যই আমার প্রভু তুমি নকুলের দেহে প্রবেশ করিয়া থাক, তবে আমি যে আসিয়াছি, তাহা অবশ্য তুমি জান। তবে তুমি অবশ্য আমাকে ডাকিবা, ডাকিয়া আমার কি ইষ্টমন্ত্র তাহা বলিবা। প্রভু, তাহা হইলেই আমার মনের সন্দেহ যাইবে।"

শিবানন্দের মনে অবশ্যই গৌরব আছে যে, তিনি প্রভুর উপর দাবি রাখেন। অতএব, সত্য যদি প্রভু নকুলের এ দেহে প্রবেশ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে জানিবেন ও তাঁহার নিজের মনস্কাম সিদ্ধি করিবেন। শিবানন্দ লোক সংঘট্টের বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রভুর নিকট মনে

মনে এইরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে দুই চারি জন লোক দৌড়িয়া আসিল। আসিয়া "শিবানন্দ সেন কে?" বলিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। "শিবানন্দ সেন কে? তাঁহাকে ঠাকুর ডাকিতেছেন।" একথা শুনিয়া শিবানন্দ দৌড়িয়া গিয়া ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিলেন। ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতে চাও? উত্তম। তোমার চারি অক্ষরের গৌরগোপাল মন্ত্র"। * এই আখ্যায়িকাটি শিবানন্দের পুত্র তাঁহার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

এইরূপ নকুল ব্রহ্মচারী প্রভুর ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। চরিতামৃত বলিতেছেন,—

'এই মত আবেশে তারিল ত্রিভুবন।
গৌড়ে দেহে আবেশের দিগদরশন॥'

অর্থাৎ গৌড়ে যেরূপ ব্রহ্মচারীর শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রভু ভক্তি-ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন সেইরূপ তিনি সমস্ত দেশে করিয়াছিলেন, অর্থাৎ নানাস্থানে নানাদেহে প্রবেশ করিয়া জীবকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত প্রভুর প্রকট কালেই কোটী কোটী ভক্ত তাঁহার পদাশ্রয় করেন। আর এই নিমিত্ত, যদিও তিনি পূর্ব্ববঙ্গ দেশে মোটে আট মাস ছিলেন, এবং সেও অধ্যাপক ভাবে, ভক্ত বা আচার্য্য ভাবে নয়, তবু সে দেশ ভক্তিতে প্লাবিত হইয়াছিল। শিবানন্দ সেন সম্বন্ধে আর এক ঘটনা বলিব। প্রভু পৌষ মাসে বঙ্গদেশে আসিবেন, এ কথা শিবানন্দ শ্রীকান্তের মুখে শুনিলেন। শুনিবা মাত্র শাকের ক্ষেত প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, এবং প্রভুর পথ পানে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু প্রভু আসিলেন না। পৌষ মাসে সংক্রান্তির দিবস জগদানন্দ ও শিবানন্দ দুই জনে প্রভুকে

* একবার একটী কথা উঠে যে "গৌর-নামের মন্ত্র নাই।" কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে শিবানন্দের মন্ত্র "গৌরগোপাল।"

অপেক্ষা করিয়া "ঐ এলো" ভাবে, কি "পড়ে পাতার উপরে পাত, ঐ এলো প্রাণনাথ," ভাবে, কাটাইলেন। প্রভু আসিলেন না। তখন দুই জনে হাহাকার করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সেখানে নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী আসিলেন। ইহাঁর পূর্ব্ব নাম ছিল প্রদ্যুম্ন, প্রভু তাঁহার নাম রাখেন নৃসিংহানন্দ, যেহেতু ব্রহ্মচারী প্রহ্লাদের ঠাকুরের বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন।

ঐ ব্রহ্মচারীর ভজন ছিল মানসিক। যোগশাস্ত্রের নামে অনেকে উন্মত্ত হয়েন, কিন্তু যেমন জ্ঞানযোগ, তেমনি ভক্তিযোগ বলিয়া আর একপ্রকার যোগ আছে। সে অতি মধুর সামগ্রী। জ্ঞানযোগের যেরূপ সমাধি, আছে, ভক্তিযোগেরও সেইরূপ সমাধি আছে। যেমন প্রভু সন্ন্যাসের পরে চারি দিবস পর্য্যন্ত সমাধিস্থ ছিলেন। এ যোগের বিশেষ লাভ এই যে ইহাতে যোগীর যে প্রাপ্তি তাহার সহিত কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়।

এই নৃসিংহ মনে মনে প্রভুর ভজনা করিতেন। প্রভু যেবার গৌড় হইয়া বৃন্দাবন গমন করেন, সেবার প্রভুর ফিরিয়া আসিবার অগ্রেই এই ব্রহ্মচারী বলিয়াছিলেন যে, প্রভুর এবার বৃন্দাবন যাওয়া হইবে না, তিনি কানাইয়ের নাটশালা হইতে ফিরিয়া আসিবেন। এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তিনি এই সংবাদ কিরূপে জানিলেন? নৃসিংহ তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, প্রভু যেমন বৃন্দাবন গমন করিতেছিলেন, তিনি (নৃসিংহ) মনে মনে তাঁহার পথ যোজনা করিতেছিলেন। নৃসিংহ ভাবিলেন, পথ হাটিয়া প্রভুর দুঃখ হইবে, অতএব তাঁহাকে ভাল পথে লইয়া যাইবেন। তাই মনে মনে পথ করিতেছেন, সে পথে কঙ্কর ও ধুলা নাই, পথের দু'ধারে কুসুম বৃক্ষ, তাহার উপরে পক্ষিগণ গান গাইতেছে। কুসুমের শোভায় ও গন্ধে দিক্ আমোদিত করিতেছে। এই পথ মনে মনে করিয়া

প্রভুকে মনে মনে সেই পথে লইয়া যাইতেছেন। প্রভুর অগ্রে মনে মনে ফুল ছড়াইতেছেন, যে তাঁহার শ্রীপদে চলিতে ব্যথা না লাগে। প্রত্যহ প্রভুকে মনে মনে ভোগ দিতেছেন, দিবাভাগে একবার আর সন্ধ্যার পরে একবার, উত্তম কুটীরে শয়ন করাইতেছেন ও পদ সেবা করিয়া ঘুম পাড়াইতেছেন। এইরূপ করিতে করিতে নৃসিংহ মনে মনে প্রভুকে কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন, কিন্তু আর পারেন না, আর কোন ক্রমে মনে মনে পথ বান্ধিতে পারেন না। তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রভু আর অগ্রবর্ত্তী হইবেন না।"

এই নৃসিংহ শিবানন্দ ও জগদানন্দের দুঃখের কারণ শুনিয়া দম্ভ করিয়া বলিলেন, "এই কথা? আমি প্রভুকে আনিতেছি, আনিয়া তোমার এখানে তাঁহাকে ভুঞ্জাইব।' ইহা বলিয়া নৃসিংহ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। তিনি নয়ন মুদিয়া চিত্তকে সংযম করিয়া উহা বাহ্য জগৎ হইতে পৃথক করিলেন। পরে চিত্তকে প্রভুর নিকটে লইয়া চলিলেন। চিত্ত চলিলেন। চিত্ত কখন আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহার যে কার্য্য তাহা ভুলিয়া অন্যদিকে যাইতেছেন, নৃসিংহ তাঁহাকে চাবুক মারিয়া আবার ঠিক পথে আনিতেছেন। এইরূপ বহু কষ্টে চঞ্চল চিত্তকে প্রভুর নিকট লইয়া গেলেন। তখন প্রভুর চরণে পড়িলেন, অনুনয় বিনয় করিলেন, করিয়া প্রভুকে সম্মত ও সঙ্গে করিয়া শিবানন্দ সেনের বাড়ী আনিতে লাগিলেন। আনিবার সময় আবার তাঁহার চিত্ত ঐরূপ চাঞ্চল্য করিতেছেন। কখন নিজ কার্য্য ভুলিয়া গিয়া প্রভুকে একেবারে হারাইতেছেন, আবার তল্লাস করিয়া ধরিতেছেন। কখন পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। এইরূপে প্রভুর নিকট যাইতে ও তাঁহাকে আনিতে তাঁহার চিত্তের, দুই দিন গেল। ইহাকে বলে ভক্তিযোগ। যাহা হউক তিন দিনের দিন নৃসিংহ প্রভুকে শিবানন্দের বাড়ী আনিয়া উত্তমরূপে ভুঞ্জাইলেন।

কিন্তু দুঃখের মধ্যে এই, প্রভু যে আসিয়া সমুদায় আহার করিলেন, নৃসিংহের মুখের কথা ব্যতীত ইহায় আর কোন প্রমাণ রহিল না। প্রভু কিন্তু ইহার প্রমাণ পরে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি এক দিবস নীলাচলে, কথায় কথায় এই সমুদায় কথা অর্থাৎ যেরূপে নৃসিংহ তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিলেন, বলিলেন। প্রভু আরও বলিলেন, সমুদায় দ্রব্যই অতি চমৎকার পাক হইয়াছিল। এই কথা শুনিয়া তখন শিবানন্দের বিশ্বাস হইল যে, প্রকৃতই প্রভু তাঁহার বাটী যাইয়া তাঁহার দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন।

ইহাকে বলে 'আবির্ভাব'। অর্থাৎ প্রভু উদয় হইয়াছেন, কেহ কেহ দেখিতে পাইতেছেন, সকলে নহে, কেহ কেহ। এরূপ প্রভুর আবির্ভাব শচীর মন্দির প্রভৃতি নানাস্থানে হইত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শিবানন্দের সঙ্গে তাঁহার পত্নী ও পুত্র চলিয়াছেন, এবং অন্যান্য ভক্ত গৃহিণীও চলিয়াছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর মোদক ও তাঁহার ঘরনী চলিয়াছেন। ভক্তগণ নীলাচলে গমন করিলে সচেতন হয়েন, আর যত দিন তাঁহারা সেখানে বাস করেন ততদিন সেইরূপে থাকেন, থাকিয়া তাঁহার প্রাচীন দেশীয় ও গ্রামস্থ সঙ্গিগণের সহিত আলাপনাদি করেন। পরমেশ্বর যাইয়া প্রভুকে দণ্ডবৎ করিলেন। ইনি শুদ্ধ যে নবদ্বীপবাসী তাহা নহে, প্রভুর পাড়ায়, এমন কি তাঁহার বাড়ীর নিকট বাস করেন। কাজেই ছোট বেলা পরমেশ্বরের নন্দন মুকুন্দের সহিত প্রভু খেলা করিতেন। আর পরমেশ্বর প্রভুকে অনেক সন্দেশ খাওয়াইয়াছিলেন। এই পরমেশ্বর যখন আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, "আমি পরমেশ্বর," তখন প্রভু আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত হইয়া তাহাকে সহাস্যে আদর করিলেন
দেখিতে আসিয়াছ, বেশ করিয়াছ।' তখন পরমেশ্বর আহ্লাদে আর

থাকিতে না পারিয়া বলিতেছেন, "আমিও আসিয়াছি, মুকুন্দের মাও আসিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া প্রভু একটু সশঙ্ক হইলেন, ভাল মানুষ পরমেশ্বর হয় ত "মুকুন্দার মাকে" প্রভুর সম্মুখে আনিয়া ফেলিবে। কিন্তু পরমেশ্বর শুনিয়াছেন যে, প্রভুর নিকট "প্রকৃতির" যাইবার অধিকার নাই, তাই সস্ত্রীক না যাইয়া একক প্রভুর দর্শনে গিয়াছেন। যখন পরমেশ্বর ছোটবেলা প্রভুকে সন্দেশ খাইতে দিতেন, তখন আর জানিতেন না যে কিছু কাল পরে সেই সন্দেশপ্রিয়-বস্তুকে দেখিবার নিমিত্ত তাহার তিন সপ্তাহের পথ হাটিয়া যাইতে হইবে।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর অনেক শিষ্য; যেখানে তাঁহার শিষ্য সেইখানেই প্রেম। কেবল সেই প্রেমে একজন বঞ্চিত হইলেন, তিনি রামচন্দ্রপুরী ইনি যদিও মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য,—যে মাধবেন্দ্রপুরী মেঘ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইতেন, যে মাধবেন্দ্র 'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ' শ্লোক প্রকৃত করিয়া উচ্চারণ করিতে করিতে অন্তর্ধান করেন, যে মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈত আচার্য্য প্রভৃতি,—তবু রামচন্দ্র চিন্ময় নিরাকার ব্রহ্ম উপাসক। তিনি সোঽহং অর্থাৎ সেই আমি বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং কৃষ্ণ, কি কৃষ্ণপ্রেম এ সমুদায় তাঁহার নিকট আমোদের সামগ্রী। যখন মাধবেন্দ্র তাঁহার অপ্রকট কালে কৃষ্ণ পাইলাম না বলিয়া রোদন করিতেছিলেন, তখন রামচন্দ্র সেখানে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। উপদেশ দিবার এমন সুবিধা পূর্ব্বে কখন পান নাই। মাধবেন্দ্রের তেজে ও ভয়ে তাঁহার নিকটে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু তিনি মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, কাজেই বড় সুবিধা পাইয়া বলিতেছেন, 'গুরো! তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া রোদন করিতেছ? কাহার জন্য রোদন কর? তুমি যাহাকে কৃষ্ণ বল তুমিই সেই কৃষ্ণ না? তোমার কি বালকের ন্যায় বিচলিত হওয়া উচিত? রোদন না করিয়া সেই তোমার ব্রহ্মকে ধ্যান

কর।' তখন মাধবেন্দ্র ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "তোর উপদেশের প্রয়োজন নাই। একে কৃষ্ণ পাইলাম না সেই জ্বালায় আমি জর্জ্জরিত, তাহার উপরে তুই আসিয়া আমায় বাক্য যন্ত্রণা দিতে লাগিলি? তুই আমার সম্মুখ হইতে দূর হ! তোর ও-সমুদায় কর্কশ নাস্তিক-বাদ শুনিলে আমার পরকাল হইবে না!"

যদিও রামচন্দ্রপুরী তাঁহার গুরুর সহিত এই ব্যবহার করিলেন, কিন্তু ঈশ্বরপুরী গুরুর অপ্রকট সময়ে তাঁহার মলমূত্র পরিষ্কার করা পর্য্যন্ত অতি যত্ন করিয়া সেবা করিয়াছিলেন, তাহাতে তুষ্ট হইয়া মাধবেন্দ্র তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত কৃষ্ণপ্রেম দিয়া যান। সে যাহা হউক, সেই রামচন্দ্রপুরী ক্রমে এক অপরূপ সামগ্রী হইলেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, সুতরাং কোন কার্য্য মাত্র নাই,—কেবল ভ্রমণ, এক স্থানে বহুদিন থাকিতে পারেন না আপনার ভরণপোষণের কোন ভাবনা নাই, উহা সমাজের উপর। ভার। দেশ, মন্দির ও অতিথিশালায় পূর্ণ, সেখানে গেলেই হইল, অন্ন ও দুগ্ধ মিলিবে। সকল স্থানেই আদর। ভ্রমিতে ভ্রমিতে নীলাচলে প্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত। অন্যান্য সন্ন্যাসিগণ, এমন কি প্রভুর গুরুস্থানীয় পুরী ভারতী পর্য্যন্ত আসিলেও, তাঁহারা প্রভুর সম্মুখে নম্র থাকেন। কিন্তু রামচন্দ্রের সে ভাব নয়। প্রভু উঠিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, কারণ তিনি প্রভুর গুরুস্থানীয়, স্বয়ং পুরী গোসাঞিও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের ভাব যেন তিনি স্বয়ং মাধবেন্দ্র। প্রভু যখন প্রথমে পুরী ও ভারতী গোসাঞিকে প্রণাম করেন তখন তাঁহারা ভয় পাইয়াছিলেন, কিন্তু রামচন্দ্র সে ধাতের লোক নহেন।

জগদানন্দ তাঁহাকে যত্ন করিয়া ভিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। ভয়ে ভয়ে জগদানন্দ রামচন্দ্রকে বড় যত্ন করিলেন। রামচন্দ্রও উদর পূরিয়া ভোজন করিলেন, শেষে জগদানন্দকে সেই পাতে বসাইলেন, বসাইয়া যত্ন

করিয়া অনুরোধ করিয়া খুব এক পেট খাওয়াইলেন। আহার সমাপ্ত হইলে বলিতেছেন, "জগদানন্দ! তোমার রীতি কি? আমি সন্ন্যাসী, আমাকে এত যত্ন করিয়া খাওয়াইলে কেন? আমার ধর্ম্ম কিরূপে থাকিবে? তোমাদের চৈতন্যের গণের ভয় নাই যে, সন্ন্যাসিগণকে অধিক খাওইয়া তাঁহাদের ধর্ম্ম নষ্ট কর? তোমরা এত খাও? আমি শুনেছি যে তোমরা চৈতন্যের গণ বড়ই খাওয়ায় মজবুত, আজ তাহা চক্ষে দেখিলাম।"

ফলকথা, "চৈতন্যের গণ" খাওয়ায় মজবুত তাহার সন্দেহ নাই। কারণ চৈতন্যের গণের শুষ্ক ভজন নয়। তাঁহাদের দেহ ক্লিষ্ট করিয়া ইন্দ্রিয় বারণ করিতে হয় না। যাহারা দেহকে দুঃখ দিয়া ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বারণ করেন, তাহাদের কয়লা ধুইয়া উহাকে পরিষ্কার করার মত কার্য্য হয়। মাথা কুটিয়া, উপবাস ও দেহে কষ্ট দিয়া পবিত্র হওয়া যায় না। পবিত্র হইতে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। উদাহরণ দেখুন ব্রজগোপীগণ কি ব্রজগোপীর শিরোমণি রাধা। রাধা কিরূপে সুন্দরী হয়েন তাহা ত জানেন? তিনি বলিয়াছেন :—

ও অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার,
সোণার বরণ খানি।

শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম ও ভক্তিতে হৃদয়ে জাগরিত কর, করিয়া তাহার স্পর্শ সুখ অনুভব কর, এবং তখন তোমার সোণার বরণ হইবে।

রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে আসিয়াছেন, তাঁহার এক প্রধান উদ্দেশ্য প্রভুকে কোনরূপে জব্দ করা। প্রভুর মহিমা জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে, যাহারা তাঁহাকে শ্রীভগবান্ বলিয়া না মানে তাহারাও বলে যে তিনি পরম মহাজন। রাম-চন্দ্রপুরী হিংসুক, তাঁহার এ সব সহ্য হয় না। নীলাচলে আসিয়া প্রভুর নিকটে রহিলেন, প্রভুর গণ কর্ত্তৃক সেবিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার কার্য্য হইল প্রভুর ছিদ্র অন্বেষণ। প্রভু কি ভোজন করেন, কিরূপ শয়ন

করেন, কিরূপে দিনযাপন করেন, ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করেন, আর প্রকারান্তরে প্রভুর উপর বিদ্বেষ ভাব ব্যক্ত করেন। এইরূপে প্রভুর নিত্য সঙ্গী যত তাঁহাদিগের নিকট গমন করেন, করিয়া প্রভু সম্বন্ধে সমুদায় গুপ্ত কথা বাহির করার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছু নাই, তাই পান না। ভক্তগণ যে এত সহ্য করিতেছেন সে কেবল প্রভুর অভিপ্রায়ে। ভক্তগণের নিকট প্রভুর নিন্দা করেন, বলেন যে চৈতন্যের ইন্দ্রিয় বারণ কিরূপে হইবে, মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিলে কি ইন্দ্রিয় বারণ হয়? ভক্তগণ নিতান্ত প্রভুর দিকে চাহিয়া সহ্য করিয়া থাকেন। প্রভু রামচন্দ্রের ব্যবহার যদিও সব জানিতেছেন, তবু তিনি উপস্থিত হইলে অতি নম্র হইয়া তাঁহার সহিত ব্যবহার করেন।

রামচন্দ্র আর কোন দোষ না পাইয়া একদিন প্রভুর সম্মুখে বলিতেছেন, "এখানে পীপিড়া বেড়ায় কেন? অবশ্য এখানে মিষ্টান্ন ব্যবহার হয়।" এ পর্যন্ত রামচন্দ্রপুরী সাহস করিয়া প্রভুর সম্মুখে কিছু বলিতে পারেন নাই। ক্রমে দেখিলেন যে, প্রভু নিরীহ কিছুই বলেন না। তাই পরিশেষে প্রভুকে তাঁহার সম্মুখে নিন্দা করিলেন। কথা এই, প্রভু জীবকে তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন। রামচন্দ্র, সম্বন্ধে গুরুস্থানীয়, তাই তাঁহাকে বাহ্যে ভক্তি করেন। যদিও বাহ্যে ভক্তি করেন, কিন্তু অন্তরে তাঁহার কার্য্যকে ঘৃণা করেন। রামচন্দ্র প্রথমে ভয়ে ভয়ে প্রভুর সহিত ব্যবহার করিতেন। পরে দেখিলেন যে প্রভু কিছু বলেন না। ক্রমে ভয় ভাঙ্গিতে লাগিল, শেষে প্রভুর সম্মুখে প্রভুকে নিন্দা করিলেন।

নিন্দা কি করিলেন তাহা উপরে বলিলাম। আর কোন দোষ পাইলেন না, পাইলেন যে প্রভুর বাড়ীতে পীপিড়া, অতএব প্রভু মিষ্টান্ন ভোজন করেন। যেহেতু সন্ন্যাসীর মিষ্টান্ন ভোজন করিতে নাই। রামচন্দ্র এই কথা বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

প্রভু গোবিন্দকে ডাকাইয়া বলিলেন, পূর্ব্বাবধি আমার ভিক্ষার নিয়ম ছিল চারিপণ, তাহাতে তোমার আমার আর কাশীশ্বরের হইত, অদ্যাবধি তাহার সিকি আনিবে। ইহার অন্যথা কর, আমাকে এখানে পাইবে না।

প্রভু যদি আহার প্রায় ত্যাগ করিলেন, ভক্তগণ মাত্র তাহাই করিলেন। প্রভু অনশনে, তাঁহারা কিরূপে ভিক্ষা করিবেন? সকলের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন তাঁহারা যাইয়া প্রভুকে ঘিরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, 'আপনি রামচন্দ্রপুরীর কথায় আপনাকে ও আমাদিগকে কেন বধ করিতেছেন? তিনি হিংসুক, আপনার কিম্বা জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি আপনার ভিক্ষাপদ্ধতি দূষেণ নাই, কেবল তাঁহার কুপ্রবৃত্তি তৃপ্তি করার নিমিত্তই তিনি ঐরূপ নিন্দাবাদ করিয়াছেন।" কিন্তু প্রভু জীবকে শিক্ষা দিতে এই জগতে আসিয়াছেন। সেই শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ঢণাদপি শ্লোক করিয়াছেন। তিনি আর কি করিবেন? যখন ভক্তগণ রামচন্দ্রপুরীকে গালি দিতে লাগিলেন, তখন প্রভু তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, পুরী গোসাঞির দোষ কি? তিনি সহজ ধর্ম্ম বলিয়াছেন। সন্ন্যাসী ব্যক্তির জিহ্বা লালসা থাকা ভাল নয়।

এদিকে পুরী গোসাঞি মহা খুসি। এতদিন কিছু করিতে পারেন নাই, এখন, খানিক অনিষ্ট করিতে যে তাঁহার ক্ষমতা আছে তাহা দেখাইতে পারিয়াছেন। প্রভুর নিকটে আসিয়া মধুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন, "শুনি তুমি নাকি অর্দ্ধাশন কর? সে ভাল নয়, যাহাতে দেহরক্ষা হয়, এরূপ আহার করা কর্ত্তব্য। শরীর ক্ষীণ হইলে ভজন করিবে, কিরূপে?' প্রভু অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "আমি আপনার বালক আপনি যে আমাকে শিক্ষা দেন, এ আমার পরম ভাগ্য।" রামচন্দ্রপুরী প্রভুর ছিদ্রান্বেষণ করিয়া কিছু পাইলেন না। আবার প্রভুর চিত্তচাঞ্চল্য পর্য্যন্ত জন্মাইতে পারিলেন না।

অবস্থা বিবেচনা করুন। তুমি রামচন্দ্র, প্রভুর পিতৃস্থানীয়। তিনি তোমাকে সেই সম্পর্কের নিমিত্ত সেইরূপ ভক্তি করেন। যে প্রভু তোমাকে এত ভক্তি করেন তিনি জগৎ পূজ্য। যেরূপ পিতাকে পুত্রের করা উচিত, তিনি তোমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করেন। কিন্তু তুমি কর কি? না, কিসে তাহার দোষ পাইবে। আবার প্রভুর প্রকাণ্ড দেহ, যেরূপ দেহ সেইরূপ ভোজন চাই, কারণ তুমি তোমার নিজের কথায় প্রকাশ কর যে দেহ ক্ষীণ করিলে ভজন চলে না। কিন্তু তুমি তাঁহার ভোজন কমাইয়া তাহাকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। শুধু তাহা নয়, তাঁহার প্রিয় ভক্তগণকে পর্য্যন্ত বধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তোমার এইরূপ কুচরিত্র যে, প্রভুর আর কোন ছিদ্র না পাইয়া বাড়ীতে পিঁপিড়া বেড়ায় এই কথা তুলিয়া তাহাকে দূষিতে ছাড় নাই। ইহার কিছুতেই প্রভুর চিত্ত বিচলিত হইল না। বরং ভক্তগণ যখন রামচন্দ্রকে দূষিলেন, তখন প্রভু রামচন্দ্রের পক্ষ হইয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন। জীবে এরূপ সহিষ্ণুতা দেখাইতে পারে না।

একবার শ্রীল নারদ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া দেখেন যে দ্বারে এক জন দাঁড়াইয়া, তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। তিনি পরম সুন্দর, ঠিক ঠাকুরের মত। নারদ, ঠাকুর ভাবিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, সেই ভদ্র লোক তটস্থ হইয়া নারদকে প্রতিপ্রণাম করিয়া বলিলেন যে, তিনি ঠাকুর নন, তাঁহার দাসানুদাস। নারদ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "তবে তোমার বপু ঠাকুরের ন্যায় কেন?" তিনি বলিলেন, ঠাকুর কৃপা করিয়া তাঁহাকে ঐরূপ করিয়াছেন, কারণ তিনি একজন পিপাসাতুরকে জল দিয়াছিলেন। নারদ অগ্রবর্ত্তী হইলেন, দেখেন সকলেই ঐরূপ চতুর্ভুজ; ঠিক ঠাকুরের মত। ভয়ে আর কাহাকে প্রণাম করেন না। তবে আর দুই চারি জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা কি পুণ্যে ঠাকুরের বপু

পাইয়াছেন? সকলেই অতি সামান্য কারণ বলিলেন। কেহ বটবৃক্ষে জল দিয়াছিলেন, কেহ তাঁহার কৃষ্ণনামা পুত্রকে কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতেন, এই সমুদায় সামান্য কারণে তাঁহারা এত কৃপা পাইয়াছেন। তল্লাস করিতে করিতে শ্রীনারদ, ঠাকুরকে পাইলেন। নারদ বলিলেন, ঠাকুর একি ভঙ্গী? ইঁহাদের প্রতি এত কৃপা কেন? ঠাকুর বলিলেন; ইঁহারা ইঁহাদের গুণে আমাকে ক্রয় করিয়াছেন, তাই আমার বন্ধু পাইয়াছেন। নারদ একটু ভাবিয়া বলিলেন, ইঁহাদের সঙ্গে কি আপনার কোন বিভিন্নতা নাই? ঠাকুর বলিলেন, কই বিশেষ কিছু নয়। নারদ আবার বলিলেন, তবে বিশেষ কিছু আছে, সেটুকু কি? তখন ঠাকুর ঈষৎ হাস্য করিয়া আপনার দেহের ভৃগুপদচিহ্ন দেখাইলেন! বলিলেন, এইটা উঁহারা পান নাই।

ইহার তাৎপর্য্য পাঠক অবশ্য বুঝিয়াছেন। মুনিদের মধ্যে বিচার হইতেছে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইঁহাদের মধ্যে কে বড়! ইহা সাব্যস্ত করিবার ভার ভৃগু পাইলেন। তিনি প্রথমে ব্রহ্মার নিকট যাইয়া তাঁহাকে গালি দিলেন, ব্রহ্মা তাহাতে ক্রোধ করিয়া ভৃগুকে বধ করিতে আসিলেন। তাহার পরে শিবের নিকট গেলেন। তিনিও গালি সহ্য করিতে পারিলেন না। পরে বৈকুণ্ঠে গেলেন, যাইয়াই কিছু না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে পদাঘাত করিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ তটস্থ হইয়া ভৃগুকে অনেক স্তুতি করিলেন। ভৃগু তখন কৃষ্ণের চরণে পড়িলেন, পড়িয়া ক্ষমা চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, অদ্যাবধি তোমার এই পদচিহ্ন আমার প্রধান ভূষণ হইল। কথা এই, শ্রীভগবানের যে দীনতা ও সহিষ্ণুতা তাহা জীবে অনুকরণ করিতে পারে না।

রামচন্দ্রপুরী পরে নীলাচল ত্যাগ করিলেন, কারণ যাহাদের কোন কার্য্য নাই তাহারা একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারে না। তিনি এক

কার্য্য করিয়া গেলেন। প্রভুর ভোজন অর্দ্ধেক কমাইয়া গেলেন। পূর্ব্বের নিয়ম ছিল চারিপণ, সেই অবধি নিয়ম হইল দুই পণ। প্রভুর আহার লঘু হইল, কাজেই দেহ শীর্ণ হইতে লাগিল। প্রভু এ লীলা করিলেন কেন, বোধ হয় জীবের কঠিন হৃদয় দ্রব করিবার নিমিত্ত। কারণ সেই পরম সুন্দর যুবা পুরুষ অনাহারে ক্রমে জীর্ণ হইতেছেন, ইহা যে দেখিত, তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইত।

নবম অধ্যায়

প্রভুর শরীর কৃষ্ণবিরহে জর জর, রোদনে প্রত্যহ কত কলস—কত শত কলস—নয়ন জল ফেলিতেছেন। কত শত কলস বলিলাম ইহা অত্যুক্তি নয়। প্রভু যখন নৃত্য করেন তখন তাঁহার নয়ন দিয়া যেন বর্ষা উপস্থিত হয়, সুতরাং তাঁহার চতুঃপার্শ্বে যাঁহারা থাকেন, মহাবৃষ্টিতে লোকে যেরূপ হয়, তাঁহারা সেইরূপ আর্দ্র হয়েন। প্রভু একটু নৃত্য করিলে সেই স্থান কর্দ্দমময় হয়। একটী প্রাচীন ছবিতে দেখিবেন যে, প্রভু সমুদ্রতীরে ভক্তগণ সহিত নৃত্য করিতেছেন, আর সে স্থান যদিও বালুকাময়, তবু কর্দ্দমময় হইয়াছে। ইহাতে হইয়াছে কি না, সেই কর্দ্দমে প্রভুর নৃত্যকালীন পায়ের দাগ পড়িয়া গিয়াছে। পায়ের দাগ দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সেখানে শত শত কলস নয়ন জল ফেলা হইয়াছে। প্রভু ক্রমে ক্ষীণ হইতেছেন। সেই পরম সুন্দর দেহে অস্থি প্রকাশ পাইতেছে। প্রভু কঠিন মৃত্তিকায় শয়ন করেন, অস্থিতে অঙ্গে ব্যথা লাগে। প্রভু একখানি শুষ্ক কলার পাতায় শয়ন করেন।

জগদানন্দ ইহাতে একটী উপায় ভাবিলেন। প্রভুর পরিত্যক্ত বহি-র্ব্বাস দ্বারা একটী ক্ষুদ্র বালিশ আর একটী তোষক করাইলেন। এই দুই দ্রব্য স্বরূপকে দিয়া বলিলেন, "প্রভুকে ইহার উপরে শয়ন করাইও।" স্বরূপ ইহাতে অতি সন্তুষ্ট হইলেন। কারণ প্রভু যে দুঃখে শয়ন করেন, ইহা তাঁহার কি কাহারও প্রাণেই সহ্য হয় না। প্রভু শয়ন করিতে যাইয়া দেখেন যে তোষক ও বালিস, ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেন, বালিস ও তোষক দূরে ফেলিলেন। বলিলেন "এ কে করিল?"

স্বরূপ বলিলেন, "জগদানন্দ।" তখন প্রভু একটু ভয় পাইলেন। যদি প্রভু বড় বাড়াবাড়ি করেন তবে জগদানন্দ উপবাস করিয়া পড়িয়া থাকিবেন। কাজেই প্রভু আস্তে আস্তে বলিতেছেন, "জগদানন্দের এ বড় অন্যায়। আমাকে তিনি বিষয় ভুঞ্জাইতে চাহেন। যদি তোষক বালিস আনিলে, তবে একখান খাট আনো, পা টিপিবার ভৃত্য আনো, তাহা হইলে তোমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।" স্বরূপ জগদানন্দের উপর দোষ দিয়া বলিতেছেন, "আপনি উপেক্ষা করিলে জগদানন্দ বড় দুঃখিত হইবেন।" কিন্তু প্রভু শুনিলেন না।

তখন স্বরূপ ভক্তগণের সহিত পরামর্শ করিয়া আর একরূপ শয্যা প্রস্তুত করিলেন। শুষ্ক কলার পাতা আনিয়া তাহা অতি সূক্ষ্ম করিয়া চিরিলেন। এই সমুদায় প্রভুর বহির্ব্বাসে পূরিলেন ও এইরূপে তোষক ও বালিস হইল। ভক্তগণ তখন প্রভুকে ধরিয়া পড়িলেন, প্রভু ভক্তের অনুরোধে এই শয্যায় শয়ন করিতে সম্মত হইলেন।

এদিকে প্রভু ক্রমেই বিহ্বল হইতেছেন। প্রভুর দেহ নীলাচলে, হৃদয় ব্রজে। প্রভু বাহিরে, অন্যে যাহা দেখে, তাহা দেখিতে পান না। আবার প্রভু যাহা দেখেন তাহা অন্যে দেখিতে পায় না। ইহাকে বলে দিব্যোন্মাদ। সম্মুখে নারিকেলের গাছ, প্রভু দেখিতেছেন সেটি কদম্ব

বৃক্ষ। লোকে দেখিতেছে বৃক্ষে ফল ঝুলিতেছে, প্রভু দেখিতেছেন শ্যাম-সুন্দর কদম্ব বৃক্ষে শ্রীপাদ ঝুলাইয়া বেণুগান করিতেছেন।

জগদানন্দ গৌড়ে গিয়াছেন। যথা কল্পতরু ৪র্থ শাখা :—

নীলাচল হৈতে, শচীরে দেখিতে,
আইসে জগদানন্দ।
রহি কথোদূরে, দেখে নদীয়ারে,
গোকুলপুরের ছন্দ॥
ভাবিছে পণ্ডিত রায়। ধ্রু।
পাই কি না পাই, শচীরে দেখিতে,
এই অনুমানে যায়॥
লতা তরু যত, দেখে শত শত,
অকালে খসিছে পাতা।
রবির কিরণ, না হয় স্ফুটন,
মেঘগণ দেখে রাতা॥
ডালে বসি পাখী, মুদি দুটি আঁখি,
ফল জল তেয়াগিয়া।
কান্দয়ে ফুকরি, ডুকরি ডকরি,
গোরাচাঁদ নাম লৈয়া॥
ধেনু যূথে যূথে, দাঁড়াইয়া পথে,
কার মুখে নাহি রা॥
মাধবী দাসের, ঠাকুর পণ্ডিত,
পড়িল আছাড়ৈ গা॥

ক্ষণেকে রহিয়া, চলিলা উঠিয়া,
পণ্ডিত জগদানন্দ।
প্রবেশি নগরে, দেখে ঘরে ঘরে,
লোক সব নিরানন্দ॥
না মেলে পসার, না করে আহার,
কারো মুখে নাহি হাসি।
নগরে নাগরী, কান্দয়ে গুমরি,
থাকয়ে বিরলে বসি॥
দেখিয়া নগর, ঠাকুরের ঘর,
প্রবেশ করিল যাই।
আধ মরা হেন, ভূমে অচেতন,
পড়িয়া আছেন আই॥
প্রভুর রমণী, সেহো অনাথিনী,
প্রভুরে হইয়া হারা।
পড়িয়া আছেন, মলিন বয়ন,
মুদল নয়ানে ধারা॥
দাসদাসী সব, আছয়ে নীরব,
দেখিয়া পথিকজন।
সুধাইছে তারে, কহ দেখি মোরে,
কোথা হৈতে আগমন॥
পণ্ডিত কহেন, মোর আগমন,
নীলাচল পুর হৈতে।
গৌরাঙ্গ সুন্দর, পাঠাইলা মোরে,
তোমা সভারে দেখিতে॥

শুনিয়া বচন, সজল নয়ন,
শচীরে কহল গিয়া।
আর একজন, চলিল তখন,
শ্রীবাস মন্দিরে ধাইয়া॥
শুনিয়া শ্রীবাস, মালিনী উল্লাস,
যত নবদ্বীপবাসী।
মরা হেন ছিল, অমনি ধাইল,
পরাণ পাইল আসি॥
মালিনী আসিয়া, শচী বিষ্ণুপ্রিয়া,
উঠাইল যতন করি।
তাহারে কহিল, পণ্ডিত আইল,
পাঠাইল গৌরহরি॥
শুনি শচী আই, চমকিত চাই,
দেখিলেন পণ্ডিতেরে।
কহে তাঁর ঠাই, আমার নিমাই,
আসিয়াছে কত দূরে॥
দেখি প্রেমসীমা, স্নেহের মহিমা,
পণ্ডিত কান্দিয়া কয়।
সেই গৌরমণি, যুগে যুগে জানি,
তুয়া প্রেমবশ হয়॥
হেন নীত রীত, গৌরাঙ্গ চরিত,
সভাকারে শুনাইয়া।
পণ্ডিত রহিলা, নদীয়া নগরে,
সভাকারে সুখ দিয়া॥

চন্দ্রশেখর; পশুর সোসর,
বিষয় বিশেষে প্রীত।
গৌরাঙ্গ চরিত, পরম অমৃত,
তাহাতে না লয় চিত॥

এইরূপ জগদানন্দ মাঝে মাঝে গমন করেন, পূর্ব্বে বলিয়াছি। শচী-মাতার নিকট যাইয়া প্রভুর নাম করিয়া প্রণাম করিলেন, আর সেই রাজদত্ত বহুমূল্য শাটী ও মহাপ্রসাদ দিলেন। এইরূপে নিমাইয়ের কথা আরম্ভ হইল। বক্তা জগদানন্দ, শ্রোতা শচী, আর একটু অন্তরালে প্রিয়া ঠাকুরাণী।

পণ্ডিত বলিতেছেন, "মা, শ্রবণ কর, প্রভু কি বলিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ আসিয়া তোমার চরণ বন্দন করেন। আর যে দিন নিতান্ত তুমি তাঁহাকে ভঞ্জাইতে ইচ্ছা কর, সেই দিবসই তিনি আসিয়া ভোজন করিয়া থাকেন।" শচী বলিলেন, "সে ঠিক কথা, কিন্তু সে কি সত্য নিমাই আইসে? আমার স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয়। আমি নানাবিধ শাক, মোচার ঘণ্ট প্রভৃতি রন্ধন করিয়া বাসয়া রোদন করি। এমন সময় দেখি নিমাই আসিল, বসিল, আমি যত্ন করিয়া তাহাকে খাওয়াইলাম। তাহার পরে যেন চেতনা লাভ করি, আর বোধ হয় সমুদায় স্বপ্ন দেখিলাম।" জগদানন্দ বলিলেন, "প্রভু তোমাকে তাহাই বলিতে আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। তিনি তোমার সেবা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মনে বড় দুঃখ পাইয়াছেন, কিন্তু যাহা করিরা ফেলিয়াছেন তাহাতে আর উপায় নাই। তবে এখন যত দূর পারেন তোমার দুঃখ নিবারণ করিবেন। তিনি সেই নিমিত্ত সত্যই তোমার সম্মুখে বসিয়া আহার করেন।" এইরূপ

কখন জগদানন্দ কখন বা দামোদর প্রভুর সন্দেশ আনিয়া শচীমাতাকে ও প্রিয়াজী ঠাকুরাণীকে সান্ত্বনা করেন।

জগদানন্দ পরিশেষে ভক্তের বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রভু সকলের নিমিত্ত কিছু কিছু মহাপ্রসাদ পাঠাইয়াছেন। পুরীর মন্দিরের মহাপ্রসাদ মহাপ্রভুর প্রতাপের এক সাক্ষী, পুরীর ঠাকুর তাঁহার আর এক সাক্ষী। ঠাকুর কে, না জগন্নাথ অর্থাৎ জগতের নাথ, জীব মাত্রের ঠাকুর, ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুসলমান বর্ব্বর, সকলের তিনি ঠাকুর। অতএব একমেবাদ্বিতীয়ং, ঈশ্বর এক, তাঁহার দ্বিতীয় নাই। তিনি সকলের নাথ বা পিতা। তাই তাঁহার নাম জগন্নাথ, জগতের নাথ।

অতএব মনুষ্য মনুষ্যের ভ্রাতা। মনুষ্যের মধ্যে পদে ছোট বড় নাই, সকলে সমান। সকলেই তাঁহার দাস তাঁহার ইচ্ছার একান্ত অধীন। অতএব আমি ব্রাহ্মণ এ দম্ভ কেবল বিড়ম্বনা, আর আমি মুচি এ ক্ষোভ কেবল স্বপ্ন বই নয়। জীব মাত্রে সমান, ব্রাহ্মণ শূদ্র বলিয়া যে ভেদ ইহা মনের ভ্রম, ভগবানের নিকট বিষম অপরাধ। শ্রীজগন্নাথ ইহার হাতে এক সাক্ষী দিতেছেন। অতি তেজস্বী যে ব্রাহ্মণ তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইল যে ঈশ্বর এক, জীব মাত্র তাঁহার সন্তান, আর তাঁহার চক্ষে ব্রাহ্মণ শূদ্র এ ভেদ নাই।

অতএব, হে ব্রাহ্মণ, শূদ্রের অন্ন তুমি কেন গ্রহণ করিবে না? কিন্তু ব্রাহ্মণ ঠাকুর ইহার অন্য কোন উত্তর করিতে না পারিয়া বলিলেন, "শূদ্রের অন্ন যে গ্রহণ করি না তাহার কারণ আর কিছুই নয়, তাহাদের আচার ভাল নয়।" ব্রাহ্মণ ঠাকুর এইরূপে নানা কারণ দেখাইলেন, কেন তিনি শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করেন না। শূদ্র যদি শ্রীকৃষ্ণের জীব হইল, তবে শূদ্র যদি তাঁহাকে অন্ন দেয় তবে তিনি, শ্রীকৃষ্ণ, কি তাহা গ্রহণ করেন না? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, "যিনি বিদুরের খুদ খাইয়াছিলেন, যিনি

সকলের পিতা, তিনি অবশ্য শূদ্রের দত্ত অন্ন খাইবেন।" তাহা যদি হইল তবে শূদ্রের দত্ত অন্ন সেই পবিত্রের পবিত্র শ্রীভগবান গ্রহণ করেন তুমি মানব, ব্রাহ্মণ সত্য, তবু কৃষ্ণের দাস, ক্ষুদ্রকীট, তুমি কেন তাহা গ্রহণ করিবে না? এই কথায় ব্রাহ্মণ নিরস্ত হইলেন। আর ঠাকুরের মহাপ্রসাদ প্রচলিত হইল। শূদ্রের অন্ন ব্রাহ্মণকে খাইতে হইল। *

মহাপ্রভু এ লীলা কিরূপে করিলেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতের পণ্ডিত, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাহার কতবো নাস্তিকতা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভক্ত হইলেন, প্রভুর নিকট প্রেম ও ভক্তি পাইলেন, তবু বৈষ্ণব হইতে পারিলেন না। পূর্ব্বকার যে ব্রাহ্মণ তাহাই রহিলেন, মনের জাড্য গেল না। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা শত সহস্র নিয়ম করিয়া তাঁহাদের শিষ্যগণকে ও সেই সঙ্গে আপনাদিগকে বন্ধন করিয়াছেন, আপনারা সে নিয়ম পালন না করিলে অন্যে মান্য করে না; সুতরাং আপনাদের সে সমুদায় নিয়ম পালন করিতে হয়। এইরূপে আপনারা সামাজিক নিয়মের এরূপ দাস হইয়াছেন যে, সে সমুদায় বাহ্যের নিয়ম পালন করিতেই তাহাদের চির জীবন যায়. প্রকৃত সাধন ভজন হয় না। কিন্তু প্রভুর সরল ধর্ম্মে সে সমুদায় বন্ধন থাকিল না। যে প্রকৃত বৈষ্ণব তাঁহার "বাহ্য-প্রতারণা" নাই। ভারতী ঠাকুর চর্ম্মের বহির্ব্বাস পরিধান করিয়াছিলেন, তাই প্রভু তাঁহাকে প্রণাম করেন নাই। এমন কি বৈষ্ণবের সন্ন্যাস নাই। তাই প্রভু আপনার সন্ন্যাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"কি কাজ সন্ন্যাসে মোর, প্রেম নিজ ধন।"

* একজন খৃষ্টিয়ান মহাপ্রসাদ কিনিয়া একটী ব্রাহ্মণের হস্তে দিল। মনে ইচ্ছা ব্রাহ্মণঠাকুরকে জব্দ করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণঠাকুর কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া তাহা বদনে দিলেন। এ কথা হণ্টর সাহেবের গ্রন্থে লিখিত আছে।

কথাটী একবার মনোযোগ দিয়া বিচার করুন। অবতার বলিতে জগতে শ্রীভগবানের, কি তাঁহার অংশের উদয়। অবতার আর শাস্ত্র, ইহার মধ্যে অবতার বড়, যেহেতু যদিও শাস্ত্রাজ্ঞা ঈশ্বরের আজ্ঞা বলিয়া গৃহীত হয়, তবু সে আজ্ঞা প্রত্যক্ষ নয়। অবতারবাক্য ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আজ্ঞা, অতএব শাস্ত্র অপেক্ষা অবতারবাক্য বড়। হিন্দুগণ যে শাস্ত্র মানেন, সার্ব্বভৌম সেই শাস্ত্র মানিতেন। কিন্তু মনের জড়তা থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম উদয় হয় না, তাই প্রভু প্রত্যুষে তাঁহার হাতে "মহাপ্রসাদ" অর্থাৎ শুষ্ক গোটা কয়েক পক্কান্ন দিলেন, দিয়া বলিলেন, "গ্রহণ কর।" মনে ভাবুন, ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, নিদ্রা হইতে উঠিয়া, মুখ না ধুইয়া, বস্ত্র ত্যাগ না করিয়া, কি কখন মুখে অন্ন দিতে পারেন? লক্ষবার মরিলেও নয়। কিন্তু মহাপ্রভু যখন সার্ব্বভৌমের হস্তে মহাপ্রসাদ দিলেন তখন সার্ব্বভৌম উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, প্রাপ্তিমাত্রই ভক্ষণ করিলেন। তাই মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজি আমার সমুদায় সাধ পূর্ণ হইল, যেহেতু মহাপ্রসাদে তোমার বিশ্বাস হইল। আজি তুমি প্রকৃতই কৃষ্ণের আশ্রয় লইলে। আজি তোমার বন্ধন ছিন্ন হইল। আজি তোমার মন শুদ্ধ হইল। যেহেতু আজি বেদ-ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া তুমি মহাপ্রসাদে বিশ্বাস করিলে।" অতএব বৈষ্ণবধর্ম্মে বৈদিক নিয়ম নাই, বৈষ্ণবধর্ম্মে সন্ন্যাস নাই, কঠোরতা নাই, খুটিনাটি নাই।

সনাতন সংসার ত্যাগ করিলেন, করিয়া বারাণসীতে প্রভুর নিকট গমন করিলেন। প্রভু তাঁহার গাত্রে, তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত প্রদত্ত ভোটকম্বল দেখিয়া, বারংবার তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিলেন। সনাতন, প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া আপনার ভোটকম্বল একজন কান্থাধারীকে দিয়া তাহার কান্থা আপনি লইলেন। প্রভু, সনাতনের গাত্রে কান্থা দেখিয়া বড় সুখী হইলেন। আবার রামানন্দ রায় বাবু লোক, দোলায়

ভ্রমণ করেন, তিনি সাড়ে তিনজনের মধ্যে একজন। অতএব এই দুইটী উদাহরণ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, বৈষ্ণব বেদবিধির বাহিরে।

যখন এই ধর্ম্ম ভারতে প্রবেশ করিবে, তখন ভারতে জাতি বিচার, বর্ণ বিচার, ছোট বড় বিচার থাকিবে না। হে গৌরভক্তগণ! তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। ভারতের উন্নতি কর। বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত সে উন্নতির উপায় নাই। তাই মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েন। ভারতবর্ষবাসিগণের এক ঠাকুর লইয়া এক জাতি হওয়া উচিত। তবেই তাঁহারা সজীব হইবেন।

নীলাচলে মহাপ্রসাদকে কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারে না, অন্য স্থানে সে মহাপ্রসাদের অনাদর কেন? যদি ঠাকুরকে নিবেদন করিলে সে দ্রব্য পবিত্র হইল, তবে এরূপ বস্তু সর্ব্ব স্থানেই সেইরূপ আদরের হওয়া উচিত। কিন্তু বৈষ্ণবগণ তাহা করেন না, করিতে পারেন না, কারণ সমাজের ভয় করেন। তাহাদের মনের ভূত যায় না। মহাপ্রসাদের গেল এই আদর, আবার মহাপ্রসাদ অপেক্ষাও অধিক প্রকার দ্রব্য আছে, যথা:—

"কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহা মহাপ্রসাদাখ্যান॥"—চরিতামৃত।

ভক্ত, মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া যাহা রাখেন, তাহা মহাপ্রসাদ অপেক্ষা আরো পবিত্র। কবিরাজ গোস্বামী, এই বাক্য কালিদাসের কাহিনী বর্ণনা করিয়া সপ্রমাণ করিতেছেন। ইনি কায়স্থ, পরম বৈষ্ণব, বৈষ্ণব মাত্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন। ক্ষুদ্র জাতি বলিয়া উপেক্ষা করেন না। ঝড়ু ঠাকুর জাতিতে ভূমিমালী, পরম বৈষ্ণব। কালিদাস তাঁহার নিকট প্রসাদ চাহিলেন। তিনি দিলেন না। পরে ঝড়ু ঠাকুর আম্র ভক্ষণ করিয়া যে আঁটি ফেলিয়াছেন, কালিদাস তাহা গোপনে চুষিয়া খাইয়া

ছিলেন। এই তাঁহার সেবা, কেবল বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া বেড়ান। সেই কালিদাস যখন মহাপ্রভু দর্শনে নীলাচলে আসিলেন, তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে বড় কৃপা করিলেন। যদি জগন্নাথের প্রসাদ পবিত্র বস্তু হয়, তবে গোপীনাথ কি মদনমোহন ঠাকুরের প্রসাদ উচ্ছিষ্ট কেন হইবে? যদি ঝড়ু ঠাকুরের প্রসাদ মহাপ্রসাদ হইল, তবে আর জাতিভেদ কোথায় থাকিল?

জগদানন্দ শ্রীনবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচল অভিমুখে যাইতে অদ্বৈতের নিকট চলিলেন। সেখান হইতে বিদায় হইয়া মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া শ্রীনবদ্বীপের ভক্তগণের সংবাদ সমুদায় বলিলেন। তাহার পরে বলিতেছেন, "শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আপনাকে একটী তরজা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, সে তরজাটী এই—

"প্রভুকে কহিও আমার কোটী নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার॥
বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল॥"

জগদানন্দ এই তরজা বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। যাঁহারা শুনিলেন তাঁহারাও হাসিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং ঈষৎ হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "তাঁহার যে আজ্ঞা।" সকলে ভাবিলেন এ একটী রহস্য বাক্য বই নয়, কিন্তু স্বরূপ তাহা ভাবিলেন না। তিনি একটু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, এ তরজার অর্থ কিছু বুঝিতে পারিলাম না, আপনি বুঝাইয়া বলুন।" মহাপ্রভু বলিলেন, "শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য আগম শাস্ত্রে পণ্ডিত। সেই শাস্ত্র বিধি অনুসারে অগ্রে দেবতাকে আহ্বান করা হয়,

করিয়া তাঁহাকে কিছুকাল পূজা করা হয়, পূজা সমাপ্ত হইলে তাঁহাকে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। আচার্য্য বোধহয় তাহাই বলিতেছেন আর কিছুই নয়। তবে আমিও তাঁহার মন বুঝিতে পারি না।"

এই কথা শুনিয়া সকলে বিশেষতঃ সরূপ অবাক হইলেন, যেহেতু তিনি বুঝিলেন যে এই তরজার মধ্যে "সর্ব্বনাশ" রহিয়াছে।

এই তরজার অর্থ লইয়া মহা মহা পণ্ডিতগণ অনেক বিচার করিয়াছেন। আমার পাণ্ডিত্য নাই, তবে আমি ইহার সহজ কি মানে বুঝিয়াছি বলিতেছি। শ্রীমহাপ্রভু এক বাউল মহাজন। আর শ্রীঅদ্বৈত আর এক বাউল, উপরি উক্ত মহাজনের অধীন। শেষোক্ত বাউল অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত পূর্ব্বোক্ত মহাজন অর্থাৎ মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া নিবেদন করিতেছেন, "হাটে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত চাউল আনা হইয়াছিল, লোকে চাউল পাইয়া আউল হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের অভাব পূর্ণ হইয়াছে। সুতরাং আর চাউল বিক্রয় হইতেছে না।" এখন ইহার বিচার করুন।

"মহাপ্রভু মহাজন" তদীয় সাঙ্গোপাঙ্গাদি লইয়া জীবের যে আহার চাউল অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি তাহাই বিক্রয় করিতে ভবের হাটে আসিয়াছিলেন। তিনি কেন আসিয়াছিলেন? যেহেতু দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, লোকের গৃহে তণ্ডুল মাত্র ছিল না, জীবে হাহাকার করিতেছিল। অর্থাৎ জগতে কৃষ্ণভক্তি ছিল না, সেই নিমিত্ত মহাপ্রভু মহাজন ভবের হাটে সাঙ্গোপাঙ্গাদি সহ আসিয়া অতি অল্পমূল্যে চাউল অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি বেচিতে লাগিলেন। কোথাও বা বিনামূল্যে বিতরণ করিলেন, কোথাও বুভুক্ষুলোকে চাউল ক্রয় করিতে লাগিল। লোকের গোলা পূর্ণ হইল। আর চাউল বিকাইতেছে না। তাই যিনি দুর্ভিক্ষের সংবাদ দিয়া মহাজন মহাপ্রভুকে ভবের হাটে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি, অর্থাৎ

শ্রীঅদ্বৈত, মহাজনকে অর্থাৎ প্রভুকে সমাচার দিতেছেন যে, চাউল আর বিকাইতেছে না, লোকের ঘর পূরিয়া গিয়াছে, এখন যাহা কর্ত্তব্য তাঁহা করুন, অর্থাৎ এখানে আমাদের থাকিবার প্রয়োজন নাই।

এই তরজাটী শ্রীচরিতামৃতে আছে। আর একটী ঘটনা পাঠক স্মরণ করুন। প্রভু উপবীত কালে এক দিবস একটী সুপারী খাইয়া অচেতন হইয়া পড়েন। তাহার পরে তেজস্কর দেহ ধরিয়া জননীকে বলেন যে, "আমি এই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিলাম।" তাহার পরে প্রভু "প্রকাশ" পর্য্যন্ত এইরূপ মুহুর্মুহু লীলা করিয়াছেন। শ্রীভগবান প্রকাশ হইলেন, পরে বলিলেন, "আমি চলিলাম," বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আর দেখা গেল যে, নিমাইয়ের দেহে ভগবানের প্রকাশ নাই, তিনি অভ্যন্তরে লুকাইয়াছেন। লীলা-লেখক মহাশয়গণ উপরে যে সমুদায় ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে অবিশ্বাস আইসে না। তাহার এক প্রধান কারণ, যে, এই প্রকার ঘটনার কথা কেহ সাজাইতে পারে না, সাজান হইলে আর এক প্রকার হইত। সুপারী চিবাইতে চিবাইতে অচেতন হইলেন, এইরূপ বর্ণনা শুনিলেই বোধহয় লীলা-লেখক প্রত্যক্ষ দেখিয়া লিখিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতের তরজাটিও তদ্রূপ; উহা একটী কল্পিত কথা নয়। পড়িলে বোধহয়, উহা প্রকৃত ঘটনা। জগদানন্দ বলিলেন ও হাসিলেন। প্রভু ব্যাখ্যা করিলেন। স্বরূপ বিমনা হইলেন। এই সমুদায় যে কল্পনা নয়, তাহা পড়িলে মনে আপনি উদয় হয়।

শ্রীরামমোহন রায়ের সহিত খৃষ্টিয়ান মিশনারিদিগের যে বিচার হয়, তাহাতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলেন যে, খৃষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে, যীশু যে শ্রীভগবান, কি শ্রীভগবানের 'বিশেষ' কেহ, এ কথা মোটেই পাওয়া যায় না। "ঈশ্বরের পুত্র" বলিয়া যীশু আপনার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সকলেই ঈশ্বরের পুত্র। রামমোহন রায় এই এক তর্ক দ্বারা সাব্যস্ত

করিলেন যে, যীশু যে অবতার তাহা তিনি স্বয়ং কোথাও স্বীকার করেন নাই। অতএব যীশু অবতার নহেন।

কিন্তু এইরূপ তর্কে আমার প্রভু কোথায় থাকেন, একবার দেখা যাউক। প্রথম প্রশ্ন এই,—প্রভু যদি স্বয়ং শ্রীভগবান হইতেন, তবে তিনি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন কেন করেন, বা ঈশ্বরের দাস বলিয়া কেন অভিমান করেন?

ইহার উত্তর এই;—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু প্রকাশ হইয়া বলিলেন যে, তিনি নরধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার এক প্রধান কারণ এই যে, জীবকে ভক্তি-ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন। কিন্তু কেবল মুখে শিক্ষা দিলে জীব উহা হৃদয়ঙ্গম, কি উহার অনুকরণ, কি গ্রহণ করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ শিক্ষার যে কয়েকটি মোটা কথা তাহা চিরদিনই আছে, তবে মুখে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আচরণে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান-রূপে প্রকাশ হইয়া বলিলেন, 'আমি আদি, আমি অন্ত, আমা ব্যতীত জগতে কিছু নাই। আমি তোমাদের হৃদয়ে বাস করি, আমি জীবের মলিন দশা দেখিয়া তোমাদের মধ্যে তোমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত আসিয়াছি। আমি তোমাদিগকে প্রেম ও ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা দিব। কিন্তু এই ধর্ম্ম, সর্ব্ব ধর্ম্মের সার, অন্য ধর্ম্ম ধর্ম্ম নয়। ইহা মুখে শিক্ষা দিলে তোমরা উহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। তাই আমি আপনি ভক্তভাব ধরিয়া কিরূপে আমাকে ভক্তি করিতে হয় তাহা তোমাদিগকে শিক্ষা দিব। আমি এখন এই দেহ ত্যাগ করিয়া চলিলাম। আমি লুকাইলে এই দেহ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে, তোমরা উহাকে সন্তর্পণ করিও।"

এই কথাগুলি বলিয়া প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চেতনা লাভ করিলেন, করিয়া বলিলেন, "আমি এখানে আসিলাম কেন? এ কি দিবস না রাত্রি? আমি কোথা? আমি কিছু প্রলাপ

বকিয়াছি?' ভক্তগণ সমুদায় গোপন করিলেন, করিয়া বলিলেন, তুমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলে, তাই তুমি এখানে।

অতএব শ্রীগৌরাঙ্গের দুই ভাব, ভক্তভাব ও ভগবদ্ভাব; বা শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ মিলিত, কি তাঁহার অন্তরে কৃষ্ণ বাহিরে গৌর। তাহার পরে পার্ষদের কথা মনে করুন। যীশু কখন আপন মুখে স্বীকার করেন নাই যে তিনি কোন বিশেষ বস্তু। শ্রীগৌরাঙ্গ কি কখন স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি শ্রীভগবান? তিনি শত বার তাহা স্বীকার করিয়াছেন। 'প্রকাশ' মানে তাই, আর কিছুই নয়। সেই "প্রকাশ' অবস্থায় সরল ভাবে ভক্তগণকে বলিতেন যে, 'তিনি সেই শ্রীভগবান, জীবের হৃদয়ে বাস করেন, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী।" যিনি সন্দিগ্ধ চিত্ত তিনি বলিতে পারেন যে. "সে তাঁহার প্রলাপ বই নয়। তিনি যে কৃষ্ণ ইহা তিনি অধিরূঢ় ভাবে বলিতেন। অধিরূঢ় ভাবে গোপীগণ অভিমান করিতেন যে তাহারাই কৃষ্ণ। সেইরূপ প্রভু অধিরূঢ় ভাবে বলিতেন যে তিনিই কৃষ্ণ।" কিন্তু মহাপ্রকাশ বর্ণনা পাঠ করিলে জানা যায় যে, প্রভুর যে প্রকাশ উহা প্রলাপ নয়। তাহার পরে মহাপ্রকাশের দিনে প্রভু কি করিলেন? ঠাকুর বৃন্দাবন বলিতেছেন, 'অন্য দিন প্রভু বিষ্ণুখট্টায় এইরূপ ভাবে উপবেশন করেন যেন না জানিয়া। অগ্রে অচেতন হয়েন, তাহার পরে খট্টায় উপবেশন করেন। কিন্তু মহাপ্রকাশের দিনে সে সমুদায় মায়া করিলেন না। সহজ অবস্থায় খট্টায় বসিলেন।"

প্রকাশাবস্থায় তিনি বলিতেন, 'আমি সেই," আর ভক্তগণ বিশ্বাস করিতেন যে "তিনি সেই।" "আমি সেই" একথা বলা সহজ, কিন্তু একথা উপস্থিত জনগণের বিশ্বাস জন্মান অসম্ভব, কেহ পারে না।

একটু চিন্তা করিলে জানা যাইবে যে, যদি শ্রীভগবান মনুষ্যের মধ্যে আগমন করেন তবে তাহার এই সংসার তদ্দণ্ডে ধ্বংস হয়। শ্রীভগবান

যদি তাঁহাদের মধ্যে আগমন করেন তবে জীবগণ কিছু করিবে না,—খাইবে না, শুইবে না, ঘুমাইবে না, নিশ্চল হইয়া থাকিবে। তাই ভগবানের আসিতে হইলে তাঁহাকে গোপনে আসিতে হয়। মহাপ্রকাশের দিন প্রভু সাত প্রহর শ্রীভগবদ্ভাবে প্রকাশ ছিলেন। তাহাতে কি হইল. না ভক্তগণ কাতর হইয়া চরণে পড়িয়া বলিলেন, "তুমি যাও, আমরা তোমার তেজ সহ্য করিতে পারিতেছি না।" তাই ভগবান, লুকাইলেন। সেই নিমিত্ত প্রভু ক্ষণমাত্র শ্রীভগবদ্ভাবে প্রকাশ হইতেন, এবং সেই নিমিত্ত ভক্তগণ তাহার সঙ্গ সহ্য করিতে পারিতেন। অন্যান্য সময় ভক্তভাবে থাকিয়া তিনি ভক্তের কি আচরণ তাহা পালন করিয়া জীবকে শিখাইতেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ যে অবতার তাহার গোটাকতক প্রমাণ দিতেছি :—

১। দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন. শ্রীসার্ব্বভৌম, শ্রীপ্রবোধানন্দ প্রভৃতি তাঁহাকে শত শত বার পরীক্ষা করিয়া উহা মানিয়া লইয়াছেন। যাঁহারা মহাহিন্দু, তাঁহারা তাঁহার চরণ গঙ্গাজল তুলসী দিয়া পূজা করিতেন।

২। প্রভু যে অবতার, ইহা তিনি প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে চিরদিন আপনি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজ মুখে স্বীকার করিতেন যে, তিনি শ্রীভগবান, আর আপনার চরণ গঙ্গাজল তুলসীদলে পূজা করিতে দিতেন। তিনি তাঁহার ভক্তগণ সম্বন্ধে যাহা বলিতেন, তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি যে শ্রীভগবান তাহা তিনি জানিতেন। যথা—যখন শ্রীনিত্যানন্দ আগমন করিবেন, তাহার পূর্ব্বে তিনি বলিলেন যে, তিনি বলরাম। নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বলিলেন যে, 'যদি নিত্যানন্দ অতি মন্দ কার্য্যও করেন, তবু তাঁহার চরণকমল স্বয়ং ব্রহ্মারও বন্দ্য।' শ্রীঅদ্বৈত সম্বন্ধে বলিলেন, "তিনি অতি প্রাচীন ভক্ত, প্রহ্লাদ প্রভৃতির

পূর্ব্বেও তিনি ভক্ত, অতএব তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা বড়।" এখন দেখুন যে, সেই অদ্বৈত প্রভু তরজা পাঠাইতেছেন, আর প্রভু সহজ অবস্থায় তাহার অর্থ কি করিতেছেন।

তরজার অর্থ এই যে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু ঠাকুরকে আহ্বান করেন. সেই নিমিত্ত তিনি ধরাধামে আগমন করিয়াছেন। ঠাকুরকে কেন আহ্বান করিলেন? না জীবের মধ্যে প্রেমভক্তি বিতরণের নিমিত্ত। প্রভুর বয়ঃক্রম যখন ২৪ বর্ষ, তখনি তিনি প্রকাশ হইলেন। ইহার পূর্ব্বে যদিও তিনি ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে কার্য্যারম্ভ প্রকাশের পর হইতেই হইল। দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রভু প্রচার করিলেন, সিন্ধু হইতে কন্যা কুমারী পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ, প্রেমের বন্যায় ডুবিয়া গেল; লক্ষ লক্ষ আচার্য্য সৃষ্ট হইল; কোটী কোটী লোক প্রেমে নৃত্য করিতে লাগিল। তখন শ্রীঅদ্বৈত (প্রভুর বয়ঃক্রম যখন ৩৬ বৎসর,) এই তরজা পাঠাইলেন। তাহা দ্বারা প্রভুকে জানাইলেন যে, "প্রভু আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। যাহার নিমিত্ত তোমাকে আহ্বান করিয়াছিলাম, তাহার সম্পূর্ণ ফল পাইলাম। এখন আপনি সচ্ছন্দে স্বস্থানে গমন করিতে পারেন।" আর প্রভু উত্তরে বলিলেন, "তাঁহার যে আজ্ঞা।" এই তরজার দ্বারা সহজে বিশ্বাস হয় যে গৌরলীলা শ্রীভগবানের কার্য্য। অতএব জীব তোমার সৌভাগ্যের আর সীমা নাই!

এই সুযোগে একটী কথা বলিয়া রাখি। প্রকাশাবস্থায় শ্রীপ্রভু বৃদ্ধ জননীর মস্তকে পদার্পণ করেন, এ কথা আমি পূর্ব্বে লিখি ও ইহার প্রমাণ দিই। অর্থাৎ বলি যে, এ কথা আমি শাস্ত্রে পাইয়াছি; আমার মনগড়া কথা নয়। প্রভুর লীলায় যাহা পাইয়াছিলাম তাহা আমি বলিয়াছি। তবু ইহাতে অনেকে আমার প্রতি বিরক্ত হয়েন। তাঁহারা বলেন, "প্রভু এমন মাতৃভক্ত, তিনি জননীর মাথায় পদার্পণ করিলেন

ইহা কি হইতে পারে? আর তুমি এরূপ কথা লিখিলে কিরূপে?" কিন্তু আমার অপরাধ কি? আমি লীলা সংগ্রাহক, প্রামাণিক যাহা পাইব তাহাই লিখিব। ভাল কি মন্দ, অর্থাৎ প্রভুর গৌরবপোষক কি নিন্দাবর্দ্ধক, তাহা বিচার করিবার আমার অধিকার নাই। তাহা যদি করিতাম তবে আমার পুস্তক পড়িয়া জীবের কোন লাভ হইত না। প্রভু যেরূপ, আমি ঠিক সেইরূপ দিয়াছি, যাহার ইচ্ছা হয় তিনি গ্রহণ করুন, না হয় না করুন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রভুর যে জননীর মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম প্রদান, ইহাতে তোমার আমার কি ক্লেশের কিছু আছে? ইহাতে ক্লেশের কিছুই নাই, বরং অতুল আনন্দের কারণ আছে। যখন শ্রীঅদ্বৈত শুনিলেন যে, নিমাই পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকাশ হইয়াছেন, তখন বলিলেন, "নিমাই যে অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বলিয়া তাঁহাকে শ্রীভগবান বলা যায় না। নিমাই পণ্ডিতকে আমি তখনি মানিব, যখন তিনি আমার মস্তকে পদার্পণ করিতে সাহসী হইবেন।" শ্রীঅদ্বৈতের বয়ঃক্রম ৭৫ বৎসর, বৈষ্ণবের রাজা, জগতে ঋষির ন্যায় মান্য, তাঁহার মস্তকে পা দেন, তাঁহার গুরু ও শ্রীভগবান ছাড়া অপর কেহ সাহসী হন না। এই অদ্বৈতের মস্তকে ২১ বৎসরের নিমাই, যদি মনুষ্য হন, তবে পা দিবেন ইহা কি হইতে পারে? লোকের মনে বিশ্বাস যে লঘুজন গুরুজনের মস্তকে পদ দিলে তাহার সে পা খসিয়া পড়ে, কি তার কুষ্ঠ হয়। শ্রীনিমাই অদ্বৈতের মস্তকে পা দিয়াছিলেন। কোন হিন্দুসন্তান, যতই মন্দ হউক, জননীর মস্তকে কি শ্রীপদ দিতে পারে? মনে ভাবুন, নিমাই পণ্ডিতের বয়ঃক্রম ২১ বর্ষ ও তাঁহার মাতার বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। এরূপ বৃদ্ধা জননীর মস্তকে শ্রীপদার্পণ করিতে কেহ পারে না। নিতান্ত যে পাষণ্ড, সেও পারে না। এখন নিমাই

পণ্ডিতের ভক্তি-বৃত্তি কিরূপ, তাহা মনে করুন। তাঁহার মত বস্তু জননীর মস্তকে কিরূপে পদার্পণ করিবেন? অতএব নিমাই পণ্ডিত যখন তাঁহার জননীর মস্তকে পদার্পণ করেন, তখন তিনি নিমাই পণ্ডিত ছিলেন না। ঘটনা এই, শ্রীভগবান প্রকাশ হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "আমি আদি, আমি সকলের পিতা।" শচী সম্মুখে করজোড়ে কাঁপিতেছেন। শ্রীবাস বলিলেন, "জননি কর কি? প্রণাম কর। উনি তোমার পুত্র নন, জগতের পিতা।" শচী প্রণাম করিলেন, আর শ্রীভগবান তাঁহার মস্তকে পদার্পণ করিলেন। যদি শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান না হইতেন, তবে জননী প্রণাম করিলে ভয় পাইয়া বলিতেন,—'মা! উঠ, কর কি? অকল্যাণ কেন কর?' তাহা হইলে মনে সন্দেহ হইতে পারিত যে নিমাই পণ্ডিত প্রকৃত শ্রীভগবান কি না। কিন্তু তখন নিমাইয়ের প্রকাশ অবস্থা, তখন তাঁহাতে নিমাই-পণ্ডিতত্ব নাই। তখন তিনি জগতের আদি, সকলের কর্ত্তা, শচীরও পিতা। তাই তিনি অনায়াসে শচীর মাথায় পা দিলেন। যখন প্রভু ভয় না পাইয়া শচীর মাথায় পদার্পণ করিলেন, তখন ইহাই প্রমাণিত হইল যে, তিনি সত্য সত্যই শ্রীভগবান্। নিমাই পণ্ডিত যে স্বয়ং ভগবান, এই লীলা তাহার এক প্রধান প্রমাণ। প্রভু জননীর মস্তকে পা দিয়াছেন বলিয়া যাঁহারা ক্লেশ পান, তাঁহারা একটী কথা ভুলিয়া যান যে, তিনি শ্রীভগবান্। তাঁহারা মনে ভাবুন যে, তিনি শ্রীভগবান তবে আর তাঁহাদের মনে ক্লেশ হইবে না। যদি শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবানের কাচ করিতেন, তবে জননী তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি তখনি জিহ্বা কাটিয়া শ্রীবিষ্ণু বলিয়া তাঁহার চরণতলে পড়িতেন! কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ সত্য বস্তু, তিনি কেন তাহা করিবেন? তিনি ঐ অবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করিলেন, জগতকে দেখাইলেন যে, যে ব্যক্তি শচীর তনয় বলিয়া জগতে বিচরণ করিতেছেন, তিনি শচীর কি জগতের পিতাও বটেন।

যখন শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীভগবান্ গৌরাঙ্গকে তরজার দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন যে, তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে এখন তিনি স্বধামে গমন করিতে পারেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তাঁহার যে আজ্ঞা।" আবার প্রভু যখন শ্রীসরূপকে তরজার অর্থ শুনাইলেন, তখন তিনি বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন যে, এ লীলা-খেলা কি এতদিনে ফুরাইল! হায়! এতদিন পরে কি ন'দের প্রেমের হাট ভাঙ্গিল? সরূপের যেরূপ মনের ভাব হইল আমাদেরও তাই হয়। শ্রীঅদ্বৈতের উপর ক্রোধ হয় যে, তিনি কেন প্রভুকে শীঘ্র বিদায় দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত কি ইচ্ছা করিয়া প্রভুকে বিদায় দিয়াছিলেন, না ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন? যাঁহার ইচ্ছায় তিনি ঠাকুরকে আহ্বান করেন, তাঁহারি ইচ্ছায় তিনি ঠাকুরকে বিদায় দিলেন।

শ্রীঅদ্বৈত এক বুঝেন যে জীবের উদ্ধার। জীব উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীভগবান্‌কে আহ্বান করিয়াছিলেন। জীব উদ্ধার হইল, প্রেমভক্তি ধর্ম্ম প্রচারিত হইল, বাকি যে কার্য্য রহিল তাহা আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সাধিত হইবে। এখন ঠাকুর স্বধামে গমন করুন। এই অদ্বৈতের মনের ভাব কিন্তু ঠাকুরের মনের ভাব অন্যরূপ। যদিও শ্রীঅদ্বৈত, ঠাকুরকে বিদায় দিলেন, তবু ঠাকুর তাহার পরে দ্বাদশ বৎসর ধরাধামে ছিলেন। কেন? না, তাঁহার একটী উদ্দেশ্য সাধিত হইতে বাকি ছিল বলিয়া। সেটী শ্রীঅদ্বৈত প্রভুও, জানিতেন না। প্রভু প্রথমে ভক্তির চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। তাহা যখন শেষ হইল তখন প্রেমের চর্চ্চা আরম্ভ হইল। জীবকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দেওয়া হইলে, প্রভু তবু আর দ্বাদশ বৎসর রহিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য রসাস্বাদন দ্বারা জীবকে রসশিক্ষা দেওয়া। হৃদয়-কূপ হইতে রাধাকৃষ্ণলীলারস, অবিশ্রান্ত উত্থিত করা যাইতে পারে। সামান্য কূপ খনন করিলে জল উঠিবে, কিন্তু তাহা তত পরিষ্কৃত নয়।

তদপেক্ষা গভীর করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল জল উঠিবে। আরো গভীর করিলে আরো পবিত্র জল উঠিবে। এইরূপে জীবশিক্ষার নিমিত্ত প্রভু দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত রাধাকৃষ্ণলীলারূপ কূপ হইতে সুধা উঠাইতে লাগিলেন। এক উদ্দেশ্য, আপনি আস্বাদ করিবেন,, অপর উদ্দেশ্য, উদাহরণ দ্বারা জীবকে শিক্ষা দিবেন। প্রভু অদ্বৈতের তরজার পর হইতে ক্রমেই আভ্যন্তরিক জগতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, পূর্ব্বে ক্ষণেক উদ্ধবের ভাব ক্ষণেক রাধার ভাব গ্রহণ করিতেন, ক্ষণেক বা সচেতন থাকিতেন। কিন্তু এখন প্রভুর অন্য সকল ভাব যাইয়া ক্রমে রাধাভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর সে ভাব রহিয়া যাইতে লাগিল। পূর্ব্বে রাধাভাবে কৃষ্ণকথা কহিতে কহিতে, কি কৃষ্ণের সঙ্গ করিতে করিতে হঠাৎ চেতনা পাইতেন, আবার তখনি চেতনা হারাইতেন। কিন্তু যখন প্রভু গম্ভীরা-লীলা আরম্ভ করি-লেন, তখন তাঁহার রাধাভাব প্রায় আর যাইত না। প্রভু রাধাভাবে সরূপের গলা ধরিয়া বলিতেছেন, "ললিতে, আমাকে কৃষ্ণের ওখানে লইয়া চল। তিনি আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন।" প্রভুর আপনাকে রাধা বলিয়া সম্পূর্ণরূপে বোধ হইয়াছে, আর সেইরূপ সরূপকে ললিতা বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাই ঐরূপ বলিতেছেন। কিন্তু রাধাভাবে কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে হঠাৎ চেতন হইল, তখন বিস্মিত হইয়া সরূপকে বলিতে-ছেন,—"সরূপ আমি এইমাত্র কি প্রলাপ করিতেছিলাম? আমার বোধ হইতেছিল যেন আমি রাধা। কিন্তু আমি ত রাধা নই, আমি কৃষ্ণচৈতন্য। ইহা বলিতে বলিতে আবার বিহ্বল হইলেন, আবার রাধাভাবে 'প্রলাপ" করিতে লাগিলেন। কিন্তু এখন এই রাধাভাব রহিয়া যাইতে লাগিল, চেতনাভাব ক্রমে কমিতে লাগিল। পূর্ব্বে সন্ধ্যা হইলে রাধাভাব হইত, আর যতক্ষণ নিদ্রা না যাইতেন ততক্ষণ সে ভাব থাকিত। এখন দিনের বেলায়ও রাধাভাব দেখা যাইতে লাগিল। এমন কি, কখন

কখন এ রাধাভাব দশদিন পাঁচদিন থাকিতে লাগিল, পরে মাসেক পর্য্যন্ত, শেষে বৎসরেক পর্য্যন্ত। অর্থাৎ যখন ভক্তগণ রথের সময় নীলাচলে আসিতেন তখনি চেতনা লাভ করিতেন, আর ভক্তগণকে বিদায় করিয়া দিয়া আবার ভাবসাগরে ডুবিতেন। এ কথা অনেকবার বলা হইয়াছে যে, শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের লীলাকে পুনর্জ্জীবিত করা গৌরলীলার একপ্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন বিহার করিয়া মথুরায় গেলেন, তখন রাধা গোপীগণ সহিত বিরহে বিহ্বল হইলেন। তখন রাধা এই বিরহে যে সমুদায় রস আস্বাদন করেন প্রভু তাহাই করিতে, ও জগতকে আস্বাদন করাইতে, লাগিলেন।

পাঠক মহাশয় অবগত আছেন, প্রেমিক ভক্তের তিন ভাব,—যথা পূর্ব্বরাগ, মিলন ও বিরহ। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ভাব বিরহ; আর সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ভাব মিলন। মিলন অপেক্ষা পূর্ব্বরাগ ভাল আবার সেই প্রকার জীবের তিন ভাব,—আনন্দের আশা, আনন্দ ভোগ, আর পূর্ব্বের আনন্দ স্মরণ। আনন্দের আশাকে পূর্ব্বরাগ বলে, আনন্দ ভোগকে বলে মিলন, আর পূর্ব্বানন্দ স্মরণকে বলে বিরহ। ইহার মধ্যে শেষোক্তটি সর্ব্বাপেক্ষা মধুর। মিলন হইতে যে বিরহ মধুর, একথা হঠাৎ লোকে বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু যাঁহারা রসাস্বাদ করিয়াছেন তাঁহারা, আমরা কি বলিতেছি, তাহা বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ শ্রীমতীর শ্লোক

"সঙ্গম-বিরহ-বিকল্পে বরমিহ বিরহ ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গমে সৈব তথৈকা বিরহে তন্ময় ভূলোকং॥"

যে পরিমাণে বিরহ সেই পরিমাণে আনন্দ, আর যে পরিমাণে বিরহ সেই পরিমাণে মিলনে আনন্দ। প্রভুর কি ভাব তাহার কতকভাব শ্রীভাগবতের ভ্রমরগীতা পড়িলে জানা যায়। অনেকে অবগত আছেন, "রাই

উন্মাদিনী' বলিয়া গীতের পালা সৃষ্টি হয়, আর জীবে উহার অভিনয় দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া পবিত্র হয়। এ "রাই উন্মাদিনী' প্রভুর পূর্ব্বে জগতে কিয়ৎ পরিমাণে ছিল। আর যাহা ছিল তাহা কথায়। কিন্তু প্রভু "রাই উন্মাদিনী' কি, তাহা কার্য্য দ্বারা দেখাইলেন। প্রভু কার্য্যে যাহা দেখাইলেন, তাহা কবিগণ অনুভবও করিতে পারেন নাই। একটী পদের বিচার করিব।

"রাই, কৃষ্ণকথা কইতে ছিল।
কথা কইতে কইতে নীরব হইল॥"

প্রভু কৃষ্ণকথা কহিতে গেলেন অমনি ভাবের তরঙ্গ উঠিল, উঠিয়া কণ্ঠ রোধ ও নিশ্বাস বন্ধ করিল, ও অমনি নয়নতারা স্থির হইয়া গেল।

এরূপ দৃশ্য কোথা ছিল, কে কোথা দেখেছেন বা শুনেছেন? প্রভু আপনি করিয়া, ইহা দেখাইয়াছিলেন। প্রভু সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে-ছেন, কিন্তু নয়ন মুদিয়া, যেহেতু হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন। তাই নয়ন মেলিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। কিন্তু নয়ন মুদিয়া চলিয়াছেন, তাই পদস্খলন হইতেছে, আর ভক্তগণ দুঃখ পাইতেছেন। বলিতেছেন, "প্রভু নয়ন মেলিয়া চলুন, পড়িয়া যাইবেন।" সেই হইতে "রাই উন্মাদিনীর" গীত হইল;—

"অমন করে যাইস্ না, যাইস্ না, ধীরে চল।
তুই নয়ন মুদে চলে যাবি,
প্রেমের দায়ে কি প্রাণ হারাবি?"

প্রভুর কার্য্যের সহায়তার নিমিত্ত, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে "জয়দেব," "বিদ্যাপতি," "চণ্ডীদাস," ও "বিল্বমঙ্গল" উদিত হয়েন। এই উপরি উক্ত প্রেমিকভক্ত কবিগণ যেরূপ কথার দ্বারা প্রেমের সূক্ষ্ম কণা লইয়া খেলা করিয়া গিয়াছেন, প্রভু আপনার আচরণের দ্বারা উহা জীবের নিকট

ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাই জীবে এখন সেই "প্রেমের সূক্ষ্ম" তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছেন। জয়দেবের নায়ক বনমালী—রাখাল। তাহার নায়িকা সেইরূপ বনচারিণী—রাধা। উভয়ে জগতের কুটিলতার কোন ধার ধারেন না, তাঁহারা প্রেমে পাগল। আবার ইহাঁরাই শ্রীভগবান, তবে ঐশ্বর্য্য-বিবর্জ্জিত। জয়দেব ইহাদের প্রেমের খেলা সুললিত কবিতায় বর্ণনা করিয়া উহাতে অতি মিষ্ট সুর দিলেন। সহজে লোকে সেই গীত শুনিলে পাগল হয়।

কিন্তু শ্রীজগন্নাথ দেবকে এই সমুদায় গীত আরও ভাল করিয়া শুনান ত। দেবদাসীগণ এই সমুদায় গীত অভ্যাস করিতেন, করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে গান করিতেন ও নৃত্য করিতেন। এ দেবদাসীগণ দক্ষিণ দেশের মন্দিরে প্রতিপালিত হইত। ইহাদিগকে "মুরারী" বলে, আর দক্ষিণ দেশে এক মন্দিরে যত মুরারী ছিল প্রভু সমুদায় উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু যদিও কোন কোন স্থানের দেবদাসীগণের চরিত্র মন্দ, তবু তাহারা যখন সুস্বরে ঠাকুরের নিকট নৃত্য গীত করিত, তখন শ্রোতা ও দর্শকগণকে মোহিত করিত।

প্রভু বিরহ-বিহ্বল অবস্থায় জলেশ্বর টোটায় গমন করিতেছেন, সঙ্গে গোবিন্দ। এমন সময় তাহার কর্ণে গীতধ্বনি প্রবেশ করিল। বুঝিলেন জয়দেবের কবিতা গীত হইতেছে, রাগিণী গুজ্জরী। তখন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া গীতধ্বনি লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। গোবিন্দ পশ্চাৎ যাইতেছেন, হঠাৎ প্রভুর এরূপ দ্রুতগতি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। প্রথমে তিনি প্রভুর দ্রুতগমনের কারণ বুঝিতে পারেন নাই। পরে গমনের কারণ বুঝিলেন, তাহাতে অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। যিনি গীত গাহিতেছেন তিনি দেবদাসী—স্ত্রীলোক। প্রভু সন্ন্যাসী, মুগ্ধ হইয়া তাহার দিকে চলিয়াছেন, কেন না তাহাকে আলিঙ্গন করিতে। প্রভু যদি বিহ্বল

অবস্থায় তাহাকে আলিঙ্গন করেন, তবে চেতন অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিবেন। তাই গোবিন্দ তাঁহাকে নিবারণ করিতে তাঁহার পশ্চাৎ ধাইলেন। প্রভুর সহিত দৌড়িয়া কেহ পারে না, গোবিন্দও পারিতেন না, কিন্তু প্রভুর অনেক বাধা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইতেছে। পথে সিঁজের কাঁটা দিয়া অনেক বাগান ঘেরা, সুতরাং যাইতে নানা বাধা পাইতেছেন, গাত্রে কণ্টক ফুটিতেছে, অঙ্গ রক্তময় হইতেছে, কিন্তু তাহাতে প্রভুর ব্যথা বোধ নাই। প্রভু কেবল দৌড়িয়াছেন, এমন সময় গোবিন্দ প্রভুকে ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, "প্রভু করেন কি? যিনি গাহিতেছেন তিনি স্ত্রীলোক।" স্ত্রীলোকের নাম শুনিবা মাত্র অমনি প্রভুর বাহ্য হইল তখন ফিরিলেন, আর বিহ্বল মনে গোবিন্দকে বলিলেন, "আজ তুমি আমাকে ক্রয় করিলে। আমি যদি প্রকৃতি স্পর্শ করিতাম তবে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমার প্রাণ দিতাম। গোবিন্দ, তুমি আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।" প্রকৃত কথা, এই ঘটনায় ভক্তগণ বড় ভীত হইলেন. বুঝিলেন যে প্রভুকে সতত নানা প্রকারে রক্ষা করিতে হইবে।

প্রভু দিবাভাগে রাধাভাবে জগৎ কৃষ্ণময় দেখেন, জগতের সমুদায় কার্য্যে কৃষ্ণলীলা অনুভব করেন, আবার রজনীতেও বটে। স্বপ্নেও তাহাই। কোন কোন দিন স্বপ্নে এরূপ নিমগ্ন হয়েন যে, বেলা হইলেও উঠেন না। একদিন স্বপ্নে রাসলীলা দেখিতেছেন, শয্যা হইতে উঠিতেছেন না। বিলম্ব দেখিয়া গোবিন্দ প্রভুকে ডাকিলেন। প্রভু উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বপ্নের আবেশ গেল না। মনে করুন্ প্রভুর মনের ভাব দিবানিশি এই যে, কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, তিনি রাধা, বৃন্দাবনে একাকিনী পড়িয়া আছেন। যখন স্বপ্নে রাসরসে নিমগ্ন হইলেন, তখন "কৃষ্ণবিয়োগিনী' ভাব গিয়াছে। বোধ হইয়াছে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন। তাই প্রভাতে গোবিন্দ যখন তাঁহাকে উঠাইলেন, তখন প্রভুর হৃদয়

আনন্দে টলমল করিতেছে, বদন প্রফুল্ল হইয়াছে। প্রভুর আনন্দ ও বিরহ বেদনা এত অধিক যে তাঁহার বদনে তাঁহার মনের ভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইত। প্রভু দর্শনে চলিলেন, যাইয়া জগন্নাথকে দেখিতে পাই- লেন না। দেখিলেন, তিনি ত্রিভঙ্গ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ। যেহেতু প্রভু তখন বৃন্দাবনে, আর সেইভাবে মন তাঁহার গর গর। প্রভু গরুড়ের স্তম্ভে হস্ত দিয়া দর্শন করিতেন, এই তাঁহার নিয়ম। আর অগ্রবর্ত্তী হইতেন না। প্রথমে যে দিবস শ্রীজগন্নাথ দর্শন করেন সে দিবস ঠাকু- রকে হৃদয়ে ধরিয়াছিলেন বলিয়া, পাছে আবার সেইরূপ করেন, সেই ভয়ে অনেক দূর হইতে, অর্থাৎ গরুড়ের স্তম্ভের নিকট হইতে, দর্শন করেন। প্রভু স্বপ্নাবেশে গরুড়ের স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া, জগন্নাথ না দেখিয়া মুরলীধর কালাচাঁদকে দেখিতেছেন, এমন সময় কোন একটী স্ত্রীলোক দর্শন করিতে না পারিয়া গরুড়ে উঠিয়াছে, উঠিয়া দর্শন করিতেছে; এক পা গরুড়ের উপর, আর এক পা মহাপ্রভুর স্কন্ধে দিয়াছে। প্রভু বিহ্বল, অবশ্য তাঁহার জ্ঞান নাই। কিন্তু গোবিন্দ ইহা দেখিলেন, দেখিয়া স্ত্রী- লোকটীকে তিরস্কার করিলেন। স্ত্রীলোক তাহার অপরাধ জানিয়া ভয়ে নামিলেন। তিনি মহাপ্রভুকে জানিতেন, লোকের ভিড়ে, না জানিয়াই মহাপ্রভুর স্কন্ধে পা দিয়াছিলেন। কথা এই, প্রভু গরুড়ের নিকট গরুড় পক্ষীর ন্যায়, আপন মনে দাঁড়াইয়া থাকেন। তিনি যে সেখানে আছেন তাহা বিদেশীয় যাত্রিগণ জানিতে পারিত না। আর স্বদেশীয় যাহারা, তাহারাও অনেক সময় লক্ষ্য করিতে পারিত না। সেই নিমিত্তই এরূপ সম্ভব হইত যে, প্রভু দর্শন করিতেছেন, আর তাঁহাকে পশ্চাৎ করিয়া অন্য লোকে অগ্রে দর্শন করিতেছে।

যখন গোবিন্দ স্ত্রীলোকটীকে তিরস্কার করিলেন, তখন প্রভু কতক বাহ্য পাইলেন, পাইয়া বলিতেছেন,—"গোবিন্দ, কর কি? উনি স্বচ্ছন্দে

দর্শন করুন।" কিন্তু স্ত্রীলোক গোবিন্দের তিরস্কার শুনিয়া প্রভুকে দেখিবা মাত্র আস্তে আস্তে নামিলেন, নামিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিলেন, তিনি না জানিয়া এরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন; আর ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। প্রভু বলিতেছেন, "আহা মরি কি আর্ত্তি! জগন্নাথকে দর্শন করিবার জন্য আমি যদি এই আর্ত্তি পাইতাম তবে কৃতার্থ হইতাম। জগন্নাথে এ স্ত্রীলোকটির মন এরূপ নিবিষ্ট যে আমার স্কন্ধে যে পা দিয়াছে তাহা ইহার জ্ঞান নাই।" সে যাহা হউক, প্রভু এ পর্য্যন্ত পূর্ব্বনিশির স্বপ্ন প্রভাবে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিতে বনমালী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছিলেন, এখন এই স্ত্রীলোকের কাণ্ডে কতক বাহ্য পাইয়া আর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না। দেখিতেছেন, জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা! তখন সন্তাপিত হইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। মনের ভাব যে শ্রীকৃষ্ণকে হারাইয়া পাইয়াছিলেন, এখন তাঁহাকে আবার হারাইয়াছেন। বাসায় বসিয়া বামহস্তে বদন রাখিয়া নয়ন মুদিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতে লাগিলেন; কখন বা নয়ন উন্মীলন করিয়া নখ দিয়া মৃত্তিকায় ত্রিভঙ্গাকৃতি লিখিতে লাগিলেন, আর নয়ন জলে উহা ধৌত হওয়ায় পুনঃ পুনঃ এই চিত্র লিখিতে লাগিলেন। আহা! যদি প্রভুর তখনকার মুখের এই ছবির একটা ফটোগ্রাফ পাইতাম তবে জীবন সুখে কাটাইতে পারিতাম। প্রিয়জনের বিরহ বহুদেশে কবিগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রভু যেরূপ কৃষ্ণ-বিরহরস প্রকাশ করিলেন, ইহা জগতে কেহ কখন স্বপ্নেও অনুভব করেন নাই। প্রভুর এই অবস্থায় সমস্ত দিবা গেল, ক্রমে সন্ধ্যা আসিতে লাগিল, সেই সঙ্গে প্রভুর বিরহ বেদনা বাড়িতে লাগিল। বিরহ বেদনার কথা সকলে শুনিয়াছেন, কিছু কিছু আপনা আপনিও ভোগ করিয়াছেন। কিন্তু বিরহ বেদনায় কে কোথায় বাণবিদ্ধ মনুষ্যের ন্যায় "উহুঃ মরি, উহুঃ মরি" বলিয়া সন্তাপ করে? বৃশ্চিক

দংশনে মনুষ্যকে অস্থির করে, দষ্ট ব্যক্তি জ্বালায় গড়াগড়ি দিয়া থাকেন, কিন্তু কে কোথা বিরহ বেদনায় ধূলায় গড়াগড়ি দেয়? অবশ্য ভারি শোক পাইলে লোকে গড়াগড়ি দিয়া থাকে, মূর্চ্ছিত হয়, আর শোক কেবল বিরহ হইতে উৎপত্তি। কিন্তু শোকের প্রধান কারণ বিরহ নহে, নিরাশ বিরহ। প্রিয়জনকে হারাইয়াছেন, আর যিনি শোকী, তিনি ভাবিতেছেন যে শুধু তাঁহাকে হারাইয়াছেন তাহা নয়, তাঁহাকে চিরজীবনের মত হারাইয়াছেন। সেই নিমিত্ত শোক এত দুঃখকর হয়। যদি শোকিব্যক্তি জানিতে পারে যে, তাহার প্রিয়জনকে পরকালে আবার পাইবে তবে অমনি শান্তি লাভ করে।

আমেরিকা দেশে একটী অদ্ভুত ঘটনা লইয়া সংবাদ পত্রের মধ্যে বিপুল বিচার হয়। একটি অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্কা যুবতী মরিয়াছেন, আর তাহার আত্মীয়গণ তাহার মৃতদেহ লইয়া, সে দেশের নিয়মানুসারে, নিশিতে জাগরণ করিতেছেন। তাঁহারা জন কয়েক স্ত্রীপুরুষে মৃত দেহের নিকট আছেন, এক একজন করিয়া জাগিতেছেন আর সকলেই ঘুমাইতেছেন। ইহার মধ্যে একজন দেখিতেছেন সেই মৃতদেহের নিকট মৃত যুবতীটি দাঁড়াইয়া যেন ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। তখন তিনি ভয়ে চীৎকার করিলেন, আর সেই শব্দ শুনিয়া সকলে জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহারা দশজনে এইরূপে সেই বালিকার পরকালের জন্ম দেখিলেন। যুবতীর জন্য তাঁহার জননী শোকে পাগল হইয়াছিলেন। তিনি অন্য স্থানে দূরে ছিলেন, তাঁহার কন্যার আত্মাকে দেখিতে পান নাই, কিন্তু দর্শকগণের মুখে শুনিলেন, বিশ্বাস করিলেন, তখন শোক ভুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, তাঁহার কন্যা মরে নাই, জীবিত আছে, পুনর্মিলনের আশা হইল, তাই শোক গেল।

বিরহ বেদনা পূর্ণরূপে উদয় হইলে "দশ দশা" উপস্থিত হয়। শ্রীরূপ

তাঁহার রস শাস্ত্রে "দশদশার" ঐ সমুদায় লক্ষণ নির্দ্ধারিত করিলেন : যথা—

"চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশাদ্দশঃ॥"

অর্থাৎ (১) চিন্তা, (২) জাগরণ, (৩) উদ্বেগ, (৪) কৃশাঙ্গতা, (৫) অঙ্গের মালিন্য, (৬) প্রলাপ, (৭) ব্যাধি, (৮) উন্মাদ, (৯) মূর্চ্ছা, (১০) প্রায় মৃত্যু, কি মৃত্যু।

বিরহে এই দশটী দশা উপস্থিত হয়। জীবে ইহা পূর্ব্বে জানিতেন না। মহাপ্রভুর ভাব দেখিয়া ইহা জানিলেন। প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহে এরূপ নয়টী দশা প্রত্যহই হইত, আর দশমী দশা মাঝে মাঝে হইত। রজনী উপস্থিত হইলে প্রভু নয়টী দশায় অভিভূত হইয়া ছটফট করিতেছেন, শেষ দশটী অর্থাৎ মৃত্যু দশাটী কেবল বাকি রহিয়াছে। সরূপ রামরায় চেষ্টা করিয়া প্রভুকে নানা উপায়ে সান্ত্বনা করিতেছেন। প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া কৃষ্ণযাত্রার সৃষ্টিও পরিবর্দ্ধন হইল। মনে ভাবুন, বদন অধিকারী যেন রাধাকে লইয়া কৃষ্ণ-যাত্রা করিতেছেন। সে কিরূপ—না, যেরূপ সরূপ রামরায় প্রভুকে লইয়া গম্ভীরা লীলা করিতেন। তবে সরূপ রামরায় প্রকৃত রাধাকে লইয়া কৃষ্ণ-যাত্রা করিতেন, বদন সেই দেখাদেখি প্রকৃত রাধাকে না পাইয়া, রাধা সাজাইয়া তাহাকে প্রভুর উক্ত কথা শিখাইয়া, কৃষ্ণ-যাত্রা করিতেন। প্রভু ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছেন, প্রলাপ করিতেছেন, কখন বা নিজেই বাহ্যলাভ করিতেছেন। যখন ক্ষণিক চেতনা লাভ করিতেছেন, তখন সরূপ রামরায়কে বলিতেছেন, "উপায় কি? বল। আমি আর সহ্য করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। রামরায় একটী শ্লোক পড়, দেখি যদি আমার হৃদয় শীতল হয়।" কখন বা সরূপকে বলিতেছেন, "একটী কৃষ্ণমঙ্গল গীত গাও দেখি, যদি প্রাণে

রাচি।" রামরায় শ্রীমতীর পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়া তাঁহার নিজকৃত শ্লোক সুস্বরে পাঠ করিলেন। সরূপ জয়দেবের রাসের পদ গাইলেন। ক্রমে প্রভুর মনের ভাব ফিরিল। হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ আসিল, পরে প্রভু দিশেহারা হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অধিক রজনী হইতেছে দেখিয়া সরূপ ও রামরায় উভয়ে অনেক যত্ন করিয়া, কতক বল দ্বারা, প্রভুকে শয়ন করাইলেন। শোয়াইয়া, প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া, বাহির হইতে শিকল দিয়া, দ্বারে গোবিন্দ, কি সরূপ, কি উভয়ে শয়ন করিলেন। প্রভু শয়ন করিয়া কোন দিন নিদ্রা গেলেন, কোন দিন বা উচ্চৈঃস্বরে নাম জপিতে লাগিলেন।

প্রভু একদিন প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেহের সমুদায় কার্য্য অভ্যাস বশতঃ করিলেন। সমুদ্র স্নানে গমন করিলেন, পরে দর্শনে দাঁড়াইলেন। কখন একবারে বিহ্বল অবস্থা, আপনার ভাবে আছেন; কখন বা লোকের সহিত কথা বলিতেছেন। সে কথা কি তাহা বুঝুন; বলিতেছেন, "কে গা তুমি বাপ, কে গা আমার বাপের ঠাকুর, কৃষ্ণ কোন পথে গিয়াছেন বলিতে পার?" সে চুপ করিয়া থাকিল, তখন আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি বলিতে পার, তিনি কোথা গেলেন?" কেহ বা বলিল, "পারি, আইস আমার সঙ্গে। আমি দেখাইয়া দিব।" ইহা বলিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল। প্রভু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সে মন্দিরের মধ্যে যাইয়া প্রভুকে সিংহাসনের অগ্রে রাখিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীজগন্নাথকে দেখাইয়া বলিল, "ঐ যে তোমার কৃষ্ণ।" ঠাকুরও কৃষ্ণকে পাইয়া মহাসুখী। যে দিবস প্রভু স্বপ্নে কৃষ্ণকে পাইয়া গরুড়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কৃষ্ণ দেখিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার স্কন্ধে আরূঢ় স্ত্রীলোকের স্পর্শে চেতন পাইয়া আবার কৃষ্ণকে হারাইয়া সমস্ত দিন রাত্রি রোদন করিয়াছিলেন, সেই রজনীতে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। অধিক

রাত্রি দেখিয়া সরূপ ও রামরায় প্রভুকে কতক বল দ্বারা ও কতক বুঝাইয়া শয়ন করাইয়া, আপনারা শয়ন করিলেন। রামরায় গৃহে গেলেন, কিন্তু সরূপ নিজ কুটিরে না যাইয়া প্রভুর দ্বারে শয়ন করিলেন; কারণ দেখিলেন প্রভু যদিও শুইলেন, তবু ঘুমাইলেন না, উচ্চ করিয়া নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নামকীর্ত্তন হইতেছে এমন সময় প্রভু হঠাৎ নীরব হইলেন। প্রভু ঘুমান নাই বলিয়া সরূপও জাগিয়া আছেন। প্রভুকে নীরব দেখিয়া ভাবিলেন, তিনি নিদ্রা গিয়াছেন। ইহা ভাবিয়া বাহির হইতে শিকল খুলিয়া অভ্যন্তর যাইয়া দেখেন, সর্ব্বনাশ! গৃহ শূন্য!! প্রভু নাই!!!

প্রভু কিরূপে কোথায় গেলেন? সদর দরজায় যেরূপ শিকলি দেওয়া ছিল সেইরূপ আছে। সেখানে আবার গোবিন্দ ও সরূপ শয়ন করিয়া। গৃহের মধ্যে তিনদিকে তিন দ্বার আছে, তাহাতেও খিল দেওয়া। তবে প্রভু কিরূপে বাহির হইলেন? কিন্তু সে সামান্য কথা! প্রধান কথা, প্রভু কোথা গেলেন?

তখন কলরব হইল, সকলের নিকট সংবাদ গেল, সকলে প্রভুর তল্লাসের নিমিত্ত দৌড়িয়া আসিলেন। দীপ জ্বালিয়া তল্লাস করিতে করিতে দেখিলেন যে, শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তর দিকে প্রভু পড়িয়া আছেন। প্রভুকে পাইয়া সকলে আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দশা দেখিয়া সকলে মহাভীত ও চিন্তিত হইলেন। দেখিলেন, হস্ত, পদ কটি ও গ্রীবার যত অস্থিসন্ধি আছে সমুদায় শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইহাতে কি না, প্রভুর হস্ত পদ ও দেহ অতি দীর্ঘ হইয়াছে। প্রভুর দেহ তখন আর মনুষ্যের দেহ বলিয়া বোধ হইতেছে না, উহা ৫।৬ হস্ত লম্বা বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহাতে আবার উত্তান নয়ন। মুখ দিয়া ফেন পড়িতেছে। এমন কি, প্রভুর দশা দেখিয়া সকলের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ ও

ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। তখন সরূপ প্রভুর কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ নাম করিতে লাগিলেন। এরূপ করিতে করিতে কর্ণে নাম প্রবেশ করিল। তখন প্রভু "কাঁহা, কাঁহা" এই শব্দ করিতে লাগিলেন। পরে "হরিবোল" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বসিলেন। আর অস্থিসন্ধি সমুদায়, যাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ যথা স্থানে আসিয়া জোড় লাগিল।

প্রভু উঠিয়া নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। বিবরণ কি, জিজ্ঞাসু হইয়া প্রভু সরূপের মুখ পানে চাহিয়া বলিতেছেন, "ব্যাপার কি বল দেখি?" সরূপ বলিলেন, "আগে ঘরে চলুন সেখানে বলিব।" বাসায় আসিয়া সরূপ সমুদায় কথা বলিলেন। প্রভু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "আমার কিছু মনে নাই। কেবল এইটুকু মনে আছে যে, চঞ্চল কৃষ্ণ আমাকে দর্শন দিয়া অদর্শন হইলেন. আর আমি তাঁহার উদ্দেশে তাঁহার পশ্চাৎ যাইতেছিলাম।"

এই লীলাটী রঘুনাথ দাস তাঁহার কড়চায় লিখিয়াছেন। তিনি ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। তিনি প্রভুকে তল্লাশ করিতে গিয়াছিলেন। যখন গ্রন্থকার এই লীলা প্রথম অবগত হইলেন, তখন তাঁহার মনে একটী কথা উদয় হইয়াছিল। প্রভুর দেহে যতরূপ অলৌকিক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহার মধ্যে একটী রহস্য বরাবর দেখা যাইবে। অর্থাৎ যদি তাঁহার দেহে কোনরূপ অলৌকিক ভাব দেখা গিয়াছে, তবে তাহার বিপরীত ভাব তাহার পরেই প্রকাশ পাইয়াছে। যথা প্রভু যদি কান্দিতেছেন, তাহার পরে নিশ্চিত হাসিবেন। প্রভুর শ্বাস বন্ধ হইল, তাহার পরে প্রভুর এরূপ ঝড়ের ন্যায় নিশ্বাস বহিতে লাগিল যে, সম্মুখে উপবেশন করে কাহারও এরূপ সাধ্য হইতেছে না। এই প্রভুর অঙ্গ লৌহদণ্ডের ন্যায় শক্ত. আবার দেখিবেন যে, উহা এত কোমল হইয়াছে যেন উহাতে অস্থি মাত্র

নাই। এই প্রভু এত ভার হইলেন যে তাঁহাকে ক্রোড়ে করে এরূপ সাধ্য কাহারও নাই, আবার এরূপ লঘু হইলেন যে, যে সে তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইয়া বেড়াইতে পারেন। এ সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম যে, প্রভুর অস্থি গ্রন্থি শিথিল হইয়া হস্ত, পদ, দেহ দৈর্ঘ্যতা পাইয়াছিল, তখন তাঁহার বিপরীত ভাব কি প্রকাশ পাইয়াছিল? দেখিলাম যে, ঠিক তাহাই হইয়াছিল। সে অদ্ভুত কাণ্ড শ্রবণ করুন।

একদিন প্রভু, সরূপ ও রামরায়ের সঙ্গে নিশি যাপন করিতেছেন। কখন সরূপ গীত গাহিতেছেন, কখন রামরায় শ্লোক বলিতেছেন ও তাহার অর্থ করিতেছেন। দুই প্রহর নিশি হইল, তখন উভয়ে প্রভুকে সান্ত্বনা করিয়া, শয়ন করাইয়া গৃহে গেলেন। কেবল গোবিন্দ দ্বারে প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত রহিলেন। প্রভু শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলেন তাহা নহে, উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপ করিতেছেন, ইহার মধ্যে হঠাৎ নীরব হইলেন। তখন প্রভু নিদ্রা গিয়াছেন কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত গোবিন্দ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখেন পূর্ব্বকার দিনের মত তিন দ্বারে কপাট, কিন্তু প্রভু নাই! তখন দৌড়িয়া গমন করিয়া সরূপকে সংবাদ দিলেন। ভক্তগণ যিনি যেখানে ছিলেন দৌড়িয়া আসিলেন, আর প্রদীপ জ্বালিয়া প্রভুকে তল্লাস করিতে লাগিলেন। সেবার প্রভুকে শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তর দিকে পাইয়াছিলেন। তাই প্রথমে সেখানে তল্লাসের নিমিত্ত গমন করিলেন, কিন্তু ঠিক সেখানে পাইলেন না। দেখেন যে সিংহদ্বারের উত্তর দিকে নয়, দক্ষিণ দিকে প্রভু পড়িয়া আছেন। প্রভুর ঘরে তিন দ্বার, তাহা খোলা হয় নাই, অথচ প্রভু ঘরে নাই! যেখানে প্রভুকে পাওয়া গেল তাহাতে বুঝা গেল যে প্রভু তিনটী অনুন্নত প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছেন। রঘুনাথ দাস সেই তল্লাসকারীর মধ্যে একজন ছিলেন, তিনি তাঁহার

স্তবাবলীতে এই ঘটনা লইয়া বলিতেছেন ; যথা—

“অনুদ্‌ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরুচি ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎ সংকোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাদ্‌
বিরাজন্‌ গৌরাঙ্গো হৃদয়েউদয়ন্মাং মদয়তি ॥”

সকলে দেখেন যে প্রভু পড়িয়া আছেন। আর তৈলঙ্গী গাভীগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে, অতি যত্নের সহিত তাঁহার অঙ্গ শুঁকিতেছে, তাহারা যেন প্রভুর অঙ্গরক্ষা করিতেছে। গাভীগণ প্রভুকে ছাড়িয়া যাইতে চাহে না। ভক্তগণ যাইয়া প্রভুকে কিরূপ দেখিলেন ?

“পেটের ভিতরে হস্তপদ কুর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার ॥
অচেতন পড়িয়াছেন যেন কুষ্মাণ্ডফল।
বাহিরে জড়িমা অন্তরে আনন্দে বিহ্বল ॥” চরিতামৃত।

পূর্ব্বে যখন প্রভুর দেহ দীর্ঘতা লাভ করে, তাহার বর্ণনা, চরিতামৃতে এইরূপ আছে,—

“প্রভু পড়িয়া আছেন দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাসায় শ্বাস নাহি বয় ॥
একেক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন হাত।
অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম আছে তাতে মাত্র ॥
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত।
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত ॥”

এখন উপরের লিখিত দেহের দুই অবস্থা দেখিলে জানা যায়, উহা পরস্পর বিপরীত। প্রভু এইরূপে পড়িয়া আছেন, প্রভুর চতুষ্পার্শ্বে গাভী, তাহারা প্রভুকে ছাড়িয়া যাইবে না।

"গাভী সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর অঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর অঙ্গ গন্ধ॥"

ভক্তগণ প্রভুকে চেতন করাইবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলেন। কিন্তু কিছুই হইল না। পরে প্রভুকে গৃহে লইয়া আসিলেন। সকলে চিন্তিত, মনের ভাব এইবার বুঝি প্রভুকে হারাইলেন। গৃহে সকলে উচ্চ করিয়া নামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন! বহুক্ষণ পরে প্রভুর কর্ণে নাম প্রবেশ করিল, প্রভু হুংকার করিয়া "হরি বোল" বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন। পরে উঠিয়া বসিলেন। প্রভু যেই মাত্র চেতনা লাভ করিলেন, অমনি তাঁহার দেহ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের কথা লেখা আছে। কিন্তু প্রভু দেখাইলেন, অষ্ট কেন, প্রেমভক্তির চর্চ্চাতে, কত অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। যোগ-সাধনে যে ফল, প্রেমভক্তির চর্চ্চাতে তাহা সমুদয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথচ ভগবানকে পাওয়া যায়। প্রেমভক্তি চর্চ্চাকেই বলে ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগ-সাধনের প্রধান উপায় নাম-কীর্ত্তন।

প্রভু চেতনা পাইয়া এদিক ওদিক চাইতে লাগিলেন। যাঁহাকে দেখিতে চাহেন তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অতি দুঃখে ও ক্লেশে সরূপকে বলিতেছেন, "তোমরা আমাকে সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া এখানে আনিলে কেন?" সরূপ বলিলেন, "প্রভু, স্পষ্ট করিয়া বলুন আমরা কিছু বুঝি-তেছি না।" প্রভু বলিলেন, "আমি বেণুর গীত শুনিয়া বৃন্দাবনে গেলাম। দেখি, কানাই গোঠে বেণুবাদন করিতেছেন। তাহার পরে বেণুসঙ্কেত শুনিয়া শ্রীমতী রাধা নিভৃতনিকুঞ্জে আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে প্রবেশ করিলেন, আর আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। কৃষ্ণের শ্রীপদে মঞ্জীর ও কটিতে কিঙ্কিণী বাজিতে লাগিল। সে মধুর ধ্বনিতে

আমার কর্ণ মুগ্ধ হইল। গোপী, রাধা, কৃষ্ণ সকলে হাস্য পরিহাস, নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। আমি সুখে এই সমুদায় দর্শন করিতেছি, এমন সময় তোমরা আমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিলে। এ কি কাজ ভাল করিলে ?" প্রভু ইহা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে প্রভুর অনেক বাহ্য হইল। তখন বুঝিতে পারিলেন যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাহাতে একটু লজ্জিত হইলেন। কিন্তু মনের বেগ একেবারে গেল না। বলিলেন, "সরূপ! তাপিত অঙ্গ জুড়াও, জুড়াও; আমার প্রাণ অস্থির হইয়াছে!" সরূপ প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া এই শ্লোক পড়িলেন, যথা শ্রীভাগবতে কৃষ্ণের প্রতি গোপীর উক্তি:—

"কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণু গীতং
সম্মোহিতার্য্য চরিতান্নচলেত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন॥"

"হে অঙ্গ! (শ্রীকৃষ্ণ) আপনার কলপদ অমৃতায়মান বেণুগীতে সম্মোহিত হইয়া ত্রিলোকী মধ্যে কোন স্ত্রী নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? অধিক কি, তোমার এই ত্রৈলোক্য সৌভগ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া গাভী, পক্ষী, বৃক্ষ এবং মৃগগণও পুলক সমূহ ধারণ করিয়াছে।"

শ্লোক শুনিবা মাত্র প্রভু শ্লোক বর্ণিত রসে নিমগ্ন হইলেন। অর্থাৎ যে গোপী উপরের কথাগুলি কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, প্রভু সেই গোপী হইলেন, হইয়া উপরের শ্লোকের ভাব লইয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। যেন কৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে। আরো বিস্তার করিয়া বলি। কৃষ্ণ রাসের নিশিতে বেণুগান করিলেন। গোপীগণ আসিলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিলেন; বলিলেন, "তোমরা বাড়ী যাও, পতিসেবা কর গিয়া।" সেই কথার উত্তর এক গোপী দিলেন, তাহার

ভাব "কাস্ত্র্যঙ্গতে" শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। প্রভু এখন সেই গোপী হইয়া কৃষ্ণকে সেইরূপ উত্তর দিতেছেন। গোপী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ত বলিলেন, আর সেই ভাব লইয়া উহা প্রস্ফুটিত করিতে লাগিলেন। ইহাকেই বলে "প্রলাপ"। প্রভু বলিতেছেন, আর সরূপ প্রভৃতি ভক্তগণ মুগ্ধ হইয়া সেই প্রলাপ শুনিতেছেন। প্রভু সেই গোপীভাবে, কি সেই গোপী হইয়া বলিতেছেন, (যেন কৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে,) "হে কৃষ্ণ, এই কি তোমার উচিত? আমরা কুলবালা, কুটীনাটী জানি না, গৃহধর্ম্ম করিতেছিলাম। এমন সময় তোমার বেণুগীত কর্ণে প্রবেশ করিল। তোমার বেণুকে উপেক্ষা করে ত্রিজগতে এরূপ কেহই নাই। সেই বেণুধ্বনি যাইয়া আমাদের চিত্তকে বন্ধন করিল করিয়া তোমার চরণে আনিল। আমাদের স্ত্রীলোকের লজ্জা, কুলের ভয়, সংসারের মমতা, সমুদয়ই অন্তের ন্যায় ছিল, কিন্তু তোমার বেণুগীতে সমুদয় নষ্ট করিল। আমরা এখন জগতে আমাদের যাহা কিছু প্রিয় ছিল সমুদয় তোমার নিমিত্ত ত্যাগ করিয়া, পথের ভিখারী হইয়া, তোমার চরণে আশ্রয় লইলাম। এখন তুমি আমাদিগকে বল, 'বাড়ী যাও অধর্ম্ম করিও না।' একথা কি উচিত?" বলিতে বলিতে প্রভুর মুখে ক্ষোভের চিহ্ন আসিল; তখন আবার বলিতেছেন, "তুমি বল বাড়ী যাও! আমরা কোথায় যাবো? আমাদের বাড়ী কোথায়, আমাদের কি আর বাড়ী আছে? আমরা সমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি, বাড়ী গেলেই বা তাহারা লইবে কেন? তোমার নিমিত্ত তাহাদিগকে ছাড়িলাম, এখন তুমি ছাড়িলে কোথা যাইব? তুমি ব্যতীত আমাদের আর কেহ নাই। তোমা ব্যতীত আমাদের আর কিছু ভাল লাগে না। হে বন্ধো! হে প্রাণ। হে প্রাণের প্রাণ! আমরা উপায়হীন অবলা, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না।" প্রভু গোপীভাবে এইরূপ কৃষ্ণকে প্রেমতিরস্কার করিতেছেন, ইহার মধ্যে সম্পূর্ণ বাহ্য হইল। তখন সরূপ

ও রামরায়ের বদন নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন, "তোমরা ত স্বরূপ আর রামরায়, আমি ত কৃষ্ণচৈতন্য। আমি এখন কি প্রলাপ করিলাম? আমার বোধ হইতেছে যে, যেন আমি সেই গোপী যিনি রাসের রজনীতে কৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। আমি সেই গোপীর ন্যায় তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছিলাম। এ কি প্রলাপ করিলাম?" ইহা বলিতে বলিতে আবার বিহ্বল হইলেন।

এইরূপে প্রভু যখন তাঁহার কৃষ্ণ-চৈতন্যত্ব সম্পূর্ণ ভাবে লোপ করিয়া গোপীভাবে কৃষ্ণের চর্চ্চা করিতেন, তাহাকে 'প্রলাপ' বলে। যেহেতু তিনি তাহাকে প্রলাপ বলিতেন। আর এই প্রলাপে তাঁহার প্রকটের শেষ দ্বাদশ বর্ষ গিয়াছিল।

পরে শুনুন, প্রভু আবার বিহ্বল হইলেন, আবার গোপী কি রাধা হইলেন, তবে ভাব একটু পরিবর্ত্তিত হইল। তখন পুর্ব্বে কৃষ্ণকে যে ওলাহন দিতেছিলেন তাহা ছাড়িয়া, স্বরূপ রামরায়কে সখী বোধ করিয়া তাঁহাদিগকে মন উঘাড়িয়া, মনের দুঃখ বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে ছাড়িয়া সখীগণকে সম্বোধন করার মানে আছে। তখন মনের মধ্যে যে ভাব উদয় হইল, তাহা কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলা অপেক্ষা সখীগণকে বলাই স্বাভাবিক। বলিতেছেন, "সখি! দেখ, কৃষ্ণের অন্যায় দেখ, আমাদিগকে কুলের বাহির করিয়া এখন পরিত্যাগ করিতে চাহেন। আমরা যে কুলের বাহির হই সে কি সাধে? কৃষ্ণের মুখের কথা অমৃত হইতেও মধু, কৃষ্ণের কণ্ঠের স্বর কোকিলকে লজ্জা দেয়, কৃষ্ণের গীতে শ্রোতা মূর্চ্ছিত হয়, আর বেণু গানে জগতের চিত্ত এলাইয়া পড়ে। এই কৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে না পারিয়া লক্ষ্মীগণ তপস্যা করিতেছেন, যাহার কর্ণ কৃষ্ণের অমৃতভাষা শুনিল না সে কর্ণ বধির।"

প্রভু যত বলিতেছেন ক্রমেই হৃদয়ের তরঙ্গ বাড়িতেছে। "সে বধির" এ কথা বলিতে বলিতে মনে উদয় হইল যে, কৃষ্ণ সেখানে নাই। তখন বিরহিণী ভাবে কৃষ্ণকর্ণামৃত হইতে এই শ্লোক পড়িলেন ;—

"কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া,
কথয়তঃ কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুর মধুর স্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে,
কৃপণ কৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরংবত লম্বতে॥"

শ্লোকের বিচার দুই প্রকারে করা যায়। পণ্ডিত কবিগণ একটী রাধার উক্তি শ্লোক আওড়াইয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন, সে একরূপ। প্রভু আপনি রাধা হইয়া বিচার করিতেন, প্রভু রাধা হইয়া কৃষ্ণ-বিরহে মৃতবৎ হইয়া সখীগণকে বলিতেছেন ;—

"সখি, উপায় বল কি করি, কি করিয়া কৃষ্ণকে পাই? এদিকে তোমরাও আমার মত কাতরা আছ, আবার আমার দুঃখ তোমাদের ছাড়া আর কাহাকে বলি? কৃষ্ণের নিমিত্ত যাহা করিলাম সেই ভাল, আর তাঁরে ভাবনা করিব না। সখি, কৃষ্ণ-কথা ব্যতীত অন্য কথা বল।"

বিল্বমঙ্গল উপরি উক্ত শ্লোকে রাধার বিরহ বর্ণনা করিলেন। প্রভু সেই শ্লোক বিচার আরম্ভ করিলেন। শ্লোক পড়িবামাত্র প্রভু আপনি রাধা হইলেন, হইয়া শ্লোক বিচার আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিত কবি শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়া থাকেন, "শ্রীমতী বিরহে কাতরা হইয়া ইহাই বলিলেন ইত্যাদি।" আর প্রভু আপনি রাধা, সুতরাং তিনি আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। তাই প্রভু বলিতেছেন, "সখি! আমার অবস্থা শ্রবণ কর ইত্যাদি।" এখন বিল্বমঙ্গলের "কিমিহ কৃণুম" শ্লোকে প্রভু রাধা হইয়া কিরূপ ব্যাখ্যা করিলেন তাহার আভাস বলিতেছি।

প্রভুর মনের ভাব, তিনি আপনি রাধা, আর সরূপ রামরায় কাজেই তাঁহার সখী! কৃষ্ণকে হারাইয়াছেন, হারাইয়া সকলে বসিয়া হাহাকার করিতেছেন। প্রভুর মনে আশা ও নিরাশা উভয়ে খেলা করিতেছে। যখন আশা আসিতেছে তখন সখীগণের পানে চাহিয়া বলিতেছেন। যথাপদ :—

"তোমরা আমার প্রিয়সখী উপায় বুদ্ধি বল না।
তোমরা জান মন প্রাণ প্রবোধ সে মানে না॥"

বলিতেছেন, "তোমরা নিজ জন, আমার মন জান, তোমাদের অ'ন খুলিয়া কি বলিব? তোমাদের প্রবোধবাক্যে আমার কোন লাভ হইতেছে না, প্রবোধে শান্ত হইতে পারিতেছি না। এখন উপায় বল কি করি? কোথা যাবো, কি করিব, কারে মনের ব্যথা বলিব। কিরূপে কৃষ্ণ পাবো, তাই বল।"

আবার এই ভাবের আর এক পদ শ্রবণ করুন। শ্রীমতী সখীগণ লইয়া বসিয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন ;—

"ধৈর্য্য ধরি, রোদন সম্বরি, শুন আমার বচন শুন।" অর্থাৎ শ্রীমতী আপনি সখীগণকে বলিতেছেন, "চুপ কর, আর কেঁদো না, এখন আমার পরামর্শ শ্রবণ কর।" বিল্বমঙ্গলের শ্লোক আওড়াইয়া প্রভু চুপ করিলেন, কৃষ্ণের উপর একটু ক্রোধ হইয়াছে; বলিতেছেন, "আমি দেখিতেছি আমাদের পক্ষে কৃষ্ণকে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল, কৃষ্ণের নিমিত্ত বিস্তর করিয়াছি। আমার যাহা কিছু আছে সমুদায় দিয়াছি, তবু তাঁহার কৃপা পাইলাম না। অতএব এরূপ নিষ্ঠুর কৃষ্ণকে ভজনা না করাই ভাল।"

হে কৃপাময় পাঠক, আপনি কি মানভঞ্জন গীত শ্রবণ করিয়াছেন? সেই গীতে দেখিবেন, শ্রীমতীর কৃষ্ণের উপর ক্রোধ হইয়াছে, তাই বলিতেছেন, "কৃষ্ণনাম আর করিব না।"

সখী। কৃষ্ণ ভজিবে না তবে কাহাকে ভজিবে?

রাধা। সিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন তাঁহাকে ভজিব। কি ভোলা দয়াময় মহেশ আছেন তাঁহাকে ভজিব। কৃষ্ণ কুটিল, চঞ্চল, নিষ্ঠুর, তাঁহাকে কি আমাদের ন্যায় অবলার ভজনা সম্ভব হয়? কৃষ্ণ ভজিব না, যাহাতে কৃষ্ণনাম স্মরায় তাহাও নিকটে রাখিব না।

সখী। তোমার কেশ লইয়া কি করিবা? কেশে যে কৃষ্ণ-নাম স্মরায়।

রাধা। মুণ্ডন করিব।

সখী। তোমার কৃষ্ণবর্ণ শ্যামা সখীর কি করিবা?

রাধা। তাহাকে কুঞ্জ হইতে তাড়াইয়া দাও।

কৃষ্ণযাত্রায় মানভঞ্জন পালায় এইরূপ রাধা ও সখীতে কথাবার্তা দেখিবেন। এ কোথা হইতে আসিল? ইহা মহাপ্রভুর প্রলাপ হইতে মহান্তগণ পাইলেন।

তাহার পরে প্রভু বলিলেন যে, "কৃষ্ণকে বিস্তর করা হইয়াছে তাহাকে আর ভজিব না।" প্রভু ইহা বলিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন তাঁহার হৃদয় মধ্যে যেন কে একজন আছেন। তিনি কে, জানিবার জন্য নয়ন মুদিলেন, মুদিয়া ঠাউরিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখেন যে, যে কৃষ্ণকে তিনি ত্যাগ করিবেন বলিতেছিলেন, সেই কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয় মধ্যে আছেন, আর তিনি পরিত্যক্ত না হয়েন, ইহার নিমিত্ত ক্ষুণ্ণ বদনে মধুর হাস্যের সহিত তাঁহার পানে চাহিতেছেন। অর্থাৎ যেন রাধা কৃষ্ণকে ত্যাগ না করেন, এই নিমিত্ত কৃষ্ণ রাধাকে অনুনয় বিনয় করিতেছেন।

প্রভু ইহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিতেছেন, "একি সর্ব্বনাশ। কৃষ্ণকে ত ছাড়া হইল না, হইল না। তিনি যে আমার হৃদয় মধ্যে স্বচ্ছন্দে

আছেন। তাঁহাকে হৃদয় হইতে কিরূপে অবসর করিব? হইল না হইল না!" প্রভু একটু চুপ করিলেন, করিয় গদগদ হইয়া বলিতেছেন, "সখি! আবার, ও কি হইল! আমার প্রাণ যে কৃষ্ণের নিমিত্ত আরো কান্দিয়া উঠিতেছে। কৃষ্ণ! আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না, কখনই না, কখনই না। আমি যে বলেছিলাম তোমাকে ত্যাগ করিব সে মনোগত নয়, রাগ করিয়া। তাহাও নয়, ক্ষুব্ধ হইয়া। তাহাও নয়, তোমার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া। তাহাও নয়, পাগল হইয়াছিলাম, হইয়া প্রলাপ বকিতেছিলাম। আমি কি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি? তাহা কি হয়? তুমি আমার ও সব কথা কেন বিশ্বাস কর? তোমাকে ত্যাগ করিব তবে আমার রহিল কি? তোমা ছাড়া আমার কে আছে, বা কি আছে? তুমি না আমার নয়নরঞ্জন, তুমি না আমার প্রাণধন, তুমি না আমার প্রাণের প্রাণ? তুমি যেও না, যেও না।" ইহা বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। কিন্তু এ মূর্চ্ছা ঘোর নহে। অতি অল্পক্ষণ পরে সম্বিত পাইলেন, দেখিতেছেন কৃষ্ণ নাই, তখন আবার সখীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "কোথা গেলেন? এই যে এখানে ছিলেন! হা পদ্মলোচন! হা শ্যামসুন্দর! হা অলকাবৃত মুখ! আমাকে ছাড়িও না।" কোথা গেলে তোমাকে পাইব? এই আমি এলেম।" ইহা বলিয়া উঠিলেন, উঠিয়া কৃষ্ণের অন্বেষণে দৌড়িলেন। কিন্তু পারিলেন না, সেখানে ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

এই গেল প্রলাপের, পরে দিব্যোন্মাদ, অগ্রে প্রলাপ পরে দিব্যোন্মাদ। রাধাভাবে যে সমুদায় কথা সে "প্রলাপ", রাধাভাবে যে কার্য্য সে 'দিব্যোন্মাদ।" যখন রাধাভাবে মনের ভাব উঘাড়িয়া বলিতেছিলেন, তখন "প্রলাপ" করিতেছিলেন। যখন কৃষ্ণের অন্বেষণের নিমিত্ত দৌড়িলেন, সে প্রভুর দিব্যোন্মাদ। প্রভু চেতন পাইয়া কৃষ্ণকে ধরিতে আবার যখন

দৌড়িলেন, তখন সরূপ উঠিলেন, উঠিয়া প্রভুকে ধরিয়া কতক বল, কতক নানারূপ ছলনা করিয়া, আপনার ক্রোড়ে বসাইলেন। ইহাতে প্রভুর অর্দ্ধ বাহ্য হইল, তখন বিষণ্ন মনে বলিতেছেন, "সরূপ, মধুর গীত গাও, আমার শরীর শীতল কর।"

সরূপ গাইলেন,—

"হামার আঙ্গিনা আওব যবে রসিয়া।
পালটী চলব হাম ঈষৎ হসিয়া॥"

প্রভুর হৃদয়ে সেই ভাব স্পর্শিল, তখন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রভু দিব্যোন্মাদের বশীভূত হইলে ভক্তগণকে অনেক সময়ে ভয় দিতেন। প্রভু সমুদ্রস্নানে যাইতেছেন, ইহার মধ্যে হঠাৎ অতিদূরে চটক পর্ব্বতের ছায়া দেখিতে পাইলেন। তখন কাজেই প্রভুর মনে বোধ হইল যে সে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত। প্রভু কেবল এক পর্ব্বত জানেন, তিনি শ্রীগোবর্দ্ধন। তখন একটী গোবর্দ্ধনের স্তুতিজনক শ্রীভাগবতের শ্লোক পাঠ করিয়া সেই চটক পর্ব্বত লক্ষ্য করিয়া দৌড়িলেন। দৌড়িলেন কিরূপে, না বিদ্যুৎ গতিতে। গোবিন্দ চীৎকার করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। সেই ধ্বনি কেহ কেহ শুনিলেন। একেবারে প্রচারিত হইল যে, প্রভু সমুদ্রস্নানে যাইতে পথে কি একটা মন্দ ঘটনা হইয়াছে। সুতরাং যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থায় সমুদ্র-স্নানের স্থানে ছুটিলেন। এইরূপে সরূপ, জগদানন্দ, গদাধর, রামাই, নন্দাই, নিতাই, শঙ্কর, পুরী, ভারতী, এমন কি খঞ্জ ভগবান পর্য্যন্ত চলিলেন। তাঁহারা আসিয়া প্রভুর লাগ পাইলেন। তাহার কারণ দৈব তাঁহাদের সহায় হইয়াছেন, নতুবা তাঁহাদের পাওয়া দুর্ঘট হইত। যে বায়ুগতিতে প্রভু প্রথমে দৌড়িয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে কাহারও ধরিতে শক্তি হইত না।

কিন্তু প্রভু এইরূপ যাইতে যাইতে স্তম্ভভাবে অভিভূত হইলেন, অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত অঙ্গ অবশ হইল, তখন চলিতে পারিলেন না, এক স্থানে দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন। অঙ্গ পুলকিত হইয়াছে, এমন কি এক একটী পুলকে ব্রণের আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা হইতে রুধির পড়িতেছে। বর্ণ হইয়াছে শঙ্খের ন্যায়, যেন শরীরে শোণিত নাই কণ্ঠ হইতে ঘর্ঘর শব্দ হইতেছে। আর নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত ধারা পড়িতেছে। ভক্তগণ প্রভুকে ধরিতে দৌড়িয়াছেন, এমন সময়ে প্রভু কাঁপিতে কাঁপিতে মৃত্তিকায় পড়িয়া গেলেন, আর তখনি গোবিন্দ সর্ব্বাগ্রে নিকটে উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ করঙ্গে জল পূরিয়া প্রভুর গাত্রে সিঞ্চন করিয়া বহির্ব্বাস দ্বারা বায়ু বীজন করিতেছেন, এমন সময় স্বরূপ, রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ আসিলেন। প্রভুর অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ কাঁদিতে লাগিলেন। অনেক সন্তর্পণে প্রভুর চেতন হইল, আর 'হরিবোল" বলিয়া উঠিয়া বসিলেন, আর সকলে আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

প্রভু উঠিয়া বসিয়া বিহ্বলের ন্যায় এদিক ওদিক চাহিতেছেন, যাহা দেখিতে চান, দেখিতে পাইতেছেন না। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আমাকে কেন ধরিয়া আনিলে? আমি গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলাম, যেয়ে দেখি যে, কৃষ্ণ গোচারণ করিতেছেন। তাহার পর কৃষ্ণ বেণু বাজাইলেন, বেণু শুনিয়া রাধা ঠাকুরাণী আসিলেন। তাঁহার যে রূপ তাহা আমি কি বর্ণনা করিব! কৃষ্ণ রাধাকে লইয়া নিভৃত স্থানে গেলেন, সখীগণ কুসুম চয়ন করিতে লাগিলেন, এমন সময় তোমরা কোলাহল করিলে আর আমাকে বলদ্বারা ধরিয়া আনিলে। কেন দুঃখ দিতে আনিলে বুঝিতে পারিলাম না। সুখে কৃষ্ণলীলা দেখিতে-ছিলাম, তাহা দেখিতে দিলে না।" ইহা বলিয়া মহাদুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে পুরী ভারতী সেখানে আসিলেন। তাঁহাদিগকে প্রভু গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রভু একটু বাহ্য পাইলেন. পাইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা প্রভুকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন। তখন প্রভু নিপট্ট বাহ্যলাভ করিলেন, বলিতেছেন "আপনারা এতদূর কেন আসিয়াছেন?" তখন সকলের মনে আনন্দ আসিয়াছে তাই পুরী সহাস্যে বলিলেন, "এতদূর আইলাম তোমার নৃত্য দেখিব বলিয়া।" প্রভু তখন লজ্জা পাইলেন। পরে প্রভু সমুদায় ভক্তগণের সহিত সমুদ্র ঘাটে আসিলেন, আসিয়া স্নান করিলেন।

ব্রজলীলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মধুর ও শ্রীভগবানের প্রেমপরিচায়ক লীলা—রাস। শ্রীভাগবতের রাসলীলা জীবে লক্ষবার পাঠ করিলেও তাহার তৃপ্তি হইবে না। শ্রীভগবান পরম সুন্দর, প্রেম পাগল। তঁাহার শ্রীবৃন্দাবনে গোপীগণকে বেণুবাদন করিয়া আকর্ষণ করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবন কি, না প্রেমের হাট, সে দেশে প্রীতি বিকি কিনি হয়। আপনি "মদনমোহন গ্রাহক, তাহে পসার যৌবন।"

অর্থাৎ রাসের হাটে গোপীগণ তাহাদের যৌবন বিক্রয় করিতে বসিয়া আছেন, আর মদনমোহন কৃষ্ণ তাহা ক্রয় করিতেছেন!

পূর্ণিমা রাত্রি, তাহাতে শরতের পূর্ণিমা, বন কুসুমে সুশোভিত। কুসুমের গন্ধে অটবী আমোদিত। কৃষ্ণ মনোহর রূপ ধারণ করিয়া করুণস্বরে বেণু বাদন করিতেছেন। বাঁশী শুনিয়া শ্রীমতী বলিতেছেন—

"মন্দ মন্দ মধুর তান, শুন ওই বাজে তান তরঙ্গ।
ঐ শুন শ্যামের বাঁশী বাজে, বাজে ওই।
শ্যামের বাঁশী বাজে কোথা প্যারী।
আমি একা কুঞ্জে রইতে নারি।

শ্যামের বাঁশী বাজে এসো রাই।"

(তোমা বিনা) আমার বৃন্দাবনের শোভা নাই ॥"

গোপীগণের কর্ণে সেই শব্দ প্রবেশ করিল। তখন উন্মাদিনী হইয়া, তাঁহারা সকলে কৃষ্ণাভিমুখে ছুটিলেন। যাঁহারা সন্তানকে স্তন পান করাইতে ছিলেন তাঁহারা সন্তান ফেলিয়া, যাঁহারা দুগ্ধ জ্বাল দিতেছিলেন তাঁহারা সেই কটাহ না নামাইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া চলিলেন। তাঁহাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ শাসন করিলেন কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন না। কোন কোন গোপীকে তাঁহাদের স্বামীরা বন্ধন করিয়া রাখিলেন, তাহাতে এই ফল হইল যে, তাঁহাদের চিত্ত তদ্দণ্ডেই শ্রীকৃষ্ণের চরণে উপস্থিত হইল।

কেহ বা ভাবিলেন কৃষ্ণের নিকট সুবেশ করিয়া যাইবেন, কিন্তু বিহ্বল হইয়া কর্ণের ভূষণ হস্তে, হস্তের ভূষণ কর্ণে পরিলেন। এইরূপে বিহ্বল অবস্থায় তাঁহারা চলিলেন। যথা পদঃ—

"আরে এ কুঞ্জে বাজিল মুরলী। ধ্রু।

বাঁশীর গান, মধুর তান, শুনে ব্রজাঙ্গনা।

সুখে চলে পড়ে ঢলে না জানে আপনা।

গোপনারী সারি সারি (চলে) শ্যাম দরশনে ॥"

শ্রীকৃষ্ণ মধুর হাসিয়া তাঁহাদিগকে আদর করিয়া বলিলেন, "তোমরা কি নিমিত্ত আসিয়াছ? ভয় পাইয়া? বল আমি ভয় দূর করিব। কিম্বা বৃন্দাবনের শোভা দেখিতে? দেখ স্বচ্ছন্দে, আমার বৃন্দাবনের শোভা আস্বাদন কর।"

কথা এই, জীব দুই কারণে শ্রীভগবানকে চায়। প্রথম ভয় পাইয়া না হয় অন্য স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত। শ্রীভগবান জীবকে দর্শন দিয়াছেন, এরূপ কথা বহুস্থানে শুনা যায়। কিন্তু যেখানে এইরূপ জীবে ও ভগবানে

সাক্ষাৎ সেখানে কেবল স্বার্থ সাধন। জীব বলে আমাকে বর দাও, আর শ্রীভগবান বর দিয়া থাকেন। কিন্তু গোপীগণ স্বার্থ পানে চাহিলেন না, তাঁহারা বর চাহিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "আমরা তোমার পাদপদ্মে আশ্রয় লইলাম, আমরা কিছু চাহি না, আমরা তোমাকে চাই।"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "পতিত্যাগ করিয়া আমাকে উপপতিরূপে গ্রহণ করিবে ? এ ত সাধু অর্থাৎ প্রচলিত পথ নয় ? ইহাতে তোমাদের সর্ব্ব-মতে স্বার্থের হানি হইবে। আমার সম্পত্তির মধ্যে এই এক বেণু, কোন সম্পত্তি দিবার আমার নাই। অতএব তোমরা যাহার কাছে বর পাইতে অর্থাৎ স্বার্থ সিদ্ধি করিতে পারো সেখানে যাও। তাই বলি তোমরা গৃহে যাও, সর্ব্বজন অবলম্বিত পথ ত্যাগ করিও না।"

মনে করুন সর্ব্বজন অবলম্বিত পথ কি ? সে পথ এই যে সংসার ধর্ম্ম কর, পূজা অর্চ্চনা কর, জীবে দয়া কর, পুষ্করিণী দাও, মন্দির স্থাপন কর ইত্যাদি। যিনি বড় সাধুপথ অবলম্বন করিতে পারেন তিনি বনে গমন করেন, চিত্ত সংযম করেন, যোগ করেন, তপস্যা করেন, করিয়া অষ্ট-সিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু গোপীগণ ইহার কিছু করিলেন না, তাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত প্রীতি করিতে চাহিলেন। গোপীগণ কতক কতক উদাসীন, তাঁহাদের দান ধর্ম্ম, পূজা অর্চ্চনা, তপস্যা যোগসিদ্ধি এ কিছু নাই, অথচ সংসারী হইয়া যে যে কার্য্য করিতে হয়, কিছু করিতেন না। কি করিতেছেন—না, কৃষ্ণের বেণুগান শুনিয়া ও তাঁহার রূপে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতেছেন। আর যখন কৃষ্ণ বলিলেন, "তোমরা যে নূতন পথ অবলম্বন করিতেছ, ইহাতে তোমাদের লাভ হইবে না, আর হয়ত নরকে যাইবে।" তখন তাঁহারা কৃষ্ণের নিমিত্ত নরকে যাইতে কুণ্ঠিত হইলেন না। মনে ভাবুন শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করা সাধারণের মতে সাধু

মত নয়। বড় লোকে বলেন, "সোহহং" তিনিও যে আমিও সে, "আমি আমার ভাল মন্দ করি," "আমি আমার কর্ম্মফল ভোগ করি," "আমার ভাল মন্দ কেহ করিতে পারে না।" যাঁহারা কৃষ্ণের রূপাস্বাদ করিয়া আনন্দ জল ফেলিতেছেন তাঁহারা, সাধারণের মতে উন্মাদ। কেহ তান্ত্রিকগণের ন্যায় মন্ত্রৌষধি দ্বারা শ্রীভগবানকে বশীভূত করেন, কেহ বনে গমন করিয়া চিত্ত সংযম করিয়া বর প্রার্থনা করিয়া শ্রীভগবানকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত তপস্যা করেন। এই সমুদায় সর্ব্ববাদিসম্মত সাধুপথ। ইহা ত্যাগ করিয়া গোপীগণ কি করিতেছিলেন, না স্ত্রীলোক যেমন স্বামী ত্যাগ করিয়া উপপতি ভজন করেন তাহাই করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন, আমার জন্য তোমরা সাধু পথ ত্যাগ করিয়া কুলের অবলা হইয়া সমাজের বিড়ম্বন সহ্য করিবে? তাহাতে গোপীগণ বলিলেন, "তথাস্তু"। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থলে গোপীগণ দ্বারা দেখাইলেন যে গোপীগণ প্রেমের উপাসক।

আর কি দেখাইলেন বলিতেছি। জগতে সকলেই শক্তির বা ঐশ্বর্য্যের উপাসক। শ্রীভগবান কীটাণু হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়াছেন দেখিয়া লোকে ভক্তি ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়। কিন্তু ভগবানের আর একটী গুণ আছে। তিনি যে শুধু সর্ব্বশক্তিমান্ তাহা নহে, তিনি মাধুর্য্যময়। শ্রীকৃষ্ণ তাহাই দেখাইলেন। জগতের সকলে ঐশ্বর্য্যের উপাসক, বৈষ্ণবগণ মাধুর্য্যের উপাসক।

শ্রীভাগবত গ্রন্থ শিক্ষা দিলেন যে, কৃষ্ণপ্রেম জীবের প্রধান আশীর্ব্বাদ। শ্রীমহাপ্রভু সেই কৃষ্ণপ্রেম কি দেখাইবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইলেন। এরূপ পবিত্র মধুর ধর্ম্ম জগতে ছিল না। এই প্রেমধর্ম্মের মর্ম্ম এই যে, "কৃষ্ণ! আমি তোমার, তুমি আমার।" "আমার এক কৃষ্ণ আছেন, আর কৃষ্ণের এক আমি আছি।" রাসে যত গোপী তত কৃষ্ণ বর্ণিত আছে। "হে কৃষ্ণ আমি আর কাহাকে জানি না, তুমিও আর কাহাকে

চাও না। তোমায় আমায় চিরদিন প্রেমানন্দে কাটাইব।” “আমি তোমার তুমি আমার’ এই মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ রাসের রজনীতে শিক্ষা দিলেন, কিরূপে বলিতেছি ঃ—

যখন গোপীগণ সমুদায় ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লইলেন, তখন তিনি “তাহাই হউক” বলিয়া তাহাদের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে বিপরীত ফল হইল, যেহেতু গোপীগণের দম্ভ হইল। যেই মাত্র গোপী হৃদয়ে দম্ভের সৃষ্টি হইল, অমনি কৃষ্ণ অদর্শন হইলেন। তখন কৃষ্ণবিরহে উন্মত্ত হইয়া গোপীগণ অচ্যুতকে তল্লাস করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বৃক্ষ, লতা, মৃগ প্রভৃতিকে শুধাইতে লাগিলেন যে, তাহারা কৃষ্ণকে কি দেখিয়াছেন? পাঠক মহাশয়, রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিবেন, যতই পড়িবেন ততই রস পাইবেন।

মহাপ্রভু এইরূপে গোপী অনুসরণ করিয়া একদিন কৃষ্ণ অন্বেষণ আরম্ভ করিলেন। তাহার বিবরণ শ্রবণ করুন ঃ—

প্রভু সমুদ্র যাইতে পুষ্পোদ্যান দেখিলেন, অমনি তাঁহার বৃন্দাবন ও রাসের রজনীর কথা মনে পড়িল। একে সর্ব্বদা কৃষ্ণবিরহে অভিভূত, তাহাতে রাসের রজনীর কথা মনে হইলে স্বভাবতঃ কৃষ্ণ-বিরহে গোপীগণ বৃন্দাবনে যে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রভুর মনে পড়িল। তাহাতে প্রভু সেই কুসুম কাননে প্রবেশ করিয়া অদ্ভুত লীলা আরম্ভ করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণন করিয়াছেন কিরূপে গোপীগণ কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন। প্রভু কার্য্যে তাহাই করিতে লাগিলেন। প্রথমে উদ্যানে প্রবেশ করিয়া বড় বড় বৃক্ষগণ দর্শন করিলেন। তখন সেই বৃক্ষগণকে বলিতেছেন, “হে চ্যুত, হে পিয়াল, হে পনস (দশম স্কন্ধে, ত্রিশ অধ্যায়ে, নবম শ্লোকে দেখ) হে কোবিদার, হে অর্জ্জুন, হে জম্বু, হে অর্ক, হে বিল্ব, হে বকুল, হে আম্র, হে কদম্ব, হে অন্যান্য তরুগণ! তোমরাও

এই যমুনাকূলে থাক, অতএব তোমরা দুঃখী জন প্রতি দয়ালু। আমরা কৃষ্ণবিরহে কাতর, তোমরা বলিতে পার, কৃষ্ণ কোন পথে গিয়াছেন?’

হে পাঠক, একদিন চেষ্টা করিয়া বৃক্ষগণকে এইরূপ সম্বোধন করিয়া দেখিবেন। এরূপ সম্বোধন করিতে রাধা ব্যতীত অন্য কোন জীবে পারে না। গোপী ভাব না পাইলে বা গোপী না হইলে, অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা না হইলে নাটকাভিনয় ব্যতিরেকে প্রকৃত পক্ষে জীবে এইরূপ বলিতে পারে না।

এইরূপে প্রভু, ভাগবতে গোপীগণের কার্য্য যেরূপ বর্ণিত আছে তাহাই কার্য্যে করিতে লাগিলেন। কোন কোন বৃক্ষের শাখা মৃত্তিকায় স্বভাবতঃ সংলগ্ন হইয়া আছে। প্রভু ইহা দেখিয়া ভাবিতেছেন, কৃষ্ণ অবশ্য এখানে ছিলেন। কৃষ্ণ এই পথে যাইতেছেন দেখিয়া, বৃক্ষগণ প্রণাম করিয়াছিল, বোধ হয় আশীর্ব্বাদ পায় নাই, আর সেই আশায় মস্তক না উঠাইয়া পড়িয়া আছে। প্রভুর অবশ্য মনের ভাব যে, জগতের স্থাবর অস্থাবরের আর কোন কার্য্য নাই, তাহারা সকলে কেবল শ্রীকৃষ্ণ উপাসনাতেই রত! প্রভুর যখন ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণান্বেষণের সমস্ত কার্য্য করা হইল, তখন কৃষ্ণকে দেখিবার সময় হইল, আর দেখিলেন যে, যমুনা পুলিনে শ্রীকৃষ্ণ ভুবনমোহন রূপ ধরিয়া, অলকাবৃত মুখে বেণুবাদন করিতেছেন। প্রভু ইহা দেখিলেন আর তদ্দণ্ডে ঘোর মূর্চ্ছায় অভিভূত হইলেন। ভক্তগণ দেখেন যে প্রভুর বদন আনন্দময়, দেহ পুলকাবৃত নয়নে আনন্দজলের স্রোত চলিতেছে। সকলে চেষ্টা করিয়া চেতন করাইলেন। প্রভু এদিকে ওদিকে চাহিতে লাগিলেন, শেষে বলিতেছেন “কৃষ্ণকে এইমাত্র দেখিলাম, তিনি কোথায় গেলেন? কৃষ্ণ চঞ্চল, আমাকে দর্শন দিয়া, পাগল করিয়া, আবার ফেলিয়া গিয়াছেন! আমি এখন কি করি। স্বরূপ! কি করি বল?” তখন স্বরূপ গাইলেন—

"রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসং
স্মরতি মনো মম কৃত পরিহাসং॥"

জয়দেবের এই পদ শুনিয়া প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন. প্রভু "গাও", "গাও" বলিতেছেন, আর নৃত্য করিতেছেন। প্রভুর বিরাম নাই, সরূপকেও থামিতে দিবেন না। পরে যখন প্রভু নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলেন, তখন সরূপ চুপ করিলেন, প্রভু বলিলেও গাহিলেন না, তখন প্রভু থামিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে স্নান করাইয়া গৃহে লইয়া গেলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীভগবানের মাধুর্য্য বুঝাইবার নিমিত্ত অবতীর্ণ। শ্রীভগবানের ইচ্ছা ভক্তকে তাঁহার রাজ্যের পরমাধিকারী করিবেন। ভক্তের যে অধিকার, সে কি প্রচুর? তাই জানিবার নিমিত্ত তিনি ভক্তভাব ধরিয়া ভক্তের যে সম্পত্তি, তাহা ভোগ করিতে লাগিলেন। ভগবানের যে মাধুর্য্য তাহা প্রভু জীবকে অতি অল্প পরিমাণে দেখাইতে পারিলেন বটে, তবে তিনি ভক্তের অধিকার দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন যে, শ্রীভগবানের যে অধিকার, ভক্তের অধিকার তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে।

"ভক্তের প্রেমবিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার।
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত অন্য কেবা আর॥"

শ্রীচরিতামৃত।

শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়া যে সুখ অনুভব করেন, তাহা কত মধুর, তাহা আস্বাদ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাব ধারণ করিলেন। দেখিলেন যে কৃষ্ণ হইতে রাধা যে সুখ ভোগ করেন, কৃষ্ণ যে পরমানন্দময় তিনিও তত সুখ ভোগ করেন না। শ্রীভগবানের মাধুরী প্রভু দুই রূপে জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। আপনি আচরিয়া, আর তাঁহার যেখানে সম্ভাবনা নাই, সেখানে বর্ণনা করিয়া। প্রভু এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য দেখাইবার নিমিত্ত একদিন তাঁহার অধরামৃতের শক্তি দেখাইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ, মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঠাকুর দর্শন করিতেছেন। হেনকালে গোপালবল্লভ-ভোগ দেওয়া হইল। দ্বার বন্ধ হইল, ভোগ দেওয়া হইলে, দ্বার খুলিয়া জগন্নাথের সেবকগণ তাহার কিঞ্চিৎ প্রভুকে আনিয়া দিলেন। প্রসাদ দিয়া সেবকগণ অনেক যত্ন করিয়া প্রভুকে তাহার কিছু খাওয়াইলেন। প্রভু আস্বাদ করিয়া বলিতেছেন, "সুকৃতি-লভ্য ফেলালব।"

সেবকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহার অর্থ কি?" ঠাকুর বলিলেন, "ফেলা মানে কৃষ্ণের ভুক্তাবশেষ। ইহা পরম ভাগ্যে মিলে, আর এই যে তোমরা আমাকে প্রসাদ দিলে ইহা ফেলা, যেহেতু ইহাতে কৃষ্ণের অধরামৃত স্পর্শ করিয়াছে।"

সেই প্রসাদ ঠাকুর কিছু আস্বাদ করিলেন, আর কিছু গোবিন্দের দ্বারা বাড়ী আনিলেন। সে যে কৃষ্ণের প্রসাদ, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই যে, সেই প্রসাদের অলৌকিক গন্ধ ও অলৌকিক আস্বাদ। প্রভু আপনি আস্বাদ করিলেন, আর আনন্দে তাঁহার নয়নধারা পড়িতে লাগিল। প্রভু সেই প্রসাদ বাসায় আনিয়া প্রধান ভক্তগণকে ডাকাইয়া তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বণ্টন করিয়া দিলেন। সকলে দেখিলেন জগতে এরূপ দ্রব্য হয় না। যদিও ইহা সামান্য বস্তু দ্বারা প্রস্তুত, কিন্তু ইহার গন্ধ ও আস্বাদ এ জগতের নয়।

প্রিয় বস্তুর অধর-রস অতি মধুর। শ্রীভগবান প্রিয় হইতে প্রিয়, তাঁহার অধর-রস অমৃত কেন না হইবে? সুগন্ধ আমাদের নাসিকায় কেন আনন্দ দেয়, তাহা আমরা জানি না। কোন কোন দ্রব্য জিহ্বায় দিলে কেন সুখের উদয় হয়, তাহাও আমরা জানি না। আমরা জানি না বটে, কিন্তু "তিনি" জানেন। তাই যখন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট চর্ব্বিত তাম্বুল ভিক্ষা করিলেন, তখন তিনি উহাতে নাসিকার ও জিহ্বার

আনন্দপ্রদ শক্তি দিয়া প্রদান করিলেন। তাই যখন প্রভুর ইচ্ছা হইল যে, এক দিন ভক্তগণকে কৃষ্ণের অধর রসের মাধুরী দেখাইবেন, তখন গোপালভোগ-প্রসাদে সেই শক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে দেখাইলেন।

কিন্তু কৃষ্ণের কোন কোন মাধুরী প্রত্যক্ষ দেখাইবার যো নাই। সে সমুদায় প্রভু বর্ণনা দ্বারা ভক্তগণকে দেখাইতেন। যেমন কৃষ্ণের জল-কেলী লীলা।

শরৎকাল, শুক্লপক্ষ, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় চন্দ্রোদয় হইতেছে। প্রভু রাসরসে বিভোর। প্রভু রাসের এক শ্লোক পড়িতেছেন, আর তাহা কি, কার্য্য দ্বারা দেখাইতেছেন। এই মাত্র একদিনকার লীলা বলিলাম। তখন প্রভু আইটোটায় বিচরণ করিতেছেন। হঠাৎ সমুদ্র দেখিতে পাইলেন, জ্যোৎস্নায় উহার জল ঝলমল করিতেছে। তখন প্রভু রাসের জলকেলীর শ্লোক পড়িলেন। সেই শ্লোক পড়িয়া জলকেলী কি, তাহা আস্বাদিতে কি জীবগণকে শিখাইতে, সমুদ্রে ঝম্ফ দিলেন। প্রভু এইরূপ দ্রুতগতিতে সমুদ্র দিকে গমন করিলেন যে ভক্তগণ লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। দেখেন প্রভু এই আছেন, আর নাই। সকলে তল্লাস করিতে লাগিলেন। প্রথমে তাচ্ছিল্যের সহিত তল্লাস করিলেন, পরে মনোযোগের ও আশঙ্কার সহিত। কোথা গেলেন? চারিদিকে ভক্তগণ ছুটিলেন। যখন রজনী তৃতীয় প্রহর, তখনও প্রভুর উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই, সকলে চিন্তায় মৃতবৎ।

আমার সরূপের অবশ্য প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। দেখেন একজন ধীবর গীত গাহিতে গাহিতে আসিতেছে। আর দেখেন যে, সে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নৃত্য করিতেছে। বুঝিলেন এ প্রভুর কার্য্য। সরূপ বলিতেছেন, ধীবর তোমাকে এরূপ বিহ্বল কেন দেখিতেছি?

ধীবর। এতদিন এখানে মৎস্য শিকার করিতেছি কখনও ভূত দেখি নাই। অদ্য জালে একটী মৃতদেহ উঠিল। জাল হইতে সেই দেহ ছাড়া-

হতে উহা স্পর্শ করিতে হইল, আর স্পর্শমাত্র আমার নয়নে জল, চরণে নৃত্য, আর বদনে কৃষ্ণনাম আসিল। এই দেখ আমার বদন কৃষ্ণনাম আর ছাড়ে না।

ধন্য আমার প্রভু!

তখন সরূপ সমুদায় বুঝিলেন। জেলেকে সঙ্গে করিয়া দেখেন প্রভুর সেই লক্ষ্মীর সেবিত দেহ, সমুদ্রতীরে বালুকার উপরে পড়িয়া আছেন, জীবনের চিহ্ন নাই।

কর্ণে হরিনাম করিতে করিতে অনেক পরে প্রভুর চেতনা হইল। তাহার পরে অর্দ্ধ বাহ্যদশা আসিল। তখন কৃষ্ণের জলকেলী বর্ণন করিতেছেন। বলিতেছেন, কৃষ্ণ গোপীগণ সহিত যমুনার স্বচ্ছজলে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দেখিলাম যে, গোপীগণের বদন পদ্মপুষ্পরূপে পরিণত হইল। দেখিলাম, কৃষ্ণের মুখও পদ্ম হইল। তবে গোপীগণের লাল, আর কৃষ্ণের নীল। দেখিলাম, এইরূপে অসংখ্য লালপদ্ম যমুনায় ভাসিতে লাগিল। আর দেখিলাম, অসংখ্য নীলপদ্মও ভাসিতেছে। এই নীলপদ্ম লালপদ্মকে, ও লালপদ্ম নীলপদ্মকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন এইরূপ ভাসিতে ভাসিতে নীল ও লালপদ্মে মিলন হইল!

বৃন্দাবন মাধুরী আমি কি বর্ণনা করিব। উঁহা ব্রহ্মা, শিব, শুক, নারদেরও অগোচর। আমার যাহা সাধ্য, আমি "কালাচাঁদ গীতায়" চেষ্টা করিয়াছি। আমার ইংরাজী গ্রন্থে দ্বিতীয় ভাগের শেষে একটী অধ্যায়ে ইহার কিছু আভাস আছে। তাহা পাঠ করিয়া ইউরোপে ও আমেরিকায় কেহ কেহ গৌরভক্ত হইয়াছেন।

৫ম খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রী অমিয়নিমাই-চরিত

অর্থাৎ

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর লীলা বর্ণনা

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ দাস কর্ত্তৃক

গ্রন্থিত।

ষষ্ঠ খণ্ড

কলিকাতা।

বাগবাজার, ১।১২০নং আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলি।

পত্রিকা-প্রেসে,

শ্রীতড়িৎকান্তি বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

গৌরাব্দ ৪২৫। সন ১৩১৭।

সূচীপত্র।

আমাদের নিবেদন ঙ—ঝ
উৎসর্গ পত্র ট—ঠ
ভূমিকা ড—ঢ
উপক্রমণিকা ।০—৸৶০

প্রথম অধ্যায়।

প্রভুর লীলা বিচার, শ্রীনবদ্বীপ, মুরারি ও নিমাই, নিমাইর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, নিমাই পূর্ব্ববঙ্গে, প্রভুর প্রকাশ, ভক্তি ও ঔদাস্য, নদে টলমল, অদ্বৈতের সন্দেহ, নব বৃন্দাবন, পূর্ব্বরাগের পদ, কান্তভাবে ভজন, গৌর বিরহ, বিষ্ণুপ্রিয়ার মান, গৌরাঙ্গ নারায়ণ, গৌরবাদীর দল, খাঁড়া পদ্মায়।

১ পৃষ্ঠা হইতে ৩৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রভুর লীলা উদ্দেশ্য, শচী ও মুরারি গুপ্ত, প্রভু কেন সন্ন্যাস লইলেন, কিরূপে জীবকে দ্রবাইলেন, অদ্বৈতের নিদ্রাভঙ্গ, বৃন্দাবনে গেলে কার্য্য পণ্ড, প্রভু নীলাচলে, প্রভু একেবারে সহায় শূন্য। ৩৪—৪৮ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়।

দক্ষিণে গমন, রামগিরি উদ্ধার, ঢুণ্ডিরামের নবজীবন লাভ, প্রভুর পথকষ্ট, সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই, তীর্থরামের পুনর্জ্জন্ম, ভিখারী রমণী, রামানন্দ স্বামীর আত্মসমর্পণ, অসভ্য ভীলের উদ্ধার, প্রভুর ভ্রমণ পদ্ধতি, অদ্ভুত সন্ন্যাসী, পানা নৃসিংহ-তীর্থ, ভক্ত শুষ্ক তর্ক করেন না, সদানন্দের নিরানন্দ, মারি খেয়ে দয়া, পুষ্পবৃষ্টি, ভর্গদেব, ভট্টগণের বাড়ী, পরমানন্দপুরী, উচ্চ শ্রেণী

যোগী, কন্যাকুমারী, রাজা রুদ্রপতি, ঈশ্বর ভারতী, প্রভুর মুখে কৃষ্ণকথা, ভারতীকে কৃপা, বিশ্বরূপের আশ্চর্য্য মৃত্যু, ইলোরে প্রভুর কীর্ত্তি, তুকারাম, থানেশ্বরী জগন্নাথ, কেন প্রভুর লাগি প্রাণ কান্দে, মধুর কৃষ্ণনাম, পুনা নগরে, দস্যুস্থানে, নারোজী, খণ্ডলায়, কর্ম্মফল, প্রভু আলোকাবৃত, বলি স্থাপিত 'বামন', প্রভুর নিজ দেশ স্মরণ, বারমুখী, পতিতোদ্ধার, শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন, দ্বারকায় তরঙ্গ, বণিকের ভাগ্য, রামরায়, মাড়ুয়া ব্রাহ্মণ, প্রভুর প্রত্যাগমন। ৪৯—১৪৫ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়।

আচার্য্য সংগ্রহ, বৈষ্ণবধর্ম্মের অধোগতি, জুলু গোসাঞি, শাহ আকবর।
১৪৬—১৫৩ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রভুর প্রচার পদ্ধতি, রূপ সনাতনকে শিক্ষা, বৃন্দাবনে আচার্য্য প্রেরণ, বৈষ্ণব গ্রন্থ। ১৫৪—১৬১ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রভুর শেষ লীলা, প্রভুর আকর্ষণ, প্রতাপরুদ্র উদ্ধার।
১৬২—১৬৬ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়।

মূল ঘটনার মূলোৎপাটন, নদিয়া-নাগরী, দয়াল নিতাই, নিতাইর প্রচার পদ্ধতি ১৬৭—১৭৬ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়।

মহাপ্রসাদ, প্রসাদের মাহাত্ম্য, রস প্রকরণ, প্রত্যক্ষ ভজন, অনুগা ভজন,

গোপীর প্রার্থনা, প্রেম ভজনা, লীলা ব্যতীত প্রেম হয় না, করুণ রস, কৃষ্ণ-লীলার পালা, মাথুর, দাসখত, কুব্জার পুনর্জ্জন্ম। ১৭৭—২০৩ পৃষ্ঠা।

নবম অধ্যায়।

মান বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠা, খণ্ডিতা, নৌকাখণ্ড, ইষ্টগোষ্ঠী।
২০৪—২১৩ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়।

প্রভুর অবস্থা, অর্দ্ধ ভোজন, নাসিকা ঘর্ষণ, শঙ্করের পদ।
২১৪—২১৯ পৃষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায়।

গম্ভীরা লীলার পূর্ব্বাভাস, প্রভুকে সন্তর্পণ, সন্তর্পণ।
২২০—২২৪ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ অধ্যায়।

নায়ক ব'।, ব্রজের বিভিন্ন নায়ক, শ্রীভগবানের ভগবত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব ভাব। ২২৪—২২৭ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শেষ দ্বাদশ বৎসর, অহেতুকী ভক্তি, অকৈতব প্রেম, প্রভুর "প্রলাপ", উৎকণ্ঠা বর্ণন, উৎকণ্ঠা নানা প্রকার, সকল শাস্ত্রের বিবাদ মীমাংসা, সোঽহং তত্ত্বের অর্থ। ২২৮—২৪২ পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গম্ভীরা লীলায় শ্রীমতীর প্রকাশ, অনুকূল নাগর, রস আস্বাদনের উপায়,

প্রতিকূল নাগর, প্রভুর অকথ্য প্রেম, মনোভাব প্রকাশের উপায়, ভজন সাধনের আবশ্যকতা, প্রভুর শিক্ষার বিশেষত্ব, কৃষ্ণ-প্রেমের লক্ষণ।

২৪৩—২৫৯ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

প্রভুর অপ্রকট, প্রভুর শ্রীমন্দিরে প্রবেশ, প্রভু শ্রীজগন্নাথে লীন হইলেন। ২৬০—২৬৪ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব, শ্রীভগবানের নবদ্বীপে উদয়, শাক্ত ও বৈষ্ণব, রামচন্দ্র কবিরাজের শ্লোক, শাক্ত বৈষ্ণবে বিবাদ, শাক্তের পরাস্ত, শাক্তদিগের রসের ভজন। ২৬৫—২৭৮ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অবতার-তত্ত্ব, কোন ধর্ম্মের কি ভিত্তিভূমি, ভগবান বড় না কর্ম্ম বড় ?

২৭৯—২৮৩ পৃষ্ঠা।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

নদিয়া পথিকের রোদন। ২৮৪—২৮০ পৃষ্ঠা।

আমাদের নিবেদন।

শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিতের ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হইল। শৈশবাবধি যাঁহাকে হৃদয়ের দেবতা বলিয়া জানিয়াছি, যাঁহার সামান্য সেবা করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, আজ যদি সেই পরমারাধ্য শ্রীল শিশির বাবু এই মরজগতে থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার শ্রীকরে, তাঁহার এই শেষ গ্রন্থখানি দিয়া, তাঁহার আনন্দে আনন্দ উপভোগ করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা হইল না, বিগত ২৬শে পৌষ মঙ্গলবার অপরাহ্ন ১টা ৩৫ মিনিটের সময় তিনি তাঁহার কার্য্য শেষ করিয়া, নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষোভ চিরদিনই আমাদের মনে থাকিবে।

যে দিন তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া গোলকে গমন করেন, সেই দিন যথাসময়ে স্নানাহার করিয়া, এই গ্রন্থের শেষ ফর্ম্মার প্রুফটি লইয়া ভ্রম সংশোধন করিতে বসিলেন। প্রুফ দেখা শেষ হইলে, উহা আমাদের হস্তে দিয়া বলিলেন, "আজ আমার কার্য্য শেষ হইল।" ইহার দুই ঘণ্টা পরে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পরিবারস্থ সকলের আহারাদি হইয়াছে কি না? যখন শুনিলেন সকলেরই আহারাদি হইয়াছে, তখন তাঁহার বদন প্রফুল্ল হইল। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে, উপবেশন অবস্থাতেই, একবার "নিতাই গৌর" বলিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলি উর্দ্ধে উত্তোলন করিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যা নিকটে ছিলেন, তিনি পিতার ঐরূপ ভাব দেখিয়া কিছু ভীত হইয়া সকলকে ডাকিলেন। আমরা যাইয়া দেখিলাম তিনি নয়ন মুদিত করিয়া বালিশ ঠেস দিয়া

যেন ঘুমাইতেছেন। এইরূপ ভাবে বসিয়া অনেক সময় তিনি ঘুমাইতেন। তখনও আমরা বুঝিতে পারি নাই যে, তিনি তখনই আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। ইহার কয়েক মিনিট পরেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

সে সময় তাঁহার বদনের অপরূপ ভাব দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইহার কয়েক ঘণ্টা পরে, সেই উপবেশন অবস্থাতেই, তাঁহার একখানি ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছিল। তখনও কে বলিবে যে এ দেহে প্রাণ নাই, বোধ হইতেছিল যেন তিনি অতি আরামে ঘুমাইতেছেন। যিনি ফটো লইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন "মৃত দেহের অনেক ফটো আমি তুলিয়াছি, কিন্তু প্রাণত্যাগের পর মুখের এরূপ সুন্দর ভাব আমি কখনও দেখি নাই।" প্রকৃতই তিনি যেন "নিতাই গৌর" বলিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। এরূপ মৃত্যু মুনি ঋষিরাও বাঞ্ছা করেন।

এই খণ্ডের উপক্রমণিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে, "পাঁচ খণ্ড শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিত বাহির হইবার পর ৬ষ্ঠ খণ্ড লিখিবার জন্য অনেকে আমাকে অনুরোধ করেন। কিন্তু শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত লিখিবার পূর্ব্বে কেহ যেন প্রভুর লীলা আমার দ্বারা লিখাইবার নিমিত্ত আমার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। কাজেই আমার লিখিতে হইয়াছিল, আর এক নিশ্বাসে প্রথম হইতে পঞ্চম খণ্ড পর্য্যন্ত লিখিয়া শেষ করিয়াছি। আমার আর লিখিবার শক্তি নাই, আর লিখিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুর অনুজ্ঞাও অনুভব করিতেছি না।"

এই যে "এক নিশ্বাসে" লিখিবার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা অত্যুক্তি নহে। যাঁহারা তাঁহার নিজজন, যাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতেন, তাঁহারা জানেন তিনি কিরূপে,—কেবল শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিতের

পাঁচ খণ্ড নহে, তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ গুলি সমস্তই,—"এক নিশ্বাসে" লিখিয়াছেন। তিনি অতি প্রত্যুষে ভজনে বসিতেন। ভজন শেষ করিয়া সেই আবেশ অবস্থায় তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতেন, আর তাঁহার নিজজন কেহ, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেন।

তিনি লিখিয়াছেন যে, পঞ্চম খণ্ড পর্য্যন্ত লেখা শেষ হইবার পর, ষষ্ঠ খণ্ড লিখিবার জন্য মহাপ্রভুর কোন অনুজ্ঞা অনুভব করেন নাই বলিয়া, তিনি ঐ খণ্ড লেখেন নাই। কিন্তু শেষে বোধহয় এই অনুজ্ঞা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, কারণ গত বৎসর একদিন তিনি আমাদিগকে বলিলেন, "ষষ্ঠ খণ্ড লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।"

তখন তাঁহার দেহের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। তাঁহার প্রধান ক্লেশ অনিদ্রা, তাহাতে জীর্ণশক্তি ক্রমে কমিয়া আসিয়াছিল, কাজেই তাঁহার দেহ কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছিল। এই কৃশ দেহে ও ব্যাধির তাড়নার মধ্যে, এক পদ ইহ জগতে এবং অপর পদ অন্য জগতে রাখিয়া, তিনি ষষ্ঠ খণ্ড লিখিতে আরম্ভ করেন। এই অবস্থায় গ্রন্থের কতকাংশ লেখা হইলে, তাঁহার দেহের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়িল। তখন প্রতিদিন রাত্রিতে, শয়ন করিবার সময়, ষষ্ঠ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি গুলি আমাদিগের হস্তে দিয়া বলিতেন, "এগুলি সাবধানে রাখিও। যদি অদ্যকার রাত্রি কাটাইয়া উঠিতে পারি তবে অবশিষ্ট অংশ লিখিব।" রাত্রিতে নিদ্রা নাই, ক্লেশে রাত্রি কাটিয়াছে, কিন্তু শেষ রাত্রিতে উঠিয়া গ্রন্থ লিখিতেছেন। এইরূপ প্রায় প্রত্যহই করিয়াছেন।

নানা কারণে গ্রন্থখানির ছাপা দেরী হইতেছিল। ইহাতে তিনি বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়েন, এবং প্রায় আমাদিগকে বলিতেন "গ্রন্থখানি ছাপিতে বড়ই দেরী হইতেছে, একটু চেষ্টা করিয়া, আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে, যাহাতে ইহার ছাপা শেষ হয় তাহা করিবে।" কিন্তু

গ্রন্থখানি লইয়া তিনি যেরূপ ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে লইয়াও আমরা সেই রূপ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়া ছিলাম। কাজেই গ্রন্থ ছাপা সম্বন্ধে আমাদের কিছু শিথিলতা হইয়াছিল, আর সেই কারণেই ইহাতে ভুল ভ্রান্তি থাকিবার সম্ভাবনা, তজ্জন্য সহৃদয় পাঠকগণ কৃপা করিয়া আমাদিগকে মাৰ্জ্জনা করিবেন।

এখন গ্রন্থখানি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। এ পর্য্যন্ত প্রভুর লীলাগ্রন্থ যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই তাঁহার গম্ভীরা লীলা বিষদরূপে বর্ণন করেন নাই। প্রভু শেষ দ্বাদশ বৎসর যে লীলা করেন, ইহা এত নিগূঢ় যে, মাত্র কয়েক জন "মহাপাত্র" এই লীলারস তাঁহার সহিত আস্বাদন করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। এই গম্ভীরা লীলা বর্ণন ও প্রভুর লীলা-রহস্যের বিচার শিশির বাবু এই খণ্ডে করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে। শিশির বাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন "জগতের যে দুইটি সর্ব্বপ্রধান সমস্যা, অদ্যাপি তাহার মীমাংসা হয় নাই। সে দুইটী এই—(১) শ্রীভগবান্ যে আছেন তাহার প্রমাণ কি? এবং (২) যদি তিনি থাকেন তবে তিনি কিরূপ বস্তু? এই দুইটী সমস্যার মীমাংসা করিবার যে বিষম ভার তাহা আমি হস্তে লইলাম।"

এখন পাঠক একটু চিন্তা করুন ও কথাটা তলাইয়া বুঝিয়া দেখুন। এই যে এত বড় একটা কথা তিনি বলিলেন, ইহা কি দম্ভ করিয়া, না নিজের মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্য? কিন্তু যিনি শ্রীভগবৎ প্রেমে তন্ময় হইয়া জীবের মঙ্গল সাধনার্থ চিরজীবন কাটাইয়াছেন, যিনি শ্রীঅমিয়-নিমাই চরিত ও শ্রীকালাচাঁদ গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া শ্রীভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ যে কতদূর মধুর তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, পরকাল সম্বন্ধে যাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস, তিনি ৭০ বৎসর

বয়সে, জরাজীর্ণ দেহ লইয়া, মহাপ্রস্থানের পথে দাঁড়াইয়া, দম্ভ করিয়া যে কিছু বলিবেন ইহা হইতেই পারে না।

তিনি যে দুইটী বিষম সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন তাহার ঠিক মীমাংসা হইয়াছে কি না, পাঠক তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। তবে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন যে, সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা তাঁহার স্থান অনেক উচ্চে। আর তিনি একজন বিশেষ শক্তিশালী মহাপুরুষ ছিলেন। এ কথাও অনেকে বলিতেছেন, শ্রীভগবান তাঁহার নিজ কার্য্য সাধনের জন্য শিশির বাবুকে এই মরজগতে পাঠাইয়া ছিলেন, সেই কার্য্য সমাধা হইবা মাত্র আবার তাঁহাকে নিজের নিকট লইয়া গিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস শ্রীল শিশির বাবুর এই ষষ্ঠ বা শেষ খণ্ড জগতের এক অমূল্য গ্রন্থ।

উৎসর্গ পত্র।

শ্রীমান্ পয়স্কান্তি

এই গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ড আমি তোমার হস্তে দিলাম। আমার বয়ঃক্রম সত্তর, তোমার পঁচিশ, এইরূপ সময়ে তুমি আমাকে হঠাৎ একদিনের পীড়ায় ছাড়িয়া গেলে। আমি তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিব ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, কিন্তু তবু সহ্য করিতেছি। ইহা কিরূপে করিলাম ?

তুমি আমার নিত্য সঙ্গী ছিলে। অতি বৃদ্ধ জীর্ণ রুগ্ন, আমার দ্বারা ভজন সাধন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তুমি আমার সে অভাব পূরণ করিতে, তুমি বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য ছিলে, তোমার কণ্ঠে মধু বর্ষণ হইত। তুমি আমাদের কীর্ত্তন, কি শ্রীতানসেনের ভজন, যখন গাহিতে, তখন পশু পক্ষী পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইত। তুমি আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে অনুক্ষণ ভগবৎ গুণসুধা পিয়াইতে। সুতরাং তুমি যখন আমাকে ছাড়িয়া গেলে তখন বিরহের সঙ্গে সঙ্গে আর এক বিপদ্ উপস্থিত হইল। আমার ভজন এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। তবু, তুমি যখন আমায় ত্যাগ করিয়া গেলে, তখন আমি শ্রীভগবানকে মনের সহিত ধন্যবাদ দিয়াছি। ইহা যদিও শুনিলে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু তিনি (শ্রীভগবান) জানেন ইহা সত্য কিনা। তানসেনের ন্যায় সঙ্গীতজ্ঞ জগতে কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি যে পদ প্রস্তুত করেন তাহা ভাবে ও তাল লয়ে অদ্বিতীয়। তাহা লোপ্ হইয়া যাইতেছিল। যাহা কিছু এখন আছে তাহা রঙ্গপুরের শ্রীমান্ রামলাল মৈত্রের কণ্ঠে ছিল, তুমি তাহার নিকট এই তানসেনের পদগুলি অভ্যাস করিয়াছিলে। তুমি সর্ব্বদা বলিতে কবে আমি তানসেনের নিকট যাইব, যাইয়া তাঁহার সমুদায় পদ শিখিব। এখন তোমার সেই সুযোগ হইয়াছে।

তুমি প্রভুর কৃপায় ভক্তি ধন পাইয়াছিলে, এখন মনানন্দে শ্রীভগবানের ভজন করিতেছ, সুতরাং তোমার এ ভাবের নিমিত্ত আমি স্বার্থপর হইয়া কেন দুঃখ করিব। বিশেষতঃ সংসারে তোমার কোন বন্ধন ছিল না, তুমি চিরদিন মুক্ত ছিলে।

তুমি আমাকে ছাড়িয়া গেলে, আমার, তোমার একখানি ছবি আনিবার ইচ্ছা ছিল। মার্কিন দেশের এক বিখ্যাত মিডিয়ম, আমার সে মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছেন। চিত্রখানি ২০ মিনিটে দিবাভাগে লোকের সাক্ষাতে অদৃশ্য হস্তে চিত্রিত হয়। সে এত চমৎকার যে এ জড়জগতে বোধ হয় এরূপ সূক্ষ্ম কারিকরী হইতে পারে না, অন্ততঃ কোন কারিকর এক মাসের কমে ওরূপ সম্পূর্ণ ছবি আঁকিতে পারেন না। সেই ছবিখানি সর্ব্বদা আমার সম্মুখে থাকে।

আমি সেই ছবি দেখি, আর আমার মনে উদয় হয় যে, আমাদের জীবনদাতা আমাদিগকে জীবন দিয়া একেবারে ভুলিয়া যান নাই, আমাদের কথা তাঁহার মনে থাকে। কারণ তিনি ভালবাসার আকর, তিনি জীবন দিয়া এজগতে কিছুকাল রাখিয়া, পরে মৃত্যু অন্তে আমাদিগকে আর এক জগতে লইয়া যান।

সেখানে শোক তাপ মৃত্যু রোগ কি অন্ধকার নাই, সেখানে আমরা আমাদের প্রীতির বস্তু লইয়া চিরদিন বাস করিব। যখন ইহা মনে উদয় হয়, তখন সেই যে ভগবান আমাদের জীবনের জীবন, তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভজনা করিতে পারি না, ইহাতে মাথা কুটিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। তুমি সুস্বরে গীত গাইয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা কর, আর আমি যাহাতে শীঘ্র মোচন হই, সে নিমিত্ত তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করি।

বাগবাজার
৪২৫।২৬ পৌষ।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ।

ভূমিকা।

পাঠকগণ দেখিবেন যে এই খণ্ডে অনেক লীলা কথা লেখা আছে যাহা পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে। ইহাতে তাঁহারা কৃপা করিয়া আমার উপর বিরক্ত হইবেন না। প্রভুর নিস্ফল লীলা একটীও নাই, সকল লীলারই মহৎ তাৎপর্য্য আছে! তাহা বুঝিতে অনেক পরিশ্রম, সাধন, জ্ঞান ও গুরু-উপদেশের প্রয়োজন। কেবল পড়িয়া গেলে সকল লীলার উদ্দেশ্য বুঝা না গেলেও পারে। পূর্ব্বে আমি প্রভুর লীলা বর্ণনা করিয়াছি, এখন তাহার মধ্যে কয়েকটী প্রধান লীলার তাৎপর্য্য বিচার করিব ইচ্ছা করিতেছি। সুতরাং পূর্ব্বে যে উদ্দেশ্যে লীলা লেখা হইয়াছে, এবার অন্য উদ্দেশ্যে লিখিতেছি। কোন একটী লীলার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে হইলে, বলিতে হয় অমুক খণ্ডে যে লীলার কথা লেখা হইয়াছে, পাঠক, আমি এখন তাহার তাৎপর্য্য বিচার করিতেছি। ইহাতে পাঠকের কথায় কথায় সেই সমুদায় লীলা তল্লাস করিতে অন্যান্য খণ্ড খুলিতে হইবে। আমি তাহা না করিয়া, পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত ইহাই করিয়াছি যে, যে লীলাটীর তাৎপর্য্য বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে মাত্র বর্ণনা করিয়া, পরে তাহার যে উদ্দেশ্য তাহাই বলিয়াছি। কোন কোন লীলা দুইবার বর্ণনা করিবার কারণ উপরে বলিলাম।

অপর, আমি যে বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি ইহা মনে করিলে ভয়ে হতজ্ঞান হইতে হয়। এই পৃথিবী বহু সহস্র কি লক্ষ বৎসর সৃষ্টি হইয়াছে, কত জাতি হইয়াছে ও নষ্ট হইয়াছে, কত বড় বড় সাধু সৃষ্টি হইয়াছেন ও তাঁহারা অন্তর্ধান করিয়াছেন। কিন্তু দু'একটি তত্ত্বের বিষয় এপর্য্যন্ত কেহ কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই। আর সে তত্ত্বগুলি অতি প্রধান, অতি

প্রয়োজনীয়। ইহার একটী তত্ত্ব এই যে, শ্রীভগবান আছেন অনেকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাহার কি কোন প্রমাণ আছে ?

ইহার উত্তর এই যে, ইহার কিছু মাত্র প্রমাণ নাই। অনেকে বিশ্বাস করেন যে তিনি আছেন এইমাত্র ; কিন্তু কেন বিশ্বাস করেন, তাহার কোন প্রমাণ আছে কিনা তাহা কেহ বলিতে পারিবেন না। কেহ কেহ নাকি শ্রীভগবানের দর্শন পাইয়াছেন, কিন্তু তাহাকে প্রমাণ বলে না। যিনি দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট এ প্রমাণ বলবৎ হইতে পারে, কিন্তু অন্যের নিকট নহে। অতএব ইহা নিশ্চিত, শ্রীভগবান যে আছেন তাহার প্রমাণ যাহাকে প্রমাণ বলে, তাহা নাই।

দ্বিতীয় বিচারের তত্ত্ব এই যে, যদি শ্রীভগবান থাকেন তবে তিনি কিরূপ বস্তু ? যেখানে শ্রীভগবান আছেন তাহার কোন প্রমাণ নাই সেখানে এ দ্বিতীয় তত্ত্বটী জানিবার কোন স্থযোগ নাই।

অতএব জগতের যে দুইটী সর্ব্বপ্রধান সমস্যা, অদ্যাপি তাহার মীমাংসা হয় নাই। সে দুটী এই যে—

(১) শ্রীভগবান যে আছেন তাহার প্রমাণ কি ?

(২) যদি তিনি থাকেন তবে তিনি কিরূপ ?

আমি এই দুইটী সমস্যার মীমাংসা করিবার যে বিষম ভার, তাহা হস্তে লইলাম। পাঠকগণ আমাকে দাম্ভিক ভাবিবেন না। পড়িলে দেখিবেন যে আমার দম্ভ করিবার কিছু নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আমি লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইতে পারি তবে জগতের মঙ্গল হইবে। না পারি আমার লজ্জার কি ক্ষোভের বিষয় কিছু থাকিবে না। যাহা কেহ পারেন নাই, আমি তাহাই পারিলাম না।

উপক্রমণিকা।

যখন এই গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড শেষ হইল তখন ভাবিলাম যে আর লিখিব না, কি লিখিতে পারিব না। আপনার অবস্থা ভাবিয়া এই পদটী প্রস্তুত করিয়াছিলাম। যথা—

গোরা জানা নাহি ছিল, তখন আছিনু ভাল,
কাল কাটাইতাম আমি সুখে।
গৌরনাম কাণে গেল, কেবা সেই মন্ত্র দিল,
হুতাশে পিয়াসে মরি দুঃখে॥
যারা গুণের সঙ্গী ছিল, তারা ফেলে পলাইল,
কাহাকে কহিব মনের ব্যথা।
কেবা দুঃখ ভাগ নিবে, সঙ্গে সঙ্গে কে কাঁদিবে,
কে শুনাবে মনোমত কথা॥
হৃদয়ে গৌরাঙ্গ ছিল, এবে কোথা পলাইল,
আগে মোর চিত্ত করি চুরি।
আপনি মোরে ডাকিল, মন আমার ভুলি গেল,
এবে করে মো সনে চাতুরী॥

আমি পাছে পাছে যাই, মোরে দেখিয়া পলায়,
এবে আমার শক্তি নাই অঙ্গে।
রোগে শোকে অভিভূত, ক্রমেতে আত্মবিস্মৃত,
ক্লান্তচিত বিশ্রাম সে মাগে॥
আরতো চলিতে নারি, লহ মোরে হাত ধরি,
যদি কেহ থাক নিজ জন।
এই ছিল মোর ভাগ্যে, ধরণী বিদায় মাগে,
বলরাম দাস অকিঞ্চন॥

তাহার পর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। অনেকে কৃপা করিয়া আমাকে প্রভুর শেষ লীলা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সে এত জন যে আমি তাহার সংখ্যা করিতে পারি না। অনেকে আমাকে এইরূপ বলেন যে, তাঁহারা এই পাঁচ খণ্ড আমূল পাঠ করিয়াছেন, তবুও তাহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় নাই।

আমি ইহাদের সকলকে একরূপ উত্তর দিই নাই। কাহাকে বলিয়াছি যে আমি বৃদ্ধ, রোগে ও পরিশ্রমে অক্ষম হইয়াছি, আর আমার দ্বারা হইবে না। কাহাকেও বলিয়াছি যে প্রভুর লীলা-লেখক মহাজনগণ, যাঁহাদের উচ্ছিষ্টই আমার কেবল মাত্র শক্তি, তাহারা প্রভুর শেষ লীলা লিখেন নাই, সুতরাং আমার লিখিতে সাহস হইবে কেন? মহাজনেরা বলিয়া গিয়াছেন,—

অদ্যাপি সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

অর্থাৎ প্রভুর লীলার আবার শেষ কি? উহার শেষ নাই। যাহারা বড় নিজজন, তাঁহাদের নিকট আর এক কথা বলিয়া অব্যাহতি লইয়াছি। প্রভুর লীলা ইচ্ছা করিলেই লেখা যায় না, তাহার

নিমিত্ত শক্তি চাই। সে শক্তি ইচ্ছা করিলেই এ জগতে মিলে না। আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা কেবল বাধ্য হইয়া। আমি কখন বাঙ্গালা লিখিতে অভ্যাস করি নাই। আমার এই সমস্ত অতুচ্ছ বিষয় লিখিতে কখনও সাহস হইত না। যখন প্রভুর লীলা লিখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলাম, তখন আপনাকে অপারগ জানিয়া, যাঁহারা খুব ভাল বাঙ্গালা লিখেন বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহাদিগকে লিখিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাঁহারা কেহ লিখিতে স্বীকার হইলেন না, অথচ লীলা না লিখিলে নয়। কেহ যেন আমার দ্বারা ইহা লিখাইবার নিমিত্ত আমার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। কাজেই আমার লিখিতে হইয়াছিল। তাই লিখিয়াছিলাম, এবং এক নিশ্বাসে প্রথম হইতে পঞ্চম খণ্ড পর্য্যন্ত লিখিয়া শেষ করিয়াছি। আর আমার লিখিবার শক্তি নাই, আর লিখিবার নিমিত্ত মহাপ্রভুর অনুজ্ঞাও অনুভব করিতেছি না।

ইহা ছাড়া আরও একটি কারণ ছিল। কেন প্রভুর শেষ লীলা লিখিতে সাহস হইল না বলিতে গেলে. সেইটি প্রকৃত কারণ। কিন্তু এ কথা সকলকে বলিতে আমি সাহস পাই নাই। তবে তাঁহাকেই বলিয়াছি যিনি, আমি জানিতাম, আমার সহিত সহানুভূতি করিবেন। সেইরূপ একজন ভক্তের সহিত আমার একবার দেখা হয়, তিনিও ষষ্ঠ খণ্ড লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহাকে আমি তখন যে উত্তর দিয়াছিলাম এক্ষণে উহা কৃপাময় পাঠকগণকে বলিতেছি। প্রভুর প্রধান প্রধান লীলাগুলি যতদূর জানিয়াছি তাহা লিখিয়াছি, তবে একটি বাকি আছে, সেইটি গম্ভীরা লীলা। শেষ দ্বাদশ বৎসর প্রভু এই লীলা করেন। এই লীলা এত নিগূঢ় যে বাহিরের লোকে কেহ উহা জানিতে পারে নাই। কেবল মাত্র সাড়ে তিনজন পাত্র

এই লীলায় সহায়তা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ (১) স্বরূপ, (২) রামরায়, (৩) শিখি মাহিতী, (অর্দ্ধজন) মাধবী দাসী। মাধবী দাসী শিখি মাহিতীর ভগিনী। ইঁহারা সাড়ে তিন জন মহাপাত্র বলিয়া বিখ্যাত। সাড়ে তিনজন কেন না, মাধবী দাসী স্ত্রীলোক বলিয়া অর্দ্ধজন।

অধিকার সকলের সমান হয় না। কারণ সকল হৃদয় একরূপ প্রশস্ত নহে। যেমন জলপাত্রের মধ্যে ছোট বড় আছে, কোন পাত্রে অধিক, এবং কোন পাত্রে অল্প জল ধরিতে পারে, সেইরূপ সেই গোলকের সুধা কাহারও হৃদয়ে অল্প, আবার কাহারও হৃদয়ে অধিক পরিমাণে ধরিতে পারে।

গম্ভীরা লীলা দ্বারা প্রভু যে নিগূঢ় রস জীবের আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন, তাহা এই সব পাত্র লইয়া প্রভু নিভৃতে আস্বাদন করেন। এই নিগূঢ় রস বিস্তার করিতে প্রভুর দ্বাদশ বৎসর লাগে। এই যে মহাধিকারী কয়জন পাত্র, ইহাদিগকে এই রস বুঝাইবার নিমিত্ত প্রভুকে অনেক কষ্ট করিতে হইয়াছিল। প্রভু এই দ্বাদশ বর্ষ আবিষ্ট অর্থাৎ অচেতন অবস্থায় ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি অহোরাত্র রোদন করিয়া, ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইয়া, ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া, তবে এই নিগূঢ় রস বুঝাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। শুধু উপদেশ দিয়া সম্যক্‌রূপে উহা বুঝাইতে পারিতেন না। কেন পারিতেন না বলিতেছি। মনে ভাবুন দুইজন ভক্ত শ্রীভগবানের রূপ আস্বাদ করিতেছেন। একজন ইহা বর্ণনা করিতে কাব্যের সহায়তা লইয়া, বাছিয়া বাছিয়া শব্দ ও উপমা প্রয়োগ করিয়া, অসীম ক্ষমতা দেখাইলেন। আর একজন সামান্য কথায় বর্ণনা করিলেন, কি করিতে গেলেন কিন্তু পারিলেন না, কথা জড়াইয়া আসিল, তাই পারিলেন

না, কি কথা কইতে কইতে মরিছিল, তাই পারিলেন না। ইহার মধ্যে কাহার বর্ণনা অধিক হৃদয়গ্রাহি হইবে? অবশ্য শেষোক্ত জনের।

এই গম্ভীরা লীলা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সহিত, যে সম্বন্ধ তাহা লইয়া। এই লীলাদ্বারা প্রভু সেই সম্বন্ধ পরিস্ফুটিত করেন। শ্রীমতী রাধা কে? না যিনি ঐশ্বর্য্যবিবর্জ্জিত মাধুর্য্যময় ভগবান্ যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহার প্রধান প্রেয়সী। ইহার অর্থ এই যে, শ্রীমতী রাধার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের অনুগত আর কেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই রাধার কি ভাব, প্রভু গম্ভীরা লীলায় তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের মনের ভাব কি তাহা জীবে অতি অল্প মাত্র জানিতে পারে। কিন্তু শ্রীভগবানের যিনি প্রেয়সী, কি শ্রীভগবান যাহার প্রাণ, তাহার মনের ভাব, জীবে সাধন করিলে, অনেকটা কি প্রায় সবই জানিতে পারে। এই গম্ভীরা লীলায় শ্রীপ্রভু, সেই রাধার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কিরূপ ভাব, তাহাই বর্ণনা করিয়াছিলেন। কেন না, জীবকে শিখাইবার নিমিত্ত। জীব উহা হৃদয়স্থ করিয়া শ্রীভগবানের সর্ব্বোচ্চ ভজন শিখিবে। যেহেতু রাধার ভজন সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। যাহার উচ্চাধিকারী হইবার বাসনা থাকে, তাহার গোপীর অনুগত কি গোপীর প্রধানা যে রাধা, তাহার অনুগত হইয়া, কি অনুকরণ করিয়া, ভজন করিতে হয়।

এই রাধার ভাব জানে কে? বুঝে কে? জানিলেও কাহার সাধ্য উহা প্রকাশ বা আস্বাদন করে? তাহাই প্রভু বাছিয়া এইরূপ কয়েক জন পাত্র লইলেন, যাঁহারা ইহা বুঝিতে বা ধারণা করিতে পারিবেন। ইহাদের বুঝাইলেন কিরূপে? প্রভু কি, প্রস্তাব লিখিয়া পরে উহা পাঠ করিয়া, কি বক্তৃতা করিয়া, কি কবিতা লিখিয়া ইহা শিখাইলেন? ইহার কিছুই নয়। কিরূপে এই সমুদায় অতি নিগূঢ়, অতি গুহ্য

অতি পবিত্র, অতি দুর্বোধ্য (অনর্পিত) ভজন প্রকাশ করিলেন, তাহা এখন সংক্ষেপে বলিতেছি।

প্রথমে প্রভু শ্রীরাধা হইলেন। সে কিরূপে তাহা পরে বিবরিয়া বলিব। তখন সে দেহে প্রকাশ্যে আর শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীপ্রভু থাকিলেন না, কি অতি গুপ্তভাবে অভ্যন্তরে রহিলেন। তখন সেই দেহ সম্পূর্ণরূপে শ্রীমতী রাধার হইল। * অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধার কিরূপ ভাব, উহা উপযুক্ত অধিকারী দ্বারা জগতকে বুঝাইবার নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীমতী আইলেন, আসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন।

প্রভু এই রাধাভাবে এক একটি মনের কথা বলেন, আর বিচলিত হয়েন। যথা শ্রীমতী রাধা বলিতেছেন, "আমার যে প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ" ইহাই বলিতে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম করিতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকাবৃত হইল। তুমি আমি হইলে, সুধু কথাদ্বারা কৃষ্ণ কত প্রিয় তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু প্রভু রাধা হইয়া কথা দ্বারা বেশী বুঝাইলেন না, তিনি প্রায় ভাবের দ্বারায় বুঝাইলেন। যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহার কিরূপ ভাব তাহা "আমি তাহাকে বড় ভালবাসি" ইহা বলিয়া না বুঝাইয়া, শ্রীমতী দেখাইলেন যে সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম করিবামাত্র তিনি পুলকাবৃত হয়েন। শ্রীমতী কৃষ্ণকথা বলিতে যেরূপ বিভাবিত হইতেন, রাধা স্বয়ং আসিয়া এই গম্ভীরা লীলায় দর্শককে তাহা দেখাইতেছেন। কাজেই যাঁহারা দর্শক কি শ্রোতা, তাহাদের হৃদয়ে সে ভাবটী একবারে বিন্ধিয়া যাইতেছে। কথায় বলিলে এইরূপ হইত না।

কথা বলিতেছেন, "সখী অদ্য শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন।" বলিতে বলিতে আর বলিতে পারিলেন না, আবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন, কি আনন্দে গলিয়া পড়িতে লাগিলেন। যখন এইরূপে কোন সুখের কথা বলিতেছেন

* এই আবেশ তত্ত্ব পরে বিবরিয়া লিখিত হইয়াছে, পাঠক দেখিবেন।

তখন নানা প্রকারে তাঁহার আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। আবার যখন কৃষ্ণবিরহ প্রভৃতি দুঃখের কথা বলিতেছেন, তখন সেইরূপে নানা প্রকারে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, অর্থাৎ ক্রন্দন করিতেছেন, ধুলায় গড়াগড়ি দিতেছেন, হৃদয়ে করাঘাত করিতেছেন, কি ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছেন। কেহ শ্রীমতী রাধা সাজিয়া অভিনয় করিতে পারেন, কিন্তু স্বয়ং শ্রীমতী রাধা আসিয়া দেখাইলে, যেরূপ পরিশুদ্ধ হয়, অভিনয় দ্বারা তাহা হয় না।

ইহাকেই গম্ভীরা লীলা বলে। এই গম্ভীরা লীলা যাহা বুঝাইতে প্রভুর দ্বাদশ বৎসর লাগিয়াছিল, শত শত কলসী নয়নের জল ফেলিতে হইয়াছিল, ধুলায় গড়াগড়ি দিতে, কি মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা যাইতে হইয়াছিল, যাহা জীবকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত উপযুক্ত পাত্র, তাহার লক্ষ লক্ষ ভক্তের মধ্যে, মোটে সাড়ে তিনজন পাইয়াছিলেন, এরূপ যে নিগূঢ় লীলা তাহা আমার ন্যায় কোন ক্ষুদ্র জীবে কি শুধু বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করিতে পারে? যদি কেহ পারেন তবে তিনিই শ্রীমতী রাধা। অতএব এ লীলা প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত।

সেই লীলা আমি এখন লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কেন হইলাম তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে আশা করি প্রভু কৃপা করিয়া আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। যদি তিনি শক্তি দেন পারিব, নতুবা নয়।

গম্ভীরা লীলা লিখিতে হইবে মনে করিয়া যেরূপ ভয় হইত, আবার অন্যান্য কয়েকটী বিষয় লিখিবার নিমিত্ত আমার ইচ্ছা সেইরূপ বলবতী হইত। এই সকল বিষয় আমি পূর্ব্বে লিখিতে পারি নাই। পূর্ব্বে কেবল লীলা লিখিয়াছি মাত্র, কিন্তু কোন লীলার কি উদ্দেশ্য তাহা পরিস্কার করিয়া লিখিবার অবসর পাই নাই। এই শ্রীগৌরাঙ্গের লীলায়, অর্থাৎ তাহার কার্য্যে ও বাক্যে, এত নিগূঢ় ও গুরুতর তত্ত্ব সকল নিহিত আছে, যাহা পূর্ব্বে জগতে কেহ জানিতে পারেন নাই, আর উহা জানিতে

জীবের মহৎ উপকারের সম্ভাবনা। শুধু লীলা পড়িয়া গেলে অনেকের মনে নিগূঢ় তত্ত্ব উদয় হয় না। লীলা মনোযোগের সহিত চিন্তা করিতে হয়, করিতে করিতে মনের মধ্যে সমস্যার মীমাংসা আইসে।

বিবেচনা করুন প্রভুর সচরাচর দুই ভাব ছিল। এক সহজ ভাব, আর এক আবেশিত ভাব। সহজ ভাবে তিনি যেরূপ থাকিতেন, আবেশিত ভাবে অন্য প্রকার হইতেন। অনেক সময় এমনও দেখা যাইত যে, সহজ সময়ের ভাব আবেশিত সময়ের ভাবের ঠিক বিপরীত। বৃন্দাবন দাস এক স্থানে বলিতেছেন যে, প্রভু এই একজনের নিকট দীন হইতে দীন হইয়া ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন, আবার একটু পরেই তাহার মস্তকে শ্রীপাদ দিতেছেন। ইহার মানে কি? প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে জর্জ্জরীভূত, মুহুর্মুহু প্রলাপ কহিতেছেন। তিনি কি বিচার করিয়া সমুদয় কার্য্য করিতেন, না বিকল অবস্থায় লোকে যেরূপ করে, অর্থাৎ যাহা মনে উদয় হইল, তাহাই করিতেন?

একদিন প্রভু শ্রীবাসকে বলিতেছেন যে, "আমি কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখাইব? ইহা কি মনুষ্যে পারে?" শ্রীবাস বলিলেন, "প্রভু ওকথা আমরা শুনিব না। আপনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট স্বীকার করেন তাঁহাকে শ্যামসুন্দর রূপ দেখাইবেন, এখন এ প্রকার কথা বলিতেছেন কেন?" প্রভু উত্তরে বলিলেন "আমি কি বলিয়াছিলাম যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখাইব? যদি বলিয়া থাকি সে উন্মাদ অবস্থায়। পণ্ডিত, তুমিত জান অনেক সময় আমাতে আমি থাকি না। ইহাও আমি শুনিয়াছি যে, সে অবস্থায় আমি নানাবিধ প্রলাপ করিয়া থাকি, এমন কি অনেক অসম্ভব কথাও বলি। কিন্তু আপনারা আমার বন্ধু, আপনাদের কি উচিত যে, উন্মাদ অবস্থায় আমি কি বলিয়াছিলাম তাহার নিমিত্ত সহজ অবস্থায় আমাকে পেষণ করা?"

শ্রীবাস বলিলেন "প্রভু, তুমি যাহাকে উন্মাদ অবস্থা বলিতেছ, সেই অবস্থায় তুমি যাহা বল, সেই তোমার মনোগত কথা, আর তুমি যাহা সহজ অবস্থায় বল সে সমদায় তোমার বাহ্য।" অতএব প্রভুর এই দুইটী অবস্থা, আবেশিত ও সহজ, সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহা যদি হইল, তবে এই আবেশিত অবস্থাই বা কি, আর সহজ অবস্থাই বা কি? আবার, ইহার কোন অবস্থার কথা কি কার্য্য আমাদের কতদূর মান্য করিতে হইবে? আমরা প্রভুর লীলায় দেখিতেছি যে অনেক স্থানে এরূপ লেখা আছে, যথা—"প্রভুর তখন আবেশিত চিত্ত", কি "প্রভু ক্ষণে বাহ্য পাইয়া"; কি "প্রভু বলিতেছেন 'বন্ধুগণ, এইমাত্র কি প্রলাপ করিলাম"। আবার প্রভুর কাণ্ড দেখুন। প্রভু করিতেছেন কি, না আপনার শ্রীপদ ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিতেছেন ও উহাতে ঘন ঘন চুম্বন দিতেছেন, আবার করিতেছেন কি, না আপনার কেশ দ্বারা আপনার শ্রীপদ বন্ধন করিতেছেন। প্রভু কিছুকাল এত বিহ্বল অবস্থায় ছিলেন যে তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া তাঁহার নিজজন বন্ধন করিতে গিয়াছিলেন। ইহা প্রভুর কিরূপ লীলা? "প্রভুর রাধাভাবে গড়া তনু" এই যে ভক্তগণ গাহিয়া থাকেন, ইহার অর্থ কি?

প্রভুর "প্রকাশ," প্রভুর "মহাপ্রকাশ", ইহার রহস্য কি? প্রভুর সেই সময় বালকের ন্যায় ব্যবহার করার মানে কি?

আবার দেখিতেছি প্রভুর দেহে নানা লক্ষণ দেখা যাইত। কখন তিনি আপনার দেহ দ্বারা চক্র হইয়া আঙ্গিনায় ঘুরিতেন, কখন আর্দ্র দেহ কখন শুষ্ক দেহ হইত ইত্যাদি এ সকল বিষয়ের তাৎপর্য্য কি? প্রভু কৃষ্ণের নিকটে অতি কাতরে পাপ মার্জ্জনার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে-ছেন ভাল, এ বেশ কথা, ভক্তেরা ইহা করিয়া থাকেন, ও প্রভু অনেক সময় ভক্ত ভাবে থাকিতেন। কিন্তু প্রভু আবার একটু পরে বলিতেছেন

যে তিনিই কৃষ্ণ, ইহাই বলিয়া অন্যের পাপ মার্জ্জনা করিতেছেন। অতএব তিনি ভক্ত না কৃষ্ণ? প্রভু রাধাভাবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া রোদন করিতেছেন। বলিতেছেন, "আমার কৃষ্ণকে কুমতি কুবজা ভুলাইয়া রাখিয়াছে", কি "তিনি কত কাল হইল মথুরায় গিয়াছেন আর তো আইলেন না।" তখন সকলে বুঝিলেন ইনি রাধা। আবার একটু পরে তিনি রাধা রাধা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, "কোথা আমার প্রাণপ্রেয়সী রাধা, তোমার বিরহে আমার মথুরার রাজ্য ভাল লাগিতেছে না।" তখন বোধ হইল তিনি কৃষ্ণ। অতএব তিনি ভক্ত, না রাধা, না কৃষ্ণ? প্রভুর কাণ্ড দেখিয়া ভক্তগণ প্রথমে বড় ধান্দায় পড়েন। প্রভু এরূপ করেন কেন? পরিশেষে স্বরূপ গোসাই ইহার একটী সিদ্ধান্ত করেন, তাহা এই দুই শ্লোকে ব্যক্ত, যথা—শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কড়চায়াম্—

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনা তাদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈ বা—
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ ৬ ॥

প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, রাধাকৃষ্ণ পূর্ব্বে পৃথক ভাবে বিরাজ করিতেন, এখন তাহারা এক দেহ লইয়াছেন। অর্থাৎ গৌরাঙ্গ বস্তুত রাধা ও কৃষ্ণ মিলিত, তাই কখনও রাধা প্রকাশ হইয়া কৃষ্ণের নিমিত্ত রোদন, আবার কখনও কৃষ্ণ প্রকাশ হইয়া রাধার নিমিত্ত রোদন করেন। এই মীমাংসায় একটী অভাব রহিল। যদি গৌরাঙ্গ রাধা

কৃষ্ণ হইলেন, তবে ভক্ত-গৌরাঙ্গ, যিনি পাপ মার্জ্জনার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, তিনি কি?

দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ বুঝিতে একটু কষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ অনুভব করিলেন যে, তিনি রাধাপ্রেম আস্বাদ করিয়া যত আনন্দ লাভ করেন, শ্রীমতী রাধা তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ অনুভব করেন। ইহাতে রাধার যে আনন্দ তাহা কিরূপ ইহা শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদ করিতে ইচ্ছা হইল, সেই জন্য দুইজনে মিলিলেন। ইহাতে রাধার যে আনন্দ শ্রীকৃষ্ণ তাহার অংশী হইলেন।

মনে ভাবুন, এরূপ মীমাংসা ভক্তগণের নিকট বড় মধুর। কিন্তু ভক্ত ব্যতীত আর এক জাতীয় মনুষ্য আছেন, যাহারা আদৌ ভক্ত নহেন, একবারে নাস্তিক। প্রধানতঃ শেষোক্ত ব্যক্তিগণের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত হইতেছে, ভক্তগণের নিমিত্ত নয়। আমি এই তত্ত্ব লইয়া বিচার করিব ও ইহার সর্ব্ববাদীসম্মত কোন মীমাংসা আছে কিনা দেখিব।

এইরূপে প্রভুর লীলার মধ্যে নানাবিধ সমস্যা আছে, ইহা লইয়া বিচার করা আবশ্যক, আর আমি তাহাই করিব এই নিমিত্ত শেষ খণ্ড লিখিতে পারিলাম না বলিয়া আপনাকে হতভাগ্য ও অপরাধী ভাবিতাম।

যেমন গম্ভীরা লিখিতে ভয় হইত, তেমনি লীলার রহস্য বিচার করিতে বড় ইচ্ছা হইত। কিন্তু এ লীলা বিচার অপেক্ষা আর একটী বলবৎ কার্য্য হস্তে লইতে আমার বরাবর অতি গাঢ় ইচ্ছা ছিল, এই সুযোগে তাহাই করিব। বিশ্বাস ও জ্ঞান দুটী পৃথক বস্তু। শ্রীভগবান বলিয়া যে এক বস্তু আছেন, তিনি বিশ্বাসের বস্তু, জ্ঞানের বস্তু নহেন। অর্থাৎ ভগবান যে আছেন এ পর্য্যন্ত ইহা কেহ প্রমাণ করিতে পারেন নাই, কেবল অনেকে ইহা মনে মনে বিশ্বাস করেন। সুতরাং তিনি কিরূপ বস্তু, ভাল কি মন্দ, তাহার প্রকৃত মীমাংসা এ পর্য্যন্ত হয়

নাই। আমাদের হৃদয় বলে যে তিনি ভাল এই মাত্র। কিন্তু একজন নাস্তিক যদি বলে যে, তিনি যে ভাল তাহার প্রমাণ কি? তখন ইহার একটা প্রমাণ দিতে পারিব না। শুনিতে পাই ভগবদ্দর্শন কোন কোন সাধুর ভাগ্যে ঘটিয়াছে, কিন্তু সে কোন প্রমাণ নয়। যেমন শাস্ত্রে দেখি যে শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেন। কিন্তু যে অবিশ্বাসী সে তাহা মানিবে কেন? নারদ বলিয়া যে কোন মুনি ছিলেন তাহা সে স্বীকার করিবে না। শ্রীভগবান আছেন ইহা যদি প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণিত হয়, আর ইহাও যদি প্রমাণিত হয় যে তিনি মনুষ্যকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন, এবং তিনি মরণের পরে মনুষ্যকে চিরজীবি করিয়া রাখেন, তবে আমাদের আনন্দের আর সীমা থাকিবে না। এ জগতে জীবের যে দুঃখ তাহার প্রধান কারণ তাহাদের মনের ভগবানে ও পরকালে বিশ্বাস নাই। যদি প্রমাণ হয় শ্রীভগবান আছেন, তিনি অনন্ত গুণময় বস্তু, মনুষ্যকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন, আর মৃত্যুর পরে তাহাদিগকে অনন্ত জগতে লইয়া পরম সুখে রাখেন, তবে সমস্ত পৃথিবী আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ দিবানিশি নৃত্য করিতেন, নৃত্যই তাঁহাদের প্রধান ভজন হইয়াছিল। কারণ প্রভুর সহবাসে তাঁহারা জানিয়াছিলেন যে, অতি স্নেহশীল ভগবান আছেন, ও পরকাল আছে। তাই তাঁহারা নৃত্য করিতেন।*

---

* অনন্ত জীবন কাহাকে বলি? কেহ বলেন মনুষ্য মরিয়া আবার এই জগতে আর একজন হইয়া আসিবে। ইহাকে অনন্ত জীবন বলিতে পারি না, কারণ যে মরিল, সেত আর জন্মিল না, জন্মিল আর একজন। "লয় কি নির্ব্বাণ" ইহাও অনন্ত জীবন নয়। অনন্ত জীবন কাহাকে বলে তাহা বেদে বর্ণিত আছে। আমাদের দেশে পুনর্জ্জন্মের তত্ত্ব

যদি আমরা ঐ কয়টি বিষয়ে জীবের জ্ঞান জন্মাইয়া দিতে পারি, অর্থাৎ আমরা যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করিতে পারি যে প্রেমময় ভগবান আছেন ও মনুষ্যের অনন্ত জীবন আছে, তবে জগতের দুঃখ প্রায় থাকিবে না। ইহাই আমরা প্রমাণ করিতে চেষ্টিত হইলাম। ইহা যে আমরা প্রভুর লীলা দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিব তাহা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

এই এক কারণ ছিল যাহার নিমিত্ত ষষ্ঠ খণ্ড লিখিতে পারিলাম না বলিয়া ব্যাকুল হইতাম। ভগবান যে আছেন, তাহা কেহ এ পর্য্যন্ত প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই প্রমাণ শ্রীগৌরাঙ্গের লীলায় পাওয়া যায়। ভগবান যে আছেন শুধু তাহা নয়, তিনি মনুষ্যের সহিত কথা বলিয়াছেন। শুধু কথা বলিয়াছেন, তাহাও নহে, তিনি মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠি করিয়াছেন, এক দিনের জন্য নহে, বহু বৎসর ধরিয়া।

প্রবেশ করিয়াছে, ইহা যে কোথা হইতে আইল তাহা নির্দ্দেশ করা দুর্ঘট। বোধহয় বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে আসিয়াছে। কারণ পুনর্জন্ম তাহাদের ধর্ম্মের জীবন। যাহারা হি : তাহারা পুনর্জন্ম মানিতে পারেন না। কারণ শাস্ত্রে আছে যে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে মত ভেদ হইলে বেদই প্রমাণ। তাহা যদি হইল, তবে বেদের পরকাল তত্ত্ব কি তাহা শ্রবণ করুন। বেদের মতে মনুষ্য মরিলে যেমন তেমনি থাকে, থাকিয়া তাহাদের মৃত আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হয়, হইয়া প্রিয় জন লইয়া চিরজীবন যাপন করে। আমাদের গৌরবের বিষয় এই যে, বেদের এইরূপ সুন্দর পরকালতত্ত্ব আর কোন দেশে কোন ধর্ম্মে নাই। ইউরোপের অনেক মহাপণ্ডিত বেদের এই পরকালতত্ত্ব দেখিয়া পুলোকিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন।

প্রভুর লীলার যতদূর প্রয়োজন, অর্থাৎ যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে শ্রীভগবান চব্বিশ বৎসর ধরিয়া জীবের সহিত ইষ্টগোষ্ঠি করিয়াছেন, একজনের সঙ্গে নয়, সহস্র সহস্র লোকের সঙ্গে। মূর্খ ও নির্ব্বোধ লোকের সঙ্গে নয়, সমাজের দেশের শীর্ষস্থানীয় লোকের সহিত।

সুতরাং তিনি কিরূপ বস্তু তাহা আর এখন তর্কের বিষয় নয়, তিনি স্বয়ং তাহা বিবরিয়া বলিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ গৌরাঙ্গ-লীলার আর এক মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, এই উপলক্ষে কৃপাময় শ্রীভগবান আপনার পরিচয় তাঁহার সন্তানগণকে দিয়া গিয়াছেন! অবশ্য কোন কোন পাঠক ভাবিতে পারেন যে, আমার এ সমুদায় কথা অতিবঞ্জিত। তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি এই সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ দিব, তাহা যেন তাঁহারা করুণ চক্ষে না দেখেন। তাহারা আমার এই প্রমাণ সমুদায় অতি নির্দ্দয়তার সহিত পেষণ করুন, তাহাতে আমি বাধিত ভিন্ন বিরক্ত হইব না। কারণ মিথ্যা কথা পেষণে নষ্ট হয়, সত্য কথা পেষণে বর্দ্ধিত হয়। তবে আমার এই নিবেদন, যেন তাহারা আমার এই অকাট্য প্রমাণ গুলিকে অন্যায় করিয়া ছেদন করিতে চেষ্টা না করেন। আর যে প্রমাণ গুলি দুর্ব্বল তাহাও একবারে উঠাইয়া না দেন। কারণ দুর্ব্বল প্রমাণ গুলি ক্রমে একত্রিত করিলে তাহাও অকাট্য কি অচ্ছেদ্য হয়। যখন আমার মনে এরূপ বিশ্বাস রহিয়াছে, তখন বুঝিতে পারেন যে এই লীলা লিখিবার নিমিত্ত আমার প্রাণ কতদূর ব্যাকুল হইয়াছিল। এই সমস্ত কথা আমি পূর্ব্বে লিখিবার অবকাশ পাই নাই, যেহেতু তখন লীলা বর্ণনা করিতে বিব্রত ছিলাম। তাহার পরে ক্রমে রুগ্ন ও বৃদ্ধ হইতে লাগিলাম, পুস্তকের শেষ করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ গম্ভীরা লীলা লিখিতে হইবে মনে করিলে হৃদয় কম্পিত হইত।

পাঠকগণ এখন বিবেচনা করুন যে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা জীবের বহু মূল্যের ধন কি না। এ ধনের সহিত অন্য কোন ধনের তুলনা হয় না। কারণ এই ধর্ম্মের যেরূপ দৃঢ় ভিত্তিভূমি আছে, এরূপ আর কোন ধর্ম্মের নাই।

প্রথম অধ্যায়।

প্রভুর লীলা বিচার।

আশীর্ব্বাদ।

শুদ্ধ বেলোয়ালি—চৌতাল।

কোটী যুগ চিরজীবী রহো আমার,—
প্রাণনাথ প্রাণেশ্বর,
জগন্নাথ সুত, গৌরাঙ্গ পতিতপাবন।
শচীর কুলতারণ, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণধন,
দুঃখী জনে দয়া করহে, তারণ শরণ।
প্রেমের বন্যায় জগত ভাসালে, আপনি কান্দি কান্দাইলে,
মধুর মধুর লীলা করিলে;
বলরাম দাসের নাথ, জীবে কর আশীর্ব্বাদ,
দাও দাও দাও দীনহীন জীবে, অমূল্য চরণ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ অনেক সময় বিহ্বল অবস্থায় থাকিতেন, শেষ লীলায় তাঁহার আবেশ প্রায় ভাঙ্গিত না। হঠাৎ দেখিলে মনে হইত, যেমন নদীতে কোন ভাসমান দ্রব্য জোয়ার ভাটায়, একবার এদিকে একবার অপর দিকে চালিত হয়, তিনি সেইরূপ চালিত হইতেন? তিনি কি সেইরূপ দৈবের অধীন ছিলেন? কিন্তু তাহা নয়। তাঁহার বিহ্বলতা বাহ্য। তাঁহার সমুদায় কার্য্য দেখিলে বোধ হইবে যে, তিনি কি কি করিবেন তাহা তাঁহার জগতে উদয় হইবার পূর্ব্বে নিরাকৃত হইয়াছিল।

কাহার দ্বারা? না একজন অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু দ্বারা। এ খেলা তাঁহার জন্মিবার পূর্ব্বে পত্তন হয়, আর যিনি ইহা করিয়াছিলেন তাঁহার ভূত ভবিষ্যৎ সমুদায় গোচর ছিল।

আবার তাঁহার এ শক্তিও ছিল যে তিনি পূর্ব্বে আপনার মনোমত খেলা পাতাইয়া, কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে পারিতেন। এই নিমিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ, অবতারের পদ প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার এই পদ প্রাপ্তিতে তাঁহার অমানুষিক অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে। এই "অবতার" তত্ত্বটী ও এই কথাটীর ইতিহাস বিচার করুন। যখন এই কথাটী সৃষ্ট হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার কার্য্যও স্থির করা হয়। কথা হয় এই যে, শ্রীভগবান মনুষ্য সমাজে বিচরণ করিয়া থাকেন, আর তখন তাঁহাকে অবতার বলা যায়। ঐ সঙ্গে আরো কথা হয় যে, এইরূপে অমুক অমুক অবতার হইয়াছেন, আর একটী হইবেন তাঁহাকে বলে কল্কি অবতার। সুতরাং এই শব্দটী সৃষ্টির সঙ্গে উহার যে কার্য্য তাহাও স্থিরকৃত হইয়া গিয়াছিল, এই শব্দের ও তত্ত্বের সহিত মনুষ্যের আর সম্বন্ধ ছিল না।

কিন্তু নবদ্বীপে এই কথা ও তত্ত্ব আবার উত্থিত হইল। যখন নবদ্বীপের লোকেরা দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ বড়টা একটা কার্য্য করিতেছেন, যে কার্য্যের ভ্রমশূন্য মানচিত্র পূর্ব্বে অঙ্কিত হইয়াছে, তখন তাঁহারা আবার অবতার কথাটা উঠাইলেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, অসীম শক্তিসম্পন্ন একটী বস্তু পূর্ব্বে একটা খেলা পাতাইয়া এবং পরে তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া, তাঁহার সেই শক্তির পরিচয় দিতেছেন, তখন তাঁহারা বলিলেন যে, এই বস্তুটী আমাদের ন্যায় মনুষ্য নহেন, তাঁহার যে শক্তি উহা ভগবান ব্যতীত আর কাহারও সম্ভবে না। তাই লোকে মৃত অবতার-তত্ত্ব কথাটী সজীব করিলেন।

মনে করুন, কোন এক অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু ইহাই সাব্যস্থ করিলেন যে, জীবকে অতি নিগূঢ় প্রেমধর্ম্ম অর্পণ করিবার নিমিত্ত আয়োজন করিতে হইবে। তিনি স্থির করিলেন যে, এই নিমিত্ত প্রথমতঃ একটী অবতারের আবশ্যক, যাহার অমুক স্থানে অমুক সময় জন্ম-গ্রহণ করা উচিত, এবং তাহার পরে তাহার এই সমুদয় কার্য্য করিতে হইবে। সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু পূর্ব্বে এই সমুদয় সাব্যস্থ করি-লেন, পরে সেই সমুদয় প্রস্তাবিত ঘটনা কার্য্যে পরিণত হইল।

উপরে যাহা বলিলাম, প্রভুর লীলা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে তাহাই বোধ হইবে। শ্রীনবদ্বীপ বিদ্যা ও বুদ্ধিচর্চ্চার পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান। সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু স্থির করিলেন যে, এই নবদ্বীপেই এই অবতারের উদয়ের উপযুক্ত স্থান। শ্রীগৌরাঙ্গ অকুতোভয়ে সেখানে জন্মগ্রহণ করিলেন। শুনিতে পাই যীশুর সঙ্গীগণ ছিলেন জালিয়া প্রভৃতি নীচ লোক। সামান্য যে যে অবতার সকলেরি সঙ্গী ঐরূপ মূর্খ অজ্ঞ লোক ছিলেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ উদয় হইলেন কোথা, না পণ্ডিত সমাজে, যেখানে সে সময় অতিশয় বুদ্ধিসম্পন্ন লক্ষ লক্ষ পণ্ডিত বিরাজ করিতেছেন। তিনি জন্মিলেন কিরূপ সময়, না যখন সেই নবদ্বীপ উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, অর্থাৎ যখন মিথিলার ন্যায়শাস্ত্র নিজ জন্মস্থানে দুঃখ পাইয়া এই নবদ্বীপ নগরে আশ্রয় লইয়াছেন; যখন বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণি ঐ নগর অলঙ্কৃত করিতেছেন; যখন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন তাহার স্মৃতি, ও আগমবাগীস তাহার তন্ত্রসার লিখিতেছেন; এবং যখন কমলাক্ষ ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা দিতেছেন। সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু ভাবিলেন যে, সেই ভাবি অবতার জগতের প্রধান স্থানে প্রধান লোক সমাজে জন্মিলে কার্য্যের সুবিধা হইবে, আর প্রকৃত তাহাই হইল। যেহেতু সেই বস্তু বুঝিয়াছিলেন যে এই ভাবি

অবতার নবদ্বীপ জয় করিতে পারিলে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান আপনা আপনি বশীভূত হইবে।

আমাদের দেশে বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর সময় ফাল্গুন মাস, অবতার সেই মাসে জন্মগ্রহণ করিলেন। আর ফাল্গুন মাসের সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর সময় পূর্ণিমা সন্ধ্যা; কাজেই যেমন পূর্ণিমার চন্দ্র উঠিলেন অমনি গৌরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। এই স্থান ও সময় অবতারের জন্মগ্রহণের উপযুক্ত।

প্রভুর লীলায় দেখিবেন যে তিনি বরাবর হরিনাম বড় ভাল বাসিতেন। এমন কি, তিনি যখন যেখানে উদয় হইতেন তখন তাহার চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি হইত, ইহার অনেক উদাহরণ পরে দেখাইব। বলিতে কি, বহিরঙ্গগণের নিমিত্ত হরিনামই তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। প্রভু এরূপ সময় জন্মগ্রহণ করিলেন যখন চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রভুর মনের অভিপ্রায় যে তিনি হরিনামের সহিত জগতে উদয় হইবেন, তাই গ্রহণের সময় জন্মগ্রহণ করিয়া সেই ইচ্ছা পূরাইলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন যে গ্রহণের সময় জন্মিবেন, ও তাহাই করিলেন।

পরে দেখাইব যে, এই যে শ্রীগৌরাঙ্গ দেহ, ইহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার প্রয়োজন ছিল। তাই প্রভু বার মাস উদরে রহিলেন, কেন বলিতেছি। সাধারণতঃ সন্তান দশ মাস গর্ভে থাকে, প্রভু আরও পূর্ণ দুই মাস থাকিলেন। যদি তিনি দশ মাসে জন্মগ্রহণ করিতেন, তবে এই দুই মাস শচীর দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন। কিন্তু তিনি গর্ভের বাহিরে আসিয়া দেহটী শচীর হস্তে ন্যস্ত না করিয়া, গর্ভের অভ্যন্তরে থাকিলেন, সুতরাং স্বভাব কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। শচীর সেই দেহ পালন করিতে অনেক ভুল হইবার সম্ভাবনা ছিল, ও তাহাতে দেহটী আঘাত পাইতে পারিত, কিন্তু স্বভাবের ভুল হয় না। কাজেই

পূর্ণ দ্বাদশ মাস গর্ভে থাকিয়া প্রভু ভূমিষ্ঠ হইলেন। তখন সে দেহ দেখিয়া লোকে চমকিত হইল। ভূমিষ্ঠ শিশুকে যেন এক বৎসরের শিশু বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আবার ভূমিষ্ঠ হইলেন অতি অপূর্ব্ব লগ্নে। এরূপ শুভ লগ্নে কেবল শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন, আর কাহাকেও এরূপ সুসময়ে জন্মিতে দেখা যায় নাই। ইহাও যে দৈব হইয়াছে, তাহা উপরের ঘটনা দেখিলে বোধ হয় না, অর্থাৎ বোধ হয় যে তিনি ইচ্ছা করিয়াই সেই সময় জন্মগ্রহণ করেন।

শিশুবেলা নিমাইর চাঞ্চল্যের অবধি ছিল না। তাহা অপেক্ষা অনেক বড় মুরারী বড় জ্ঞানী ছিলেন, অর্থাৎ তিনি যোগবাশিষ্ট পড়িতেন, বড় একটা ভগবান মানিতেন না। এক দিবস তিনি বয়স্যের সহিত যোগবাশিষ্ট বিষয়ক কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছেন; মনের ভাব বুঝাইবার নিমিত্ত হাত চালাইতেছেন, মাথা নাড়িতেছেন, অঙ্গভঙ্গী করিতেছেন। পঞ্চম বর্ষায় নিমাই বয়স্যের সঙ্গে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাকে ভেংচাইতে ভেংচাইতে চলিয়াছেন। মুরারি দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন, জগন্নাথের বেটাকে নিন্দা করিলেন। পরে যখন আহারে বসিয়াছেন, তখন নিমাই তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার থালে মুত্র ত্যাগ করিলেন, আর বলিলেন, "মুরারি, হাত নাড়া মুখ নাড়া ছাড়, জ্ঞান ছাড়, বক্তৃতা ছাড়, ছাড়িয়া ভগবানকে ভজনা কর। যে ব্যক্তি বলে যে সে নিজে ভগবান, তাহার থালে আমি প্রস্রাব করি।" অবশ্য কাহারো থালে প্রস্রাব করা অন্যায়, কিন্তু ভাবুন নিমাই কি বলিয়া উহা করিয়াছিলেন। যোগবাশিষ্ট নাস্তিকতা শিক্ষা দেয়। সে পুস্তকের মর্ম্ম এই যে, ভগবান বলিয়া আর কোন পৃথক্ বস্তু নাই, মানুষই ভগবান। মুরারী তাহারই চর্চ্চা করিতেছিলেন।

প্রেমভক্তি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গৌরাঙ্গ অবতার। সুতরাং

যোগবাশিষ্টের শিক্ষা আর তাঁহার শিক্ষা একেবারে বিপরীত। ভক্তি-ধর্ম্মে বলে ভগবান মনুষ্যের কর্ত্তা, আর মনুষ্য তাহার দাসানুদাস। তাই বালক নিমাই মুরারীকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিলেন, এমন করিয়া যে তিনি তাহা চিরকাল মনে রাখিয়াছিলেন, আর আমরাও সে শিক্ষার ফল ভোগ করিতেছি।

আপনারা নিমাইর এই কাণ্ডকে অবশ্য কৃপা করিয়া পাগলামী বলিবেন না। ইহা একটী উদ্দেশ্যপূর্ণ লীলা। আবার আর এক লীলা শ্রবণ করুন। নিমাই গয়া হইতে আসিয়া যে সংকীর্ত্তন রচনা করেন, ঠিক সেইরূপ সংকীর্ত্তন পূর্ব্বে এক দিবস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার বয়স মোটে পাঁচ ছয় বৎসর। বয়স্য বালকগণকে নিমাই বনমালা পরাইয়াছেন, মধ্য স্থানে আপনি নৃত্য করিতেছেন, আর বয়স্য বালকগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া ঐরূপ নৃত্য করিতেছে। যে বালক নাচিতেছে না তাহাকে নিমাই আলিঙ্গন করিতেছেন, আর সেই স্পর্শে শক্তি পাইয়া সে তখন নৃত্য করিতেছে। পথে কয়েকটী পণ্ডিত যাইতেছিলেন তাঁহারা কৌতুক দেখিতে দাঁড়াইলেন। একটু পরে আবেশিত হইয়া তাঁহারা চৈতন্য হারাইলেন, হারাইয়া বালকগণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। চৈতন্যমঙ্গল বলেন—

চৌদিকে বালক বেড়ি হরি হরি বলে।
আনন্দে বিভোর প্রভু ভূমে পড়ি বুলে॥

বোল বোল বলি ডাকে মেঘ গম্ভীর স্বরে।
আইস আইস বলিয়া বালক করে কোলে॥

শ্রীঅঙ্গ পরশে বালক পাশরে আপনা।
আশ্চর্য্য ঘটনা এই বালক কান্দে না॥

হেনকালে সেই পথে চলিছে পণ্ডিত।
বিশ্বম্ভর খেলনা দেখিল আচম্বিত॥
আপনা পাসরি পণ্ডিত সান্তাইল মেলে।
করতালি দিয়া নাচে হরি হরি ব'লে॥
এ বোল শুনিয়া শচী আইল ত্বরিত।
দেখে পুত্র নাচে যত পণ্ডিত সহিত॥
পুত্র পুত্র বলি শচী নিমাই কৈল কোলে।
সভারে দেখিয়া সে নিষ্ঠুর বাণী বলে॥
এমত ব্যাভার সব পণ্ডিত সভায়।
পর পুত্র পাগল করি উন্মত্তে নাচায়॥

অর্থাৎ শচী গোল শুনিয়া ধাইয়া আইলেন, পুত্রকে কোলে করিলেন। তখন পণ্ডিতগণের আবেশ ভাঙ্গিল, ভাঙ্গিয়া তাঁহারা লজ্জায় মরিয়া গেলেন। তাঁহারা না রাজপথের সর্ব্বলোক সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিলেন? মনে রাখুন নিমাই যখন এই লীলা করেন তখন তিনি মায়ের কোলের ছেলে। এটী নিমাইয়ের বাল্য-চপলতা, না লীলাখেলা? কি বলেন?

নিমাই পাঠারম্ভ করিলেই দেখা গেল যে, বিদ্যাবুদ্ধির আকর স্থান যে নবদ্বীপে, সেখানেও তিনি শীর্ষস্থানের উপযুক্ত পাত্র। সেখানে তখন সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান রঘুনাথ শিরোমণি। তাহা অপেক্ষা বুদ্ধিমান জগতে আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। সেই রঘুনাথ নিমাইর বুদ্ধিতে প্রতিভাশূন্য। নিমাই ও রঘুনাথে অনেক দ্বন্দ্বের কথা জনশ্রুতিতে জানা যায়। আর সকল দ্বন্দ্বেই নিমাই জয়লাভ করিতেন। রঘুনাথের দীধিতির ন্যায় অমূল্য গ্রন্থ লিখিত হইত না, যদি নিমাই আপনার ন্যায়গ্রন্থ রঘুনাথের সান্ত্বনার নিমিত্ত ছিড়িয়া না

ফেলিতেন। তখন দেখা গিয়াছিল যে তিনি নিতান্ত উদ্দেশ্যশূন্য ছিলেন না। তিনি যে একটী দৈবের দাস ছিলেন না, তাহা দিগ্বিজয়ীকে জয় করিয়া নবদ্বীপের ও জগতের পণ্ডিতগণকে দেখাইয়াছিলেন। নিমাই যখন বালক, তখন তিনি নবদ্বীপের ন্যায় বিদ্বজ্জন সমাজে টোল স্থাপন করেন। আর সে টোলে কত সহস্র পড়ুয়া বিদ্যা শিক্ষা করিত। কত সহস্র বলিলাম ইহা অত্যুক্তি নয়, যথা চৈতন্য ভাগবতে—

কত বা প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাই।
কত বা মণ্ডলী হয়ে পড়ে নানা ঠাই॥

আবার পদ—

সহস্র সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ।
অবাক হইল সবে শুনিয়া বর্ণন॥

আবার ভাগবতে দেখি যে প্রভু যখন বঙ্গদেশে গমন করেন, তখন সেখানেই তাঁহার সহস্র সহস্র শিষ্য হয়, ও তাহারা তাঁহার সঙ্গে নবদ্বীপে আগমন করে। সেই বালক কালে তিনি যে ব্যাকরণের টিপ্পনী করেন, তাহা নবদ্বীপের ন্যায় সমাজে চলিত হইয়াছিল।

নিমাই পূর্ব্বাঞ্চলে কেন গমন করিলেন? তখন তিনি কেবল যৌবনে পদার্পণ করিতেছেন। তিনি জননীকে বুঝাইলেন যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে যাইতেছেন। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জনে যে তাঁহার কখনও বাসনা ছিল, তাহা তাঁহার লীলা পড়িলে বোধ হয় না। তিনি কেন পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কার্য্য দ্বারা কিছু কিছু জানা যায়। তিনি অবতাররূপে প্রকাশ হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে যাইবেন না তাহা তিনি জানিতেন, অথচ পূর্ব্ববঙ্গে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করা প্রয়োজন। তাই করিতে পদ্মাবতী তীরে গেলেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে কিরূপে ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই, কেহ তাহার সেখানকার প্রচার প্রণালীর

কথা কোন লীলা গ্রন্থে বলেন নাই। যখন নদীয়া ত্যাগ করেন, তখন তিনি কেবল একজন বিখ্যাত শিশুপণ্ডিত মাত্র, তাঁহাতে যে ধর্ম্মের কিছু ভাব আছে তাহাও লোকে জানিত না, বরং লোকে তাঁহাকে এক প্রকার নাস্তিক ভাবিত। আবার যখন নবদ্বীপে ফিরিয়া আইলেন, তখনও সেইরূপ বড় পণ্ডিত, কেবল বিদ্যাচর্চ্চা করেন, তাঁহার হৃদয়ে কোন ধর্ম্মভাবের চিহ্নও দেখা যাইত না। কিন্তু তিনি পূর্ব্ববঙ্গে একটী ভক্তির তরঙ্গ উঠাইয়া আইলেন। চৈতন্যমঙ্গল এই মাত্র বলেন—

সেই পদ্মাবতী তটবাসী যত জন।
বিশ্বম্ভর দেখি শ্লাঘ্য করিল নয়ন॥
পদ্মাবতী তীরে তীরে ভ্রমে গৌরহরি।
সে দেশ ভকত কৈল শ্রীচরণ ধরি॥
চণ্ডাল পতিত কিবা দুর্জ্জন সজ্জন।
সভারে যাচিয়া প্রভু দিল হরিনাম॥

চৈতন্যভাগবত বলেন :—

এই মতে বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের পতি।
বিদ্যারসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি॥
সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তখন।
হেন নাহি জানি কে পড়ায় কোন ধন॥
সেই ভাবে অদ্যাপিও বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন করে স্ত্রী পুরুষে॥

এইরূপে নবদ্বীপবাসীকে জানিতে না দিয়া প্রভু লুকাইয়া বঙ্গদেশ উদ্ধার করিলেন। বঙ্গদেশে যাইবার সময় আর একটী কারণ রঘুনাথ ভট্টকে সৃষ্টি করা। কারণ গোস্বামী রঘুনাথ তাঁহার লীলা খেলার এক অঙ্গ। সে কিরূপ বলিতেছি। একদিন প্রাতে সে দেশের অতি প্রধান

লোক তপন মিশ্র প্রভুর চরণে পড়িলেন, ইহাতে প্রভু জিব কাটিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তপন বলিলেন আমাকে বঞ্চনা করিরেন না, আমি কল্য স্বপ্নে জানিয়াছি, আপনি স্বয়ং ভগবান। এখন আমাকে উদ্ধার করুন। প্রভু বলিলেন, তুমি সস্ত্রীক বারাণসী গমন কর, সেখানে তোমার সহিত আমার দেখা হইবে। এই কথা শুনিয়া তপন মিশ্র তদ্দণ্ডে সস্ত্রীক দেশ ত্যাগ করিয়া বারানসী গেলেন, আর একাদশ বৎসর পরে সেখানে তিনি প্রভুর দর্শন পাইলেন। অতএব এই লীলাখেলা যিনি পাতাইয়াছিলেন তিনি তাঁহার খেলায় লিখিয়াছিলেন যে তপন মিশ্রের বারানসী যাইতে হইবে, সেখানে অবতারের সহিত তাঁহার দেখা হইবে। আর সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু তাঁহার খেলা কার্যো পরিণত করিতে শক্ত হইলেন। অতএব প্রয়োজনীয় ঘটনা গুলি তাহার অধীন ছিল, কি ঘটনা হইবে তাহা তিনি অগ্রে সাব্যস্থ করিতেন, পরে সে গুলি ঘটাইতেন।

সেই বারাণসীতে রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী; যাহাকে প্রভুর প্রয়োজন, তপনের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাই প্রভু তপন মিশ্রকে আজ্ঞা করেন তুমি সস্ত্রীক বারানসী গমন কর। এইরূপে প্রভুর লীলার প্রধান প্রধান সঙ্গী গুলির মধ্যে অনেককেই তিনি নিজে সংগ্রহ করেন।

নিমাই পণ্ডিত গয়াধামে যাইবেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি নদীয়ায় কিরূপ জীবনযাপন করিয়াছেন স্মরণ করুন। তাঁহার গঙ্গায় সন্তরণে ভব্য লোক অস্থির হইতেন। ঘাটে লোকে পূজা করিতে আসিয়াছে, তিনি পুরুষের ও মেয়ের কাপড় বদলাইলেন। বালিকারা ব্রত করিতেছে, তিনি নৈবিদ্য কাড়িয়া খাইলেন। একটু বড় হইলে সে সব ছাড়িলেন, কিন্তু তবু তাঁহার গাম্ভীর্য্যের লেশ ছিল না। শ্রীধরের সহিত কলাপাতা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেন, মুকুন্দকে "বাঙ্গাল" "বাঙ্গাল" বলিয়া অস্থির

করিয়া তুলিতেন। বঙ্গদেশে বাঙ্গালিয়া কথা শিখিয়া আসিয়া তাহার দিব্য অনুকরণ করিয়া বয়স্যগণকে হাসাইতেন। পড়ুয়া দেখিলেই ফাকি জিজ্ঞাসা করিতেন। তাঁহার ফাকির ভয়ে অধ্যাপক পর্য্যন্ত অস্থির হইতেন। তাঁহার পিতৃবন্ধু শ্রীবাস পণ্ডিত তাঁহাকে কৃষ্ণ ভজন করিতে উপদেশ দিলে, তিনি সেই গর্ব্বিত গুরুজনকে ঠাট্টা করিলেন। তবে যখন টোলে বসিতেন, তখন কাহার সাধ্য যে চপলতা করে। যখন পূর্ব্ববঙ্গে গমন করেন, তখনও কয়েক মাস একটু স্থির ছিলেন। কিন্তু নবদ্বীপে জন্মাবধি এই চতুর্ব্বিংশতি বয়স পর্য্যন্ত কেবল চাপল্য, কেবল উদ্ধতপনা, কেবল পড়ুয়ার দাম্ভিকতা করিয়াছেন। সেই পাত্র, চঞ্চল শিরোমণি, সেই উদ্ধত নবীন অধ্যাপক, এখন গয়ায় চলিলেন—

গয়াতীর্থ বাসে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া।
নমস্কারীলেন প্রভু শ্রীকর জুড়িয়া॥ (ভাগবত)

এই দুই কর জুড়িলেন আর এই কর চিরজীবন জোড়াই থাকিল; পরে চক্রবেড়ে গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিলেন, ইহাতে হইল কি, না—

অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম নয়নে।
রোমহর্ষ কম্প হইল চরণ দর্শনে॥
অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে। (ভাগবত)

পরে :— আত্ম প্রকাশের আসি হইল সময়।
দিনে দিনে বাড়ে প্রেমভক্তির বিজয়॥

পরে রোদন করিতে লাগিলেন :—

কৃষ্ণরে বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন্ দিগে গেলে মোর প্রাণ করি চুরি॥
আর্ত্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা গেলে কৃষ্ণনিধি ছাড়িয়া আমারে॥

গড়াগড়ি যায়েন কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
ভাসিলেন নিজ ভক্তি বিরহ সাগরে॥ (ভাগবতে)

যে নিমাই নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া গয়ায় গমন করিলেন তিনি আর ফিরিলেন না, যিনি আইলেন তিনি আর এক বস্তু।

তিলার্দ্ধেক উদ্ধতের নাহিক প্রকাশ।
পরম বিরক্ত রূপ সকল সম্ভাষ॥
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর।
কৃষ্ণ বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥
ভরিল পুষ্পের বন মহা প্রেমজলে।
মহাশ্বাস ছাড়ি প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে॥
পুলকে পূর্ণিত হইল সর্ব্ব কলেবর॥

(ভাগবত)

এইরূপে দিবানিশি ক্রন্দন চলিল, নয়ন জলে স্থান কর্দ্দমময় হইতে লাগিল, আবার ইহার সঙ্গে ঘন ঘন মূর্চ্ছা। প্রাতে স্নানে চলিলেন, অনেক কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া চলিয়াছেন, ক্রন্দন আসিতেছে বহিরঙ্গ লোক দেখিয়া সম্বরণ করিতেছেন; যথা—

প্রাতঃকালে যবে প্রভু চলে গঙ্গাস্নানে।
বৈষ্ণব সবার সঙ্গে হয় দরশনে
শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্কারে।
প্রীতি হয়ে ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করে॥

গয়া হইতে প্রত্যাগত নিমাই বৈষ্ণবগণকে বলিতেছেন:—

তোমা সবা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।
এত বলি কারু পায় ধরে সেই ঠাই॥

সেই সঙ্গে ভক্তের সেবা আরম্ভ করিলেন :—

নিঙ্গড়ায়েন বস্ত্র কারু করিয়া যতনে।
ধুতি বস্ত্র তুলি কারু দেন সে আপনে॥
কুশ গঙ্গা মৃত্তিকা কাহার দেন করে।
সাজি বহি কোন দিন চলে কারু ঘরে॥

পরে অধ্যাপক শিরোমণি পড়াইতে গেলেন, পারিলেন না। পড়ুয়ারা প্রশ্ন করে, ধাতুতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে, তিনি বলেন "কৃষ্ণ বল," এইরূপে সাত দিন গেল, কাজেই পড়ান বন্ধ হইল।

যাঁহার মুখে দিবানিশি হাসি ছিল, এখন তাঁহার দিবানিশি ক্রন্দন। যিনি এত দাম্ভিক ছিলেন, তিনি এখন যাহার তাহার চরণ ধরিয়া, যাহাকে তাহাকে প্রণাম করিয়া, দাস্য ভক্তি ভিক্ষা করেন। যিনি দিবানিশি বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন, এখন তিনি কেবল চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন, যথা—

যে যে জন আইসেন প্রভু সম্ভাষিতে।
প্রভুর চরিত্র কেহ না পারে বুঝিতে॥
পূর্ব্ব বিদ্যা ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন।
পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ॥

শচী পুত্রকে সুস্থ করিবার নিমিত্ত বধূকে পুত্রের সমীপে আনয়ন করেন, যথা :—

লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্র সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিবারে প্রভু নাহি চায়॥

পরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এই নিমাইর কীর্ত্তনে উত্তম ভাবঘটিত কি রাগরাগিণী যুক্ত পদ ছিল না, তবে কি ছিল, না মুখে কেবল হরি বলা আর মৃদঙ্গের সহিত নৃত্য। ইহাতে সকলে আনন্দে মাতোয়াল

হইতেন ও আনন্দে মূর্চ্ছা যাইতেন। ক্রমে কীর্ত্তনের তেজ বাড়িয়া চলিল, ক্রমে নূতন নূতন লোকে এই কীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিলেন। অগ্রে রজনীতে সামান্য কীর্ত্তন হইত, পরে দিবানিশি হইতে লাগিল। ইহাতে নদে টলমল করিতে লাগিল। বাসুঘোষের পদ যথা :—

চাঁদ নাচে সূর্য্য নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকী নাচে বলি গোরা গোরা॥

তথা ত্রিলোচনের পদ :—

অরুণ করল আঁখি, তারক ভ্রমরা পাখী,
ডুবু ডুবু করুণ মকরন্দে।
বদন পূর্ণিমাচান্দে, ছটায় পরাণ কান্দে,
তাহে নব প্রেমার আরম্ভে॥
আনন্দ নদীয়া পুরে, টলমল প্রেমার ভরে,
শচীর দুলাল্ গোরা নাচে।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে, শুনিয়া চমক লাগে,
মদনমোহন নটরাজে॥
পুলকে ভরল গায়, ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু তায়,
রোম চক্রে সোনার কদম্ব।
প্রেমার আরম্ভে তনু, যেন প্রভাতের ভানু,
আধ বাণী কহে কম্বুকণ্ঠ॥
শ্রীপাদ পদম গন্ধে, বেড়ি দশনখ চান্দে,
উপরে কনক বঙ্করাজ।
যখন ভাতিয়া চলে, বিজুরী ঝলমল করে,
চমকরে অমর সমাজ॥

সপ্তদ্বীপ মহি মাঝে, তাহে নবদ্বীপ সাজে,
তাহে নব প্রেমার প্রকাশ।
তাহে নব গৌরহরি, গুণ সঙ্কীর্ত্তন করি,
আনন্দিত এ ভূমি আকাশ॥
সিংহের শাবক যেন, গভীর গর্জ্জন হেন,
হুঙ্কার হিল্লোল প্রেমসিন্ধু।
হরি হরি বোল বলে, জগৎ পড়িল ভোলে,
দুকুল খাইল কুলবধু॥
অঙ্গের ছটায় যেন, দিনকর প্রদীপ হেন,
তাহে লীলা বিনোদ বিলাস।
কোটি কোটি কুসুম ধনু, জিনিয়া বিনোদ তনু,
তাহে করে প্রেমের প্রকাশ॥
লাখ লাখ পূর্ণিমাচান্দে, জিনিয়া বদন ছান্দে,
তাহে চারু চন্দন চন্দ্রিমা।
নয়ন অঞ্চল ছলে, ঝর্ ঝর্ অমিয় ঝরে,
জনম মুগধ পাইল প্রেমা॥
কি কব উপমা তার, করুনা বিগ্রহ সার,
হেন রূপ মোর গোরা রায়।
প্রেমায় নদীয়ার লোকে, তাহে দিবানিশি থাকে,
আনন্দে লোচন দাস গায়॥

শ্রীনিমাই বিজয়ার দিনে গয়াযাত্রা করেন, আর চারি মাস পরে পৌষ মাসে শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন। আসিয়া সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ করিলেন। তিনি চারি সপ্তাহের মধ্যে নদের আকার পরিবর্ত্তিত হইল। সেই প্রকাণ্ড নগরে কিরূপ তরঙ্গ উঠিল তাহা উপরে লোচনের প্রলাপে

কতক প্রকাশ পাইবে। ভারতবর্ষীয়গণ কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি যোগী, কি দেবোপাসকগণ, সকলে শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু নদে এখন একদল হিন্দুর সৃষ্টি হইল, যাহাদের হুঙ্কারে, গর্জ্জনে, নর্ত্তনে, মৃদঙ্গের বোলে ও কীর্ত্তনের রোলে, ভব্য নগরবাসীগণ একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন, সমাজের বন্ধন ছিন্নভিন্ন হইল, কাজেই নিমাইর বড় বড় শত্রুর সৃষ্টি হইল।

ইহার মধ্যে একজন কমলাক্ষ। তাঁহার নাম পূর্ব্বে করিয়াছি। ইনি তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রধান। ইনি পরম পণ্ডিত, তাপস ব্রাহ্মণ, দিবানিশি ভজন লইয়া থাকেন। তাঁহার বিষয় সম্পত্তির ও সম্মানের অবধি ছিল না। শ্রীহট্টের রাজা, কৃষ্ণদাস নাম লইয়া, শান্তিপুরে থাকিয়া তাঁহার চরণসেবা করিতেছেন। এই কমলাক্ষ অদ্বৈত আচার্য্য নামে বিখ্যাত। ইনি যদিও বৈষ্ণব, তবু তাঁহার বৈষ্ণবতায় ও নিমাই যে বৈষ্ণবতা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে অনেক প্রভেদ। বলিতে কি, তাঁহার বৈষ্ণবতায় সহিত অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীগণের মতের বড় একটী বিভিন্নতা ছিল না। তবে তাঁহাদের ঠাকুর শিব দুর্গা কি কালী, আর তাঁহার ঠাকুর বিষ্ণু অর্থাৎ গদাপদ্মাদিধারী চারি হস্তের নারায়ণ। কিন্তু নিমাইর ভজনীয় দ্বিভুজ মুরলীধর। নিমাই নবদ্বীপে এক প্রকাণ্ড বৈষ্ণব দল সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারা ও অদ্বৈত আচার্য্যের দলস্থ সকলে, অদ্বৈতের শীর্ষস্থানীয় পদে নিমাইকে বসাইলেন। ক্রমে তাঁহারা নিমাইকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন।

অদ্বৈতের এ সব ভাল লাগে না, তিনি বলেন ভজনে নাচন আর গায়ন কেন? আবার বলেন কলিকালে অবতার কি? শাস্ত্রে ইহার কোন আভাস নাই। একি সামান্য রহস্যের কথা যে, জগ-

ন্নাথের বেটা কিনা আজ আবার ঠাকুর হইয়া বসিল? যখন অদ্বৈত আচার্য্যের এরূপ ভাব, তখন কাজেই নিমাইর এক প্রধান কাজ হইল, এই অদ্বৈত আচার্য্যকে বশীভূত করা। ওদিকে অদ্বৈতের সংকল্প যে তিনি তাঁহার শীর্ষস্থানীয় পদ ত্যাগ করিয়া কখন জগন্নাথের বেটার অধীন হইবেন না। কিন্তু প্রভু পরিশেষে আচার্য্যকে বশীভূত করিলেন। *

নিমাইর আর এক শত্রু জগাই মাধাই। ইহারা শাক্ত ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মের কোন ধার ধারিতেন না। মদ্য পান করিতেন আর নদেবাসীর উপর বড় অত্যাচার করিতেন, কারণ ইহারা নগরে কোটাল

* শ্রীঅদ্বৈত তপস্যা করিয়া শ্রীভগবানকে আনিলেন। গৌর-নিতাই যেরূপ ঠাকুর তিনি সেইরূপ উপাসকদিগের প্রতিনিধি। এই লীলার পুষ্টির নিমিত্ত অদ্বৈতের ন্যায় একজন তেজস্কর ব্যক্তিকে প্রভুর প্রতিদ্বন্দী করার প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই নিমিত্ত যদিও তিনি এক প্রকার জানিতেন যে শ্রীভগবান মনুষ্য সমাজে আসিবেন, কিন্তু তাঁহার এই ভ্রম হয় যে সে তিনি কে? তিনি কি আসিয়াছেন, না আসিতেছেন? যদি আসিয়া থাকেন তবে তিনি যে জগন্নাথের বেটা তাহার প্রমাণ কি? আবার ইহাও বলিতেন যে ভগবান যে সত্য আসিবেন তাহার শাস্ত্র কৈ? সেই নিমিত্ত বৈষ্ণবদিগের প্রধান শ্রীঅদ্বৈত, প্রভুকে পদে পদে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, আর সকল পরীক্ষায়ই প্রভু উত্তীর্ণ হয়েন। কাজেই তখন শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর শরণাগত হইলেন। যদি অদ্বৈত প্রথমেই তাঁহাকে চিনিতে পারিতেন, তবে এই কঠোর পরীক্ষা আর হইত না। তাই আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, "হে সন্দিগ্ধচিত্ত পাঠক, তুমি যদি প্রভুকে পরীক্ষা করিতে চাও তবে দেখিবে তুমি যেরূপ তাঁহাকে কঠোর পরীক্ষা করিতে, অদ্বৈত তাহা তোমার পূর্ব্বেই করিয়া গিয়াছেন।"

ছিলেন, অস্ত্রধারী সৈন্য কি দস্যু সহায় ছিল, কাজেই নিরীহ বিদ্যাব্যবসায়ী নগরবাসীরা তাহাদের নামে কাঁপিয়া উঠিতেন। সে দুজনার কথা এইরূপ লেখা আছে,—

হরিনাম দুই ভাই সহিতে না পারে।

প্রভুর আজ্ঞাক্রমে নিতাই ও হরিদাস নগরে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। একদিন তাঁহারা জগাই মাধাইর নিকট গমন করেন, জগাই মাধাই "মার মার" করিয়া তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া আইসে। ইহাতে নগরের লোকের বড় আমোদ হয়। তাহারা বলিতে লাগিল, নিমাই পণ্ডিত বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছিলেন, বেশ হইয়াছে। এদিকে নিতাই, প্রভুর নিকট যাইয়া বলিলেন যে, তিনি আর প্রচার করিতে যাইবেন না। তিনি বলিলেন "প্রভু, সাধুকে সকলেই তরাইতে পারে, তুমি জগাই মাধাইকে আগে উদ্ধার কর তাহা হইলে তোমার প্রচারিত ধর্ম্ম লোকে শীঘ্র গ্রহণ করিবে।" প্রভু দেখিলেন তাঁহার এই দুইটি মাতাল বশীভূত করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার কার্য্য হইবে না।

তৃতীয় শত্রু চাঁদকাজী, গৌড়ের ও নদের অধিকারীর অর্থাৎ রাজার প্রতিনিধি, রাজা হোসেন সাহার দৌহিত্র। কিন্তু বলিতে ঘৃণা হয়, নিমাইর বিপক্ষগণ হিন্দু হইয়া এই মুসলমান কাজীর নিকট নিমাই ও তাঁহার দলস্থগণের নামে নালিশ করিল। বলিল যে, ইহারা দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে, যেহেতু ইহারা ভগবানকে মনে মনে না ডাকিয়া চেঁচাইয়া ডাকে ইত্যাদি। কাজীর বহুতর সৈন্য ছিল। তিনি হিন্দুতে হিন্দুতে এইরূপ বিবাদ দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইয়া কীর্ত্তন বন্ধ করিতে লাগিলেন। যেখানে কীর্ত্তন হয়, তিনি সেখানেই যাইয়া তাহাদিগকে প্রহার করিতে ও ভয় দেখাইতে লাগিলেন। বিস্তর খোল ভাঙ্গিলেন, কাহারও ঘর ভাঙ্গিলেন, কাজেই কীর্ত্তন একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। তখন এরূপ

হইল যে কাজীকে রোধ না করিতে পারিলে আর নিমাইর ধর্ম্মপ্রচার হয় না। সুতরাং নিমাইর এই জন্যে বলবান কাজীকে দমন করিতে হইয়াছিল। কিরূপে তিনি ইহা করিলেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রভু অসংখ্য লোক লইয়া তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

প্রভু প্রথমে গোপনে শ্রীবাসের প্রাচীরবেষ্টিত মন্দিরে কীর্ত্তন করিতেন। জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিতে প্রথমে বাহিরে প্রকাশ হইলেন। জগাই মাধাই এক প্রকার নদীয়ার রাজা, অথচ ঘোর অত্যাচারী, তাহাদিগকে চরণতলে আনয়ন করায় প্রভুর নিজ আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হইল। যাহা বাকি ছিল তাহা নগরকীর্ত্তন করিয়া ও কাজীকে উদ্ধার করিয়া সমাপ্ত করিলেন। এইরূপে নদীয়ার লীলা সাঙ্গ হইলে, প্রভুর নদীয়ার বাহিরে দৃষ্টি পড়িল, আর তাই সন্ন্যাস লইলেন।

নদীয়ায় গোপনে আর একটী মহত কার্য্য করিলেন। নদীয়ানগরে যতদিন শ্রীগৌরাঙ্গ ছিলেন, [illegible] তাহার মুহুর্মুহু শ্রীভগবান ভাব হইত। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বৃন্দাবনে [illegible], তিনি সেইরূপ নদীয়ায় প্রেমের বস্তু ভগবান থাকিতে ই[illegible] [illegible]লেন। যখন তিনি সন্ন্যাস লইলেন, তখন তিনি ভক্তির ব[illegible], কি মহাপ্রভু হইলেন। নদীয়ায় তিনি "প্রাণনাথ" বলিয়া পূ[illegible] [illegible]তেছিলেন। যখন সন্ন্যাস লইয়া বাহিরে আইলেন, তখন হ[illegible] "গুরু" "পতিতপাবন" "অগতির গতি" ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীবৃন্দাবনের কথা স্মরণ করুন। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে নন্দ, যশোদা, বলরাম, রাখালগণ ও গোপীদের প্রিয় বস্তু ছিলেন। যখন তিনি মথুরায় গেলেন, তখন আর প্রাণনাথ থাকিলেন না, তখন হইলেন ভক্তের শিরোমণি যে উদ্ধব ও কুব্জা, তাহাদের প্রভু বা কর্ত্তা।

শ্রীপ্রভু নবদ্বীপকে নব-বৃন্দাবন করিলেন, আপনি তথায় কৃষ্ণ হইলেন, শচী ও জগন্নাথ, যশোদা ও নন্দ হইলেন, নিতাই প্রভৃতি সখা হইলেন, এবং বিষ্ণুপ্রিয়া ও নদীয়ানাগরীগণ হইলেন তাঁহার প্রেয়সী। ব্রজের ভজনই সর্ব্বোত্তম ভজন, অর্থাৎ ভগবানকে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তভাবে ভজনা করা। এই প্রেমভজনা কৃষ্ণলীলার সাহায্যে অতি সহজ করা যায়। অতএব প্রভু গোপনে গোপনে জীবের ভজন সুলভ নিমিত্ত নদীয়ায় এক পৃথক নিগূঢ় লীলার সৃষ্টি করিলেন। এই ভজনের নাগর তিনি স্বয়ং, আর বিষ্ণুপ্রিয়া ও নদীয়ানাগরীগণ রাধা ও গোপী। নদীয়ার ভক্তগণ এই ভজনে একবারে মজিয়া গেলেন, গিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ভুলিলেন। এই ভক্তগণের মধ্যে কয়েকটী পদকর্তার নাম করিতেছি, যথা—গোবিন্দ, মাধব, বাসুঘোষ, নরহরি, ত্রিলোচন, নয়নানন্দ, বলরাম, শেখর ইত্যাদি। আর একজন পূর্ব্বে এই ভজনের বিরোধী ছিলেন, পরে অনুগত হয়েন, তিনি স্বয়ং বৃন্দাবনদাস। সে কথা পরে বলিব। এখন এই পদকর্ত্তাদিগের কয়েকটী পদ নিম্নে দিতেছি। পদগুলি সম্পূর্নরূপে দিলে অনেক স্থান লইবে সেই জন্য স্থানে স্থানে বাদ দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। যাহাদের এইরূপ পদ দেখিতে লোভ হয়, তাঁহারা পদ সংগ্রহ গ্রন্থে ইহা অনেক দেখিতে পাইবেন। লোভের কথা বলিলাম তাহার কারণ এই যে, যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে চিত্ত দিয়াছেন, তাঁহারা এই সমুদয় পদ পড়িয়া পুলকিত হইবেন সন্দেহ নাই। যথা পদঃ—

ধানশ্রী।

মো মেনে মনু মো মেনে মনু।
কিখনে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইনু॥
সাত পাঁচ সখী যাইতে ঘাটে।
শচীর দুলাল দেখি আইনু বাটে॥

চাঁদ ঝলমলি বদন ছাঁদে।
দেখিয়া যুবতী ঝুরিয়া কাঁদে॥
চাচর কেশে ফুলের ঝুটা।
যুবতী উমতি কুলের খোটা॥
তাহে তনু সুখ বসন পরে।
গোবিন্দদাস তেই সে ঝুরে॥

উপরের পদটী পূর্ব্বরাগের। রাধাকৃষ্ণ লীলায় পূর্ব্বরাগের বিস্তর পদ আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে একটীও উপরের পদ অপেক্ষা ভাল পাইবেন না। আবার দেখুন যে, এইরূপ পদ দুই একজন প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা নয়। নদীয়ায় তখন উপস্থিত, কি তাহার পরের, যত প্রধান পদকর্ত্তা, সকলেই রাধাকৃষ্ণ ভজন ছাড়িয়া গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বা গৌর-নদেনাগরী ভজন আরম্ভ করিলেন। নিম্নের পদটী বলরামদাসের, —নব্য বলরামদাস নহেন, আসল বলরামদাস, পদ যথা ঃ—

ধানশ্রী।

গৌর বরণ, মণি আভরণ, নাটুয়া মোহন বেশ।
দেখিতে দেখিতে ভুবন ভুলল, ঢলিল সকল দেশ॥
মনু মনু সই দেখিয়া গোরাঠাম।
বধিতে যুবতী গঢ়ল কো বিধি, কামের উপরে কাম॥ ধ্রু॥
ওরূপ দেখিয়া নদীয়া-নাগরী পতি উপেখিয়া কাঁদে।
ভালে বলরাম, আপনা নিছিল, গোরা-পদ-নখছাঁদে॥

ধানশ্রী।

আর একদিন, গৌরাঙ্গসুন্দর, নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে।
কোটী চাঁদ জিনি, বদন সুন্দর, দেখিয়া পরাণ ফাটে॥

অঙ্গ ঢল ঢল, কনক কষিল, অমল কমল আঁখি।
নয়ানের শর, ভাঙ ধনুবর, বিধয়ে কামধানুকী॥
কুটিল কুন্তল, তাহে বিন্দু জল, মেঘে মুকুতার দাম।
জলবিন্দু তল, হেমমোতি জনু, হেরিয়া মূরছে কাম॥
মোছে সব অঙ্গ, নিঙ্গাড়ি কুন্তল, অরুন বসন পরে।
বাসুঘোষ কয়, হেন মনে লয়, রহিতে নারিবে ঘরে॥

এইরূপ পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান এই কয়েকজন ছিলেন যথা—নরহরি, বাসু, মাধব, গোবিন্দ ঘোষ ও লোচন। লোচনের ধামালি প্রসিদ্ধ ও উপাদেয়।

সো বহুবল্লভ গোরা, জগতের মনচোরা,
তবে কেন আমার করিতে চাই একা।
হেন ধন অন্যে দিতে, পারে বল কার চিতে,
ভাগাভাগি নাহি যায় দেখা॥
সজনি লো মনের মরম কই তোরে।
না হেরি গৌরাঙ্গ মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
কে চুরি করিল মনচোরে॥ ধ্রু॥
লও কুল লও মান, লও শীল লও প্রাণ,
লও মোর জীবন যৌবন।
দেও মোরে গোরানিধি, যাহে চাহি নিরবধি,
সেই মোর সরবস ধন॥
নতু সুরধুনী নীরে, পশিয়া তেজিব প্রাণ,
পরাণের পরাণ মোর গোরা।
বাসুদেব ঘোষ কয়, সে ধন দিবার নয়,
দণ্ডে দণ্ডে তিলে হই হারা॥

উপধ্বের পদে বাসু বলিতেছেন, তোমরা আমার সমুদয় লও, কিন্তু আমার সর্ব্বস্ব ধন, পরাণের পরাণ, গৌরাঙ্গকে দাও।

বিভাস।

করিব মুই কি করিব কি ?
গোপত গৌরাঙ্গের প্রেমে ঠেকিয়াছি ॥ ধ্রু ॥
দীঘল দীঘল চাঁচর কেশ রসাল দুটী আঁখি।
রূপে গুণে প্রেমে তনু নানা জনু দেখি ॥
আচম্বিতে আসিয়া ধরিল মোর বুক।
স্বপনে দেখিনু আমি গোরাচাদের মুখ ॥
বাপের কুলের মুই ঝিয়ারী।
শ্বশুর কুলের মুঞি কুলের বৌহারি ॥
পতিব্রতা মুঞি সে আছিনু পতির কোলে।
সকল ভাসিয়া গেল গোরাপ্রেমের জলে ॥
কহে নয়নানন্দ বুঝিলাম ইহা।
কোন পরকারে এখন নিবারিব হিয়া ॥

সুহই।

সই, দেখিয়া গৌরাঙ্গচাঁদে।
হইনু পাগলি, আকুলি ব্যকুলি, পড়িনু পীরিতি ফাঁদে ॥
সই, গৌর যদি হৈত পাখী।
করিয়া যতন, করিতু পালন, হিয়া পিঞ্জিরায় রাখি ॥
সই, গৌর যদি হৈত ফুল।
পরিতাম তবে, খোপার উপরে, দুলিত কাণেতে দুল ॥
সই, গৌর যদি হৈত মোতি।
হার যে করিতু, গলায় পরিতু, শোভা যে হইত অতি ॥

সই, গৌর যদি হৈত কাল।
অঞ্জন করিয়া, রঞ্জিতাম আঁখি, শোভা যে হইত ভাল॥
সই, গৌর যদি হৈত মধু।
জ্ঞানদাস কহে, আস্বাদ করিয়া, মজিত কুলের বধু॥

কিন্তু হে গৌরগত-প্রাণ জ্ঞানদাস! গৌর পাখী কি ফুল না হইয়া যাহা আছেন তাই ভাল না?

কামোদ।

সখি গৌরাঙ্গ গড়িল কে?
সুরধুনী তীরে, নদীয়ানগরে, উয়ল রসের দে।
পিরীতি পরশ, অঙ্গের ঠাম, ললিত লাবণ্যকলা।
নদীয়ানাগরী, করিতে পাগলী, না জানি কোথা না ছিলা॥
সোণার বাধল, মণির পদক, উর ঝলমল করে।
ও চাঁদমুখের, মাধুরী হেরিতে, তরুণী হিয়া না ধরে।
যৌবন তরঙ্গ, রূপের বাণ, পড়িয়া অঙ্গ যে ভাসে।
শেখরের পহু, বৈভব কো কহুঁ, ভুবন ভরল যশে॥

উপরে কেবল দুই একটী পূর্ব্বরাগের পদ উদ্ধৃত করিলাম, কিন্তু মহাজনগণ গৌরাঙ্গকে নাগর করিয়া মাথুর প্রভৃতি সকল রসের পদ করিয়াছিলেন। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ গোটা কয়েক মাথুরের পদ দেওয়া গেল যথা—

করুণ।

গেল গৌর না গেল বলিয়া।
হাম অভাগিনী নারী অকূলে ভাসাইয়া॥ ধ্রু॥
হায় রে দারুণ বিধি নিদয় নিঠুর।
জন্মিতে না দিলি তরু ভাঙ্গিলি অঙ্কুর।

হায়রে দারুণ বিধি কি বাদ সাধিলি।
প্রাণের গৌরাঙ্গ আমার কারে নিয়া দিলি॥
আর কে সহিবে আমার যৌবনের ভার।
বিরহ-অনলে পুড়ি হব ছারখার॥
বাসু ঘোষ কহে আর কারে দুঃখ কব।
গোরাচাঁদ বিনা প্রাণ আর না রাখিব॥

ভূপালী।

ভেদ রে পরাণ নিলাজিয়া। এখন না গেলি তনু তেজিয়া॥
গৌরাঙ্গ ছাড়িয়া গেছে মোর। আর কি গৌরব আছে তোর॥
আর কি গৌরাঙ্গচাঁদে পাবে। মিছা প্রেম-আশা-আশে রবে॥
সন্ন্যাসী হইয়া পঁহু গেল। এ জনমের সুখ ফুরাইল॥
কান্দি বিষ্ণুপ্রিয়া কহে বাণী। বাসু কহে না রহে পরাণি॥

পাহিড়া।

অবলা সে বিষ্ণুপ্রিয়া, তুয়া গুণ সোঙরিয়া,
মুরছি পড়ল ক্ষিতিতলে।
চৌদিকে সখীগণ, ঘিরি করে রোদন,
তুল ধরি নাসার উপরে॥
তুয়া বিরহানলে, অন্তর জর জর,
দেহ ছাড়া হইল পরাণি।
নদীয়ানিবাসী যত, তারা ভেল মুরছিত,
না দেখিয়া তুয়া মুখখানি॥
শচী বৃদ্ধা আধমরা, দেহ তার প্রাণ ছাড়া,
তার প্রতি নাহি তোর দয়া।

নদীয়ার সঙ্গীগণ, কেমনে ধরিবে প্রাণ,
কেমনে ছাড়িলা তার মায়া ॥
যত সহচর তোর, সবই বিরহে ভোর,
শ্বাস বহে দরশন আশে।
এ দেহে রসিকবর, চল হে নদীয়াপুর,
কহে দীন এ মাধব ঘোষে ॥

শ্রীরাগ।

গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া।
প্রাণহীন হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
তোমার পূরব যত চরিত পীরিত।
সোঙরি সোঙরি এবে ভেল মূরছিত ॥
হেন নদীয়াপুর সে সব সঙ্গিয়া।
ধূলায় পড়িয়া কান্দে তোমা না দেখিয়া ॥
কহয়ে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি।
তিলেক বিলম্বে, আমি আগে যাই মরি ॥

এইরূপ মান খণ্ডিতা প্রভৃতি অনেক রসের পদ আছে। নীচের পদটীতে প্রভুকে ধৃষ্ট নাগর সাজান হইয়াছে।

অলসে অরুণ আঁখি, কহ গৌরাঙ্গ একি দেখি,
রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে।
নদীয়া নাগর সনে, রসিক হইয়াছ বটে,
আর কি পার ছাড়িবারে।
সুরধুনী তীরে গিয়া, মার্জ্জন করহে হিয়া,
তবে সে আসিতে দিব ঘরে ॥

এ পদটী বৃন্দাবন দাসের। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুকে বলিতেছেন কিগো

ঠাকুর, তোমার চক্ষু ঢুলু ঢুলু ও অরুণ বর্ণের কেন? বুঝেছি, নদীয়া নাগরীর সহিত মজিয়াছ, কিন্তু আমাকে ছুইও না।" ইত্যাদি। এই বৃন্দাবনদাস তাঁহার গ্রন্থে পূর্ব্বে লিখিয়াছেন যে এ অবতারে "শ্রীগৌরাঙ্গ নাগর" বলিয়া আর কেহ ভজনা করিবে না। কিন্তু পরে আপনি স্রোতে পড়িয়া গেলেন, যাইয়া তাহাই করিতে লাগিলেন। তাহার প্রমাণ উপরের পদ।

যখন শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়া নগরে ভগবানরূপে মুহুর্মুহু প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, তখন নদেবাসী ভক্তগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণকে একেবারে না ভুলিলেও, তাঁহাদিগকে আর ভজনের নিমিত্ত প্রয়োজন বোধ হইল না। শ্রীবাস বলিলেন, আমাদের গৌররূপই ভাল। শ্রীধর প্রার্থনা করিলেন যে, প্রভু তুমি গৌররূপে আমার হৃদয়ে থাক। শিবানন্দ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, শ্যামরায় বিগ্রহ স্থাপন করায়, তিনি পুত্রকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এত কষ্ট করিয়া আমরা কালকে গৌর করিলাম, তুই আবার গৌরকে কাল করিলি?

ইহার মধ্যে একটা বড় রহস্য আছে। যখন পণ্ডিত মহাশয়গণ আপত্তি তুলিলেন যে কলিকালে অবতার নাই, তখন ভক্তগণ শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, আছে, ও তাঁহার বর্ণ সোণার ন্যায়। অতএব কলির কৃষ্ণ হইতেছেন গৌর। তাহা যদি হইল, তখন ভক্তগণ বলিতে লাগিলেন যে দ্বাপরের কৃষ্ণ কাল ছিলেন, আর সে যুগের লোকেরা কৃষ্ণকে ভজন করিয়া আসিয়াছেন। আমরা কলির লোক, আমাদের দ্বাপরের ঠাকুরকে ভজনা না করিয়া কলির যে সোণার বর্ণের ঠাকুর গৌর, তাঁহাকে ভজনা করাই উচিত ও প্রসিদ্ধ।

অনেকে এ কথাও তুলিলেন যে, যেমন কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় যাইয়া সেখানে নারায়ণ মাত্র হইলেন, সেইরূপ গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস

লইয়া যেই কৃষ্ণচৈতন্য হইলেন, সেই তিনি নারায়ণ অর্থাৎ গুরু হইলেন, আমাদের কান্ত আর রহিলেন না, আমাদের কান্ত নদের নিমাই।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপীগণের সহিত লীলা করিয়া বহিরঙ্গ লোকের চক্ষে অসুর দমন করিতে মথুরায় গমন করিলেন। সেইরূপ যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গকে কান্তভাবে ভজনা করেন, অর্থাৎ নদেবাসীগণ, তাঁহারা বলেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ানগরে নদীয়ানাগরীর সহিত বিলাস করিয়া বহিরঙ্গ লোকের চক্ষে সন্ন্যাসী হইয়া নদের বাহিরে পাষণ্ড দলন করিতে গমন করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃত পক্ষে বৃন্দাবন ত্যাগ করেন না। তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া এক পদও গমন করেন নাই, বৃন্দাবনে গোপন ভাবে রহিলেন। সেইরূপ গৌরাঙ্গ নদীয়া ত্যাগ করিলেন না, গোপন ভাবে সেখানে রহিলেন, যথা বৃন্দাবন দাসের পদ :—

"অদ্যাপী সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

এ ভাগ্যবান কাহারা? ইহারা নদীয়ানাগরী। এ নদীয়ানাগরী কি ভদ্রলোকের স্ত্রী ও কন্যা গৌরাঙ্গের সহিত কুলটা হইয়াছিলেন? না, তাহা নয়। নদীয়ানাগরী যাহারা গৌরাঙ্গকে নাগর ভাবে অর্থাৎ কান্তভাবে ভজনা করেন। এই নদীয়ানাগরীগণের নাম শুনিবেন? একজন নরহরি, একজন বাসু ঘোষ, একজন ত্রিলোচন ইত্যাদি ইত্যাদি।

কান্তভাবে ভজনা কি? কান্ত মানে স্বামী। স্বামীর নিকট তাহার স্ত্রী কি প্রার্থনা করেন? ভালবাসা। শ্রীভগবানকে যদি ভালবাসিতে চাও তবে তাঁহাকে কান্ত বলিয়া কি প্রাণনাথ বলিয়া বোধ করিও। কিন্তু যদি তোমার অন্য প্রার্থনা থাকে, যথা ভবনদী পার

হওয়া, কি পাপ মার্জ্জনা, তবে তাঁহাকে প্রভু বলিয়া ভজনা করিতে হইবে। অতএব এইরূপ যে নাগরীগণ তাঁহাদের গৌরাঙ্গের নিকট কেবল এই প্রার্থনা যে তাঁহার সহিত তাঁহাদের প্রীতি হয়। অতএব তাঁহাদের যোগ্য প্রার্থনা এই, হে নাথ, হে প্রাণ, আমি তোমার বিরহে যন্ত্রণা পাইতেছি, আমার হৃদয়ে এসো, তোমার চন্দ্রবদন হেরি।

অতএব গৌরাঙ্গ অবতার যদি নদীয়ায় সমাপ্ত হইত তবুও যে জন্য প্রভু আসিয়াছিলেন তাহা রাখিয়া যাইতে পারিতেন। জীবকে এই কয়েকটী বিষয় জানাইবার নিমিত্ত তাঁহার অবতার। (১) শ্রীভগবান কিরূপ বস্তু; (২) তাঁহাকে কিরূপে পাওয়া যায়; (৩) প্রেম কি ও কিরূপে উহা আহরণ করা যায়। শ্রীনবদ্বীপে এ সমুদয় প্রচুররূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং তিনি নদীয়ার লীলা সমাপ্ত করিলে, জগতে প্রেম ধর্ম্ম থাকিয়া যাইত।

যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলেন, তখন একদিন তিনি রাধার বিরহে অস্থির হইয়া সেখানে থাকিতে না পারিয়া প্রিয়াকে দর্শন দিতে বৃন্দাবনে আইলেন। আসিবার সময় রাজবেশে আসিলেন। তাহা দেখিয়া শ্রীমতী ঘোমটা টানিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, ইনি অতি ঐশ্বর্য্যশালী রাজা, ইঁহাকে আমি ভজন করি নাই। আমি যাঁহাকে ভজনা করিয়াছি তিনি আমারি মত, মাধুর্য্যময় ঐশ্বর্য্য বিবর্জ্জিত। গৌরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র লইলেন। প্রভু সন্ন্যাস লইলে পুরী গোসাঞির আর তাঁহাকে দেখিলেন না। বলিলেন, আমার সেই প্রিয়তম বংশ গৌরাঙ্গ তিনি নাগর। তাঁহার সন্ন্যাসী-রূপ আমি দেখিব না। ঐরূপ পুরুষোত্তম আচার্য্য প্রভুর অতি মর্ম্মী ভক্ত। প্রভু সন্ন্যাস লইলে তিনি রাগ করিয়া কাশীতে গমন করিয়া সন্ন্যাস লই-লেন, নাম পাইলেন স্বরূপ,—সেই স্বরূপ যিনি গম্ভীরার সাক্ষী। তিনিও

প্রভুর সন্ন্যাস মূর্ত্তি দেখিতে চান নাই বলিয়া প্রভুকে ত্যাগ করেন। কিন্তু পরে আর থাকিতে পারিলেন না, আসিয়া চরণে পড়িলেন। রাধাকৃষ্ণবাদীরা তখন আর এক কথা উঠাইলেন। তাহারা বলিতে লাগিলেন যে পরকীয়া ভজন সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, কিন্তু তাহা গৌর-লীলায় নাই। গৌরবাদীরা উত্তর দিলেন, অবশ্য আছে, যেহেতু প্রভু সন্ন্যাস লইলে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তখন পরকীয়া হইলেন।

এইরূপ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন ক্রমে চলিতে লাগিল। নরোত্তম ঠাকুর গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ স্থাপন করিলেন। বক্রেশ্বর নিমানন্দ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামীগণের প্রতাপে সে ভজন উঠিয়া গেল। ভজন ত গেল, স্বয়ং গৌরাঙ্গ পর্যান্ত যাইবার উপক্রম হইয়াছিলেন।

কিন্তু আবার সেই ভজন প্রচলিত হইতেছে, সে বড় আশ্চর্য কথা। মনে ভাবুন এ সন্দেহের যুগ। এ সন্দেহ ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে এদেশে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন, কি রাধাকৃষ্ণ ভজন ত পাছের কথা, ভজন পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছিল। অনেকে নাস্তিক হইয়া রহিলেন, যাহার অন্তরে পতন হয় নাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে একটা কল্পনার বস্তু বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। তাহারা বলিতে লাগিলেন কৃষ্ণ বলিয়া যে কেহ ছিলেন তাহার প্রমাণ কি? সুতরাং রাধাকৃষ্ণ লীলারও কোন প্রমাণ নাই। এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা, যাহা গুপ্ত ছিল, জগতে প্রকাশ হইল। যিনি গৌর-লীলা পাঠ করেন তিনিই প্রভুর পক্ষপাতী হয়েন। পরে অনেকে তাঁহার লীলা পড়িয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের যদিও কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাখেলার প্রচুর প্রমাণ আছে

তাহাতে জানা যায় যে তিনি স্বয়ং ভগবান। আর তিনি যখন বলিতেছেন শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভজন কর, তখন সেই যথেষ্ট প্রমাণ যে সে ভজন শ্রীভগবানের অনুমোদনীয়। তাহারা তাই রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ উভয় ভজন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু আর একদল বলিতে লাগিলেন যে আর রাধাকৃষ্ণ ভজনের প্রয়োজন কি? তাঁহারা নরহরি ও বাসুর পথ ধরিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার ভজন ত আমাদের সন্মুখে। রাধা-কৃষ্ণ অনেক দিনের কথা, কিন্তু গৌর-লীলা যে আমরা এক প্রকার চক্ষে দেখিতেছি। অতএব গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন যেরূপ আমাদের জীবন্ত সামগ্রী হইবে, রাধাকৃষ্ণ ভজন কখনও সেইরূপ হইবে না।

তাই এখন গৌরবাদীর দলের বড় প্রতাপ, ইহারাই এখন প্রকৃত পক্ষে প্রভুর ধর্ম্মের প্রতিনিধি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীভাগবতভূষণ, জিয়ড় নৃসিংহ ও সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন পুনর্জীবিত করেন। এই তিনজনে প্রথমে গৌর-নিতাইকে দাস্য ভাবে ভজনা আরম্ভ করিলেন। পরে জিয়ড় নৃসিংহ ও সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী শ্রীগৌরাঙ্গকে কান্ত ভাবে ভজন করিতে লাগিলেন। ভাগবতভূষণ ইহাতে যোগ দিতে পারিলেন না। তিনি তখন শ্রীনিত্যানন্দের পথ অবলম্বন করিয়া প্রচার করিতেছিলেন, ---দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, দলবল লইয়া 'ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ" গাহিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি তাঁহার দুই প্রিয় বন্ধুকে বলিলেন যে তাঁহারা নির্জ্জনে ভজনা করেন, তাঁহারা মনের সাধ মিটাইয়া প্রভুকে আস্বাদ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি প্রচারক, বহিরঙ্গ লোক লইয়া তাঁহার ইষ্টগোষ্ঠী, তাঁহার অত নিগূঢ় ভজনা প্রচার করিলে বিষম অনিষ্ট হইবে। ভাগবতভূষণের এই কথা

আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। পরে, তাঁহার দেহ রাখিবার কিছুদিন পূর্ব্বে, তিনি পার্ষদগণকে বলিলেন "আর কেন, যে কয়েক দিন বা যে কয়েক মুহূর্ত্ত বাঁচিব, এখন গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন করিব" ও তাহাই করিতে লাগিলেন।

এই তিন মহাত্মার বিবরণ আমরা তাঁহাদের পার্ষদ শ্রীল লক্ষণচন্দ্র রায়ের নিকট শ্রবণ করি। শ্রীভাগবতভূষণের শ্রীগৌরাঙ্গে এতদূর বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি বলিতেন যে গৌরমন্ত্র না লইলে কোন ভক্তের মন সিদ্ধ হইবে না. তাহাই বলিয়া, যিনি কৃষ্ণমন্ত্র লইয়াছেন তাঁহাকে তিনি আবার গৌরমন্ত্র দিতেন। *

* ভাগবতভূষণের এক রহস্যজনক কীর্ত্তি আমরা শ্রীলক্ষণ রায় মহাশয়ের মুখে শ্রবণ করি। তাঁহারা প্রচার কার্য্যের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতে করিতে এক সময় পদ্মার ধারে এক সাহু জমিদারের বাড়ী, তাঁহাকে বৈষ্ণব জানিয়া, অতিথী হইলেন। জমিদারের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, তাহার ভয়ে সকলে কম্পিত হইতেন। বাবুটী ভাগবতভূষণকে প্রণাম করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ভাগবতভূষণ বসিয়া দেখিলেন একখানা খাড়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া জমিদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বৈষ্ণবের বাড়ী খাড়া কেন? তাহাতে জমিদার একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আমাদের গোড়ামী নাই, আমরা বৈষ্ণব বটে, কিন্তু দুর্গোৎসবও করি, বলিদানও করি! আপনি কি জানেন না যে, যে দুর্গা, সেই কৃষ্ণ?"

ভাগবতভূষণ অমনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিতেছেন "বেটা পাষণ্ড অস্পৃশ্য পামর! আবার দেখি রসিকতাও আছে। বের হ আমার এখান হইতে, বের হ বের হ।" অতি ক্রোধের সহিত ইহা বলিতে বলিতে

ভাগবতভূষণের মনে পড়িল যে সে বাড়ী ঐ জমিদারের, আর সে যত অপরাধীই হউক, তাহার নিজ বাড়ী হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিবার অধিকার তাঁহার নাই। তখন ঠাকুর উঠিয়া দলবল লইয়া গ্রামের অন্য স্থানে চলিয়া গেলেন।

জমিদার অন্য লোককে ধমকাইয়া থাকেন নিজে কখন ধমকানী খান নাই, বিশেষতঃ নিজের বাড়ীতে, আবার বিশেষতঃ একজন অতিথি দ্বারা, সুতরাং তিনি একেবারে মরমে মরিয়া গেলেন। একটু পরে গ্রামের মধ্যে ভাগবতভূষণ যেখানে ছিলেন সেখানে যাইয়া জমিদার তাঁহার চরণে পড়িয়া ক্ষমা মাগিলেন। আর অতি দীনভাবে সহিত তাঁহাকে গৃহে আনিবার নিমিত্ত অনুনয় করিতে লাগিলেন। ভাগবতভূষণ বলিলেন, "তাই হবে, তবে তোমার এক কার্য্য করিতে হইবে। কল্য প্রাতে একশত ঢাক আনাইব, আর তুমি সেই পাদুকা খানি মস্তকে করিয়া সেই ঢাকের বাদ্যের সহিত নৃত্য করিতে করিতে পদ্মায় যাইবা, যাইয়া মধ্য নদীতে উহা নিক্ষেপ করিবা। ইহা যদি কর তবে আমি তোমার বাড়ী পুনরায় যাইব।" জমিদার তাহাই স্বীকার করিলেন, আর সেই অবধি তাহারা পরম ভক্ত হইলেন।

* প্রথম প্রচারক নিত্যানন্দ। তাঁহার প্রচার পদ্ধতি অতি সুন্দর। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে প্রচার করিতে লাগিলেন যে 'ভাই তোমাদের জন্য শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে শচীর উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব "ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ ইত্যাদি।" ইহার রহস্য পরে বলিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রভুর লীলা উদ্দেশ্য।

শচী ও মুরারি গুপ্ত।

সন্ন্যাস করিয়া নিমাই, শান্তিপুরে বহে যাই,
মিলিতে জননী ভক্তগণে।
নদেবাসীগণে ধায়, আগে করি শচী মায়,
শান্তিপুরে মিলে গৌরসনে॥
নিশিতে করে কীর্ত্তন, সঙ্গে নাচে ভক্তগণ,
পিড়ায় বসি শচী হেরে দুঃখে।
শচীর দেখিয়া দুঃখ, মুরারীর ফাটে বুক,
কীর্ত্তন ছাড়ি শচী কাছে থাকে॥
শচী বলে শুন গুপ্ত, যাও কর গিয়া নৃত্য,
এ সুখ ছাড়িবে কেন তুমি।
গৃহ ছাড়ি যায় নিমাই, তুমি নৃত্য কর যাই,
তার মাতা কান্দি বসি আমি॥
যুবা পুত্র দণ্ডধারী, কালি যাবে দেশ ছাড়ি,
মোর পুত্রে তোমরা বাস ভাল।
কালি দেশ ছাড়ি যাবে, বৃক্ষতলে পড়ে রবে,
এলো তোদের নাচিবারে কাল॥

নিমাই তোদের প্রাণের প্রাণ, বলে থাকে ভক্তগণ,
চোখে দেখি যত ভালবাসা।
নিমাই যায় গৃহ ছাড়ি, তারা নাচে ধিং ধিং করি,
আমি দেখি বিষ্ণুপ্রিয়া দশা॥
দেখ না চাহি মুরারি, নাচে কত ভঙ্গি করি
কেহবা দিতেছে হুহুঙ্কার।
আনন্দের ত সীমা নাই, সন্ন্যাসী হয়েছে নিমাই,
তোদের চরণে আমার নমস্কার॥
জিজ্ঞাস ওদের কাছে, কি সুখেতে ওরা নাচে,
একে আমি মরি নিজ দুঃখে।
দুই বাহু তুলে নাচে, পায়েতে নূপুর বাজে,
নৃত্য দেখে শেল হানে বুকে॥
ইহা বলি শচী মাতা উচ্চস্বরে কহে কথা,
বলে "তোমরা করিলে দে ভঙ্গ।
নবদ্বীপে নিমাই ছিল না, কোন স্থানে ছেলে নিয়া,
তোদের লাগিয়াছে বড় রঙ্গ॥"
ক্রোধে শচী যেতে চায়, মুরারি ধরিল তায়,
তবে শচী ডাক ধরে ডাকে।
শুন নিতাই অদ্বৈত, শ্রীবাস আর যত ভক্ত,
রাখ কীর্ত্তন দাদি এই দিকে॥
পুনঃ পুনঃ খায় আছাড়, ভাঙ্গিল বাছার হাড়,
কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
বাছারে ছাড়িয়া দাও, তোমরা নাচ আর গাও,
রাত্রি গেল দাও ঘুমাইতে॥"

কারণ, প্রেমধর্ম্ম যাহা পূর্ব্বে জগতে ছিল না, তাহা প্রচার করা। জীবকে যে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা অর্থাৎ রাধার প্রেম কি, তাহা দেখান তাঁহার শেষ কার্য্য, আর সেই নিমিত্ত তিনি গম্ভীরায় প্রবেশ করিয়া আপনি আচরিয়া উহা জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, দিয়া অন্তর্ধান হইলেন। যখন সন্ন্যাস করিতে গৃহের বাহির হইলেন, তখন এইরূপ দেখাইলেন যেন কেবল বৃন্দাবন গমন করিবেন বলিয়াই ঐ আশ্রম গ্রহণ করেন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে ঃ—

নারিব নারিব হেথা রহিবারে আমি।
দেখিবারে যাব আমি বৃন্দাবন ভূমি॥

ভক্তগণকে বলিলেন ঃ—

"যখন সন্ন্যাস লইলাম ছন্ন হইল মন।
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন॥"

তখন স্পষ্টাক্ষরে দেখাইলেন যে তিনি সন্ন্যাস লইয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু বৃন্দাবন দর্শন একটী উপলক্ষ মাত্র, তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার ভিতরে একটী মহৎ কারণ, ছিল। সেটী এই যে, কঠিন জীবের হৃদয় কোমল করা। তিনি কাঙ্গাল না হইলে, জীবে আর হরিনাম লইবে না। এই জন্য কাঙ্গাল হইলেন। কিন্তু এ কথা একবারও মুখে আনেন নাই, মনের কথা মনেই রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ভক্তগণ জানিতে পারিলেন, যথা বৃন্দাবন দাসের পদ ঃ—

শুষ্ক হিয়া জীবের দেখিয়া গৌরহরি।
আচণ্ডালে দিলা নাম বিতরি বিতরি॥
অকুরন্ত নাম প্রেম ক্রমে বাড়ি যায়।
কলসে কলসে ছেঁচে তবু না ফুরায়॥
নামে প্রেমে তরি গেল যত জীব ছিল।
পড়ুয়া নাস্তিক আদি পড়িয়া রহিল॥

শাস্ত্র-মদে মত্ত হৈয়া নাম না লইল।
অবতার সার তারা স্বীকার না কৈল
দেখিয়া দয়াল প্রভু করেন ক্রন্দন।
তাদের তরাইতে তার হইল মনন॥
সেই হেতু গোরা[illegible] সন্‌ন্যাস।
মরমে মরিয়া রোয়ে [illegible] দাস॥

প্রভু কৃষ্ণ বিরহে জর জর, বৃন্দাবন [illegible] যাইবেন ইহা বলিয়া তিনি গৃহ ত্যাগ করিলেন, করিয়া সন্ন্যাস লইলেন। ইহাতে তাঁহার দুটা কার্য্য সুসিদ্ধ হইল। যখন বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া ছুটিলেন তখন দেখাইলেন কৃষ্ণের নিমিত্ত কিরূপ [illegible] হইতে হয়, কি বৃন্দাবনে কিরূপ ব্যাকুল হইয়া যাইতে হয়। আবার সন্ন্যাস লইলেন ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হবে বলিয়া। হৃদয়ের অভ্যন্তরে ইচ্ছা ছিল যে জীবকে কাদাইয়া তাহাদের হৃদয় তরল করিবেন, আর তখন তাহারা হরিনাম লইতে আপত্তি করিবে না। পূর্ব্বে একথা কেহ জানিতে পারে নাই, কিন্তু যাই প্রভু সন্ন্যাস লইলেন, অমনি চতুর্দ্দিকে ক্রন্দনের রব উঠিল আর কঠিন লোকের হৃদয় তরল হইল। তখন সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য সকলে বুঝিল। যথা বৃন্দাবন দাসের আর এক পদ :—

নিন্দুক পাষণ্ডগণ প্রেমে না মজিল।
অযাচিত হরিনাম গ্রহণ না কৈল॥

না ডুবিল শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের বাদলে।
তাদের জীবন যায় দেখিয়া বিফলে॥

তাদের উদ্ধার হেতু প্রভুর সন্ন্যাস।
ছাড়িল যুবতী ভার্য্যা সুখের গৃহবাস॥

বৃদ্ধ জননীর বুকে শোক শেল দিয়া।
পরিলা কৌপিন ডোর শিখা মুড়াইয়া ॥
সর্ব্বজীবে সম দয়া দয়াল ঠাকুর।
বঞ্চিত দাস বৃন্দাবন বৈষ্ণব কুকুর ॥

হায়! হায়! কি দয়া, এরূপ দয়া অননুভবনীয়। ইহার আর এক পদ শুনুন :—

কান্দয়ে নিন্দুক সব করে হায় হায় ;
আবার নদীয়া এলে ধরিব তার পায় ॥
না জানি মহিমা গুণ বলিয়াছি কত।
লাগাইল পাইলে এবার হব অনুগত ॥
দেশে দেশে কত জীব তরাইল শুনি
চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি ॥
না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন।
এইবার পাইলে তার লইব শরণ
গৌরাঙ্গের সঙ্গে যত পারিষদগণ।
তারা সব শুনিয়াছি পতিতপাবন ॥
নিন্দুক পাষণ্ড যত দেখিল প্রকাশ।
কান্দিয়া আকুল ভেল বৃন্দাবন দাস ॥

আবার :— নিন্দুক পাষণ্ডি আর পণ্ডিত দুর্জ্জন।
মদে মত্ত অধ্যাপক পড়ুয়ারগণ ॥
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি কান্দিয়া বিকলে।
হায় হায় আমরা কি করিনু সকলে ॥
লইল হরির নাম জীব শত শত।
কেবল মোদের হিয়া পাষাণের মত ॥

যদি মোরা নাম প্রেম করিতাম গ্রহণ।
না করিত গৌরহরি শিখার মুণ্ডন॥
হায় কেন হেন বুদ্ধি হইল মো সবার।
পতিত পাবনে কেন কৈল অঙ্গীকার॥
এইবার যদি গোরা নবদ্বীপে আসে।
চরণে ধরিব কহে বৃন্দাবন দাসে॥

প্রকৃতই যখন সন্ন্যাস লইয়া, প্রভু রাঢ় দেশে চারিদিন ভ্রমণ করিয়া নিতাই কর্ত্তৃক শান্তিপুর আনিত হইলেন, তখন নদীয়া মনুষ্য শূন্য হইল। মুরারীর পদ যথা—

চলিল নদের লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে।
আগে শচী যায় সবে চলিল পশ্চাতে।
হা গৌরাঙ্গ হা গৌরাঙ্গ সবাকার মুখে।
নয়নে গলয়ে ধারা হিয়া ফাটে দুঃখে॥
গৌরাঙ্গ বিহনে ছিল, জিয়ন্তে মরিয়া।
নিতাই বচনে যেন উঠিল বাঁচিয়া॥
হেরিতে গৌরাঙ্গ মুখ মনে অভিলাষ।
শান্তিপুরে ধায় সব হয়ে উর্দ্ধশ্বাস॥
হইল পুরুষ শূন্য নদীয়া নগরী।
সবাকার পাছে চলে দুঃখিয়া মুরারি॥

অতএব পদকর্ত্তা মুরারি এই সঙ্গে ছিলেন। সন্ন্যাস লইয়া অবধি প্রভু ঘোর অচেতন ছিলেন। পাঁচদিনের দিন শান্তিপুর আইলে তখন তাঁহার সহজ জ্ঞান হইল, তখন যেন জানিতে পারিলেন যে তিনি মনের বেগে সন্ন্যাসী হইয়াছেন, হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন। জননীর মুখ দেখিয়া প্রভুর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, জননী কেন, সকলই যেন মরিয়া

য়াছেন। তিনি বৃদ্ধ মাতা যুবতী ভার্য্যা ও সংসারের সমুদায় সুখ ত্যাগ করিয়া দুঃখের বোঝা ঘাড়ে করিয়া ঘরের বাহির হইয়াছেন। তাঁহাকে ভক্তগণ শান্তনা করিবেন তাহাই উচিত, কিন্তু তাহা হইল না। তিনিই ভক্তগণকে শান্তনা করিতে লাগিলেন। কাহাকে আলিঙ্গনে, কাহাকে চুম্বনে, কাহাকে মধুর বাক্যে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা সংকল্প করিলেন প্রভুকে ছাড়িবেন না। তাহারা না সকলে একদিকে? তাহার মা না তাহাদের সহায়? যখন প্রভু শান্তিপুর ত্যাগ করিবার উদ্‌যোগ করিলেন তখন সমস্ত লোক তাঁহার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া, চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যেমন গোপীগণ মথুরায় যাইবার সময় তাঁহাকে আগুলিয়া কান্দিয়া ছিলেন। কিন্তু প্রভুকে তাঁহার সংকল্প হইতে বিরত করে ইহা মনুষ্যের সাধ্য নয়। প্রভু অবিচলিত চিত্তে চলিলেন।

অদ্বৈত যখন বড় অধীর হইলেন, তখন প্রভু একটু ফাপরে পড়িলেন। কারণ তিনি পুরী ভারতী ও অদ্বৈত এই তিনজনকে পিতার ন্যায় সম্মান করিতেন। শ্রীঅদ্বৈত যখন বড় অধীর হইলেন তখন প্রভু গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিলেন। যথা :—

অদ্বৈত বিলাপে প্রভু হইলা বিকল।
শ্রাবণের ধারা সম চক্ষে ঝরে জল॥
কহেন "অদ্বৈতাচার্য্য এত কেন ভ্রম।
তুমি স্থির করিয়াছ মোর লীলাক্রম॥
নীলাচলে নাহি গেলে পণ্ড হবে লীলা।
বিফল হইবে সব তুমি যা চাহিলা॥
কিরূপেতে হরিনাম হইবে প্রচার।
কিরূপে ভুবনের লোক পাইবে নিস্তার॥

প্রাকৃত লোকের ন্যায় শোক কেন কর
সঙ্গে সদা আছি আমি এ বিশ্বাস কর॥
প্রভু বাক্যে অদ্বৈত পাইলা পরিতোষ।
জয় গৌরাঙ্গের জয় কহে বাসুঘোষ॥

বাসু ঘোষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাহা তাঁহার অন্যান্য পদে জানা যায়। অতএব প্রভু অদ্বৈতকে কি বলিয়া নিরস্ত করিলেন বুঝা যায়। বলিলেন, "তুমি বিষয়ী লোকের মত শোক করিতেছ কেন? জীব কি উদ্ধার হইবে না? তুমি কি এই অবতারটী বিফল করিবে? নীলাচলে না গেলে আমার সব কার্য্য নষ্ট হইবে। তুমিত নিজেই এ খেলা পাতাইয়াছ, আবার তুমিই বাধা দিতেছ! আমাকে ছেড়ে দাও আমি যাই।" পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভু কখন সহজ অবস্থায় স্বীকার করিতেন না যে তিনি অবতার। আবার ইহাও বলিয়াছি যে যখন নিজজনের সঙ্গে থাকিতেন, তখন কখন কখন স্পষ্ট করিয়া আপনার প্রকৃত পরিচয় দিতেন, যেমন উপরে ভক্তগণ সমুখে শ্রীঅদ্বৈতকে বলিলেন, নীলাচলে না গেলে তিনি যে জন্য আসিয়াছেন তাহা সফল হইবে না, আর অদ্বৈত তখন সব স্মরণ করিয়া শান্ত হইলেন। বহিরঙ্গ লোকের নিকট প্রভু বলিয়াছিলেন,

কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন।
যখন সন্ন্যাস লইনু ছন্ন হলো মন॥

আবার নিজজনের নিকট বলিতেছেন যে সন্ন্যাস করার সময় তাহার মতি ছন্ন হয় নাই, তাঁহার সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য আর কিছু নয় কেবল জীব উদ্ধার।

প্রভু শান্তিপুর হইতে বৃন্দাবনে না যাইয়া নীলাচলে গমন করিলেন, কেন? বৃন্দাবনে তাঁহার প্রাণ ছুটিয়াছে বলিয়াছেন, সন্ন্যাস করিয়া "কোথা বৃন্দাবন" "কোথা বৃন্দাবন" বলিয়া চারি দিবস কেবল ছুটাছুটী করিলেন। যমুনায় স্নান করিতেছেন ভাবিয়া সুরধুনীতে ঝম্প দিলেন।

আর সেখান হইতে শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। যখন শান্তিপুর ত্যাগ করিলেন, তখন নীলাচলে চলিলেন, আর মুখে বৃন্দাবনের কথাটী নাই, ইহার মানে কি? কথা এই, প্রভু ভক্ত ভাবে বৃন্দাবন ছুটীলেন। কিন্তু ভক্তকে শিক্ষা দেওয়া ব্যতীত প্রভুর আর একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেটী জীব উদ্ধার করা, তাহা বৃন্দাবনে গমন করিলে হইত না। তাঁহার বাসের একমাত্র উপযুক্ত স্থান নীলাচল, তাই নীলাচলে চলিলেন ও বৃন্দাবন ভুলিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে তখন গমন করিলে কোন কোন কার্য্য সফল হইত না, তাহার কারণ বলিতেছি। প্রথমতঃ বৃন্দাবন তখন মনুষ্য শূন্য, দ্বিতীয় আগ্রা অর্থাৎ মুসলমান সম্রাটের বাড়ীর নিকট। সেখানে নিশ্চিন্ত হইয়া জীবোদ্ধার কি তাহাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা সম্পাদন হইত না। তখন ভারতের একটী প্রধান তীর্থস্থান অর্থাৎ নীলাচল, হিন্দুরাজের অধীনে ছিল। তাহাতেই তিনি নীলাচলে চলিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার লীলার সহায় সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ রায় এই দুইজনকে প্রয়োজন। সার্ব্বভৌম পণ্ডিত-গণের প্রধান। তাঁহার "দর্পচূর্ণ" করিতে হবে, না করিলে পড়ুয়া পণ্ডিতগণের শ্রদ্ধার পাত্র হবেন না, রামানন্দকে কেন প্রয়োজন, তাহা আপনারা অবগত আছেন।

প্রভু বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া নীলাচল ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা ঘুরিয়া একবারে গৌড়ে উপস্থিত। সেখান হইতে রূপ সনাতনকে শক্তি সঞ্চার করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতএব বৃন্দাবন যাওয়া একটী উপলক্ষ মাত্র। প্রকৃত উদ্দেশ্য রূপসনাতনকে কার্য্যে প্রবর্ত্ত করা। এইরূপে যদিচ প্রভু সর্ব্বদা বিহ্বল থাকিতেন তবু উদ্দেশ্য সব ঠিক ছিল।

প্রভু কোন পথে নীলাচল গমন করেন তাহা লইয়া গণ্ডগোল ছিল, কারণ লীলা গ্রন্থে যে পথের কথা উল্লেখিত আছে, তাহা এখন পাওয়া

যায় না। ইহার হেতু এই যে, ভাগিরথী পূর্ব্বে যে পথে সাগরে মিশ্রিত হয়েন সে পথ তিনি পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু বাবু সারদাচরণ মিত্র সেই পথ আবিষ্কার করিয়া গৌর-ভক্তগণের কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন। * যাহারা এই পথের গতি উত্তমরূপে অবগতি হইতে বাসনা করেন তাহারা সারদাবাবুর গ্রন্থ পাঠ করিবেন। কথা কি, প্রভু যখন রামচন্দ্র খাঁয়ের সাহায্যে নীলাচলে গমন করেন, তখন আর কেহ হইলে সে পথে যাইতে পারিতেন না। যেহেতু সে পথ এক প্রকার সমুদ্র দিয়া। আবার উহা সৈন্য কর্ত্তৃক রক্ষিত ও দস্যু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত। রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা প্রভুকে পাঠাইবেন। তিনিই অধিকারী, তাহার ক্ষমতার সীমা ছিল না। তাই প্রভুকে পাঠাইতে পারিয়াছিলেন। প্রভুর যে এই লীলা খেলা পূর্ব্বে পাতান হয়েছিল তাহার এই এক প্রমাণ, তাহার নীলাচলে গমন। তখন যুদ্ধের নিমিত্ত পথ বন্ধ বলিয়া কাহারো যাইবার সাধ্য ছিল না। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছায় স্বয়ং অধিকারী আসিয়া উপস্থিত, যিনি কেবল প্রভুকে পাঠাইতে পারিতেন।

প্রভু মন্দিরের নিকট যাইয়া ভক্তগণকে বলিলেন, হয় তোমরা আগে যাও না হয় আমি যাই। অগ্রে ভক্তগণের মনে মহা ভয় ছিল যে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রভু আদৌ নীলাচলে যাইতে পারিবেন না, আবার মন্দিরের নিকট যাইয়া ভাবিতে লাগিলেন শ্রীজগন্নাথের দর্শন কি প্রকারে হইবে,

---

* গোবিন্দের কড়চা যে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার প্রথম কয়েক পত্র প্রক্ষিপ্ত, কল্পনা দেবীর সৃষ্ট। তাই তাহাতে লেখা আছে যে প্রভু মেদিনীপুর পথে গমন করেন। তাহা যদি হয় তবে আমাদের যতগুলি লীলা গ্রন্থ আছে সমুদয় ফেলিয়া দিতে হয়। গোবিন্দের কড়চা প্রথম কয়েক পত্র যে কল্পিত তাহার রহস্য শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে

যেহেতু তাঁহার দর্শন তখন যাত্রিদিগের পক্ষে বড় কঠিন ছিল। এই পদ দেখুন—

কলহ করিয়া ছলা, আগে প্রভু চলি গেলা,
ভেটিবারে নীলাচল রায়।

কথা কি, ভক্তগণ কথায় কথায় ভুলিতেন যে প্রভু কি বস্তু, তাই তাহারা সর্ব্বদা তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে ব্যস্ত থাকিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ভগবানের সঙ্গ অবিকম্পন করা যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবান, এ কথা সর্ব্বদা মনে থাকিলে ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গে থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু প্রভু কিরূপে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিবেন, ও পড়ুয়াগণের স্কন্ধে চড়িয়া, (স্মরণ থাকে প্রভুর এই নিয়ম ছিল যে যখন কোন নূতন স্থানে উদয় হইবেন তখন হরিনামের সহিত হইতেন) হরিনামের সহিত সার্ব্বভৌমের বাড়ী যাইবেন, উহা সমুদায় পূর্ব্বে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তাই কলহ ছলা করিয়া অগ্রে গমন করিলেন, ভক্তগণ সঙ্গে গেলে তাহা হইত না।

সার্ব্বভৌমকে কৃপা করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কয়েক সপ্তাহ নীলাচলে থাকিতে হইল। যে মাত্র সার্ব্বভৌম তাঁহার ভক্ত হইলেন অমনি দক্ষিণে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার সঙ্গিগণ নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে বলিলেন "তোমরা দেশে যাও, আমি গোবিন্দকে সঙ্গে করিয়া দক্ষিণে যাইব।" নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন যে দক্ষিণে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি। প্রভু বলিলেন দাদা বিশ্বরূপকে অন্বেষণ করা। নিত্যানন্দ স্বয়ং প্রভুর সহিত যাইতে চাহিলেন, কিন্তু প্রভু তাঁহাকে লইলেন না। তিনি বলিলেন, শ্রীপাদ আপনি গৌড়দেশে গমন করিয়া জীবকে হরিনাম বিতরণ করুন, আর আমি দক্ষিণ দেশ ঘুরিয়া আসি। প্রভু বিশ্বরূপের তল্লাসে দক্ষিণে চলিলেন, কিন্তু তিনি জানিতেন যে তাহার বহু পূর্ব্বে বিশ্বরূপ অদর্শন হইয়াছেন। প্রকৃত উদ্দেশ্য দক্ষিণ দেশ উদ্ধার করিবেন, বিশ্বরূপের

অনুসন্ধান একথা উপলক্ষ মাত্র। যদি বিশ্বরূপের অনুসন্ধানই উদ্দেশ্য হইত, তবে নিতাইকে সঙ্গে লইতেন।

প্রভু দক্ষিণে নতন এক মূর্ত্তি ধরিলেন। তিনি জীবের হৃদয় দ্রব করিবেন বলিয়া সন্ন্যাস লইলেন। এত দিন নিজ জনের মধ্যে ছিলেন, কেমন নিজ জন যে তাহারা তাঁহার নিমিত্ত শতবার প্রাণ দিতে পারিতেন। তাহাদের মধ্যে প্রভু কোন কঠোর করিলে তাহারা প্রাণে মরিতেন। এখন একেবারে অপরিচিত লোকের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তাহারা প্রভুর নামও শুনে নাই, সুতরাং তিনি দুঃখ লইলে নিবারণ করে কি সহানুভূতি করে এমন লোক আর তাঁহার সহিত রহিল না। প্রভু নিশ্চিন্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারিবেন বলিয়া শ্রীনিতাই ও অপর কাহাকে সঙ্গে আনিলেন না। লইলেন গোবিন্দকে যে তাঁহার সম্মুখে মাথা তুলিয়া কথা কহিতে পারে না।

এইরূপ সঙ্গ ও সম্বলহীন হইয়া আলালনাথ ত্যাগ করিলেন। অমনি দুই অজানুলম্বিত বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই শ্লোক আপনি পবিত্র হইতে আবার বলি। সেটী এই :—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষমাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহিমাং॥

প্রভু আপনি আচরিয়া ভক্তকে ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন। তাই দেখাইলেন যে যখন বিপদ সম্ভব তখন শ্রীভগবানের আশ্রয় কিরূপে লইতে হয়। তিনি ডাকিতেছেন, কৃষ্ণ রক্ষমাং কি কৃষ্ণ পাহিমাং, সে এরূপ ঐকান্তিক ভাবে যে, যে শুনিতেছে তাহারি

মনে হইতেছে যে কৃষ্ণ যেন তাঁহার সম্মুখে। আরো সে বুঝিতেছে যে এরূপ প্রাণভরা ডাক উপেক্ষা করিতে কৃষ্ণ কখনও পারিবেন না। বস্তুত প্রভু আপনাকে বিপদসাগরে লইয়া চলিলেন। চরদিন তিনি অন্য দ্বারা রক্ষিত, যেহতু তিনি প্রেম ও ভক্তিতে বিহ্বল। দিবানিশি শত লোক তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছে। অদ্য তিনি বিদেশে একা। সে দেশ জানেন না, সেখানকার কাহাকে জানেন না, সে দেশের ভাষা জানেন না। সঙ্গে কপর্দ্দকও নাই। উত্তর পশ্চিম দেশে হিন্দিভাষা অনেকটা সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মত, কিন্তু দক্ষিণ দেশের ভাষা আর একরূপ। গোবিন্দ বলেন "কাইমাই কথা"।

তিনি কোথা যাইতেছেন তাহা কেহ জানে না, এমন কি যেন তিনি আপনিই জানেন না। তবে কোথা যাইতেছেন? যেখানে কৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন। রাত্রি হইল, একটী বৃক্ষতলে বৃক্ষ হেলান দিয়া বসিয়া গেলেন। প্রভাত হইল আর চলিলেন, কি খাইবেন, আর কোথা আহার পাইবেন, তাহার কোন চিন্তা নাই। এদিকে প্রভু ভাবে মুহুর্মুহু ডাকিতেছেন, "কৃষ্ণ পাহিমাং।" কৃষ্ণ করেন কি, কাজেই আহার যোগাইতে হইতেছে, না যোগাইলে আর কে যোগাইবে? না যোগাইলে গীতায় কৃষ্ণ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তার বিফল হয়। সম্মুখে ব্যাঘ্র পড়িল, প্রভু লক্ষও করিলেন না, কেন? তিনি না ভক্ত? ভক্তভাবে কৃষ্ণ রক্ষমাং বলিয়া আপনার রক্ষার দায় কৃষ্ণের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন!

প্রভু পাছে মূর্চ্ছিত হইয়া আছাড় খায়েন ইহার নিমিত্ত নিতাই, অদ্বৈত, নরহরি, স্বরূপ প্রভৃতি শত শত ভক্ত সর্ব্বদা দুই বাহু পসারিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেন। এখন তিনি শত সহস্র আছাড় খাইলে

রক্ষা করে এমন মানুষ নাই। প্রভু কূর্ম্মক্ষেত্রে বাসুদেবকে কুষ্ঠরোগ হইতে উদ্ধার করিয়া ও ভক্তি দিয়া গোদাবরী তীরে রাম রায়ের ওখানে গমন করিলেন, সেখানে অদ্ভুত সাধ্যসাধন নির্ণয় রূপ বিচার উঠাইলেন। এ সমুদায় গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে পাইবেন। পরে সেখান হইতে যখন বিদায় হয়েন রামরায় একেবারে অস্থির হইলেন। প্রভু তাহাকে বলিলেন, তুমি অপেক্ষা কর আমি শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে যাইব। রামরায় গোপনে গোবিন্দের নিকট কিছু বহির্ব্বাস দিলেন। তিনি অতিশয় ধনী, বিস্তর অর্থ দিতে পারিতেন, আর নিশ্চয় দিতেন, যদি সাহস করিতেন। কিন্তু প্রভু বরাবর দখল লইবার বিরোধী। তিনি বলেন কৃষ্ণ পালন করেন, সম্বল কেন লইব? তাই বিনা সম্বলে প্রভু গোবিন্দকে লইয়া দক্ষিণ দেশে চলিলেন।

দক্ষিণে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সমাপ্ত করিতে হইবে বলিয়া প্রভু সে দেশে অসীম শক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একজনকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি এরূপ শক্তি পাইলেন যে তিনি শক্তি সঞ্চার করিতে লাগিলেন। আবার তিনি যাহাদের শক্তি সঞ্চার করিলেন তাহারাও শক্তিসঞ্চার করিবার শক্তি পাইলেন। এইরূপে প্রভু একজনকে আলিঙ্গন করিয়া দেশকে দেশ ভক্তিতে মজাইতে লাগিলেন। এ কথা বিস্তার করিয়া পূর্ব্বে বলিয়াছি।

প্রভুর দক্ষিণ দেশের লীলা এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে অতি সংক্ষেপে বর্ণিত আছে, এখন উহা বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিতেছি। কাজেই ইহাতে মধ্যে মধ্যে এক কথা দুইবার বলিতে হইতেছে, বোধহয় পাঠক সে নিমিত্ত আমাকে ক্ষমা করিবেন। কতক এখানে আর কতক সেখানে পাঠকের এইরূপ আখ্যায়িকা খানিক:পড়িতেরসভঙ্গ হইবার সম্ভবনা। তাই ধারাবাহিক লীলা লিখিতেছি, কাজেই নানাস্থানে পুনরুক্তি দোষ হইতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়।

দক্ষিণে গমন।

কি করিব কোথা যাবো কি কর্ত্তব্য মোর।
না জানিয়া বসে ছিনু চাই মুখ তোর॥
এক বছর গেল পহুঁ আর বছর এলো।
আশাপথ চেয়ে চেয়ে আঁখি আন্ধা হলো॥
নব অনুরাগ-কালে পানু কিছু সুখ।
সে সব স্মরিয়া এবে বিদরয়ে বুক॥
চুরনী নদীর ধারে কৃষ্ণচূড়া তলে।
বান্ধা ঘাটে বসে ছিনু একলা বিকালে॥
এই ত ফাগুনে তোমা সনে পরিচয়।
ভুলিলাম দেহ গেহ তোমার চিন্তায়॥
কি দেখিনু কি শুনিনু নাহি মনে হয়।
সেই হতে প্রাণ কাড়ি নিলে প্রেমময়॥
পানু নব জন্ম, দেখি সব সুখময়।
রসেতে পূরল চির নীরস হৃদয়॥
একা ছিনু ভব মাঝে না ছিল দোসর।
রসে ডগমগ তনু আনন্দে বিভোর॥
হিয়া আশাশূন্য ছিল, ভুবন আন্ধার।
পহিলা জানিনু তুমি আছহ আমার॥

তোমা কথা শুনি শুনি ভাবিয়া ভাবিয়া।
সুখের তরঙ্গে চলি ভাসিয়া ভাসিয়া॥
এবে কোথা গেলে, কেন গেলে প্রাণনাথ।
আমারে না নিয়া গেলে করি তোমা সাথ॥
এখানে থাকিয়া আমি কি কাজ করিব।
হেন শক্তি নাই লীলা আবার লিখিব॥
বলরামের মনে বিন্ধি আছে এই শেল।
তুমি কি পরম বস্তু জীবে না জানিল॥

প্রভু দক্ষিণে এরূপ অনেক কঠিন জীব সমূহ পাইলেন যাহাদের উদ্ধার করিতে নতন নূতন উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। প্রভু পথে যাইতে ত্রিমন্দ নগরে উপস্থিত হইলেন, দেখেন সেখানে শুধু যে অনেক বৌদ্ধ বাস করে তাহা নয়, সেখানকার রাজাও বৌদ্ধ। আমাদের হিন্দুশাস্ত্র মতে বৌদ্ধগণের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিতে নাই, তাহাদের সহিত কথা কহিতে নাই, মুখ দেখিতে নাই ইত্যাদি। কিন্তু প্রভুর সে মত নয় তাহা আপনারা বুঝিতে পারেন। তাঁহার মত এই যে, যে যত অধিক পতিত, সে তত অধিক কৃপাপাত্র। প্রভু চিরদিন তাহাই শিখাইয়া আসিয়াছেন, কর্ত্তব্যেও করিয়া আসিয়াছেন। বৌদ্ধগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আইল, ও তাঁহাকে তাহাতে অনিচ্ছুক না দেখিয়া মহা আনন্দের সহিত বিচার আরম্ভ করিল। একটী পদস্থ হিন্দুকে তাহাদের সহিত বিচারে প্রবর্ত্ত দেখিয়া তাহারা অতিশয় আনন্দিত হইল। শেষে রাজা স্বয়ং সেই বিচারে যোগ দিলেন। বৌদ্ধগণের কর্ত্তা রামগিরি। প্রভু সেই নাস্তিকগণের নিকট ভগবানের কথা বলিতে আরম্ভ করিবা মাত্র আপনি পুলকিত হইলেন, ও তাহা দেখিয়া রামগিরির অঙ্গ আনন্দে পুলকাবৃত হইল। অমনি প্রভু বলিলেন, "হে

ভক্তবর! তোমার সহিত কি তর্ক করিব? তুমি পরম কৃপাপাত্র, কারণ দেখিতেছি হরিকথায় তুমি মুগ্ধ হও।" প্রভু বলিলেন:—

হরি বলি পুলকিত হয় যেই জন।
মাথার ঠাকুর সে এইত কথন॥

ইহা শুনিয়া রামগিরি অতিশয় বিচলিত হইলেন।

শুনিয়া প্রভুর কথা রামগিরি রায়।
অমনি আছাড় খাইয়া পড়িল ধরায়॥

প্রভুর চরণ ধরিয়া রামগিরি বলিলেন:—

সর্ব্বজীবে থাক তুমি দেখিছ সকল।
কৃপা করি রাঙ্গা পায় দেহ মোরে স্থল॥

মনে করুন ইঁহারা মহাপণ্ডিত লোক। পাণ্ডিত্যের আশ্রয় লইলে ইহাদিগকে বিচারে নিরস্ত করা সহজ হইত না, কেবল কচকচি বাধিয়া যাইত। কিন্তু প্রভু সে পথে গমন না করিয়া, ভগবানের মাধুর্য্যরূপ যে মধু তাহার একবিন্দু তাহার বদনে দিলেন, আর অমনি রামগিরি ধরা পড়িলেন। যিনি যত বড় নাস্তিক হউন, সকলের হৃদয়েই ভক্তির বীজ আছে। কোনক্রমে উহা একবার জাগরিত করিতে পারিলে তাঁহাদের নাস্তিকতা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। রামগিরি প্রভুর শ্রীপদে আপনাকে সমর্পণ করিলেন।

পণ্ডিতের শিরোমণি যত বৌদ্ধগণ।
রামগিরি পথে সব করিল গমন॥

গোবিন্দের কড়চায় যে ত্রিনন্দনগরের কথা লেখা আছে, শ্রীচরিতামৃত তাহাকে ত্রিমট বলিতেছেন। বৌদ্ধগণের সহিত প্রভুর বিচার তিনি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন:—

বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমেতে।
প্রভু আগে উদ্‌গ্রাহ করি লাগিল কান্দিতে॥
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি মিলিল প্রভু তাদের উদ্ধারিতে॥

বৌদ্ধগণের উদ্ধার শুনিয়া ঢুণ্ডিরাম তীর্থ বিচার করিতে যাইলেন। সেই স্থানের নিকট ঢুণ্ডিরামের আশ্রম আছে। এই আশ্রমের যিনি গুরু তিনি ঢুণ্ডিরাম খ্যাতি পাইয়া থাকেন। ঢুণ্ডিরাম এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ সম্বন্ধে চরিতামৃত বলেন :—

তার্কিক মীমাংসক মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি পুরাণ অগণন॥
হারি হারি প্রভু মতে করেন প্রবেশ।
এই মত বৈষ্ণব করিল দক্ষিণ দেশ॥

গোবিন্দ ঢুণ্ডিরাম সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"অহংকার সদা মত্ত পণ্ডিতাভিমানি।"

সর্ব্ব-শাস্ত্রে পণ্ডিত, কাহাকে ভয় নাই, জীবনের সুখ বিচার করা ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজয় করা। এই ইহাদের চরিত্র। প্রভুকে অতি উত্তম একটী শিকার পাইয়াছেন ভাবিয়া "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া সম্মুখে বসিলেন, কিন্তু প্রভুর বদনপানে চাহিয়া এরূপ বিচলিত হইলেন যে মুখে বিচার আর আইল না। প্রভুর মুখ আন্ধার, নয়ন করুণায় পূর্ণ, ঢুণ্ডিরাম কান্দিয়া ফেলিলেন, পরে লুটাইয়া পড়িলেন। তখন :—

প্রভু কহে শুন শুন ঢুণ্ডিরাম স্বামী।
তোমার সহিত তর্কে হারিলাম আমি॥
জয়পত্র আমি লিখে দিব সঙ্গোপনে।
হারিল চৈতন্য এরে তোমার সদনে॥

সরস্বতী সম তুমি পণ্ডিত গোসাঞি।
কার সাধ্য তর্কে শাস্ত্রে জেনে তব ঠাঞি॥
ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল বেদান্ত দর্শন।
সর্ব্ব শাস্ত্রে অধিকারী তুমি গো সুজন॥
মুরখ সন্ন্যাসী মুই কিছু নাই জানি।
বার বার হারি মানিলাম আমি॥
আগেকার ঢুণ্ডি চেয়ে তুমি সুপণ্ডিত।
তোমার পাণ্ডিত্য আছে ভুবন বিদিত॥

প্রভু করযোড়ে বলিলেন, আমি মূর্খ সন্ন্যাসী আমি তোমায় পারিব না। আপনি আপনার আশ্রমে গমন করুন আমি আপনাকে জয়-পত্র লিখিয়া দিতেছি, কিন্তু—

যাইতে না চাহে ঢুণ্ডি চারিদিকে চায়।

ঢুণ্ডিরাম গেলেন না, কান্দিতে লাগিলেন, পরে প্রভুর চরণে আশ্রয় লইলেন। ঢুণ্ডিরামের ঢুণ্ডিরামত্ব গেল, তাঁহার আশ্রম গেল ও তাহার নাম হইল "হরিদাস"। ঢুণ্ডিরামের উদ্ধারের পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ যে যে তীর্থ দর্শন করেন তাহা চরিতামৃত এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

প্রভু গৌতমী গঙ্গায় স্নান করিয়া মল্লিকার্জ্জুন তীর্থ দেখিলেন ও মহেশকে প্রণাম করিলেন; সমুদ্রতীর ত্যাগ করিয়া কিছু দূর পশ্চিমে অহোবলের নৃসিংহ ঠাকুরকে দর্শন করিলেন, সেখান হইতে সিদ্ধিবট গেলেন। সেখানে পরম ভক্ত এক বিপ্র দিবানিশি রামনাম জপিতেন, তাহার ঘরে প্রভু ভিক্ষা করিলেন, করিয়া পরে সকলে দর্শনে গমন করিলেন। সেখান হইতে সিদ্ধিবটে ফিরিয়া সেই ব্রাহ্মণ বাড়ী আবার আগমন করিলেন, দেখেন যে সেই ব্রাহ্মণ রামনাম ছাড়িয়া কেবল কৃষ্ণনাম জপিতেছেন। প্রভু ইহাতে হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করি-

লেন, ব্যাপার কি ? রামনাম ত্যাগ করিয়া এখন কৃষ্ণনাম ধরিয়াছ ? তাহাতে ঃ—

বিপ্র কহে এই তোমার দর্শন প্রভাবে।

দক্ষিণে যে সমুদায় অদ্ভুত কাণ্ড করেন তাহা বর্ণনা করিবার অগ্রে, তিনি কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দক্ষিণ দেশ উদ্ধার করেন, তাহার কিছু আভাস দিতে হইতেছে। প্রভু রাধার ঋণ শোধ দিতে, অর্থাৎ জীবকে ভক্তিপথে লইতে আসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার শুধু নদিয়া কি শ্রীক্ষেত্র, কি বৃন্দাবন লইয়া থাকিলে চলিবে না। তাঁহার সমস্ত ভারতবর্ষ উদ্ধার করিতে হইবে। তাই দক্ষিণাভিমুখে দৌড়িলেন, সময় অল্প, অতএব শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। সুতরাং মাঝে মাঝে তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তি অবলম্বন করিতে হইতেছিল। যথা একজনকে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহার দ্বারা বহু জনকে উদ্ধার করা।

ঐশ্বরিক শক্তি ছাড়া অনেক স্থানে প্রভু অন্য উপায় অবলম্বন করিতেন। যথা তর্কে পরাজয় করিয়া। তবে তাহার তর্কে এই গুণ ছিল যে, তাহার প্রতিপক্ষ পরাজিত হইয়া অপমানিত বোধ না করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া অনুগত হইত। কাহাকে আপনার দৈন্যে, কাহাকে আপনার ঔদার্য্যে, কাহাকে আপনার মধুর চরিতে বশীভূত করিতেন, কাহাকে বা দুই একটী প্রেমবাক্য বলিয়া উদ্ধার করিতেন।

কিন্তু তাঁহার সকল অপেক্ষা আর একটী অতি বলবৎ যন্ত্র ছিল, যাহা দ্বারা তিনি জীবকে মোহিত করিতেন, অর্থাৎ তাঁহার "জীবে দয়া" ও "ভগবানে প্রেম" দেখাইয়া।

তাঁহার ঔদার্য্যের কথা কি বলিব। তিনি এক গালে চপটাঘাত খাইয়া অন্য গাল ফিরাইয়া দিতেন না। সে তাঁহার পক্ষে সামান্য কথা। এমত ব্যবহার করিলে তিনি সেই ব্যক্তিকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিতেন।

তিনি পরের দুঃখ দেখিলে কান্দিয়া উঠিতেন। তাঁহার আপনার জয়-পরাজয় বোধ ছিল না। সর্ব্বদাই আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া অন্যকে মান দিতেন। যে যত অপরাধী, তাহাকে তিনি তত কৃপা করিতেন। এই যে সমুদায় বলিলাম ইহা যে অত্যুক্তি নয় তাহা তাঁহার কার্য্য দেখিলে আপনারা স্বীকার করিবেন।

প্রভু দক্ষিণে যে কাণ্ড আরম্ভ করিলেন তাহা স্মরণ করিলে পাষাণ গলিয়া যায়। প্রভু মনুষ্যের দেহ ধারণ করিয়াছেন, সুতরাং সে দেহ স্বভাবের নিয়মের অধীন। উপবাসে ও অনিদ্রায় দেহ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়, অধিক পথশ্রমেও কষ্ট হয়। প্রভুর এ সমুদায় হইতেছে, তাহাতে হইয়াছে কিনা সেই প্রকাণ্ড দেহ অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট হইয়াছে, যেন চলিতে পারেন না, চলিতে অতি কষ্ট হয়। মুখে শশ্রু হইয়াছে, মস্তকে জটা হইয়াছে। সোণার অঙ্গ সর্ব্বদা ধূলায় ধূসরিত। প্রভু সিদ্ধি বটেশ্বর গিয়াছেন, যাইয়া সেখানকার শিবকে প্রণাম করিলেন। সে রাত্রি আর আহার জুটিল না। গোবিন্দ প্রাতে ভিক্ষা করিতে বাহির হইলেন, যাহা পাইলেন লইয়া আসিলেন, পরে প্রভু স্বয়ং রন্ধন করিলেন, সেবা করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। যেন কাহাকে অপেক্ষা করিতেছেন।

পাঠককে বলিয়া রাখি প্রভুর এরূপ অবস্থায় সচরাচর পড়িতে হইত না। কারণ যখন যেখানে যাইতেন সেখানে অমনি লোকের কলরব ও হরিধ্বনি হইত, এবং প্রভুর ভিক্ষার সামগ্রী ও রাশি রাশি বস্ত্র প্রভৃতি দানের সামগ্রী আসিয়া উপস্থিত হইত। কিন্তু এখানে একটা লীলা করিবেন মনে আছে তাই চুপে চুপে আইলেন, সামান্য অবস্থায় রহিলেন। ঠিক যেন একটী সামান্য সন্ন্যাসী।

সেখানে তীর্থরাম আইলেন। তিনি, সওদাগর, অভক্ত, খুব ধনবান। সেই সামান্য নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাহার একটু আমোদ করিবার

ইচ্ছা হইল। একে যৌবনমদে মত্ত, তাহে ধনমদে মত্ত, আবার চরিত্র অতি মন্দ, সুতরাং মন্দ কার্য্যেই আনন্দ। তাঁহার ইচ্ছা হইল যে নবাগত নবীন সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন। আর সেই অভিপ্রায়ে দুইটী বেশ্যা আনিয়া উপস্থিত করিলেন, একজনের নাম সত্যবাই, আর একজনের নাম লক্ষ্মীবাই।

সত্যবাই লক্ষ্মীবাই নামে বেশ্যাদ্বয়।
প্রভুর নিকটে আসি কত কথা কয়॥

তীর্থরাম বেশ্যাদিগের কি কি করিতে হইবে, তাহা তাহাদিগকে শিখাইয়া আনিয়াছেন। আর সেখানে যাহারা ছিলেন তাহাদিগকে বলিতেছেন যে, মজা দেখ, সন্ন্যাসীর যত ভারিভুরি সব এখানে বাহির হইবে। এখন বেশ্যাগণের কাণ্ড শুনুন :—

কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবাই হাসে।
সত্যবাই হাসি মুখে বসে প্রভু পাশে॥

প্রভু চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, কিছুই বলিতেছেন না। তাহাতে সত্য একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। যেন অন্য মনস্ক হইয়া সে অঙ্গের আবরণ ফেলিয়া দিল। ঐরূপ নির্লজ্জ ব্যবহার করিলে প্রভু তখন তাহার দিকে চাহিলেন। সে চাহনীতে সত্যবাই বিচলিত হইল, দেখিল যে প্রভুর চক্ষু দিয়া কারুণ্যরস ও দয়া চোয়াইয়া পড়িতেছে। সেরূপ দৃষ্টি তাহারা আর কখন দেখে নাই, সে অতি পবিত্র। দেখিয়া বুঝিল যে ইঁহার বিকার নাই, যেন ইনি মনুষ্য নহেন—দেবতা। প্রভু তাহার দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন "কি মা, তুমি কি চাও?" প্রভুর সেই দৃষ্টির পর যখন তিনি সত্যবাইকে "মা" বলিয়া ডাকিলেন, তখন বেশ্যার হৃদয় হইতে রঙ্গরস দূরে পলাইল। সে কাঁপিতে

লাগিল। লক্ষ্মীও বড় ভয় পাইল, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বুঝা গেল। তাহারা উভয়ে প্রভুর মুখ দেখিয়া বেশ বুঝিয়াছে যে:—

কিছুই বিকার নাই প্রভুর মনেতে।

আর কি কি দেখিল তাহা তাহারা জানে। তখন সত্যবাই, যে লক্ষ্মী অপেক্ষা অধিক অপরাধী, সে কি করিল শ্রবণ করুন:—

সত্যবাই একেবারে চরণে পড়িল।

তখন প্রভু যেন তটস্থ হইয়া, "আমি তোমার পুত্র, তুমি আমার মা, অতএব আমার চরণে পড়িয়া,

"কেন অপরাধী কর আমারে জননী!"

প্রভু আর বলিতে পারিলেন না, উপরের কথাগুলি বলিয়াই "পড়িলা ধরণী"

খসিল জটার ভার ধুলায় ধুসর।
অনুরাগে থর থর কাঁপে কলেবর॥
সব এলো থেলো হলো প্রভুর আমার।
কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখে আর॥
নাচিতে লাগিল প্রভু বলি হরি হরি।
রোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দরদরি॥
হরিনামে মত্ত হয়ে নাচে গোরা রায়।
অঙ্গ হতে অদভুত গন্ধ বাহিরায়॥

তীর্থরাম সব দেখিতেছেন। প্রথমে সত্যকে যখন প্রভু মা বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন প্রভুর মুখ দেখিয়া মদমত্ত যুবকের প্রাণ ভয়ে উড়িয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসীকে লোকে সচরাচর ভয় করে, সেকালে আরো করিত। তীর্থরামের তখন বেশ বোধ হইয়াছে যে সন্ন্যাসীত ভণ্ড নয়, বরং বড় ক্ষমতাশালী, তাই ভয় পাইয়া সহজ যে উপায়, তাহা অবলম্বন করিলেন,

অর্থাৎ কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভুর চরণতলে পড়িয়া আশ্রয় লইলেন। প্রভু কি করিলেন? প্রভু একেবারে অচেতন। তীর্থ যে চরণে পড়িলেন তাহা তাহার গোচর হইল না, তাই ধনবান যুবক প্রভুর চরণে দলিত হইতে লাগিলেন। যদিও প্রভু তীর্থরামকে লক্ষ্য করিলেন না, কিন্তু সত্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি রহিয়াছে। সেই অচেতন অবস্থায় প্রভু সত্যকে উঠাইলেন।

সত্যেরে বাহুতে ছাঁদি বলে হরি হরি।

তাহাকে বাহুতে ছাঁদিয়া বলিতেছেন "কৃষ্ণ বল, মুকুন্দ মুরারিকে ডাকো।"

হরিনাম মন্ত্র প্রভু নাই বাহজ্ঞান।
ঘাড়ি ভাঙ্গি পড়িতেছেন আকুল পরাণ॥
গিয়াছে কৌপিন খসি কোথা বহির্ব্বাস।
উলঙ্গ হইয়া নাচে ঘন ঘন শ্বাস॥
মুখে লালা অঙ্গে ধূলা নাইক বসন।
কণ্টকিত কলেবর মুদিত নয়ন।
আছাড়িয়া পড়ে, নাই মানে কাঁটা খোচা।
ছিড়ে গেল কণ্ঠ হতে মালিকার গোচা॥
পিচকারি সম অশ্রু বহিতে লাগিল।

তখন ষড়যন্ত্রকারী তিনজনে, অর্থাৎ তীর্থ ও বেশ্যাদ্বয় মৃতপ্রায় হইয়াছে। তীর্থরামের অবস্থা দেখিয়া তখন অতি কঠিন যে তাহারও দয়া হইবার কথা। যাহারা সেখানে ছিলেন তাহারা তীর্থরামের কার্য্যকে ঘৃণা করিয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ ছিলেন, সেইজন্যে যখন অচেতন প্রভুর পদাঘাতে তাহার দেহ চূর্ণ হইতে লাগিল, তখন তাহারা ভাবিতে লাগিল বেশ হইয়াছে। কিন্তু সে ভাব আর তাহাদের রহিল না। তীর্থরামের

কাতরোক্তি শুনিয়া ও তাহার ভাব দেখিয়া তাহার প্রতি তাহাদের দয়া হইল। তাহার বিশেষ কারণ এই যে, তীর্থরাম অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রভুর ভাব শুন। প্রভু একটু পরে চৈতন্য পাইলেন, চৈতন্য পাইবা মাত্র তীর্থরামকে অতি প্রেমে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন! পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভু এক গালে মার খাইলে আর এক গাল ফিরাইয়া দেওয়া অপেক্ষা অধিক করিতেন, তাহার নিদর্শন উপরে দেখুন। তীর্থ-রামকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলে, তিনি ভয় পাইয়া বলিলেন, "প্রভু করেন কি, আমি অপবিত্র অস্পৃশ্য, আমাকে স্পর্শ করিলেন!" প্রভু উত্তরে বলিলেন :—

"পবিত্র হইনু আমি পরশি তোমারে।"

তীর্থরামের ঐশ্বর্য্যে সর্ব্বনাশ ঘটিতেছিল। কারণ স্বভাবতঃ তিনি ভক্তিমান ব্যক্তি, অন্তর্যামী প্রভু তাই তাহাকে কৃপা করিবেন বলিয়া মনে মনে সাব্যস্ত করিয়া রাখেন। কৃপা করিবেন বলিয়া এত ভঙ্গী উঠাইলেন। পরে প্রভু তীর্থরামকে কিছু উপদেশ দিলেন। তীর্থ-রামের একেবারে বিষয়ে বিরক্তি হইল। সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন, তীর্থরাম এতদিনে আটকা পড়িলেন।

তীর্থরাম তখনি বিষয় ছাড়িলেন। তিনি উদাসীনের পথ অবলম্বন করিতেছেন এই কথা শুনিয়া তাহার অতি সুন্দরী ভার্য্যা কমলকুমারী ছুটিয়া আইলেন, আসিয়া পতির চরণে পড়িয়া বলিতেছেন, "বাড়ী চল, আমাকে ত্যাগ করিও না।"

কমলে বলিলা তীর্থ কর ধরি করে।
বিষয় সম্পত্তি সব দিলাম তোমারে॥

নরক হইতে ত্রাণ পাইয়াছি আমি।
বিষয় বৈভব সব ভোগ কর তুমি॥

তীর্থরাম আর মুগ্ধ হইলেন না। তীর্থ সেই হইতে পথের ভিখারী হইলেন। তাহার পরে আঁহারীয় দ্রব্যের সহিত :—

কত লোকে কত বস্ত্র আনি জুটাইল।
কিন্তু এক খণ্ড প্রভু হাতে না ছুইল॥

সেখান হইতে প্রভু নন্দীশ্বর চলিলেন। যাইতে মধ্যে বিশাল জঙ্গল, সে বন দশ ক্রোশ ব্যাপিয়া। বনে প্রবেশ করিয়াই গোবিন্দের বড় ভয় হইল। অন্তর্যামী প্রভু তাহা জানিলেন, তখন ঈষৎ হাসিয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন, গোবিন্দ পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুড়ি পথ দিয়া চলিলেন। জঙ্গল পার হইয়া সম্মুখে মুন্নী নগর পাইলেন, নগরে প্রবেশ না করিয়া উহার নিকটে একটী বৃক্ষতলে যেন বিশ্রামের নিমিত্ত বসিলেন। তাঁহারা দুজনে চুপ করিয়া বসিয়া যেন বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। দুটী নগরবাসী আইলেন, তাহারা প্রভুকে দেখিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন সন্ধ্যা হইতেছে। কিরূপে কে জানে ইহার মধ্যে নগরে ধ্বনি হইয়াছে যে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তাঁহার অঙ্গের তেজ আগুনের ন্যায়। শেষে নগরবাসী পালে পালে আসিতে লাগিল, যে আইল সেই ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, আর প্রভুকে ছাড়িয়া গেল না।

প্রভু কিন্তু একেবারে নীরব। এত লোক যে একত্র হইয়া সম্মুখে দাড়াইয়া আছে, তাহা তিনি একেবারে লক্ষ্য করিলেন না। সকলে তখন বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল, স্বামী নগরে চলুন। কিন্তু :—

প্রেমে মত্ত মোর প্রভু শুনে নাহি কথা।

এই যে সে স্থান লোকারণ্য হইল, প্রভু কি কোন চর পাঠাইয়া

তাহাঁদিগকে ডাকাইয়া ছিলেন? ডাকাইলেই বা তাহারা আসিবে কেন? লোক আইল কেন, না প্রভুর অনিবার্য্য আকর্ষণে। ক্রমে যখন কলরব অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, তখন প্রভু আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না :—

অমনি উঠিয়া প্রভু নাচিতে লাগিল।

তখন সেই সমুদায় লোক সেই সঙ্গে করতালি দিয়া যোগ দিল। সেই বৃক্ষতলা যেন শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইল। এইরূপে সমস্ত রজনী গেল। এই সমস্ত লোকে সমস্ত নিশি আনন্দে প্রভুর সঙ্গে নৃত্য করিয়া কাটাইল। প্রভাত দেখিয়া প্রভু গোবিন্দকে ইঙ্গিত করিয়া চলিলেন, আর গোবিন্দ মাথায় দুখানি খড়ম বান্ধিলেন, আর দুটা খড়ি স্কন্ধে ঝুলাইলেন, করোয়া হস্তে লইলেন এবং প্রভুর সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। সেই সকল লোক তখন প্রভুকে থাকিতে মহা জিদ করিতে লাগিল, কিন্তু :—

প্রভু মোর কোন উপরোধ না শুনিল।

যেই সময় একজন ভিখারী রমণী প্রভুর নিকট কান্দিয়া ভিক্ষা মাগিল। ভক্তি ভিক্ষা নয়, অন্ন বস্ত্রের ভিক্ষা, যাহা প্রভুর দিবার শক্তি নাই। দরিদ্র রমণীর অবস্থা মন্দ। পরিধান জীর্ণবাস, আর অনাহারে দেহ শীর্ণ, কিন্তু দারিদ্র্যের নিমিত্ত এরূপ জ্ঞানশূন্য স্বার্থপর নীচ হই-য়াছে যে, যদিও দেখিতেছে যে প্রভু একজন কাঙ্গাল সন্ন্যাসী, তাঁহার দিবার কিছু নাই, তবু হাত পাতিতে ছাড়িল না। আমরা হইলে তাহাকে দূর দূর করিতাম, কিন্তু প্রভু আমার তাহা করিলেন না। তাঁহার দয়া হইল, কিন্তু আপনার ত কপর্দ্দক মাত্র নাই, দিবেন কি। তাই প্রভু ঈষৎ হাসিয়া মুন্ত্যারবাসিগণের নিকট ভিক্ষা মাগিলেন, ইহাতে :—

মুন্ত্যাবাসী নরনারী আনন্দে ভাসিয়া।
রাশি রাশি অন্ন বস্ত্র দিলেক আনিয়া॥

সবে বলে পথের সম্বল তরে চায়।
সে কারণে রাশি রাশি আনিয়া যোগায়॥
সকলে ব্যাকুল বস্ত্র প্রভু হস্তে দিতে।
গণ্ডগোল দেখি প্রভু লাগিল হাসিতে॥

সকলে প্রভুকে তাহার দ্রব্য লইতে আগ্রহ করিতেছে, কেহ কেহ বলিতেছে, "আমার এই বস্ত্রের অনেক মূল্য ইহা আগে গ্রহণ কর।" প্রভু বলিলেন, "আমি তোমাদের ভিক্ষা গ্রহণ করিলাম, কিন্তু আমি সন্ন্যাসী আমার ত কাপড় পরিতে নাই, আর একমুষ্টি অন্ন পাইলে আমার যথেষ্ট। তোমরা যাহা দিলে এত অন্ন আমি লইয়া যাইব কিরূপে? এক কাজ কর, আমি ভিক্ষা লইলাম, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি ভগবান তোমাদের ভাল করিবেন, তোমরা এই সমুদায় অন্ন বস্ত্র এই দুঃখিনীকে দাও।" তাহারা তাহাই করিল, আর আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। তখন প্রভু দ্রুত চলিলেন, বহুতর লোক সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ফিরাইবার নিমিত্ত চলিল, কিন্তু প্রভু কাহার কথা শুনিলেন না। পর দিন দুই প্রহরে বেঙ্কটনগরে পৌছিলেন।

পূর্ব্ব দিন উপবাসে গিয়াছে, রজনীতে আহার নিদ্রা কিছুই হয় নাই, পর দিবস দুই প্রহর পর্য্যন্ত হাটিলেন, কাজেই প্রভুর প্রকাণ্ড দেহ এইরূপে কঠোর জীবনযাপনে দুর্ব্বল হইতেছে। বেঙ্কট নগরে প্রভু তিন দিবস থাকিলেন। সেই নগরে অতি বড় একজন বেদান্ত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া প্রভুকে আক্রমণ করিলেন। প্রভু বলিলেন, আমি হারিলাম, তুমি খুব বড় পণ্ডিত। কিন্তু পণ্ডিত ছাড়েন না। তখন প্রভু তাহার সহিত ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন, তাহার তত্ত্বগুলি যে সারহীন ইহা সেই ব্যঙ্গতে বুঝা যাইতে লাগিল। প্রভু রহস্য করিতেছেন, আবার হাস্যও করিতেছেন। যদিও প্রভু ব্যঙ্গ

ছলে কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু পণ্ডিত তাহাতেই নিরুত্তর হইতে লাগিলেন। শেষে এই পণ্ডিত,—ইনি সন্ন্যাসী, নাম রামানন্দ স্বামী,—প্রভুকে আত্মসমর্পণ করিয়া দীক্ষিত হইলেন। তিনি ও তাঁহার সকল শিষ্য হরিনাম লইলেন, কাজেই—

মাতিল নগর পল্লি বালক বালিকা।
কত লোক আসে যায় কে করে তালিকা॥

শ্রীচরিতামৃত সংক্ষেপে বলিতেছেন :—

মহাপ্রভু চলি আইল ত্রিপদী ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ বিষ্ণু দেখি বেংকটায়ে চলে॥
ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরাম দর্শন।
রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম স্তবন॥
স্বপ্রভাবে লোক সবে করিয়া বিনয়।
পানা নৃসিংহে আইল প্রভু দয়াময়॥

পানা নৃসিংহে আসিবার পূর্ব্বে প্রভু কতকগুলি অতি মধুর লীলা করেন তাহা এখন বলিব। বৌদ্ধগণের উদ্ধার সম্বন্ধে একটী কাহিনী আছে, সেটী আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কাহিনী এই যে বৌদ্ধগণ বিচারে পরাস্ত হইলে, তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভুকে পতিত করিবার ও কষ্ট দিবার নিমিত্ত একটী ষড়যন্ত্র করিল। তাহারা এক খানি অপবিত্র অন্নপূর্ণ থালি আনিয়া প্রভুকে বলিল, ইহা বিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণ করুন। প্রসাদ লইতে প্রভু হাত পাতিলেন, কিন্তু সেই সময় একটী পক্ষী আসিয়া ঠোটে করিয়া ঐ থালি লইয়া উড়িল, পরে উহা এরূপ ভাবে ত্যাগ করিল যে, উহা তেরছ হইয়া বৌদ্ধগণের যে আচার্য্য তাহার মাথায় পড়িল, তাহাতে তাহার মাথা কাটিয়া গেল ও আচার্য্য মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তখন বৌদ্ধগণ প্রভুর শরণ লইল।

প্রভু বলিলেন তোমরা কীর্ত্তন কর, তবে উনি বাঁচিবেন। এইরূপে সকলে বৈষ্ণব হইল।

আমরা এ কাহিনী বিশ্বাস করি না। গোবিন্দ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও এ লীলা উল্লেখ করেন নাই, বিশেষতঃ প্রভুর লীলায় এরূপ অলৌকিক ঘটনা পাইবেন না। শুনিলেই বুঝা যায় এরূপ দৈব-বলের সহায়তা গ্রহণ করা প্রভুর লীলার অনুমোদিত নয়। বিশেষতঃ এ অবতারে দণ্ড নাই, দৈব বল প্রয়োগ নাই, ভয় প্রদর্শন নাই। গোবিন্দের কড়চায় দেখিতে পাই যে বৌদ্ধগণ প্রভুর সহিত বিচার প্রার্থনা করে, প্রভু কোন কথা না বলিয়া কেবল "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া তাহাকে ডাকিতে লাগিলেন, পরে ভাবে উন্মত্ত হইলেন। বৌদ্ধগণ সেই তরঙ্গে পড়িয়া গেল এবং প্রভুর চরণে আশ্রয় লইল। তাহাদের সেই মুহূর্ত্তের বৈষ্ণবতা দেখিয়া প্রভু পুলকিত হইলেন ও তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। "পক্ষী চঞ্চুচ্যুৎ ভাণ্ডে মস্তক ভঙ্গ হওয়ায় বৌদ্ধগণ বশীভূত হইলেন," ইহা অপেক্ষা প্রভু তাহাদিগের হৃদয় বিগলিত করিয়া ভক্তিদান করিলেন, এরূপ প্রথা প্রভুর যে অনুমোদনীয় তাহা সকলে স্বীকার করিবেন। প্রভু তিন দিবস বেংকট নগরে ছিলেন থাকিয়া নগরবাসিগণকে হরি নামে উন্মত্ত করিলেন।

সেই সময় শুনিলেন যে নিকটে বগুলার বন আছে, সেখানে দস্যু নাম ভীল বাস করে। সে পথিক পাইলে তাহাকে সর্ব্বশান্ত এবং কখন কখন বধ করে। প্রভু শুনিবা মাত্র সেখানে চলিলেন। তখন নগরের প্রধান লোক সকল প্রভুকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। তাহারা বলিলেন যে সে পাপাচারী ভীল অজ্ঞান, আপনার মহিমা কিছু বুঝিবে না, আপনার অনিষ্ট করিলে পারে। আপনার সেখানে যাওয়া বিবেচনাসিদ্ধ নয়। প্রভু কাহারো নিষেধ শুনিলেন না, সেই বন পানে

চলিলেন। গোবিন্দ করেন কি, ভয়ে ভয়ে, তাহার যে সম্পত্তি বহির্ব্বাস কৌপীন করোয়া ও খড়ম, ইহা লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রভু সেখানে তিন রাত্রি বাস করিলেন। ভীলপতির সঙ্গে মিষ্টালাপ আরম্ভ করিলেন। বলিতেছেন, তুমিই প্রকৃত সাধু। সাধুগণ বনে থাকেন তুমিও বনে থাক। সাধুগণের সংসারে পুত্র কন্যা নাই তোমারও তাহা নাই, অতএব তুমিই সাধু, তোমার দর্শনে পাপক্ষয় হয়।

ভীল প্রভুর কথা শুনিল, প্রভুর কথার ভঙ্গি বুঝিল ও ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিল। প্রভু তখন কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পন্থ ভীলের ভক্তি উথলিয়া উঠিল, সেও সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিল, শেষে সমুদায় দস্যুগণ সেই নৃত্যে যোগ দিল।

সেই দিন হইতে পন্থ পরিল কৌপীন।
হইল সাধুর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেতে প্রবীণ॥
* * * *
লইতে হরির নাম অশ্রু পড়ে আসি॥
হরি নামে মত্ত হয়ে যত দস্যুগণ।
সেই বন করিলেক আনন্দ কানন॥

দস্যু দমনের এই এক নূতন পদ্ধতি। ফল কথা প্রভু চিরদিন এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই জীবকে সুপথে লইয়া গিয়াছেন। "পক্ষী থালি লইয়া বৌদ্ধা-চার্য্যের মাথা ভাঙ্গিয়া দিল।" এরূপ ভাবে দুষ্ট দমন তাঁহার অনুমোদিত নয়। যখন মাধাই নিত্যানন্দকে প্রহার করে, তখন পাছে প্রভু ক্রোধ করিয়া মাধা-ইকে শারীরিক দণ্ড করেন, সেই ভয়ে নিতাই বলিয়াছিলেন, "প্রভু, যে অপ-রাধ করে তাহাকে যদি দণ্ড দিবা তবে কৃপা কাহারে করিবে? প্রভু, আমি তোমায় স্মরণ করাইয়া দিই যে এ অবতারে তোমার দণ্ড করিবার অধিকার নাই তুমি না বারবার বলিয়াছ যে এ অবতারে দণ্ড দিবা না কেবল কৃপা করিবা।"

গোবিন্দ দাস, (যাহাকে নিঠুর অর্থ পিপাসী লোকে কামার, হাতা বেড়ী গড়ে বলিয়া পরিচয় দিয়াছে), তাহার কড়চায় কোথায়ও বড় একটু বিস্তারে বর্ণনা নাই, কেবল প্রধান ঘটনাগুলি বলিয়া গিয়াছেন মাত্র। কিন্তু প্রভু কি ভাবে দক্ষিণে ভ্রমণ করেন তাহার সেই বর্ণনাটী, যাহা তাহার চাক্ষুষ দেখা ও অতি উপাদেয় বলিয়া, এখানে উদ্ধৃত করিলাম। যথা—

পন্থভীলে এইরূপে পবিত্র করিয়া।
চলে মোর ধর্ম্মবীর আনন্দে ভাসিয়া ॥
অনাহারে শীর্ণ দেহ চলিতে না পারে।
তবু প্রভু হরি নাম দেন ঘরে ঘরে ॥
সে দেশের লোক সব করে কাইনাই।
তথাপি বিলান নাম চৈতন্য গোঁসাই ॥
কোন অভিলাস নাই আমার প্রভুর।
যখন যেখানে যান সামগ্রী প্রচুর ॥
যেই জন প্রভুরে দেখয়ে একবার।
ছাড়িয়া যাবার শক্তি না হয় তাহার ॥
এমনি প্রভুর শক্তি কি কহিব আর।
ভক্তি সাগরের বাঁধ কাটিল আবার ॥
উথলিয়া ভক্তিসিন্ধু ডুবাইল দেশ।
কেহ বা সন্ন্যাসী কেহ হইল দরবেশ ॥
বিরক্ত বৈষ্ণব কেহ কৈলা সেইখানে।
আউল বাউল হয়ে নাচিছে প্রাঙ্গনে ॥
এইভাবে নামে মত্ত হয়ে প্রভু মোর।
গড়াগড়ি দেন প্রভু হইয়া বিভোর ॥

জড় সম কখন না থাকে বাহ্যজ্ঞান।
পুলকিত কলেবর কদম্ব সমান॥
আধ নীমিলিত চক্ষু যেন মৃতদেহ।
এমন আশ্চর্য্য ভাব না দেখেছ কেহ॥
কাঁটা খোচা নাহি মানে পড়ে আছাড়িয়া।
কি ভাবে কখন মত্ত না পাই ভাবিয়া॥
ত্রিরাত্রি চলিয়া গেল গাছের তলায়।
অনাহারে উপবাসে কিছু নাহি খায়॥
বহিছে হৃদয়ে দর্‌দর্‌ অশ্রুধারা।
শত ডাকে কথা নাই পাগলের পারা॥
প্রভু গড়াগড়ি দেন উলঙ্গ হইয়া।
চতুর্থ দিবসে এক রমণী আসিয়া।
অতিথ্য করিলা তবে আটা চূর্ণ দিয়া॥

এ সমুদায় কেন? জীবকে হরিনাম দিয়া পবিত্র করিতেছেন। যাঁহারা এরূপ উপকৃত হইতেছে তাহারা জানিতেছে না যে তিনি কে? তৎপর সেখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে গিরীশ্বর মন্দিরে গমন করিলেন। কথিত আছে যে, উহা স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করেন, আর শিবের বিগ্রহ স্বয়ং ব্রহ্মা স্থাপন করেন।

বড় এক-বিল্ব বৃক্ষ আছে সেইখানে।
পোয়া পথ জুড়িয়াছে শাখার বিথানে॥

গোবিন্দ শুনিলেন যে এ বৃক্ষ কখন ফল ধরে না। এই মন্দিরের তিন ভিত পর্ব্বত কর্ত্তৃক বেষ্টিত। এখানে একটী সন্ন্যাসীর সহিত প্রভুর মিলন হয়, যাহা শুনিলে বুঝা যায় যে শাস্ত্রে যে যোগীগণের কথা বর্ণিত আছে তাহা কল্পিত নয়। সামান্য সন্ন্যাসী ও ভণ্ড সন্ন্যাসী দেখিয়া দেখিয়া

এখন লোকে আর যোগ শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতে চাহে না। প্রভু এই মন্দিরে দুই দিবস কাটাইলেন, কিরূপে না "প্রেমেতে বিভোর হয়ে—

আছাড়িয়া বিছাড়িয়া পড়েন ধরায় ॥
কভু হাসি কভু কান্না পাগলের মত।
দরদরে অশ্রু পড়ে ধারা অবিরত ॥"

দুই দিবস এইরূপ ঘোর অচেতন অবস্থায় প্রভুর কাটিয়া গেল, মোটে চেতন হইল না। তিন দিনের দিন একটী জটাধারী সন্ন্যাসী পাহাড় হইতে নামিলেন। তিনি একেবারে উলঙ্গ। তিনি আসিয়া আপন মনে শিবকে পূজা করিয়া, কারু সহিত কোন কথা না বলিয়া, যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথ দিয়া আবার পর্ব্বতোপরি গমন করিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া গোবিন্দ একটু আকৃষ্ট হইলেন, কারণ তিনি এরূপ সন্ন্যাসী কখন দেখেন নাই। দেহটী যেন একখানি "পোড়াকাঠ"। প্রভু যেই চেতন পাইলেন গোবিন্দ অমনি সাহস করিয়া প্রভুকে সেই সন্ন্যাসীর কথা বলিলেন। শুনিবা মাত্র প্রভু সেই পর্ব্বতোপরি চলিলেন। প্রভু সচরাচর এক দিনের অধিক কোন স্থানে থাকেন না, এখানে নির্জ্জন স্থানে যে তিন দিন ছিলেন বোধ হয় সন্ন্যাসীর সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিবেন এই কারণ। প্রভু চলিলেন ও অবশ্য গোবিন্দও চলিলেন। ক্রমে পর্ব্বতোপরে যাইয়া দেখেন যে সন্ন্যাসী উলঙ্গ, বৃক্ষতলে বসিয়া, একেবারে ধ্যানে মগ্ন, বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই।

প্রভু প্রথমে সন্ন্যাসীকে বিনয় করিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না। তখন প্রভু দাঁড়াইয়া যোড় হস্তে তাঁহাকে স্তব আরম্ভ করিলেন, ইহাতে সন্ন্যাসী চক্ষু উন্মিলন করিলেন, করিয়া প্রভুর পানে চাহিলেন। চাহিয়া যেন অতি আনন্দের সহিত হাসিয়া উঠিলেন। এই পোড়া কাঠের মুখে হাসি ইহাও এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। কেন হাসিলেন তাহা কে বলিতে পারে? প্রভু তখন তাঁহার কাছে বসিলেন। সন্ন্যাসী

কথা কহিলেন, বলিলেন এখানে অপেক্ষা করিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন। ইহা বলিয়া ছয়টা পরটা ফল দিলেন, দুইটা প্রভুকে চারিটা গোবিন্দকে। ফল পাইয়া গোবিন্দের আর দেরি সহে না, কিন্তু প্রসাদ না করিলে খাইতে পারেন না, তাই প্রভুর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতে লাগিলেন। প্রভু বুঝিয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন, তখন গোবিন্দ চারিটা ফল ভক্ষণ করিলেন।

এ পরটা ফলটা কি? গোবিন্দ বলেন যে উহা মধুসম বড় মিষ্ট গোবিন্দ চারিটা ফল খাইয়া লোভে একবারে জ্ঞানশূন্য হইলেন, এমন কি ইচ্ছা হইল যে প্রভুর হস্তে যে দুটা ফল রহিয়াছে তাহাও ভক্ষণ করেন। অন্তর্যামি প্রভু জানিয়া গোবিন্দের হস্তে আপনার দুটা ফল দিলেন। গোবিন্দ সেই ফল হাতে করিয়াই হনুমানের দুর্দ্দশার কথা তাহার মনে পড়িল। আপনারা জানেন হনুমান লোভে অভিভূত হওয়া অপরাধে দুঃখ পাইয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার গলায় আঁটি বাধিয়া গিয়াছিল। তাই মনে করিয়া ফল খাইতে গোবিন্দ ইতঃস্তত করিতে লাগিলেন। অমনি অন্তর্যামি প্রভু মৃদু হাসিয়া বলিতেছেন "গোবিন্দ! তুমি সচ্ছন্দে খাও, তোমার গলায় আঁটি বাধিবে না।" তখন গোবিন্দ লজ্জা পাইয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন, পরে সে দুটা ফলও খাইলেন। সন্ন্যাসী তখন প্রভুকে আর দুটা ফল আনিয়া দিলেন। প্রভু কৃষ্ণ কথা আরম্ভ করিলেন, করিবা মাত্র ভাবে বিভোর হইলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইল।

প্রেম ভরে খুলে গেল জটার বন্ধন।
চরণে চরণ বান্ধি পড়িল তখন॥

কি দুঃখের বিষয় গোবিন্দ তখন ধরিতে পারিলেন না, প্রভু সেই পাথরের উপর পড়িয়া গেলেন—

কপাল ফাটিয়া গেল পাথরের ঘায়।
রুধিরের ধারা কত পড়িল ধরায়॥

মুখে লালা বহে কত জল নাসিকায়।
জড়ের সমান পড়ি রহে গোরা রায়॥

সন্ন্যাসী তখন এক নূতন জগৎ দেখিলেন। প্রভু আত্মারাম শ্লোক লইয়া কত কাণ্ড করেন তাহা আপনারা জানেন। এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য এই যে, যে সমুদায় আত্মারামগণ সমস্ত গ্রন্থি ছেদন করিয়াছেন তাহারাও তুলসীর গন্ধে আকৃষ্ট হয়েন, অর্থাৎ ভক্তিতে লোভ করেন। এই তত্ত্বটী পূর্ব্বে শ্লোকে আবরিত ছিল, এখন প্রভু তাহার সারত্ব দেখাইতেছেন। এই সন্ন্যাসীটী আত্মারাম ও নির্গ্রন্থি, বটে। এখন তুলসীর গন্ধ পাইয়া কি করিলেন শ্রবণ করুন ঃ—

প্রভুর চরণে পড়ি কান্দিতে লাগিল॥
পোড়া কাষ্ঠ সম দেহ অঙ্গে নাই বাস।
খুলিল জটার ভার বহিল নিশ্বাস॥
শ্মশ্রু বহি অশ্রু ধারা বহিতে লাগিল।
প্রেমে সেই পোড়া কাষ্ঠ ফুলিয়া উঠিল॥"

জ্ঞান হইতে আনন্দ হয়, প্রেম হইতেও আনন্দ হয়। যাহারা মনের সমুদায় কমনীয় ভাব নষ্ট করিয়া শুধু যোগ দ্বারা আত্মার পরিবর্দ্ধন করেন, তাহারা জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন। তাহারা একা, তাহাদের সঙ্গী নাই। ভগবানও তাহাদের সঙ্গী নন, তাহারা আপনার আত্মার সহিত রমণ করেন। আর যাহারা অন্তরের কমনীয় ভাবগুলি বর্দ্ধন করিতে থাকেন তাহাদের সঙ্গী জীব মাত্রেই ও তাহাদের সঙ্গী ভগবান। তাহারা ক্রমে প্রেম লাভ করেন, করিয়া প্রেমানন্দ ভোগ করেন। যাহারা জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন, তাহারা এক প্রকার গুলিখোর, আনন্দ লইয়া পড়িয়া থাকেন, প্রেমানন্দ হইতে বঞ্চিত। যাহারা প্রেমানন্দ ভোগ করেন জগৎ তাহাদের, আর জগতের তাহারা, ভগবান তাহাদের আর ভগবানের তাহারা। তাঁহারা উভয়

প্রেমানন্দ ও জ্ঞানানন্দ ভোগ করেন। প্রেমানন্দ বলিয়া যে কোন বস্তু আছে তাহা জ্ঞানানন্দীগণ অবগত নহেন।

এখন সন্ন্যাসী ঠাকুর এক বিন্দু প্রেম সুধা আস্বাদ করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন, প্রভু এই সন্ন্যাসী দ্বারা দেখাইলেন যে যাহারা আত্মারাম ও গ্রন্থি শূন্য তাহারাও তুলসী গন্ধতে লোভ করেন। পোড়া কাষ্ঠ এখন সরস হইল। রূপে গর্ব্বিতা স্ত্রী অহংকারে মৃত্তিকায় পা দেন না, তাহার রূপে ভাল লোকের আনন্দ হয় না, বিরক্ত হয়। তিনি দৈবাৎ প্রেমের ফাঁদে পড়িয়া গেলেন। তখন তিনি দীন হইতে দীন হইলেন। তাহার দর্শন ও ভাব অতি মধুর হইল, তাহার হৃদয়ের কমনীয় ভাবগুলি যাহা শুখাইতেছিল তাহা সজীব হইল, আর তাহার সৌন্দর্য্য শক্তি বাড়িয়া উঠিল. সন্ন্যাসীর ঠিক তাহাই হইল।

"ছটফট করিতে লাগিল সন্ন্যাসী বর।
প্রভুরে নেহারি বলে তুমি সে ঈশ্বর॥"

এই নিগ্রন্থি আত্মারাম সন্ন্যাসী বরকে শ্রীভগবানের চরণে আনিয়া প্রভু পুনঃ গতিতে ত্রিপদি নগরে গেলেন। চরিতামৃত সংক্ষেপে এইরূপে প্রভুর ভ্রমণ বর্ণনা করিতেছেন :—

বেঙ্কট হইতে ত্রিপাদ আসিয়া শ্রীরাম দর্শন করিলেন, পরে,—

পানা নরসিংহে আইলা প্রভু দয়াময়॥
নৃসিংহ প্রণতি স্তুতি প্রেমাবেশ হৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হইল॥
শিবকাঞ্চি আসি কৈল শিব দরশন।
বিষ্ণুকাঞ্চি আসি দেখিল লক্ষ্মীনারায়ণ॥
প্রেমাবেশে নৃত্য গীত বহুত করিল।
দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল॥

ত্রিমল্ল দেখি গেল ত্রিকাল হস্তি স্থান।
মহাদেব দেখি তারে করিল প্রণাম ॥
পক্ষতীর্থ যাই কৈল শিব দরশন।
বৃদ্ধ কেথল তীর্থ তরে করিল গমন ॥
শ্বেত বরাহ দেখি তারে নমস্কার করি।
পীতাম্বর শিব স্থানে গেলা গৌর হরি ॥
শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন।
কাবেরী তীরে আইল শচীর নন্দন ॥

এখন উপরিউক্ত তীর্থ স্থানে কি কি লীলা করিলেন বলিতেছি। ত্রিপদী নগরে শ্রীরাম দর্শন করিয়া প্রভু ধুলায় পড়িয়া গেলেন। সেখানে রামায়েৎ-গণের বাস, সর্ব্বপ্রধান মথুরা রামায়েত ভারি পণ্ডিত। তখনকার দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে সেই সময় দেশে পরম পণ্ডিতের ছড়াছড়ি হইয়াছিল, দেশ কেবল পরম পণ্ডিতের দলে ছাকিয়া ফেলিয়াছিল। এক স্থানে আমি বলিয়াছিলাম যে যখন ভারতবর্ষ বিদ্যা ও অধ্যাত্ম চর্চ্চা করিতে করিতে চরমসীমা উপস্থিত হয়েন প্রভু আসিয়া সেই সময়ে উদয় হইলেন। আমরা দেখিতে পাই যে সে সময় কি বাঙ্গালা কি পশ্চিম, কি উত্তর কি দক্ষিণ সকল স্থানই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন, আর প্রায় সকলেই শঙ্করের ভাষ্য দ্বারা হয় প্রত্যক্ষে নয় পরোক্ষে চালিত হইতেছিলেন। মথুরা—

বড়ই তার্কিক বলি নগরে বিদিত।

তিনি কাজেই প্রভুর নিকট যুদ্ধংদেহি বলিয়া উপস্থিত হইলেন।
প্রভু তাহাকে বড়ই মধুর সম্ভাষণ করিলেন। বলিতেছেন—

মথুরা ঠাকুর, আমি বিচার না জানি।
তোমার নিকটে শতবার হারি মানি ॥

বলিতেছেন, তুমি শ্রীরামের ভক্ত, অবশ্য তোমার নিকট সব তত্ত্ব নিহিত আছে, তুমি কেন আমাকে তাহার কিছু শিক্ষা দাও না? আমার উপকার হয়, শ্রীরামচন্দ্রও তোমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন। বিচারে আমাকে জয় করিবে ভাল, কিন্তু ইহাতে তোমার কি লাভ হইবে? শুষ্ক তর্কে কিছু লাভ নাই। তুমি পরম ভক্ত তোমার জিগীষা শোভা পায় না, কেমন —যেমন শুভ্রবস্ত্রে কালির দাগ। তুমি বরং কিছু ভগবৎ কথা বল আমি শুনি। শ্রীভগবানের নাম করিতে, অমনি প্রভু আবিষ্ট হইলেন—

বলিতে বলিতে প্রভু হরিবোল বলি।
মাতিয়া উঠিল নামে হয়ে কুতুহলি॥
কোথায় কৌপীন কোথায় রহিল বহির্ব্বাস।
লোমাঞ্চিত কলেবর ঘন বহে শ্বাস॥
আছাড় খাইয়া তবে পড়িল ধরায়।
অচেতন হইল প্রভু যেন জড়প্রায়॥

সেই সঙ্গে রামায়তগণ ঃ—

নাচিতে লাগিল তবে প্রভুরে বেড়িয়া॥

প্রভু সেখানে অধিকক্ষণ রহিলেন না, উঠিয়া চলিলেন, তখন মথুরা আর পশ্চাৎ ছাড়েন না, সেবার আর যুদ্ধ করিতে নয়। প্রভু অনেক প্রবোধ দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। এই ত্রিপদি সেই অবধি বৈষ্ণবের স্থান হইল, এমন কি অতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব তীর্থ বলিয়া গণিত হইল, শেষে প্রভু পানানরসিংহ গমন করিলেন।

এই ঠাকুর প্রহ্লাদের প্রভু। সেইভাবে বিভোর হইয়া ঠাকুরকে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন নৃসিংহের অধিকারী মাধবেন্দ্র ভুজা প্রভুর গলায় তুলসীর মালা পরাইয়া দিল, আর পূজারী দ্রুত গতিতে প্রসাদ আনিল, আনিয়া প্রভুর সম্মুখে রাখিল। প্রভু তাহার কণামাত্র লইলেন, লইয়া

হস্তে করিয়া সেই কণাকে "বহু স্তব" করিলেন। স্তব করিতেছেন আর দুই পদ্ম চক্ষু হইতে অবিরত আনন্দ ধারা পড়িতেছে, গোবিন্দেরও প্রসাদ জুটিল, তাহার উপযুক্ত প্রসাদ। এখানকার প্রধান ভোগ চিনিপানা, তাই ঠাকুরের নাম পানানৃসিংহ। গোবিন্দ বলিতেছেন—

শর্করের পানা মোরে দিল আনাইয়া।
পিয়ে পিয়ে খাই পানা উদর পুরিয়া॥
নৃসিংহের পানা হয় অমৃতের সমান।

তাহার সন্দেহ কি, বিশেষ তখন গ্রীষ্মকাল। পরে প্রভু সেখান হইতে শিবকাঞ্চি ও বিষ্ণুকাঞ্চি আইলেন। বিষ্ণুকাঞ্চির ঠাকুর লক্ষ্মীনারায়ণ, তাহার অধিকারী ভবভূতী, ইনি শেঠী, যেমন ধনবান তেমনি ভক্ত, ইহারা সস্ত্রীক ঠাকুরের সেবা করেন। সেবার নিমিত্ত প্রত্যহ দুই মণ ক্ষীরের পায়স হয়। তাহারা ভোগের নিমিত্ত বৎসরে বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করেন। তাহার স্ত্রীর সেবা আরো চমৎকার। তিনি প্রত্যহ মন্দির ধৌত করেন।

বিষ্ণুকাঞ্চি হইতে ছয়ক্রোশ দূরে চারি হস্ত পরিমিত গৌরি পট্ট-শিব। সেখান হইতে পক্ষগিরি দেখা যায়, তার নীচে পক্ষতীর্থ, ভদ্রা নদীর ধারে। প্রভু সেই নদীতে স্নান করিলেন, আর সেবা করিলেন—চাম্পি ফল। সে ফল কিরূপ? সেখানে বৃক্ষতলে প্রভু ও ভৃত্য রজনী বঞ্চিলেন। সে রজনী প্রভু এক লীলা করেন। রাত্রিতে শয়ন করিয়া আছেন এমন সময় একটী ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিতে করিতে তাহাদের আক্রমণ করিল। ইনি বোধ হয় পক্ষগিরিতে বাস করিতেন।

প্রভু হাস্য করিলেন, হরিধ্বনি করিলেন।

হরিধ্বনি শুনি ব্যাঘ্র লেজ গুটাইয়া।
পিছাইয়া গেল এক বলে লম্ফ দিয়া॥

তখন গোবিন্দ বিস্ময়াবিষ্ট ও কৃতজ্ঞ হইয়া প্রভুর চরণরজ বারবার

মস্তকে দিতে লাগিলেন। সেখান হইতে পঞ্চক্রোশ দূরে কানতীর্থ (চরিতামৃত বলেন "কেবল" তীর্থ), এখানে বরাহ দেবের মূর্ত্তি। প্রভু দর্শন করিয়া পুলকিত ও দরদরিত ধারা হইলেন।

পিচকারি সম অশ্রু বহিতে লাগিল?
ফুলে ফুলে কান্দি প্রভু আকুল হইল॥

সেখান হইতে পঞ্চক্রোশ দক্ষিণ সন্ধিতীর্থ, যে হেতু সেখানে দুই নদীর সঙ্গম, নন্দী ও ভদ্রা। সেখানে সদানন্দ পুরী বাস করেন। নাম শুনুন! সদানন্দ পুরী! তিনি প্রভুর ভক্তি দূষিলেন। তিনি বড় পণ্ডিত আর সোঽহং এই গর্ব্ব করিতে লাগিলেন। প্রভু তাহাকে তুলসীর গন্ধ শুকাইলেন। আর তাঁর "সদানন্দত্ব" ফুরাইয়া গেল। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। ফল কথা, যে ব্যক্তি বলে আমি ঈশ্বর, অথচ একটি পীপড়া দংশন করিলে বাবারে মারে করিয়া গড়াগড়ি দেয়, তাহার মত হতভাগ্য কি কেহ জগতে আছে? সদানন্দ বুঝিলেন, অর্থাৎ প্রভু বুঝাইয়া দিলেন, যে ভগবান অতি প্রকাণ্ড বস্তু, আর তিনি কীটাস্থ, আর আপনি ভগবান না হইয়া ভগবানকে ভজন করাই ভাল। সদানন্দ প্রভুর পায়ে লুটাইয়া । সেখান হইতে প্রভু চাঁইপল্লি তীর্থে গমন করিলেন। পূর্ব্বে গোবিন্দ একটি সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলেন, এখন সিদ্ধেশ্বরী নাম্নী অতি তেজস্বিনী একটি সন্ন্যাসিনী দেখিলেন। বিল্ববৃক্ষের তলায় বসিয়া একেবারে ধ্যানস্থ। বয়স যেন একশত বৎসর হইয়াছে। সেখানে শৃগালি বা শেয়ালি বিগ্রহ আছেন। অর্থাৎ এখানে শৃগাল, পূজার বস্তু, তাহার নাম শৃগলি ভৈরবী। প্রভু তাহার পর কাবেরী তীরে ও সেখান হইতে নাগর নগরে গমন করিলেন।

উপরে যে কয়েকটি তীর্থের কথা লিখিলাম, সেখানে প্রভু কি কি লীলা করেন তাহা গোবিন্দ লেখেন নাই। তিনি গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে,

তাহার এ গ্রন্থ লেখার অনেক অসুবিধা ছিল, প্রথম দেশের ভাষা বুঝিতেন না, দ্বিতীয় পথে পথে চলিয়াছেন। তাই তিনি কড়চা করিয়া রাখিয়াছিলেন মাত্র। বিস্তার করিয়া লিখিলে, প্রভুর এক এক স্থানের লীলা বর্ণনা করিলে একখানি গ্রন্থ হইত। যাহা হউক, গোবিন্দ যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই প্রচুর ও তাহার নিমিত্ত আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

নাগর নগরে বহুতর লোকের বাস। সেখানকার ঠাকুর রামলক্ষ্মণ। প্রভু সেখানে তিন দিবস অনবরত নৃত্যগীত ও নাম বিতরণ করেন, ইহাতে কি হইল, না গ্রাম সমেত ভক্তিতে পাগল হইল। অধিকন্তু দশক্রোশ হতে লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। প্রভুর প্রতাপ দেখিয়া সেখানকার একজন ব্রাহ্মণের ঈর্ষা হইল, সে আসিয়া প্রভুকে গালি দিতে লাগিল। বলে, তুই ভণ্ড সন্ন্যাসী, গ্রামের নির্বোধ লোককে ভুলাইতেছিস্, তোকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিব। প্রভু নদীয়ায় যখন ছিলেন তখন প্রহারের ভয়ে সন্ন্যাসী হয়েন, কিন্তু এখানে দেখিতেছি সন্ন্যাসী হইয়াও নিস্তার পাইলেন না। তবে তিনি ব্রাহ্মণের বাক্যে হাসিতে লাগিলেন, আর সহাস্যে বলিলেন, তুমি আমাকে মারিবে সে সোজা কথা, কিন্তু অগ্রে তোমার মুখে হরি বলিতে হইবে। তখন গ্রামের লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে, তাহারা ইহা কিরূপে সহিবে? তাহারা ব্রাহ্মণকে প্রহার করিবে এইরূপ উদ্যোগ করিল। প্রভু তাহাদিগকে, নিবারণ করিলেন। তখন সকল লোকে প্রভুর এরূপ বশীভূত হইয়াছে যে তাহার সামান্য ইচ্ছা তাহাদের কাছে ভগবৎ আজ্ঞা স্বরূপ অলঙ্ঘ্য হইয়াছে। তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া প্রভু ব্রাহ্মণকে বলিতেছেন যে, শুন দয়াময় ঠাকুর, এ সমুদায় কাজ ভাল নয়, বরং হরি বল বলিয়া অনন্ত সুখ আহরণ কর। তুমি প্রকৃতপক্ষে ভক্ত, তাহার সন্দেহ নাই। তবে তোমার এরূপ প্রবৃত্তি কেন?

তুমি, আমারে আঘাত কর তাতে দুঃখ নাই।
প্রাণ ভরে হরি বল এই ভিক্ষা চাই॥

সকলে দেখিল প্রভুর ক্রোধ নাই, কোন বিকার নাই, বরং যেন হৃদয় দয়াতে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণ বিনা অপরাধে তাহাকে যথেষ্ট অপমান করিল, এমন কি অন্যে প্রভুকে রক্ষা না করিলে সত্যই তাহাকে প্রহার করিত, ইহাতে প্রভু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, বরং পাছে অন্যে বিপ্রকে প্রহার কি অপমান করে এই ভয়ে ব্যস্ত হইয়া অতি প্রেমের সহিত সেই ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইহাতে সকলে মুগ্ধ হইল, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মুগ্ধ হইল এই "দয়াময়" ঠাকুর। সে আর থাকিতে পারিল না। "প্রভু রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমার একি দুর্ম্মতি", বলিয়া—

প্রভুর চরণ তলে পড়িল ধরায়॥
এইরূপে ব্রাহ্মণে যে কৃতার্থ করিয়া।
চলিল চৈতন্যদেব নাগর ছাড়িয়া॥

যাইয়া সাত ক্রোশ দূরে তাঞ্জোরে উপস্থিত হইলেন। চরিতামৃত সংক্ষেপে বলিয়াছেন—

শিয়ালি ভৈরবী দেখি করি দরশন।
কাবেরী তীরে আইল শচীর নন্দন॥

সেখানে গো-সমাজ শিব দেখিলেন, পরে কুম্ভকর্ণের কপালের সরোবর দেখিয়া পরিশেষে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আইলেন। তাঞ্জোর নগরে ব্রাহ্মণ ধনেশ্বর, রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সেবা করেন। সেই ঠাকুর বাড়ীর আঙ্গিনায় এক প্রকাণ্ড বকুল বৃক্ষতলে থাকেন, আর অনেক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী সেখানে বাস করেন। গো-সমাজ শিব তাহার বামভাগে থাকেন। ধনেশ্বর, প্রভুকে কুম্ভকর্ণ সরোবর দেখাইতে লইয়া গেলেন। প্রবাদ এই যে, এই সরোবরটি কুম্ভকর্ণের মাথা আর কিছু নয়। কুম্ভকর্ণ লঙ্কায় মরেন, তাঁহার

সেই অত বড় মাথা তাঞ্জোরে কে বহিয়া আনিল তাহার সংবাদ আমরা পাই নাই। সেখান হইতে অতি সুন্দর চণ্ডালু পর্ব্বত দেখা যায়। দেখিতে যেন একখানা সুন্দর চিত্র। সেখানে বিস্তর গোফা আছে, আর উহাতে অনেক সন্ন্যাসী থাকিয়া তপস্যা করেন। এইরূপে ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র পর্ব্বতে লক্ষ লক্ষ গোফা ছিল ও এখনও আছে। তবে তখন সেখানে সন্ন্যাসীগণ বাস করিতেন, এখন সমুদায় শূন্য পড়িয়া আছে, কি ব্যাঘ্র ভল্লুকের বাসস্থান হইয়াছে। দক্ষিণদেশে মুসলমান উপদ্রব তখন প্রবেশ করে নাই। কাজেই ভারতবর্ষে মুসলমানগণ আসিবার পূর্ব্বে কি অবস্থা ছিল, তাহা তখনকার দক্ষিণদেশ দেখিলে বুঝা যাইত। এই যে প্রভু চলিয়াছেন, ইহাতে প্রতি পদে পদে তীর্থস্থান পাইতেছেন। আর সকল স্থানেই সাধু সন্ন্যাসীগণ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত। নিকটে একটি ক্ষুদ্র বনে সুরেশ্বর নামক সন্ন্যাসী দশজন শিষ্য লইয়া বাস করেন। বনটি অতি মনোহর, বড় বড় গাছ ও একটি ঝরণার দ্বারা শোভিত। সাধু, সন্ন্যাসী, উদাসীন ও যোগিগণ এইরূপ বাছিয়া সুন্দর স্থানে থাকেন। নিকটস্থ গ্রাম হইতে লোকে তাহাদের ভিক্ষা যোগাইয়া থাকেন। এইরূপ পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সকল স্থানে আশ্রম ছিল। প্রভু সেখানে কয় দিন থাকিয়া, সন্ন্যাসী কয়েকটিকে প্রেমে উন্মত্ত করিয়া, সেই বৈকুণ্ঠতুল্য স্থান ত্যাগ করিয়া পদ্মকোটে গেলেন।

সেখানে অষ্টভুজা দেবী থাকেন। প্রভুকে দেখিতে বহুলোক আইল। তাহাদের সহিত দুই এক কথা বলিতে বলিতে কি এক আশ্চর্য্য অলৌকিক ভাব হইল। প্রভু হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। আর চারিদিকে তাহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। দেবী যেন দুলিতে লাগিলেন আর পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল, সেই পুষ্প লইয়া রমণীগণ ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন।

বালক বালিকা যুবক ক্ষেপিয়া উঠিল।
অষ্টভুজা দেবী যেন দুলিতে লাগিল॥
পদ্মগন্ধ চারিদিকে লাগিল বহিতে।
সেইখানে পুষ্পবৃষ্টি হইল আচম্বিতে॥

পশ্চাতে রমণীগণ ছিলেন, তাহারা সেই ফুল কুড়াইয়া কেলি আরম্ভ করিলেন, অর্থাৎ পরস্পরে পরস্পরের গাত্রে ফুল ফেলিতে লাগিলেন।

এই সমুদায় অলৌকিক কাণ্ড হইতেছে, যেন সকলে আবেশিত, তাহাদের সম্পূর্ণ চেতন নাই। এমন সময় একটি অন্ধ ব্রাহ্মণ সাধু, ধীরে ধীরে আসিয়া, প্রভুর পদদুখানি জড়াইয়া ধরিল, ধরিয়া বলিতেছে, "হে জগদীশ্বর কৃপা কর।" প্রভু বলিলেন "এখানে জগদীশ্বর কোথা, সম্মুখে জগদীশ্বরী আছেন বটে!" অন্ধ বলিলেন, "প্রভু আমাকে দয়া কর, আমি চক্ষু ভিক্ষা করি না, আমি কেবল একবার তোমার রূপ দেখিব।" প্রভু বলিলেন, "তোমার চর্ম্মচক্ষু নাই, তুমি কি রূপে দেখিবে. তবে তুমি জ্ঞান চক্ষু দ্বারা সমুদায় দেখিতে পাইতে পারো বটে।"

কিন্তু অন্ধ পা ছাড়েন না। বলিলেন, "তবে শুনিবে? আমি বহুকাল এই ভগবতীর আশ্রয়ে মন্দিরে পড়িয়া আছি। কল্য নিশিতে আমাকে ভগবতী স্বপ্নে দেখাইয়াছেন যে, তুমি আসিতেছ আর তুমিই অগতির গতি। তাহাই তোমার চরণে আশ্রয় লইয়াছি। জীবে তোমাকে দয়াময় বলে। তুমি তোমার সেই দয়ার গুণে আমাকে তোমার রূপটি একবার দেখাও, আমি আর কিছুই চাই না।" প্রভু অগ্রে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আবার বলিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, "আমি সামান্য মানুষ, তবে এক হিসাবে আমি ভগবান, যেহেতু জীবমাত্রের হৃদয়ে ভগবান বাস করেন। কিন্তু তুমি আমাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া আমাকে অপরাধী করিতেছ।"

অন্ধ বলিলেন, "ও সব কথা থাকুক ; আমাকে তোমার রূপ দেখাও।" ইহা বলিয়া কান্দিয়া আকুল হইলেন। তখন প্রভু অস্থির হইলেন। কারণ প্রভু বরাবর একটি বিষম "দৌর্ব্বল্যের" পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, অর্থাৎ লোকের আর্ত্তি শুনিলে অস্থির হইতেন, লোকের আর্ত্তি দেখিতে পারেন নাই। পরে অন্ধের কর ধরিলেন, ধরিয়া তুলিলেন, তুলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর স্পর্শ পাইবামাত্র অন্ধ শিহরিয়া উঠিলেন, আর তখনি নয়ন মেলিলেন। একটু স্থির নয়নে প্রভুর চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিলেন, করিয়া তাহার মুখ অতি প্রফুল্ল হইল। আর অমনি অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। সে চেতন আর ভাঙ্গিল না, তিনি প্রভুকে দর্শন করিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন।

তখন মহা কলরব হইল, প্রভু সেই মৃতদেহ বেড়িয়া কীর্ত্তন ও নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভু অমনি লোকের অগোচরে পলায়ন করিলেন।

যেখানে এরূপ কোন অলৌকিক কাণ্ড হয় প্রভু সেখান হইতে দ্রুত পলায়ন করেন। প্রভু যদি কোন কুষ্ঠকে আরোগ্য কি অন্ধকে চক্ষুদান দিলেন, তবে লক্ষ লক্ষ লোকে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিবে, আর তাঁহার কার্য্যের ব্যাঘাত হইবে। তাই সেখান হইতে পলায়ন করিয়া ত্রিপাত্র নগরে গেলেন। ত্রিপাত্র কাবেরীর দক্ষিণে সমুদ্র হইতে একটু দূরে।

সেখানে চণ্ডেশ্বর শিব। সে মন্দিরে একবার ববম্ শব্দ করিলে এক দণ্ডকাল পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনি হয়। আঙ্গিনায় এক প্রকাণ্ড বিল্ববৃক্ষ, সেখানে অনেক শৈব পণ্ডিত বাস করেন। তাঁহাদের প্রধান পণ্ডিতপ্রবর অতি বৃদ্ধ ভর্গদেব বসিয়াছিলেন। প্রভু উপস্থিত হইলে অমনি চিনিলেন। প্রভুর যশ প্রভুর আগে আগে চলিতেছে। ভর্গদেব তাঁহার অনুগত জনকে বলিতেছেন, তোমরা চৈতন্যের কথা শুনিয়াছ, যাঁহার প্রতাপে দেশে আর পাপী রহিল না। যিনি হরিনামে জগৎ মাতাইয়াছেন, তিনি স্বদেশ

ছাড়িয়া এদেশ উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। দেখ যেমন শুনিয়াছি তাই বটে, এমন সুন্দর চিত্তাকর্ষক বিগ্রহ তোমরা কি দেখিয়াছ?" প্রভু অগ্রে দাঁড়াইয়াছেন, আর ভর্গ তাহাকে শুনাইয়া এই সব কথা বলিতেছেন। পরে বলিতেছেন, "না হবে কেন উনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার। এসো আমরা সকলে প্রণাম করি।" ইহাই বলিয়া সকলে প্রণাম করিলেন। প্রভু অমনি প্রতি প্রণাম করিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিতেছেন, "ভর্গদেব! আপনি আমাকে বড় অপরাধী করিতেছেন। আমার নাম চৈতন্য বটে, আমার বাড়ী বঙ্গদেশে, নদীয়ায়। আমি অতি ক্ষুদ্র একটি জীব।" তখন ভর্গ বলিতেছেন, "আমি অতি বৃদ্ধ আমাকে উদ্ধার করিতে এখানে আসিয়াছ, আমার সঙ্গে লুকোচুরি ভাল নয়। আমি তোমাকে চিনেছি আমার মাথায় চরণ তুলিয়া দাও। কি সৌভাগ্য! কি তোমার কৃপা!" ইহা বলিয়া ভর্গ ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। প্রভু করেন কি সেখানে সাত দিন থাকিতে হইল। সমুদায় শৈবগণকে মালাধারণ করাইয়া কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত করাইয়া তাহাদিগকে ছাড়িলেন। গোবিন্দ বলিতেছেন যে, "প্রভুকে দেখিবামাত্র যে লোকে আকৃষ্ট হয় তাহার অনেক কারণ ছিল।" বলিতেছেন।

আমার প্রভুর কথা কি কহিব আর।
আশ্চর্য্য প্রভাব তার বিচিত্র আকার ॥
দিনান্তে সামান্য ভোজন করে গোরারায়।
না খাইয়া দেহ ক্ষীণ যষ্টির প্রায় ॥
অস্থি চর্ম্ম অবশিষ্ট হইয়াছে তাঁর।
তথাপি দেহের জ্যোতি অগ্নির আকার ॥
মোহিত সকলে হয় অঙ্গের আভায়।
অহেতুক পদ্ম গন্ধ সদা তার গায় ॥

(৬ষ্ঠ—৬ষ্ঠ খণ্ড)

যে জন তাঁহার প্রতি আঁখি মেলি চায়।
তেজের প্রভাবে চক্ষু ঝলসিয়া যায়॥

ভর্গদেব প্রভুর সঙ্গে আসিতে চাহিলেন, কিন্তু প্রভু অনেক বিনয় করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন।

লক্ষ লক্ষ লোক আসে প্রভুকে দেখিতে।
কাতর না হয় প্রভু কৃষ্ণ নাম দিতে॥
"ক্ষেপা হরিবোলা" বলে প্রভুরে সকলে।
খেপাইতে কত লোক হরি বোল বলে॥
হরি বলি কত লোক পেছু পেছু ধায়।
নাম শুনি প্রভু মোর ধূলি মাখে গায়॥
কেহ বলে ওরে ভাই সেই ক্ষেপা যায়।
হরি হরি বলি সবে খেপাও উহায়॥
আরম্ভিল খেপাইতে সব শিশুগণ।
সেই সঙ্গে নাচে প্রভু শচীর নন্দন॥

বালকগণ প্রভুকে কিরূপে হরি বলে খেপাইত পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহারা প্রভুর নাম খেপা হরিবোলা দিয়াছিল! বালকগণ বলে "হরি হরি বোল" আর পরস্পর বলাবলি করে যে, এই দেখ পাগল খেপে আর কি। প্রভু তাঁহাদের ভাব বুঝিয়া বসিয়া গায়ে ধূলা মাখেন কখন নৃত্য করেন কখন ধূলায় গড়াগড়ি দেন। আমার প্রভু যখন এই চপল ও সরল বালকের ন্যায় হয়েন তখন সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর হয়েন।

সেখান হইতে প্রভু পঞ্চাশ যোজন ব্যাপি একখানি মহাবনে প্রবেশ করিলেন। আহার কেবল বনফল, ও তাহার অভাব ছিল না। তিন দিবস মনুষ্যের মুখ দেখা গেল না, পরে এক সন্ন্যাসীর দলের সহিত দেখা হইল। তখন সকলে একত্রে চলিলেন, আর বন পার হইয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে

উপস্থিত হইলেন। এই নগরে আমরা প্রকাশানন্দ ও গোপালকে পাই। সমুদ্রতীর ত্যাগ করিয়া পঞ্চদশ দিবস বন পার হইয়া সকলে রঙ্গক্ষেত্রে পহুছিলেন। অভ্যন্তরে চলিলেন আর—

সেইখানে ভট্ট নামে এক বিপ্রবর।
প্রভুরে লইয়া গেল আপনার ঘর॥
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু ব্রাহ্মণের ঘরে।
তাহা দেখি ব্রাহ্মণ পুলক অন্তরে॥

ইহার নাম বেঙ্কট ভট্ট। ইহার পুত্র গোপাল ভট্ট, বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর একজন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী এই বেঙ্কট ভট্টের সহোদর; যাহার প্রভুদত্ত নাম প্রবোধানন্দ। গোপাল ভট্ট ও প্রবোধানন্দ এই দুই জনের অদ্ভুত জীবন আমি যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিয়াছি। তাহাতে লেখা আছে যে প্রভু বেঙ্কটের বাড়ীতে চাতুর্মাস্য করেন। আমি যেমন পড়িয়াছিলাম, তেমনি লিখিয়াছিলাম, এখন আমার বোধ হইতেছে সেটি ভুল। প্রভু বৈশাখে নীলাচল ত্যাগ করিয়া মাঘ মাসে প্রত্যাগমন করেন। যে বৎসর গমন করেন সেই বৎসর যদি প্রত্যাবর্ত্তন করেন তবে তিনি মোটে দশ মাস দক্ষিণে ছিলেন। তাহার চারিমাস যদি বেঙ্কটের বাড়ীতে অতিবাহিত করিয়া থাকেন তবে তাঁহার সমুদায় দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিয়া পরে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন কি এত অল্প সময়ে সম্ভব হয়? তাহা হয় না। তিনি কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত যাইয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম ধার দিয়া ঘুরিয়া দ্বারকায় গমন করেন। সেখান হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সুতরাং তিনি দক্ষিণে অষ্টাদশ মাস ছিলেন। যদি চাতুর্মাস্য নিয়ম তিনি পালন করিয়া থাকেন, তবে তাহার আর একবার উহা পালন করিতে হইয়াছিল। সে কোথা? যদি কোথাও করিয়া থাকেন তবে তাহার এই দুই বার চাতুর্মাস্য করিতে তাঁহার অষ্ট মাস

লাগিয়াছিল। তিনি কি তাঁহার প্রিয় ভক্তগণকে ছাড়িয়া অষ্ট মাস দক্ষিণে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন? তিনি কি চুপ করিয়া থাকার বস্তু? তিনি চলিয়াছেন—দৌড়িয়া; তাঁহার ক্ষুধার ভয় নাই, অনিদ্রার ভয় নাই, ব্যাঘ্রের ভয় নাই, তবে বৃষ্টি কি তাঁহার এত ভয়ের কারণ হইয়াছিল? আসল কথা, তাহার যে সঙ্গি গোবিন্দ তিনি চতুর্ম্মাস্যের কথা আদৌ বলেন নাই।

প্রভু বেঙ্কটের বাড়ীতে অবশ্য কিছুকাল ছিলেন, আর বালক গোপাল তাহার সেবা করিত। যখন প্রভু সেই স্থান ত্যাগ করেন তখন বেঙ্কট ও গোপাল দুই জনে প্রভুর পাছ লাগিলেন, প্রভু উভয়কে নিরস্ত করিলেন। গোপালকে বলিলেন যে তাহার পিতামাতা অদর্শনে যেন তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। সেখানে প্রভু তাহার সংবাদ লইবেন। তাই ইহার ত্রিশ বৎসর পরে গোপাল বৃন্দাবনে গমন করেন। সে যাহা হউক যাহারা ইচ্ছা করেন সে কাহিনী উপরিউক্ত পুস্তকে দেখিতে পারেন। চরিতামৃতে বলেন যে, সেই তীর্থে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। কিন্তু নিজের বিদ্যা অধিক ছিল না, তাই অশুদ্ধ পড়িতেন আর লোকে তাহাকে উপহাস করিত। তিনি তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইতেন না, কারণ,—

গীতা

আবিষ্ট হইয়া পড়ে আনন্দিত মনে।
পুলকাশ্রু কম্প স্বেদ যাবৎ পঠনে॥

মহাপ্রভু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাশয়! আমি শুনিতে চাই গীতার কোন অর্থে আপনার এত সুখ হয়। ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি মূর্খ অর্থ কিছু বুঝি না। তবে যখন আমি পড়ি, তখন দেখি অর্জ্জুনের রথে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে উপদেশ দিতেছেন তাহাই দেখিয়া আমার এত আনন্দ হয়, গীতা না পড়িয়া থাকিতে পারি না। প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন

করিয়া বলিলেন যে, তোমারি গীতা পাঠের অধিকার। তুমিই ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝ। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, বুঝেছি তুমিত সেই কৃষ্ণ। গোবিন্দ এই কাহিনী এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন যথা, অর্জ্জুন মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ গীতা পাঠ করেন অথচ আনন্দে বিচলিত হয়েন।

প্রভু বলে কেন কান্দ ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
বিপ্র বলে গীতা পড়ি আনন্দ প্রচুর ॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ দেখিবারে পাই।
সেই লোভে গীতা পড়ি সন্ন্যাসী গোসাঞি ॥
প্রভু বলে কৃষ্ণ তুমি পাও দরশন।
তবে মোরে দয়া করি দাও আলিঙ্গন ॥
বিপ্র বলে তুমি কৃষ্ণ কৃতার্থ করিলে।
এত বলি পদযুগ সাপটি ধরিলে ॥

সেখানে প্রভু শুনিলেন যে, যথা গোবিন্দের কড়্চা—

বৃষভ পর্ব্বতে থাকে পরমানন্দ পুরী।
তাহারে দেখিতে প্রভু হইল আগুসারি ॥
পুরি সহ কৃষ্ণ কথা বহুত কহিলা।

চরিতামৃতে পুরী গোসাঞির সম্বন্ধে বলেন ঃ—

তিন দিন প্রেমে দোহে কৃষ্ণ কথা রঙ্গে।
এক বিপ্র ঘরে দোহে রহে এক সঙ্গে ॥
তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয় ॥

অর্থাৎ প্রভু আর পরমানন্দ পুরী তিন দিবস এক ব্রাহ্মণের বাড়ী থাকিয়া কৃষ্ণ কথায় বিহ্বল ছিলেন। প্রভু বলিলেন চলুন নীলাচলে একত্র থাকিব, আর পরমানন্দপুরী অবশ্য এই প্রস্তাবে কৃতার্থ হইলেন।

এই পরমানন্দ পুরী গোসাঞির প্রতি প্রভু এত সদয় কেন? তাহার কারণ ইনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ও প্রভুর গুরু ঈশ্বর পুরীর ধর্ম্ম ভাই। তাহারা উভয়ে মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আর উভয়েই কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা। তাই পরমানন্দ পুরীকে প্রভু প্রণাম করিতেন, আর নীলাচলে যাইতে আদেশ করিলেন। এই পুরী গোসাঞি চিরদিন প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে বাস করেন, ভক্তগণ ভাবিতেন যে বিশ্বরূপের তেজ তাহাতে ছিল। অর্থাৎ পুরী গোসাঞির হৃদয়ে প্রভুর দাদা বিশ্বরূপ প্রবেশ করিয়া, কনিষ্ঠ নিমাইর কার্য্যের সহায়তা করিতেন।

সেখান হইতে কামকোটী, কামকোটী হইতে দক্ষিণ মথুরায় আইলেন। কৃতমালা নদীতে স্নান করিয়া এক রাম ভক্ত ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণে তাহার বাড়ী প্রভু উপস্থিত হইলেন। ইনি সুধু রামভক্ত নন, রামের নামে একেবারে পাগল। ব্রাহ্মণ কিছু পাক করিতেছেন না দেখিয়া প্রভু বলিলেন, "কি ঠাকুর কৈ আমার ভিক্ষা কই, পাক করিতেছেন না কেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "পাক কি করিব? এ বনে সামগ্রী কোথায়? লক্ষণ বনে গিয়াছেন। তিনি যাহা কিছু আনেন তাহা আনিলে সীতা পাক করিবেন।" প্রভু দেখিলেন, যে ব্রাহ্মণ আপনাকে শ্রীরাম ভাবিতেছেন। সে যাহা হউক, ব্রাহ্মণের চেতন হইল, তিনি পাক করিয়া তৃতীয় প্রহরে প্রভুকে ভিক্ষা দিলেন।

সেই ব্রাহ্মণ উপবাস করেন, যে হেতু তাহার দুঃখ যে রাবণ সীতাকে স্পর্শ করিয়াছিল। প্রভু যখন রামেশ্বর তীর্থে আইলেন সেখানে এক পুঁথিতে দেখিলেন যে রাবণ যে সীতা হরণ করে সে মায়া সীতা, প্রভু সেই পাতা নকল করিয়া তাহা প্রতীতার্থে সেই পুরাতন পাতাখানা লইয়া সেই ব্রাহ্মণকে আনিয়া দিয়া তাহার চিরজীবনের দুঃখ মোচন করিলেন।

প্রভু, রামনদে আসিয়া সেখানে রামের চরণ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহার পরে রামেশ্বরে, রামেশ্বর শিব দর্শন করিলেন। বহুতর

পণ্ডিত উদাসীন সেখানে বাস করেন। তাহার মধ্যে যিনি বড় পণ্ডিত তিনি অবশ্য যুদ্ধং দেহি বলিয়া উপস্থিত। প্রভু তখনি পরাজয় স্বীকার করিলেন। বলিলেন, তোমার সহিত বিচারে আমি পারিব কেন? তুমি আমাপেক্ষা খুব বড় পণ্ডিত। প্রভুর এরূপ বিনয় দেখিয়া সে একটু স্তম্ভিত হইল, হইয়া ভাবিতে লাগিল। প্রভু তাহা দেখিয়া বলিতেছেন, সন্ন্যাসী ঠাকুর ভাবিতেছ কি? বিচার ছাড়, যাহাতে ভগবচ্চরণে প্রীতি হয়, তাই কর। বিচারে অহঙ্কার বৃদ্ধি, আর অহঙ্কার বৃদ্ধি হইলে, দর্পহারী ভগবান আছেন, বুঝলে? বলিতে বলিতে প্রভু আবেশিত হইলেন। আর সেই অবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে :—

পড়িল চৈতন্য প্রভু আছাড় খাইয়া।
পাথরের ধারে গেল থুতনি কাটিয়া॥
দরদর রক্ত ধারা পড়িতে লাগিল।
যতনে পণ্ডিত বর তাহা মুছাইয়া দিল॥

সেখানে তিন দিন থাকিয়া তাহাদিগকে ভক্তি দিয়া বামে মাধিব কনল গমন করিলেন। শুনিলেন সেখানে একজন উচ্চশ্রেণীয় সন্ন্যাসী আছেন। প্রকৃতই তিনি একজন যোগ সিদ্ধ। অতি বৃদ্ধ, শ্বেত শ্মশ্রুতে হৃদয় ঢাকিয়াছে, উলঙ্গ, বসিয়া আছেন? ধ্যানস্থ, মুখে কোন শব্দ নাই। বসিয়া আছেন বৃক্ষ তলে, সেই তাহার ঘর। প্রভু তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার ধ্যান ভাঙ্গিল না। তিন দিন এরূপে গেল। সন্ন্যাসী এইরূপ তিন দিন ধ্যানস্থ থাকেন, পরে সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কিঞ্চিৎ ফলমূল আহার করেন, করিয়া জীবন ধারণ করেন। সন্ন্যাসী যে দিন প্রথম ধ্যানস্থ হয়েন, প্রভু সেইদিন গিয়াছিলেন। তাই তিনি তিন দিন রহিলেন, সন্ন্যাসী চেতন পাইলে, অমনি প্রভু কথা কহিতে লাগিলেন। কি যে কথা হইল গোবিন্দ তাহার কিছু বুঝিতে পারিলেন না।

দুই চারি কথা কহি যোগী মহাজন।
"চাম্পনি শিঙড়ি" বলি হাসিল তখন॥
চাম্পনি শিঙড়ি বলি অতি শুদ্ধ মনে।
হাসিয়া প্রণাম করে প্রভুর চরণে॥
প্রতি নমস্কার করি মোর গোরা রায়।
আনন্দে ভাসিয়া তবে কৃষ্ণগুণ গায়॥

যখন সেই যোগীবর প্রভুকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন, তখন অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ তটস্থ হইয়া প্রভুকে কাযেই প্রণাম করিলেন। প্রভু সেখানে সাত দিন ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কি করিলেন কি বলিলেন জানিতে পারি নাই।

তখন মাঘ মাস, প্রভু বৈশাখে নীলাচল ত্যাগ করেন, এবং দশ মাসে রামেশ্বর আইলেন। আর পরের মাঘে নীলাচল প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দশ মাসে রামেশ্বর আইসেন তাহার প্রমাণ এই যে মাঘিপূর্ণিমায় তাম্রপর্ণীর মেলায় প্রভু স্নান করেন। তাহার পরে চৈতন্য চরিতামৃত সংক্ষেপে এইরূপ প্রভুর তীর্থ দর্শন বর্ণনা করিতেছেন।

তথা আসি স্নান করি তাম্রপর্ণি তীরে।
নব ত্রিপদি দেখি বুলে কুতুহলে॥
চিয়ড়তালা তীর্থে শ্রীরাম লক্ষণ।
তিলকাঞ্চি আসি কৈল শিব দরশন॥
গজেন্দ্র মোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণু মুর্ত্তি।
পানাগড়ি তীর্থে আসি দেখি সীতাপতি॥
চামতপুর আসি দেখি শ্রীরাম লক্ষণ!
শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন॥
মলয়া পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য বন্দন।
কন্যা কুমারী তাহা কৈল দরশন॥

তাহার পরে আমলকি তলাতে রাম দেখিয়া পরে পয়স্বিনী তীরে, সেখান হইতে আদি কেশব মন্দিরে গেলেন। আর সেখানে সেই অমূল্য গ্রন্থ "ব্রহ্ম সংহিতা" পাইলেন।

আবার বলিতেছেন :—

পলাঙ্কী আসিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণে।
সিংহারি মঠ আইল শঙ্করাচার্য্য স্থানে॥
মৎস্য তীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রা স্নানে।

গোবিন্দের কড়চায় পাই যে, প্রভু পলাঙ্কিতে শিব নারায়ণ দেখিয়া শঙ্করাচার্য্যের মঠে শঙ্করের শিষ্যগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া, মৎস্য তীর্থে, পরে কাচাড়ে, তাহার পরে নাগ পঞ্চনদীতীরে, তাহার পরে চিতানে, পরে তুঙ্গভদ্রা তীরে, পরে কোটি গিরিতে, শেষে চণ্ডপুরে গেলেন।

প্রভু কন্যা কুমারীতে সমুদ্র স্নান করিয়া বড় একদল সন্ন্যাসীর সহিত পঞ্চদশ ক্রোশ হাটিয়া, সাতল পর্ব্বতে গমন করিলেন। সেখানে একজন শেঠী আসিয়া সকল সন্ন্যাসীকে দুগ্ধ আটা দিলেন। সে এক দিন ছিল। এখন দেশের প্রত্যেক শতের মধ্যে পঁচাত্তর জন পরিশ্রম করিত আর পচিশ জন তাহাদের দ্বারা পালিত হইয়া ধর্ম্ম যাজন করিতেন। এই সন্ন্যাসীগণের সহিত প্রভু মিলিত হইলেন না, কেন, তিনি জানেন। তবে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ত্রিবাঙ্কুর দেশে প্রবেশ করিলেন। সে দেশের লোক পরম হিন্দু, তাহারা অতিথীকে অভ্যর্থনা না করা মহা পাপ মনে করিত। রাজার নাম রুদ্রপতি, ভারি ঐশ্বর্য্যশালী, বদান্যতা ও সেইরূপ! সে দেশে অতিথীর ত কোন দুঃখ নাই। আবার নগরের তিন স্থানে রাজার ব্যায়ে তিনটী অন্নছত্র আছে। সেখানে যে যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারে। লোকে সকলে রাজার সুখ্যাতি করে। বলে রাজা যেমন প্রজা পালক তেমনি ভক্ত। সন্ধ্যাকালে প্রভু ত্রিবাঙ্কুরে গমন করিলেন। যাইয়া এক

বৃক্ষতলে প্রফুল্ল অন্তঃকরণে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তখনি একজন ভাগ্যবন্ত লোক আহারীয় আনিয়া দিল।

প্রাতে যেরূপ হইয়া থাকে সেইরূপ হইল, অর্থাৎ প্রচার হইল যে, এক অপরূপ সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। ক্রমে লোক জুটিতে লাগিল। আর সকলে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া জোড় হস্তে সম্মুখে দাঁড়াইা রহিল। প্রভু বসিয়া আপন মনের ভাবে আপনি গরগর রহিলেন।

নয়নের কোণ বহি অশ্রুধারা পড়ে।
লোমাঞ্চিত কলেবর পুলক অন্তরে॥

একটু পরে গ্রাম্য লোক স্তব স্তুতি আরম্ভ করিল, পরে বাড়ী লইবার জন্য অনুনয় বিনয়, কেহ সেখানেই আহারীয় আনিতে লাগিল। কিন্তু প্রভু ভাবে বিভোর নয়ন মেলিলেন না। শেষে তর্ক প্রয়াসী একজন আইলেন, তিনি অবশ্য ব্রহ্মবাদী। ক্রমে নগরে মহা কলরব হইল। রাজা শুনিলেন। তখন প্রভুকে আনিতে দূত পাঠাইলেন। রাজদূত প্রভুকে ধরিয়া লইয়া যাইবে সেই ভাব করিল। প্রভু যাইতে অস্বীকার, রাজদূত বলিলেন, সন্ন্যাসী তুমি বড় নির্ব্বোধ, রাজা ডাকিতেছেন, তোমার ভাগ্য, তুমি গেলে প্রচুর অর্থ পাবে। প্রভু বলিলেন আমার অর্থের প্রয়োজন নাই। আমি সন্ন্যাসী, আমার বিষয়ীর সহিত সংসর্গ করিতে নাই। দূত প্রভুকে সরলভাবে ভাল পরামর্শ দিতেছিল। তাহাতে ধন্যবাদ পাইল না, বরং রুক্ষ কথা শুনিল, কাযেই ক্রুদ্ধ হইল। দূত বলিল বটে! তোমাকে মজা দেখাইতেছি;

এই কথা বলি তবে দূত করি ক্রোধ।
রাজ দ্বারে চলি গেল দিতে প্রতিশোধ॥

দূত যাইয়া প্রভুর নামে নানা কথা বলিলেন। যাহা প্রভু বলেন নাই তাহাও বলিলেন। কিন্তু রাজা ক্রুদ্ধ না হইয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন। সন্ন্যাসীর সম্বল কৌপীন, তিনি রাজা, সেই সন্ন্যাসী তাহাকে গ্রাহ্য করিল

না, এরূপ তিনি কখন দেখেন নাই। এরূপ সন্ন্যাসী আছেন তাহার বিশ্বাস ছিল না।

সন্ন্যাসী হেরিতে চলে রাজা রুদ্রপতি।
ভক্তি ভরে বাহিরিয়া আসে শীঘ্রগতি ॥
হস্তী অশ্ব তেয়াগিয়া অতি দূর দেশে।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে আসে অতি দীন বেশে ॥
দুই চারি মন্ত্রি সহ রাজা মহাশয়।
প্রভুর নিকটে আসি ভক্তি ভরে কয় ॥
জোড় হস্তে রুদ্রপতি কহে বার বার।
দয়া করি অপরাধ ক্ষমহ আমার ॥
না বুঝিয়া ডাকিয়াছিলাম আপনারে।
সেই অপরাধ মোর ক্ষম এইবারে ॥
জ্ঞান শিক্ষা দেহ মোরে অধম তারণ।

রাজার সঙ্গে আবার ধর্ম্ম শাস্ত্র বেত্তাও দুই চারিজন, পণ্ডিত আছেন। রাজা বৈষ্ণব এবং ভাগবতে পণ্ডিত। প্রভু বলিলেন, রাজা তুমি বড় ভাগ্যবান, তুমি ভাগবতী, আমার নিকট আবার কি জ্ঞান চাও? আমি জ্ঞান জানি না, আমি জানি কেবল—রাধাকৃষ্ণ। যেই প্রভু রাধাকৃষ্ণের নাম লইলেন অমনি যাহা হইবার তাহা হইল :—

লইতে কৃষ্ণের নাম প্রেম উপজিল।
দরদর অশ্রু ধারা পড়িতে লাগিল ॥
কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত প্রভু অমনি উঠিয়া।
নাচিতে লাগিল দুই বাহু পসারিয়া ॥
গোরা হরিবোল বলে অজ্ঞান হইয়া।
নাচিতে নাচিতে পড়ে আছাড় খাইয়া ॥

পাছাড়িয়া রাজা তবে প্রভুরে তুলিল।
সেই সঙ্গে মহারাজ মাতিয়া উঠিল॥
হরি বলি মহারাজ নাচিতে লাগিল।
নয়নের জলে তার হৃদয় ভাসিল॥
লোমাঞ্চিত কলেবর পুলকে পূরিল।
ধূলায় পড়িয়া অঙ্গে ধূসর হইল॥
দেখিয়া রাজায় ভক্তি আমার নিমাই
কোল দিয়া রাজারে বলেন এস ভাই॥
হরি নামে যার চক্ষে বহে অশ্রু ধারা।
সেই জন হয় মোর নয়নের তারা॥
দেখিয়া তোমার ভক্তি রাজা মহাশয়।
জুড়াল আমার প্রাণ জানিহ নিশ্চয়॥

প্রভু সেখান হইতে শীঘ্র বিদায় হইলেন, কারণ, রুদ্রপতি রাজা! প্রতাপরুদ্র নীলাচলে এইরূপ প্রভুকে একবার স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাই প্রভু বলিয়াছিলেন, ছি! আমার বিষয়ীর স্পর্শ হইল। কিন্তু রুদ্রপতির সহিত আর এক ভাব কেন? ইহার কারণ, প্রতাপরুদ্রের সহিত সেরূপ ব্যবহার করা প্রয়োজন ছিল, কারণ সেখানে তাঁহার থাকিতে হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভু কোট গিরি ত্যাগ করিয়া চণ্ডপুরে গমন করিলেন। তাহার বামে সত্যগিরি পর্ব্বত রাখিয়া প্রভু নগরে গেলেন, যাইয়া বটবৃক্ষ তলে বসিলেন। কারণ সেখানে একটী বড় সন্ন্যাসী আছেন অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানিয়াছেন, ও তাঁহাকে কৃপা করার ইচ্ছা আছে। সেই সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হইল। তাহার এক কর্ণে সোণার কুণ্ডল, সন্ন্যাসীর নাম ঈশ্বর ভারতী। তিনি আসিয়া প্রভুর নিকট মায়াবাদ তত্ত্ব কহিতে লাগিলেন। লোকটী ভাল, সরল, ইচ্ছা প্রভুর কি মত তাহা শ্রবণ করেন।

কথা কি প্রভুকে দর্শন মাত্র তাহার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইয়াছে, সেটি এই যে, এই নূতন সন্ন্যাসী তাহা অপেক্ষা অনেক উন্নত। আবার প্রভু যেমন যাইতেছেন, প্রভুর সুখ্যাতি অগ্রে অগ্রে চলিতেছে। সুখ্যাতি এইরূপ যে, একজন পরম রূপবান্, পরম পণ্ডিত ও পরম ভক্ত সন্ন্যাসী দেশ সমেত লোককে হরিবোলা করিতেছেন, আর তাঁহার প্রতাপে দেশে পাপী তাপী আর থাকিতেছে না। অতএব তাহার নিকট তাহার এরূপ শক্তির কারণ জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। সে কথা সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলে পারিতেন। কিন্তু মনে অভিমান আছে, তাহা পারিলেন না। তর্ক উঠাইয়া প্রকারান্তরে প্রভুর সাধন ভজন কি, ও তাহার ভিত্তিভূমি কি, ইত্যাদি জানিয়া লইবেন। অবশ্য প্রভু সন্ন্যাসীর মনের ভাব বেশ বুঝিতেছেন। তাই সন্ন্যাসীর কথায় কোন উত্তর না দিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আপনাদের মনে আছে যে একদিন শচী জননীর ইচ্ছা হইয়াছিল যে, নিমাইকে কথা বলাইবেন কারণ নিমাইর কথা যেন মধু হইতে মধু। সেইজন্য বালক নিমাইকে কথা বলাইয়া কর্ণ তৃপ্ত করিবেন, তাই নিমাইকে কথা বলাইবার নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধূর্ত্ত নিমাই তাহা বুঝিয়া মোটে কথা বলে না। এ সম্বন্ধে একটি কবিতাও আছে। বড় পিড়াপিড়ি করিলে নিমাই কেবল মাথা নাড়িতে ও হাসিতে লাগিল। তখন শচী রাগ করিয়া হাতে ঠেঙ্গা ধরিলেন, আর নিমাই দৌড় মারিল।

এখানে তাহাই হইতেছে। প্রভু সন্ন্যাসীঠাকুরের মনোগত ভাব বুঝিলেন, তাই চুপ করিয়া রহিলেন। প্রভু যদি কোন উত্তর দিলেন না অথচ অল্প অল্প হাসিতে লাগিলেন। তখন শচী যেরূপ করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসী তাই করিলেন। অবশ্য ঠেঙ্গা ধরিলেন না, তবে ক্রোধ করিলেন, করিয়া প্রভুকে নানা মন্দ বলিতে লাগিলেন।

অল্প হাসিল প্রভু মুখ ফিরাইয়া।
ভাল মন্দ নাহি কহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিরক্ত হইয়া অবশেষে ন্যাসীবর॥
প্রভুকে কহেন তুমি নাহি কহ বাণি।
সুপণ্ডিত বলিয়া তোমারে নাহি মানি॥

এখানে কড়্চা হইতে উদ্ধৃত করিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। সন্ন্যাসী বলিতেছেন।

সুপণ্ডিত বলিয়া তোমারে নাহি মানি।
সর্ব্বলোকে বলে তুমি বড়ই পণ্ডিত।
মুহি দেখি জ্ঞান নাহি তোমার কিঞ্চিত॥
দেশ শুদ্ধ হরিবোল্না করিয়াছ তুমি।
তোমার কিঞ্চিত গুণ নাহি দেখি আমি॥
শুনেছি শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু মুখে নাহি কথা।
ভ্রমিয়া বেড়াও ভিক্ষা করি যথাতথা॥
বিদ্যা নাহি জ্ঞান নাহি বিচার করিতে।
তবে কেন মূর্খ লোকে ভোলে আচম্বিতে॥
কি জানি কেমন ছলে কৌশল করিয়া।
সূক্ষ্মতত্ত্ব সর্ব্বলোকে দেও দেখাইয়া॥
এ দেশের মূর্খলোকে হরিবোলা করি।
কেমনে যাইবে তুমি বুঝিব চাতুরী॥
শক্তি যদি থাকে তবে করহে বিচার।
এইবারে বুদ্ধিশুদ্ধি বুঝিব তোমার॥
এত বলি ভারতী গোসাঞি দৌড় দিল।
তিন সঙ্গী সহ পুনঃ আসিয়া মিলিল॥

চারিজনে বসিল প্রভুর চারিভিতে।
এই রঙ্গ দেখি প্রভু লাগিল হাসিতে॥
ভারতী বলিল তুমি উড়াও হাসিয়া।
মুহি যাহা বলি তাহা দেখ আলোচিয়া॥

ভারতী বলিতেছেন, এই তিন জন মধ্যস্থ রহিলেন। তুমি আমাকে বুঝাইয়া দাও যে আমাদের উপাস্য কে?

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রভু কখন বা কাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বশীভূত করিতেন, তাহার উদাহরণ এই একটি দেখুন। প্রভু তখন রহস্য ভাব ছাড়িয়া দিলেন, দিয়া গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন। হে পণ্ডিত! আমি বিচার জানি না, তাহাতে আবার তুমি অত বড় পণ্ডিত, তোমার নিকট আমি শত বার হারি মানিলাম।

চাহ যদি জয়পত্র লিখে দিতে পারি।
তোমার বিচারে আমি মানিলাম হারি॥

যোগীর বিচার ইচ্ছা নয়, জয়ও ইচ্ছা নাই। তাহার প্রার্থনা জ্ঞান উপার্জ্জন, তাই কাতর ভাবে প্রভুর পানে চাহিতে লাগিলেন। তখন প্রভুর দয়া হইল। প্রভু বলিলেন "আমি ভগবান্", "আমিও যে তিনিও সে" এ সমুদায় দম্ভ ত্যাগ কর। করিয়া সেই মধু হইতে মধু যে ভগবান তাহাকে ভজনা কর। তাহা হইলে শান্ত হইবে, সুখ পাইবে। ইহা বলিয়া প্রভু কৃষ্ণকথা, অর্থাৎ কৃষ্ণের মাধুর্য্য বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। একে কৃষ্ণের কথা, তাহাতে আবার প্রভুর মুখে কাযেই সুধাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভক্তগণ অবশ্য জানেন যে যাহার ভক্তি উদয় হয় তাহার সমুদায় লাবণ্যময় হয়, ও স্বর মধু হয়। আবার এরূপ অবস্থাপন্ন ভক্তের মুখে কৃষ্ণ নাম কি মধু, তাহা যিনি শুনিয়াছেন তিনি জানেন। তাই পদ, "কেবা শুনাইল শ্যাম নাম?" তাই পদ "লইতে কৃষ্ণ নাম জিহ্বা নাচে অবিরাম।" প্রভু

কৃষ্ণ কথা কইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে বিভাবিত হইলেন। (যেমন প্রাচীন পদে আছে।)

রাইধ্বনি কৃষ্ণকথা কইতে ছিল।
কথা কইতে কইছে মুরছিল॥

সেইরূপ কৃষ্ণকথা কইতে প্রভুর কথা ঘন হইয়া আসিল, গদগদ হইলেন, বলিতে জান বলিতে পারেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। পরে কাজেই কৃষ্ণকথা বন্ধ হইল।

পড়িতে লাগিল অশ্রু হৃদয় বাহিয়া।
কৌপিনে গ্রন্থি ক্রমে যাইল খসিয়া॥
থর থরি হৃদ্ কম্প শরীর ঘামিল।
কৃষ্ণ বলি ডাক দিয়া ঢলিতে লাগিল॥
কৃষ্ণ হে কোথায় আজ প্রভু দয়াময়।
ভক্তি বিতরিয়া কর বিশুদ্ধ হৃদয়॥
এই কথা বলি প্রভু কান্দিতে লাগিল।
মনের আবেগ ক্রমে দ্বিগুণ বাড়িল॥
ভাল মন্দ কথা নাহি শুনে বিশ্বম্ভর।
ফুলে ফুলে কান্দিতে লাগিল বিশ্বম্ভর॥
তমালের বৃক্ষ এক সমুখে দেখিয়া।
কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়া ধরে জড়াইয়া॥

তখন যোগী প্রভুর চরণে পড়িলেন। বলিতেছেন আমি বিচার চাই না, আমি জয় চাই না, আমি ভক্তি চাই। প্রভু আর তখন সে সমুদায় কিছু শুনিতে পাইতেছেন না। তবে,

অশ্রুজলে প্রভু মোর পৃথিবী ভিজায়।
মহা ভাবাবেশে অঙ্গ স্তম্ভিত হইল।
সোণার দোসর দেহ ধুলায় পড়িল॥

কৃষ্ণ বলি পৃথিবীতে প্রভু গড়িযায়।
ধুলায় ধুসর অঙ্গ বিন্ধিল কাটায়॥

প্রভুর অল্প বাহ্য হইল, দেখিলেন সন্ন্যাসী ব্যাকুল হইয়া কান্দিতেছেন। তখন পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করুন। প্রভু সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করিয়া এ কথা বলিতেই তাঁহার প্রেমোদয় হইল।

কেমন প্রভুর কৃপা কহনে না যায়।
প্রেমে মত্ত হয়ে যোগী ধূলায় লুটায়॥
যোগী বলে তুমিই আমার কৃষ্ণ হবে।

মহাত্মাগণকে ভক্তগণ স্তুতি করিয়া থাকেন, বলেন, তুমি পরম ভক্ত, তুমি ভগবানের কৃপার পাত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু প্রভুকে এরূপ স্তুতি কেহ করিত না। যিনি স্তুতি করিতেন, তিনি বলিতেন তুমিই সেই কৃষ্ণ, তুমিই সেই ভগবান। কারণ তাঁহার সঙ্গলাভ করিলেই মনে এই ভাব হইত যে, ইনি মনুষ্য হইতে বড়।

প্রভু সেই স্থান ত্যাগ করিবেন, ঈশ্বর ভারতী আসিতে দিবেন না। বলিতেছেন, "আমি তোমায় ভক্তিডোরে বাঁধিয়া রাখিব, যাইতে দিব না।"

ঈশ্বর ভারতী তবে এতেক বলিয়া।
জোরে টানাটানি করে খড়ম ধরিয়া।
প্রভু বলেন কৃষ্ণে তোমার এতেক বিশ্বাস।
আজি হতে তব নাম হইল কৃষ্ণদাস।

প্রভুর আশ্রয় লইলেই, যে এরূপ ভাগ্যবান তাহার নাম পরিবর্ত্তিত হয়, নাম প্রভু স্বয়ং রাখেন, আর নাম প্রায়ই কৃষ্ণদাস, না হয় হরিদাস এইরূপ।

প্রভুর ভক্তের মধ্যে হরিদাস ও কৃষ্ণদাস নামধারী অসংখ্য লোক ছিলেন। তবে বিশেষ লোকের বিশেষ নাম দাখা হইত, যেমন রূপ আর সনাতন,

এই নাম প্রভু দুই ভাইকে দর্শন মাত্রে অর্পণ করেন। প্রভু চণ্ডীপুর ত্যাগ করিয়া দুই দিবস জনমানব শূন্য পর্ব্বত দিয়া চলিলেন।

কেবল কদম্ব বৃক্ষ দেখি সারি সারি।

দুই জনে চলিতেছেন, ইহার মধ্যে দেখেন ব্যাঘ্র জলপান করিতেছে, গোবিন্দ উহা দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া প্রভুর নিকট ঘনাইয়া গেলেন ও শব্দ না করিয়া প্রভুকে ইঙ্গিত দ্বারা উহা দেখাইয়া দিলেন।

মোর ভাবগতি দেখি ঈষৎ হাসিয়া।
বলে তুমি ভয় কর কিসের লাগিয়া॥
হরিনাম বলে নাহি রহে যম ভয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাক না কর সংশয়॥

গোবিন্দ বলিতেছেন, ইহা প্রভুর মুখে শুনিয়া আমি নির্ভীক হইলাম। ব্যাঘ্র কিন্তু উহাদিগকে দেখিতে পায় নাই। আর একদিকে চলিয়া গেল, পরে তাঁহারা এক দরিদ্র পল্লীতে গমন করিলেন। প্রভুকে এক বৃক্ষতলে বসিতে দেখিয়া গোবিন্দ এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর বাড়ী ভিক্ষা করিতে গেলেন। ব্রাহ্মণ বলেন, আমার দিবার কিছুই নাই, কিন্তু তাই বলে অতিথি ফিরাইতে পারি না, আপনি অপেক্ষা করুন্। ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বাহির হইলেন, একটু পরে দুটা নারিকেল আনিয়া দিলেন, সেই সে দিনকার আহার হইল। সন্ধ্যাকালে প্রভু তাহাদের বাড়ীতে গমন করিলেন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী উভয়ে করযোড়ে প্রভুর অগ্রে দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, আমরা অতি দরিদ্র, আমার ঠাকুর গোপাল আছেন, ভিক্ষা করিয়া তাঁহার সেবা করি। আমি এরূপ দরিদ্র যে বসিতে আসন দিব, তাহাও আমার নাই। হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, প্রভু জানিয়া শুনিয়া এরূপ দরিদ্রের বাড়ী কেন গমন করিলেন, কিন্তু কারণ ছিল। ব্রাহ্মণ যখন বলিলেন যে, বসিতে যে দিব তাহার আসনখানি

পর্য্যন্ত নাই, তখন ব্রাহ্মণী বলিতেছেন, "ঠাকুর! তুমি আসন আর কি দিবে, মাথা পেতে দাও, দেখিতেছ না স্বয়ং গোপাল আসিয়াছেন। ভোগ আর কি দিবে, শ্রীপাদপদ্মে তুলসী চন্দন দাও।" ব্রাহ্মণ তাহাই করিতে গেলেন, কিন্তু প্রভু করিতে দিলেন না, তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, করিয়া বলিতেছেন, দেখ আমি সামান্য মানুষ, এই তুলসী চন্দন গোপালকে দাও।" বিপ্র বলেন, ভাল তুমি আমাদের ন্যায় মানুষ, কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে বল দেখি :—

তব অঙ্গে সৌদামিনী খেলা করে কেন।
তব দেহে পদ্মগন্ধ অনুমানি হেন॥
তুমি যদি ভগবান নহ দয়াময়।
তবে কেন তব অঙ্গে পদ্ম গন্ধ কয়?

এই যে প্রভুর অঙ্গে সর্ব্বদা পদ্ম গন্ধের কথা ও সৌদামিনী খেলার কথা, ইহা গোবিন্দ বারম্বার বলিয়াছেন। পদ্মগন্ধ সর্ব্বদায়, সৌদামিনী মাঝে মাঝে প্রকাশ পাইত। যে ভাগ্যবান, যেখানে প্রভুর আপনাকে লুকাইবার কোন কারণ নাই, সেখানে ঐ বিদ্যুল্লতা অতি জাজ্বল্যরূপে প্রকাশ হইত।

প্রভু ত্রিবাঙ্কুর ত্যাগ করিয়া ক্রমে মহারাষ্ট্রীয় দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেখানে অনেকগুলি অদ্ভুত লীলা করেন। প্রভু গুর্জ্জরী নগর ছাড়িয়া পুনা যাইবেন মনস্থ করিলেন। কিন্তু তাহা না করিয়া একবারে বিজাপুরে গেলেন। সেখান হইতে পাণ্ডুপুরে বা পাণ্ডারপুরে গমন করিলেন। যেখানে তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপ অতি আশ্চর্য্যরূপে নিত্যধামে চলিয়া যান। শিবানন্দ সেন তখন সেখানে ছিলেন। তিনি দেখিলেন বিশ্বরূপের আত্মা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তাহা দেখিয়া শিবানন্দ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

বহুকাল হইল যখন আমরা বোম্বাই নগরে থিওসোফিষ্টগণের অতিথি হইয়া, তাহাদের সাধনপদ্ধতি শিখিতেছিলাম, তখন কেবল প্রথম তাঁহারা আসিয়াছেন, একটী পার্সি ব্যতীত আর কাহারও সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ হয় নাই। একদিন তাঁহাদের প্রাচীর-পরিবেষ্টিত একটা বাঙ্গলার বারান্দায় আমি ও অল্‌কট সাহেব একটী মান্দুরে শয়ন করিয়া গল্প করিতেছিলাম। ইহার মধ্যে শুনিলাম যে কীর্ত্তন হইতেছে। "কীর্ত্তন" হইতেছে কেন বলি? কারণ খোল করতাল বাজাইতেছিল, কীর্ত্তনের সুরে গীত গাওয়া হইতেছিল, আখর দেওয়া হইতেছিল। মোটামুটী আমাদের দেশে যেরূপ কীর্ত্তন হয়, ঠিক সেইরূপ শুনিলাম। প্রথমে লক্ষ করি নাই, পরে যেন কর্ণে নিতাই গৌরের নাম শুনিলাম। তখন চমকিয়া উঠিলাম, ভাবিলাম এ আবার কি ব্যাপার, অনুসন্ধান করিতে হইবে, যাইয়া দেখি তাঁহারা চলিয়া গিয়াছে, আর তাঁহাদের ঠিকানা পাইলাম না। ইহাতে একটু বিমর্ষ হইলাম, কিন্তু এ কথাটী আমাদের বরাবর মনে রহিয়া গেল।

এখন শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগচী, তিনি দেহ রাখিয়াছেন, কিরূপে গৌরভক্ত হইলেন তাহা তিনি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বাটী শ্রীনবদ্বীপে, কিন্তু ইংরাজি পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া কিছু মানিতেন না। তাঁহার দক্ষিণদেশে ইলোরার গহ্বর দেখিতে ইচ্ছা হয়। এই গহ্বরের মধ্যে প্রাচীন নানাবিধ ভগ্নপ্রায় মন্দির আছে, যাহা দেখিতে পৃথিবীর অনেক লোক সেখানে গিয়া থাকেন। প্রভু এখন যেখানে বেড়াইতেছেন অর্থাৎ পাণ্ডুপুর, তাহারি নিকটে ইলোরা। রামযাদব বাবু কষ্টে শ্রষ্টে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখেন কি সেখানে একটী শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে, আর সন্ধ্যার সময় সেই মন্দিরে আরতি হইতেছে।

কিন্তু আর এক কাণ্ড দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি

দেখিতেছেন যে, সেই বিগ্রহের সম্মুখে আমাদের দেশীয় খোল করতাল ইয়া ঐ দেশীয় কয়েক জন বৈষ্ণব সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। আমাদের ঙ্কীর্ত্তন বলার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও সে কীর্ত্তন-ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্তু তবু ইহার অন্যান্য আকৃতি ঠিক আমাদের সঙ্কীর্ত্তনের মত। রামযাদব বাগচী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছেন। এমন সময় সেই কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম শুনিলেন। ইহাতে তাঁহার শরীর বিস্ময়ে কাঁপিয়া উঠিল। এই নিবাড় জঙ্গলে, এই বহু দূরদেশে, এই খোল করতাল, এই কীর্ত্তন, আর আমাদের নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ কুমারটীর নাম কিরূপে আইল? এই ভাবিতে ভাবিতে রামযাদব বাবু বিভোর হইলেন।

কীর্ত্তনান্তে বৈষ্ণবগণের নিকট ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাহারা কিছুই বলিতে পারিল না। তখন রামযাদব বাবুর এই সংকল্প হইল যে, ইহার তথ্য না জানিয়া যাইবেন না। এই উদ্দেশে সেখানে রহিয়া গেলেন। দুই দিবসের অনুসন্ধানে একটি প্রাচীন বৈষ্ণব পাইলেন, যিনি ইহার তথ্য বলিলেন। তিনি বলিলেন যে, তোমাদের বাড়ী যে বঙ্গদেশে সেই বঙ্গদেশ হইতে এই খোল করতাল ও এই কীর্ত্তন আসিয়াছে। কিরূপে আইল ইহা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "তোমাদের দেশের যিনি চৈতন্যদেব তিনি এই মন্দিরের সম্মুখে নৃত্য করিয়াছিলেন। সেই হইতে এই বঙ্গীয় কীর্ত্তন ইত্যাদি এখানে আসিয়াছে, আর অদ্যাপি আছে।"

এ কিরূপ অদ্ভুত কাণ্ড একবার বিচার করুন। চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে পথে যাইতে যাইতে সেই ইলোরার মন্দিরের সম্মুখে শ্রীগৌরাঙ্গ নৃত্য করিয়াছিলেন, আর সেই কথা, সেই তরঙ্গ অদ্যাপি আছে। একবার এই বিষয়টী অনুভব করুন, তবে বুঝিবেন যে রামযাদব বাবু কি ভাবে মোহিত হইলেন। "এখানে তোমাদের চৈতন্যদেব ত্য করিয়াছিলেন।"

বৈষ্ণব ইহাই বলিলেন। কেবল নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মের বীজ বপন করা হইয়াছিল। রামযাদব বাবু ভাবিলেন, তাঁহার বাড়ী শ্রীনবদ্বীপে, তিনি গৌরাঙ্গের কিছুই তথ্য জানেন না। আর এই ইলোরায় তাঁহাকে পূজা করে। ইহাই ভাবিয়া তাঁহার ধিক্কার হইল। আর তখন তিনি গৌরাঙ্গ প্রভুকে তল্লাস করিতে লাগিলেন। তল্লাস করিতে গিয়া প্রায় যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইল, অর্থাৎ তিনি বান্ধা পড়িলেন।

প্রভু পাণ্ডুপুর বা পাণ্ডারপুর গেলেন। এ অতি পবিত্র স্থান, ভীমা-নদীর ধারে, যাহাকে দেশীয় লোকে গঙ্গা বলেন। এখানে অনেক সন্ন্যাসী বাস বা আসা যাওয়া করেন। এখানে তুকারামের বাস ছিল, যে তুকারাম মহারাষ্ট্রীয় দেশ ভক্তিতে প্লাবিত করেন। এখন এই তুকারামের কাহিনী শ্রবন করুণ। বহুদিন হইল যখন আমি পুনা নগরে গমন করি, তখন কথায় কথায় এক ভদ্র মজলিসে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম করিয়াছিলাম, তাহাতে বম্বে প্রদেশের অতি প্রধান পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান, শ্রীযুক্ত মহাদেব রাণাডে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, তোমাদের যেমন চৈতন্য আছেন, আমাদের তেমন তুকারাম আছেন। সকলেই আপনার আপনার দ্রব্য বড় দেখে। তুকারামের মাহাত্ম্যের কথা যদি তুমি জানিতে তবে আর তোমার চৈতন্যকে বড় বলিতে না।

শ্রীযুক্ত রাণাডে মহাশয়ের কথায় আর কি উত্তর দিব, কিন্তু তুকারামের কথা আমি সেই প্রথম শুনিলাম। ইহাতে কাজেই তুকারামের বিষয় অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। অনুসন্ধান দ্বারা জানিলাম, যে তুকারাম যদিও সর্ব্ব মহারাষ্ট্রে পূজিত, তবুও অতি নীচ জাতীয়। তিনি রাধাকৃষ্ণ ভক্ত, কোলাপুরের সাতারা ও পুনার নিকট ভীমানদীর তীরস্থ পাণ্ডুপুরবাসী ছিলেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের আর এক মূর্ত্তি বিট্‌ঠলদেব আছেন, তাঁহাকে পূজা করিতেন। তাঁহার প্রেম অকথ্য, আর শিষ্য অগণন,

তিনি বিট্‌ঠলের সম্মুখে গীত গাহিতেন ও নৃত্য করিতেন। সেই গীতগুলিকে আভঙ্গ বলে।

তিনি যেমন গীত গাহিতেন, অমনি তাঁহার ভক্তগণ উহা লিখিয়া রাখিতেন। তাহাতে তুকারামের আভঙ্গ বলিয়া একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হয়।

আর শুনিলাম তুকারাম ভজন করিতে করিতে সশরীরে রথে আরোহণ করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে বৈকুণ্ঠে আরোহণ করেন। অদ্যাপি পুনা দেশের পণ্ডিতগণ ব্যতীত প্রায় অনেকেই তাহার শিষ্য। পুনা নগরে তুকারাম সম্বন্ধে এই কাহিনী শুনিলাম। তাঁহার কয়েক বৎসর পরে ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক আমার সহিত দেখা করিতে আইসেন। তাঁহার নিকট আমি তুকারামের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। পণ্ডিত বিশ্বনাথ ইংরাজি ও সংস্কৃত বিদ্যায় পরম পণ্ডিত। তিনি তুকারামের সংবাদ কিরূপে জানিবেন, তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না। যাহা হউক তিনি কৃপা করিয়া তুকারামের একখণ্ড আভঙ্গ আমাকে আনাইয়া দিলেন। এখানি বড় গ্রন্থ, মুদ্রিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাহারা বুঝেন তাহাদের নিকট আভঙ্গের অর্থ করিয়া লইতে লাগিলাম।

দেখিলাম যে তুকারাম আমাদের গোষ্ঠি। ব্রজের নিগূঢ় রসের অধিকারী, ইহাতে নিতান্ত বিস্মিত হইলাম।

তখন ভাবিলাম তুকারাম এরস কোথায় পাইলেন? এত শ্রীগৌরাঙ্গের পথ, ইহাত "অনর্পিত", ইহা ত অন্য স্থানে গোচর নাই, তুকারাম কি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা পাত্র?

তাহার পরে তুকারামের আভঙ্গে তিনি কিরূপে গুরুর নিকট কৃপা পারেন তাহার বিবরণ দেখিতে পাইলাম। সেটী এই,—

সদ্‌গুরু রায়েন কৃপা মুঝো কেলি।

পরি নাহি ঘটলি সে ওয়া কাঁহি।
সাপড় বিলে ওযাটে যাতা গঙ্গাস্নান।
মণ্ডকি তুজান ঠেকাইল কর।
ভোজন মাগতি তুপ পাওসের।
পড়িল বিসর স্বপ্না মাজি।
কাঁহি করে উপজলা আগুরায়।
মানোনিয়া কাজ তরা গাজি।
রাঘব চৈতন্য কেশব চৈতন্য।
সাঙ্গিতলি খুন মাড়ি কেচি।
বাবাজি আপলেঁ সাঙ্গিতলে নমোঙ্গ।
মন্ত্র দিলা রাম কৃষ্ণ হরি।
মাঘ শুক্ল দশমী পাহুনা গুরুবার।
কেলা অঙ্গিকার তুকা ভনে।

এই অভঙ্গের মোটামুটী বঙ্গানুবাদ করিতেছি—

প্রভু গুরু তিনি আমায় করিলেন কৃপা।
কিন্তু আমাহতে তাঁহার নাহি হলো সেবা॥
আমি যেতেছিনু করিবারে গঙ্গাস্নান।
মোর শিরে প্রভু কর করিলা প্রদান॥
প্রভু মোরে চেয়েছিল ঘৃত আর অন্ন।
আমি দিতে নারিনু হয়ে ছিনু অচেতন॥
কিছু নাহি জানি পরে কিবা ঘটেছিল।
কোন কার্য্যের তরে প্রভু কোথা চলি গেল॥
রাঘব চৈতন্য আর কেশব চৈতন্য।
তাঁর কথা বলি দেখাইল এক চিহ্ন॥

বাবাজি বলিয়া বলিল নিজ নাম।
রামকৃষ্ণ হরিনাম করিলেন প্রদান ॥
মাঘ শুক্ল দশমী গুরুবার দিনে।
প্রভু কৃপা মোরে কৈল তুকারাম ভণে॥

এখন ইহার পরিষ্কার অর্থ করিতেছি। তুকা নিজের কাহিনী এইরূপ বলিতেছেন। একদিন মাঘ মাসে বৃহস্পতিবারে শুক্ল দশমী তিথিতে আমি গঙ্গা। ভীমাকে পাণ্ডুপুরে গঙ্গা বলে) স্নানে যাইতেছিলাম। ইহার মধ্যে প্রভু দর্শন দিলেন। দিয়া আমার মাথায় হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহাতে আমি অচেতন হইলাম। আমাকে রাম কৃষ্ণ হরি এই তিনটী নাম দিলেন। আর কি সঙ্কেত করিলেন, আর রাঘব চৈতন্য কেশব চৈতন্য বলিলেন। আর আপনাকে বাবাজী বলিলেন, প্রভু আমার নিকট তণ্ডুল ও ঘৃত চাহিলেন। কিন্তু তিনি আমার মস্তকে হস্ত দিলে আমি অচেতন হইয়া পড়ি, তাহার পর চেতন পাইয়া দেখি যে, স্বেচ্ছাময় প্রভু নিজের কার্য্যের নিমিত্ত কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না।

তুকারাম যে প্রভুর সেবা করিতে পারেন নাই, তণ্ডুল ও ঘৃত দিতে পারেন নাই, সেই ক্ষোভ চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় ছিল।

তুকারাম বলিতেছেন যে, তাঁহার প্রভু হরি কৃষ্ণ রাম এই তিনটি নাম দিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই শ্রীগৌরাঙ্গের মহামন্ত্র যাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব জপ করেন, সেটি এই :—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে ॥

প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গের মহামন্ত্র হরি কৃষ্ণ ও রাম এই তিনটি নাম। তুকারাম যে রূপ কৃপা প্রাপ্ত হন, শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ রূপে অনেক সময় ভক্ত-

গণকে কৃপা করিতেন তাহা সকলে জানেন। বিশেষতঃ যখন দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করেন, প্রভু তখন কেবল স্পর্শ করিয়া জীবকে সমুদায় শক্তি সঞ্চার করিতেন। যথা, চরিতামৃতে—

নবদ্বীপে সেই শক্তি না কৈল প্রকাশ।
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণদেশ॥

কৃপাময় পাঠক, দেখিবেন যে, প্রভু এইরূপে কৃপা করিতে করিতে আসিতেছেন, এইরূপে প্রভু পাণ্ডুপুর তুকারামের স্থানে গমন করিলেন। এই যে মহাভাগবত সৃষ্টি করিতে করিতে প্রভু যাইতেছেন, তাহারা অনেকে তিনি যে কে, কোথা বাড়ী, কি নাম, কিছুই জানিতে পারিলেন না। প্রভু "কৃষ্ণ কেশব পাহিমাং রাম রাঘব রক্ষমাং" বলিতে বলিতে যাইতেছেন। এমন সময় ভীমানদীতীরে তুকারামকে দেখিলেন। প্রভু তাহাকে দেখিয়া মাথায় হস্ত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ও কর্ণে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র দিলেন। তাহার সঙ্গে যে ভক্তটি ছিলেন, বোধ হয় তিনি তণ্ডুল ও ঘৃত চাহিয়া থাকিবেন। আর সেই ভৃত্য হয়ত বলিয়া থাকিবেন, যে প্রভুর নাম কৃষ্ণচৈতন্য। কিন্তু প্রভু যখন তুকারামকে স্পর্শ করিয়া কর্ণে মন্ত্র দিলেন, তখন তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। ভৃত্যের কাছে শুনিলেন প্রভুর নাম কৃষ্ণচৈতন্য, আর প্রভুর মুখে রাম রাঘব কৃষ্ণ কেশব শ্লোক শুনিলেন। ইহাতে বাবাজীর নাম কেশবচৈতন্য কি রাঘবচৈতন্য এইরূপ কি হইবে সাব্যস্ত করিলেন। বস্তুতঃ এক সন্ন্যাসীর দুই নাম হইতে পারে না। তুকারাম অচেতনাবস্থায় যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে সাব্যস্ত করিলেন যে তাহাতে তাঁহার প্রভুর নাম, হয় রাঘবচৈতন্য, নয় কেশবচৈতন্য হইবে। বিশেষতঃ সাধুগণের বাবাজি আখ্যা কেবল বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, আর কোথায় নয়।

আর একটু বিস্তার করিয়া বলি। তুকা বলিতেছেন যে গুরুর সহিত

পথে দেখা হয়, দেখা হইলে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন, তাহাতেই আমি অচেতন হই।

এ গুরু কে? এ শক্তি কেবল মহাপ্রভু জগতে দেখাইয়া গিয়াছেন।

গুরুর কাছে কি তত্ত্ব শিখিলেন? শিখিলেন ব্রজের নিগূঢ় রস, যাহা জগতে পূর্ব্বে ছিল না। বৈষ্ণবগণের শ্রীরামানুজ প্রভৃতি চারি সম্প্রদায়, এই রস অপর কোন সম্প্রদায়ে নাই, কেবল মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে আছে, সুতরাং এ গুরু, হয় মহাপ্রভু স্বয়ং, না হয় তাঁহার কোন ভক্ত।

তিনি কে?

তুকা। তাহাকে চিনি না, একবার মাত্র তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। দেখিয়াই অচেতন হই, এমন কি তিনি যে চাউল আর ঘৃত চাহেন তাহা দিতে পারি নাই।

একটু ঠাহরিয়া দেখ দেখি তিনি কে বলিতে পার কি?

তুকা। তিনি আমাকে তিনটী নাম দেন, সে কৃষ্ণ, হরি ও রাম।

এ তিনটী নাম মহাপ্রভুর বহিরঙ্গের পক্ষে মূলমন্ত্র। অতএব ইহাতে বোধ হয় সেই গুরু শ্রীমহাপ্রভু।

আর কিছু মনে পড়ে?

তুকা। তাঁহার নাম শুনিলাম যেন কি চৈতন্য, কেশবচৈতন্য কি রাঘবচৈতন্য।

মহাপ্রভুর নাম কৃষ্ণচৈতন্য, সুতরাং নাম শুনিলেও বোধ হয় যে, তুকারামের গুরু আর কেহ নহে মহাপ্রভু। তাহা যদি হইবে তবে তুকা "কেশব", "রাঘব" এ দুটী কথা কোথা পাইল? তাহার উত্তর যে মহাপ্রভু "কৃষ্ণ কেশব রক্ষমাং" "রাম রাঘব রক্ষমাং" বলিতে বলিতে পথে যাইতেন।

তুকা। যেন তাঁহার আর এক নাম শুনিলাম, "বাবাজী"।

এই বাবাজী শব্দ কেবল বাঙ্গালায় প্রচলিত বৈষ্ণব ভক্তগণকে বুঝায়। অতএব এই গুরু বাঙ্গালী।

ভাল তোমরা কোন সম্প্রদায়ে বৈষ্ণব ?

তুকা। আমরা চৈতন্য সম্প্রদায়ের।

এখন দেখুন জগতে চৈতন্য এক বই নাই। আমরা দেখিতেছি যে মহাপ্রভু সেই সময় সেই পাণ্ডারপুর গিয়াছিলেন, আর আমরা দেখিতেছি তিনি এইরূপে আচার্য্য সৃষ্টি করিতে করিতে যাইতেছিলেন।

কেহ বলেন যে তুকা মহাপ্রভুর পরে প্রকাশ হয়েন, খুব সম্ভব ইহা ভুল। আর যদি তাহা না হয়, তবে সেই তুকার গুরু প্রভুর কোন ভক্ত তার সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে তিনি চৈতন্য সম্প্রদায়ে ভুক্ত হইতেন না।

তুকারাম দিবানিশি প্রেমানন্দে মত্ত থাকিতেন, আর সেই অবস্থায় বিট্ঠলদেবের অগ্রে নৃত্য ও তখনি রচনা করিয়া গীত গাহিতেন। তুকারাম ও তাঁহার শিষ্যগণ আপনাদিগকে চৈতন্য সম্প্রদায় বলিয়া পরিচয় চিরদিন দিয়া আসিতেছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ দ্রুতবেগে অগম্য দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করিলেন। যেখানে উপযুক্ত পাত্র দেখিতেন, সেখানে তাহাকে কৃপা করিতেন, যদি সে পথের মাঝে না থাকে তবে পথ ত্যাগ করিয়া বিপথ দিয়া তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে কৃপা করিতেছেন। প্রভুর সময় অতি অল্প, দুই এক বৎসরের মধ্যে সমুদায় দক্ষিণদেশে ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। তাই যখন অন্তর্যামী প্রভু জানিলেন যে কোন স্থানে একটী বিষবৃক্ষ আছে সেই স্থানে যাইয়া, সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষটী কর্ত্তন করিয়া সেই স্থানে একটী অমৃত বৃক্ষ রোপণ করিতেছেন। প্রভু শিশু বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া যাহাতে বীজ হইয়াছে এইরূপ বড় বড় বৃক্ষের নিকট যাইতেছেন। শিশু বৃক্ষেতে বীজ ফলে না,

বর্দ্ধিত বৃক্ষে বীজ ফলে। উপযুক্ত পাত্র দেখিলে তাহাকে আশ্চর্য্য শক্তি দিতেছেন।

এইরূপে ভুবন-পাবন আচার্য্য সৃষ্টি করিতে করিতে দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিলেন। প্রভু কেবল স্পর্শ করিয়া হৃদয়ে যে ব্রজের রস প্রবেশ করাইতেন, ইহা অনানুষিক শক্তি। মূর্খ নীচ জাতি তুকারাম প্রভুর স্পর্শ পাইল, আর তাহার হৃদয়ে সমস্ত উজ্জ্বল নীলমণির রস স্ফুরিত হইল ইহা অমানুষিক শক্তি সন্দেহ নাই।

পাণ্ডুপুর হইতে অল্প দূরে ইলোরা প্রাচীন মন্দির সমূহ, সেখানে রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে, প্রভু সেখানে গমন করেন, রামযাদব বাবু সে মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। আর সেখানে তিনি কি জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। চরিতামৃত সংক্ষেপে এইরূপ বলিয়াছেন, যথা—

কোলাকুল লক্ষ্মী দেখি ক্ষীর ভগবতী।
লাঙ্গা গণেশ দেখি চোরা ভগবতী॥
তথা হইতে পাণ্ডুপুর আইল গৌরচন্দ্র।
বিট্‌ঠল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্দ॥

আমরা একটু অগ্রে বলিয়াছি যে তুকারাম যেরূপ পুনর্জন্ম লাভ করিলেন তাহা জানিলেই মনে হয় যে, এ প্রভুর কার্য্য অন্যের নহে, অন্য এরূপ শক্তি দেখাইতে পারেন নাই। ভক্তিভাজন বৃন্দাবনের পরম পণ্ডিত ও ভক্ত শ্রীমধুসূদন গোস্বামী আমাকে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। "আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভু কখন কি করিতেন তাহা কাহাকেও বলিতেন না। কোথায় কি করিয়া আসিয়াছেন তাহাও বলিতেন না। সুতরাং তাঁহার অনেক লীলা অপ্রকাশ আছে। কিন্তু আমাদের এই পশ্চিম দেশে মহাপ্রভুর একটী শাখা আছে। তাঁহারা বলিয়া থাকেন আমরা থানেশ্বরী শ্রীজগন্নাথের পরিবার। এই থানেশ্বরী গ্রামটী কুরুক্ষেত্রের

নিকটাবস্থিত তাহা জানেন। থানেশ্বরী জগন্নাথের বংশধর লোকেরা এই আখ্যায়িকা বলিয়া থাকেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু থানেশ্বর যাইয়া শ্রীজগন্নাথ পণ্ডিতের দরজার সম্মুখে একটা বৃক্ষমূলে তিন দিন তিন রাত্র উপবেশন করিয়াছিলেন। জগন্নাথ, শঙ্করমতানুযায়ী বেদান্তের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কাহাকে গ্রাহ্য করিতেন না, বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় অথবা বাড়ী আসিবার সময় প্রভুকে দেখিয়া একটু হাসিয়া চলিয়া যাইতেন। শ্রীপ্রভু ও নেত্র নিমীলন করিয়া হরিনাম করিতেন, আর কাহার সহিত কথা কহিতেন না। গ্রামের সহস্র সহস্র লোক প্রভুকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকিত ও সঙ্গে সঙ্গে নাম করিত, তাহা দেখিয়া পণ্ডিতের আরো হাসি পাইত। পণ্ডিতপ্রবর যখন প্রভুকে দেখিয়া হাসিয়া যাইতেন, প্রভু সেই সময় পণ্ডিতের দিকে সজল নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেন। পণ্ডিত যদিও বিদ্যাদর্পে হাসিতেন, কিন্তু প্রভুর দৃষ্টিপাত সময় তাহার মন কেন অস্থির হইত, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না, তিনি প্রভুকে হাসিয়া যাইবার সময় একটী কথা বলিয়া যাইতেন, সেটী এই, "অহংব্রহ্মোহস্মি।" কেবল মাত্র তিন দিনের মধ্যে কয়েকবার প্রভুর কৃপা দৃষ্টি লাভ করিয়াও শ্রীমুখের হরিনাম শ্রবণ করিয়া চতুর্থ দিবসের প্রাতঃকালে তাঁহার পূর্ব্বকার যে বাক্য "অহংব্রহ্মোহস্মি" উহা পরিত্যাগপূর্ব্বক যোড়হস্তে ক্রন্দন করিয়া, "তত্ত্বমসি তত্ত্বমসি" বলিতে বলিতে প্রভুর পাদপদ্মে শরণাপন্ন হইলেন। প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিয়া অন্যত্র যাত্রা করিলেন, পণ্ডিতও প্রভুর বিরহে কাতর হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন এবং তথায় শ্রীমদ্রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর আশ্রয়ে রহিলেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ পশ্চিমোত্তর প্রদেশের নানাস্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর দোহাই দিয়া জীবোদ্ধার করিতেছেন।"

এইরূপ জীবোদ্ধার পদ্ধতি দেখিলেই প্রভুর কথা মনে পড়ে। প্রকৃত

এই কাহিনী তুকারামের কাহিনীর সহিত অনেক ঐক্য হয়। তুকারামের গণ দক্ষিণে আর থানেশ্বরী জগন্নাথের গণ উত্তরে। তুকারামের গণেরা বলেন তাঁহারা চৈতন্য সম্প্রদায়। জগন্নাথের গণেরাও তাহাই বলেন। তুকারামকে প্রভু অন্যের অগোচরে কৃপা করেন, জগন্নাথকেও তাহাই। ফল আবার বলি, ঐ কৃপাপদ্ধতি দেখিলে, বোধ হয় যে মহাপ্রভুর কাণ্ড। তবে প্রভু যে থানেশ্বরে গিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। হয়ত গিয়াছিলেন। ইহাও হইতে পারে, জগন্নাথকে তাহার নিজগ্রামে নয়, তবে বৃন্দাবনের পথে কোন স্থানে কৃপা করিয়া থাকিবেন।

মনে থাকে যে, প্রভু যুবতী ভার্য্যা বৃদ্ধ মাতা ছাড়িয়া আসিয়াছেন। তিনি শ্রীভগবানের পদ ত্যাগ করিয়া কৌপীন পরিয়াছেন। তিনি রাজরাজেশ্বরের সেবা পাইতেছিলেন, তাহা ছাড়িলেন। তিনি এখন দক্ষিণদেশে হাটিয়া চলিয়াছেন। উপবাসে, অনিদ্রায়, পথশ্রান্তে দেহ ক্ষীণ। যখন দক্ষিণে গমন করেন ভক্তগণ জিজ্ঞাসিলেন কেন যাইতেছ? বলিলেন আমার দাদার তল্লাসে। কিন্তু উদ্দেশ্য কেবল জীবের মঙ্গল। সেই জীব তাঁহাকে আদর করিতেছে না, তাহাতেও তাহার দৃক্‌পাত নাই। সেই জীব তাহাকে মারিতে চাহিতেছে, তাহাতেও তাহার প্রীতি তাহার, মমতা কমিতেছে না। তিনি কৃপা করিলেন, করিয়া পাছে তাঁহাকে জানিতে পায়, তাই দৌড় মারিয়া পলাইলেন। বড় ভয়, পাছে তিনি কে, তাহা জানিতে পারে, পাছে কেহ তাঁহাকে ধন্যবাদ দেয়, পাছে কেহ তাহার প্রতিষ্ঠা করে, এই সকল ভাবিয়া,—

সাধে কি তার লাগি ঘুরিয়া মরি।
না জানি কত তার ধার ধারি॥

অনেক সময় প্রভুর এই কৃপাপদ্ধতিতে একটু রহস্য রস দেখা যাইত। এইরূপে তিনি শিখিমাহিতীকে কৃপা করেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে

প্রভু তাঁহাকে দেখিয়া হাসিলেন, এইরূপে তুকারামের মাথায় হাত দিয়া তাহাকে পাগল করিয়া পলায়ন করিলেন। তুকারাম চেতন পাইয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

কিন্তু পাণ্ডুপুর আসিবার পূর্ব্বে প্রভু অনেক মধু হইতে মধু লীলা করেন। প্রভু গুর্জ্জরী নগরে আইলেন, আসিয়া দেখিলেন সেখানে বহু অট্টালিকা ও অসংখ্য কুণ্ড। প্রভু সেখানে স্নান করিয়া একটি কুণ্ডতীরে বসিয়া হরিগুণ গাহিতে লাগিলেন। লোক জুটিতেছে, দাঁড়াইয়া শুনিতেছে, মোহিত হইতেছে, বলিতেছে "একি মধু? কৃষ্ণনাম এত মধুর? সন্ন্যাসী ঠাকুর তোমার মুখে হরিনাম বড়ই মধুর।" কিন্তু প্রভুর মুদিত নয়ন বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই।

চক্ষু মুদি গোরাচাঁদ ঢুলিতে লাগিল।
নয়ন ফাটিয়া অশ্রু আসি দেখা দিল॥
লোকজন নাহি দেখে মোর গোরারায়।
কৃষ্ণহে বলিয়া কান্দি মৃত্তিকা ভিজায়॥
ফোপায়ি ফোপায়ি প্রভু কান্দিতে লাগিল।
বাধন খুলিয়া পৃষ্ঠে জটা এলাইল॥
লোমাঞ্চিত কলেবর কান্দিয়া আকুল।
আলুথালু বেশে প্রভু কহে নানা ভুল॥
কভু প্রভু মত্ত হয়ে গড়াগড়ি যায়।
আছাড়ি আছাড়ি কভু পড়য়ে ধরায়॥
ঐ মোর প্রিয়সখা মুকুন্দ মুরারি।
এই বলি ধেয়ে যান চৈতন্য ভিখারী॥
কথন বলেন এস প্রাণ নরহরি।
কৃষ্ণনাম শুনি তোরে আলিঙ্গন করি॥

এইভাবে নানা কথা কহে গোরারায়।
ভাবে মত্ত হয়ে প্রভু ছুটিয়া বেড়ায়॥
আশ্চর্য্য প্রভাব শুনি যত মহাজন।
প্রভুর সমীপে সব করে আগমন॥

গোবিন্দ এ কথা যখন দেশে ফিরিয়া মুরারি, নরহরি ও মুকুন্দের নিকট বলিয়াছিলেন, তখন তাহারা কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায়। প্রভু তাহাদের বিরহে কান্দিয়াছিলেন, কি ভাগ্য! অর্জ্জুন নামক একজন মহাপণ্ডিত সেখানে বসিয়া সব দেখিতেছেন কিন্তু তিনি তবু কোমল হইলেন না, তিনি যুদ্ধ চাহিতে লাগিলেন। তাহাকে প্রভু কৃপা করিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, তাহার শুষ্ক বিদ্যা ফেলিয়া ভগবানের ভজন করিলে তাহার প্রকৃত মঙ্গল হইবে। ইহা বলিয়া প্রভু কৃষ্ণকে ডাকিলেন, এমনি ভাবে ডাকিলেন যেন কৃষ্ণ সম্মুখে, এমনভাবে ডাকিলেন যে সে ভাবে কেবল তিনিই ডাকিতে পারেন। গোবিন্দ বলিতেছেন:—

"প্রভুর মুখে কতবার ডাক শুনিয়াছি, কিন্তু আজকার মত কৃষ্ণকে আহ্বান কখন শুনি নাই।" তখন সেখানে যে কাণ্ড হইল তাহা গোবিন্দের বর্ণনায় কিছু জানিতে পাওয়া যায়। যেন স্ত্রীপুরুষ সকলে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন।

সেখানে তখন যেন বৈকুণ্ঠ হইল।
দলে দলে গ্রাম্য লোক আসি দেখা দিল॥
শত শত লোক চারিদিকে দাঁড়াইয়া।
হরিনাম শুনিতেছে নিঃশব্দ হইয়া॥
নাম শুনিবারে যেন স্বর্গে দেবগণ।
মাথার উপর আসি করিছে শ্রবণ॥
ছুটিল পদ্মের গন্ধ বিমোহিত করি।
অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌরহরি॥

প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন।
ঝর ঝর করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ ॥
বড় বড় মহারাঠী আসি দলে দলে।
শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়া সকলে ॥
পশ্চাৎ ভাগেতে মুঁই দেখি তাকাইয়া।
শত শত কুলবধূ আছে দাঁড়াইয়া ॥
অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিয়া।
হরিনাম শুনিতেছে বিভল হইয়া ॥
এইরূপ হরিনাম করিতে করিতে।
অজ্ঞান হইয়া প্রভু লাগিল নাচিতে ॥

তখন হুঙ্কারে গর্জ্জনে সকল মর্ত্ত্যলোককে বিমোহিত করিয়া প্রভু মৃতবৎ অচেতন হইয়া পড়িলেন।

প্রভু অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন আর নগরবাসীগণ তাঁহাকে সন্তর্পণ আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনের আর বিচার ইচ্ছা রহিল না। প্রভু এরূপ তরঙ্গ উঠাইলেন যে, উপস্থিত ব্যক্তি সকলে তাহাতে ডুবিয়া গেলেন।

সেখান হইতে গুর্জ্জরা, আর গুর্জ্জরী ত্যাগ করিয়া প্রভু বিজয়পুরে গেলেন। এখান হইতে পাণ্ডুপুর বা পাণ্ডারপুরে বিট্‌ঠল দর্শন করিতে গমন করেন, সে তুকারামের স্থান। সে পর্ব্বত হইতে নামিয়া কুলাচলে আরোহণ করিলেন। অবশেষে পুণানগরে প্রবেশ করিলেন।

বাঙ্গালায় যেমন নবদ্বীপ, দক্ষিণে সেইরূপ পুণা। সেখানে অচ্ছসর সরোবরের তীরে একটী বৃহৎ বকুলতলায় প্রভু বসিলেন। সেখানে অধ্যাপক ও পড়ুয়ার মেলা হয়, যেমন নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে হইত। প্রভুকে দেখিয়া যেমন হয়ে থাকে, বিস্তর লোক জুটিতে লাগিল। প্রভুর

মাথায় জটা, পরিধান কৌপীন, গাত্রে ধূলা, উপবাসে শরীর শীর্ণ। আবার তাঁহার সৌন্দর্য্য অমানুষিক, তাঁহাকে দেখিলে লোকের মনে কারুণ্যরসের উদয় হয়, নয়নে জল আইসে। মনে হয় যে, এই গোলকের বস্তুটীকে কুসুমাসনে অতি যত্নপূর্ব্বক বসাইয়া সেবা করা উচিত। কিন্তু ইহার অবস্থা অতি শোচনীয়, দেখিলে হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়।

প্রভু নয়ন মুদিয়া আপনার মনে কৃষ্ণের সহিত কথা বলিতেছেন। বলিতেছেন, "কৃষ্ণ দেখা দাও আমি আর বাঁচি না। আমি কোথায় গেলে তোমায় পাব" ইত্যাদি ইত্যাদি। পণ্ডিতগণ প্রভুর সেই আবেগ শুনিতেছেন ও তাঁহার ভাব দেখিয়া মোহিত হইতেছেন। ইহার মধ্যে একজন, যে জন্যই হউক, বলিয়া উঠিলেন, "সন্ন্যাসী! তুমি কেন ব্যাকুল হইতেছ? তোমার কৃষ্ণ এই জলে লুকাইয়া আছেন।"

এই বাণী শুনি প্রভু চমকি উঠিল।
লোমাঞ্চিত কলেবর উঠে দাঁড়াইল॥
এমন অশ্রুর বেগ কভু দেখি নাই।

প্রভু এরূপ কান্দিতে লাগিলেন যে, উপস্থিতগণের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সেই পণ্ডিত আবার ঐ কথা বলিলেন, "সন্ন্যাসী কেন কান্দ তোমার কৃষ্ণ এই সরোবরেই আছেন?" এবার প্রভু আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। হুহুঙ্কার করিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন!

লোকে তখন প্রভুর ভাব দেখিয়া,এত আকৃষ্ট হইয়াছেন যে, তাঁহার জলে ঝাঁপ যে তাঁহার মনোগত কার্য্য, কাচপনা নয়, সকলে বুঝিলেন। কাজেই, বহুতর লোক সেই সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিলেন। প্রভুকে উঠাইয়া, তখন সকলে সেই পণ্ডিতকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। প্রভু তখন চেতনা পাইয়াছেন। তিনি তখন সেই ভদ্রলোকের পক্ষ হইয়া কথা কহিতে লাগিলেন।

সেখান হইতে প্রভু ভোলেশ্বর গেলেন, প্রকাণ্ড পর্ব্বতের উপরে এক মন্দির, তাহার মধ্যে মহাদেব। তাহার পরে দেবলেশ্বর গমন করিলেন। সেখান হইতে জিজুরী নগরে খাণ্ডবাকে দর্শন করিতে প্রভু চলিলেন। এখানে মুরারিগণ প্রতিপালিত হয়েন। ইহাদের দুর্দ্দশার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে কন্যার বিবাহ না হয়, তাহার বিবাহ খাণ্ডবার সঙ্গে হয়, ইহারাই মুরারি। খাণ্ডবা মন্দির তাহাদিগকে পালন করেন। আর সেই মুরারিগণ ঠাকুরের সম্মুখে নৃত্যগীত করেন। এই উত্তম উদ্দেশ্য এই প্রথা প্রচলিত হয়, ইহারা যেন খৃষ্টিয়ানদিগের "নন"। নন দিগের ন্যায় মুরারিগণেরও পতন হইয়াছে, প্রায় সকলেই বেশ্যাবৃত্তি করেন। এমন কি তাহাদের এক পাড়া হইয়াছে, সেখানে ভদ্রলোক যায় না।

ইহাদের কথা শুনিয়াই প্রভুর দয়া উপজিল। দেখুন, প্রভুকে যে সকলে দয়ার ঠাকুর বলে, সে সাধে না। দুঃখ তিনি দেখিতে পারিতেন না। দুঃখ দেখিলে কান্দিয়া উঠিতেন। মুরারিগণের কথা শুনিবামাত্র প্রভুর হৃদয় ব্যথিত হইল। প্রভু ভারতবর্ষের চারিদিকে নগ্নপদে অনাহারে অনিদ্রায় হাটিতেছেন, কেন? কেবল জীবে দয়ার নিমিত্ত। প্রভুর কি কিছু স্বার্থ ছিল? যদি দেখেন যে কোন স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, অমনি সেখান হইতে পলায়ন করেন। যদি লোকে বলেন তুমি ভগবান্, অমনি জিভ্ কাটেন। যদি রাজা পদতলে পড়েন, তবে তাহাকে দূর দূর করেন। যে তাহাকে প্রহার করিতে আইসে, আগে তাহাকে আলিঙ্গন করেন। তাই মহাজনেরা প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—

কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া॥ বাসুদেব ঘোষ।

গোবিন্দ ভয়ে আকুল; বলেন প্রভু করেন কি, সেখানে যাবেন না, লোকে কি বলিবে? প্রভু সে কথা কর্ণে করিলেন না, একবারে মুরারি

পাড়ায় প্রবেশ করিলেন। কাজেই মুরারিগণ অপরূপ সন্ন্যাসীকে দেখিতে আসিলেন। প্রভুর নির্ম্মল পবিত্র মুখ, তাহার অরুণ করুণ চক্ষু দেখিয়া মুরারিগণের হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইল। প্রভুর দর্শনে তাহাদের হৃদয় শুধু ভক্তিতে নয় করুণায় দ্রবীভূত হইল। আর তাহারা অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, তোমাদের পতি কৃষ্ণ, তোমাদের আর ভাবনা কি? তবে পতিকে বিশুদ্ধ মনে ভজিতে হইবে। ইহা বলিয়া প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, শেষে যাহা হইবার তাহা হইল, মুরারিগণ তাহাদের পাপ স্মরণ করিয়া অস্থির হইলেন। তখন উদ্ধারের নিমিত্ত প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। সকলের প্রধান অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ঐশ্বর্য্যশালী ইন্দিরা বলিলেন—

বৃদ্ধ হইয়াছি মুই কুকর্ম্ম করিয়া।
উদ্ধার করহে মোরে পদধূলি দিয়া॥
ইহা বলি ইন্দিরা ধূলায় লুটি যায়।

পরে প্রভুর কাণ্ড শ্রবণ করুন। যত মুরারি সকলেই ভেক লইলেন, হরিনামে মত্ত হইলেন, একজনও আর কুপথে রহিলেন না। তাহারা এতদিনে প্রকৃতই দেবদাসী হইলেন।

প্রভু চোরানন্দী চলিলেন, সেখানে ডাকাতের বাস। বড় বলবান ডাকাইত। সকলে প্রভুকে সেখানে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। রামস্বামী বলিলেন, "স্বামী অবশ্য তোমার কোন ভয় নাই, কিন্তু তুমি সেখানে কেন যাও? সেত তীর্থস্থান নয়, তুমি যেও না। কারণ—

যদি কোন অমঙ্গল করে দস্যুগণ।
তোমার বিরহে লোক ত্যজিবে জীবন॥

প্রভু অতি বিনীত হইয়া বলিলেন, প্রয়োজন আছে, তাই যাইতেছি।

তাহার কি প্রয়োজন, পরে জানা গেল। সেখানে একটি প্রকাণ্ড বিষবৃক্ষ ছিল, সেটি ছেদন করিতে হইবে, সেই তাঁহার উদ্দেশ্য।

প্রভু গ্রামে প্রবেশ করিতেই একটি বৃক্ষ দেখিলেন, দেখিয়া যেন বিশ্রাম করিতে তাহার তলে বসিলেন। তখন বেলা আন্দাজ এক প্রহর। দস্যুগণ সর্ব্বদা সতর্ক থাকে যে কেহ তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদের গ্রামে প্রবেশ করিতে না পারে। এইজন্য প্রহরী নিযুক্ত আছে। তাহারা প্রভুকে দেখিল, দেখিয়া নিকটে আসিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে আর দুএক জন মিলিল। তাহারা আসিয়া প্রভুকে সেখানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর না পাইয়া বলিল যে তিনি এখানে বসিতে পারিবেন না। তাহাদের সর্দ্দারের নিকট তাঁহার যাইতে হইবে। প্রভু মাথা নাড়িয়া যাইতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু প্রহরীগণ জিদ্ করিতে লাগিল, ইচ্ছা যেন বল করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু প্রভুকে যে জোর করিয়া লইয়া যাইবে, সে সাহসও হইতেছে না, কারণ প্রভুকে দেখিয়া তাহাদের একটু নরম হইতে হইয়াছে। পরে তাহারা অভ্যন্তরে যাইয়া সর্দ্দারকে সংবাদ দিল, সর্দ্দারের নাম নারোজী। সে অতিশয় বলবান, ভারি যোদ্ধা, বয়ঃক্রম ষাটি, কিন্তু দেখিতে তাহার অপেক্ষা ন্যূন। সর্দ্দার একটি সন্ন্যাসী আগমনের কথা শুনিয়া দৌড়াইয়া আসিল, এবং প্রভুকে দেখিয়াই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। দেখিল পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসরের যুবক। তাঁহার বর্ণ কাঁচা সোণার ন্যায়, অঙ্গ দিয়া লাবণ্য চোঁয়াইয়া পড়িতেছে, বদন সুন্দর নির্ম্মল ও চিত্তাকর্ষক। নারোজীর যাহা কখন হয় নাই, এখন তাহাই হইল, অর্থাৎ হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইল। তখন সে সাষ্টাঙ্গে প্রভুকে প্রণাম করিল, এবং তাহার দেখাদেখি সমুদয় দস্যুগণ তাহাই করিল।

প্রভু হাঁ না কিছু না বলিয়া নয়ন মুদিয়া বসিয়া আছেন। তখন

নারোজী করজোড়ে ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি আমার সঙ্গে ভিতরে আসুন, আপনার আতিথ্য করিব।" প্রভু উত্তর করিলেন যে, তিনি কোথাও যাইবেন না, এই বৃক্ষতলেই থাকিবেন। দস্যুর ইহাতে ক্রোধ করা উচিত ছিল। কারণ তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কেহ পারে, ইহা তাহার জানা ছিল না। কিন্তু সে ক্রোধ করিল না। অনুচরগণকে বলিল যে, তাহারা গোঁসাইর নিমিত্ত দুধ আটা চিনি ইত্যাদি লইয়া এখানে আইসে। অনুচরগণ ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহাদের কর্ত্তার কাহাকেও এরূপ আদর করা অভ্যাস ছিল না, সুতরাং তাহারা নানা জনে নানারূপ আহার উপস্থিত করিল। গোবিন্দ বলিতেছেন যে, তাঁহার আহারের দ্রব্য দেখিয়া হৃদয় আনন্দে পুলকিত হইল।

কিন্তু প্রভু নয়ন মুদিয়া আছেন, আর নারোজী স্থিরনেত্রে তাঁহার চন্দ্রবদনখানি দেখিতেছেন। যত দেখিতেছেন ততই বিচলিত হইতেছেন। পরে তাহার বাহ্যজ্ঞান প্রায় গেল, যে হেতু মনের ভাব আর গোপন করিতে পারিতেছেন না, যাহা মনে আসিতেছিল তাহাই মুখে বলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন, কত পাপ করিয়াছি? কেন পাপ করিয়াছি? লোকের দ্রব্যাপহরণ করিয়াছি, কত মনুষ্য এই হস্তে বধ করিয়াছি, কেন? স্ত্রীপুত্রের নিমিত্ত? আমারত স্ত্রীপুত্র নাই। আপনার উদরের জন্য, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে ভিক্ষা করিয়া দুটা অন্ন সংগ্রহ করিতে পারিতাম। পাপ করিয়া করিয়া জীবন কাটাইলাম, এখন দণ্ড লইবার সময় হইয়াছে। আমি এই যে দণ্ড পাইতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রাণের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিতেছে। আর, একি বিপদ? আমার হৃদয়ে দয়ামায়া নাই। কিন্তু :—

সন্ন্যাসী দেখিয়া আমার প্রাণ কান্দে কেন?

প্রভু নয়ন মুদিয়া আছেন, পরে উহা হইতে দরদরিত ধারা পড়িতে

লাগিল। ক্রমে প্রভু বিহ্বল হইলেন, ও তখন উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে আহারীয় সাজান রহিয়াছে, প্রভু তাহার মধ্যস্থানে অচেতন হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। তাহাতে দ্রব্যাদি নষ্ট হইতে লাগিল।

দুই চারি জন বলে কেমন সন্ন্যাসী।
ইচ্ছা করি নষ্ট করে খাদ্যদ্রব্যরাশি॥

নারোজী বলিলেন:—

নষ্ট হইল সব দ্রব্য নাহি কর ভয়।
পুন যোগাইব আমি এই দ্রব্যচয়॥

এইরূপে:—

অপরাহ্ণ কালে মোর গোরাগুণমণি।
প্রেমে মুরছিত হইয়া পড়িল ধরণী॥

তখন নারোজী প্রভুর চরণে পড়িলেন, পড়িয়া আশ্রয় চাহিলেন। অগ্রে হাতে যে অস্ত্র ছিল, তাহা টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। বাকি ছিল কৌপীন পরিধান, তাহাও করিলেন। করিয়া সেই প্রকাণ্ড দেহধারী যোদ্ধা, দীনের দীন হইয়া, প্রভুর অগ্রে দাঁড়াইয়া করজোড়ে বলিতেছেন:—

এত দিন চক্ষু অন্ধ ছিল ভ্রান্তিধূমে।
আজি হইতে অস্ত্রশস্ত্র ফেলাইলাম ভূমে॥
এই মুখে কত জনে কটু বলিয়াছি।
এই হস্তে কত নরহত্যা করিয়াছি॥

নারোজী তাহার দলস্থ গণকে বিদায় দিয়া বলিলেন, "তোমরা যাও সুপথে গমন কর, আর কুকার্য্য করিও না"। ইহা বলিয়া প্রভুর পশ্চাৎ দাঁড়াইলেন। প্রভু চলিলেন, পশ্চাতে নারোজী চলিলেন। প্রভু নিষেধ করিলেন না। নারোজী ছায়ার মত প্রভুর পশ্চাতে চলিলেন, মুখে

বাক্য নাই। নারোজী যে পশ্চাতে আসিতেছেন তাহা প্রভু জানিলেন কিনা তাহাও বুঝা গেল না। এই দিন হইতে তাহারা তিন জন হইলেন। প্রভু, গোবিন্দ তাঁহার ভৃত্য ও নারোজী তাহার কি বলিব?—বডি গার্ড। এই চৌরানন্দি যেখানে নারোজী ছিলেন, এখন সেখানে "কিরকি" উপনগর, সেখানে বম্বের লাটসাহেব বাস করেন।

সেখান হইতে খণ্ডলা যাইয়া প্রভু মূলানদীতে স্নান করিলেন। খণ্ডলা-বাসীগণ আতিথ্যধর্ম্মের অত্যন্ত পক্ষপাতী।

বড় আতিথেয় হয় যত খণ্ডলিয়া।
টানাটানি করে সবে প্রভুকে লইয়া॥
অবশেষে সকলে বিবাদ বাধাইল।
খুনাখুনি করিবারে প্রস্তুত হইল॥

প্রভু বলিলেন যে ভিক্ষা করিয়া আমার সঙ্গিগণ অন্ন আনিয়াছে আমাদের প্রয়োজন যাহা তাহার অধিক লইবার অধিকার নাই। অতএব আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।

এতবলি প্রভু আর বাক্য না কহিল।
নয়ন মুদিয়া হরি বলিতে লাগিল॥

পরে, প্রেমে বিভোর হইয়া সমস্ত রজনী নৃত্য করিয়া কাটাইলেন, সেই দিন সেখানকার যত লোক তাহাদের শিক্ষা। এই এক রজনীর মধ্যে হরিনাম বিতরণ করিতে হইবে। বহুলোক আসিয়াছিলেন তাহারা সেই রজনী প্রভুর ভজনের ফললাভ করিয়া চিরজীবন, এমন কি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে, ভোগ করিতে লাগিলেন। যাঁহার দর্শনে মন পবিত্র হয় তাহার সঙ্গে এক রজনী যাপন করিয়া ফল কি হয়? গৌরাঙ্গ প্রভুর পবিত্র বায়ু গাত্রে লাগিলে, যে ফল হয়, তাঁহাই খণ্ডলাবাসীগণের হইল। নারোজী পশ্চাৎ থাকিয়া প্রভুর সেবা করিতেছেন। কিরূপ, না :—

কাছে বসি স্বেদ বাবি নারোজী মুছায়।

সেখান হইতে নাসিকে গেলেন, নাসিক ত্যাগ করিয়া দমন নগরে ও দমন ত্যাগ করিয়া পঞ্চদশ দিবস পথে কাটাইয়া সুরাটে উপস্থিত হইলেন। সুরাট হইতে বরোচ, বরোচ হইতে বরদায় গেলেন। সেখানে গোবিন্দের মন্দিরের সম্মুখে বিপদ ঘটিল। এ পর্য্যন্ত আন্দাজ দেড় মাসকাল নারোজী প্রভুর পশ্চাৎ ছায়ার মত চলিয়াছেন। নারোজী প্রভুর সঙ্গে আসিতে থাকিলে প্রভু আপত্তি করেন নাই। তাহার কারণ এই এক বোধ হয় যে, নারোজী ভেক লইয়াছেন, তাহার পরে তাহার যে সময় হইয়া আসিয়াছে, তাহা প্রভু অবশ্য জানিতেন। নারোজী প্রভুর নানা সেবা করিতে করিতে যাইতেছেন, যথা পাদসম্বাহন, বায়ু বাজন, মূর্চ্ছার সময় সন্তর্পন ইত্যাদি।

বরদায় গোবিন্দের মন্দিরের সম্মুখে নারোজীর জ্বর হইল।

তিন দিন পরে সেথা বিপদ ঘটিল।
জ্বর রোগে নারোজীর মরণ ঘটিল॥
মৃত্যুকালে সম্মুখে বসিয়া গোরারায়।
পদ্ম হস্ত বুলাইল নারোজীর গায়॥
নারোজী মরণকালে যোড় হাত করি।
চাহিয়া প্রভুর পানে বলে হরি হরি॥
যেই কালে নারোজীর নয়ন মুদিল।
আপনি শ্রীমুখে কর্ণে কৃষ্ণ নাম দিল॥
নারোজীরে কোলে করি প্রভু বিশ্বম্ভর।
তমাল তল হইতে করে স্থানান্তর॥

আপনারা এখন বলুন নারোজীর মৃত্যুর পরে কি গতি হইল? যদি কেহ অন্যের এক কপর্দ্দক হরণ করেন, তবে তাহার নিমিত্ত সে দণ্ডার্হ হয়।

নারোজী বহুতর লোকের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছেন। যদি কেহ কাহাকে অকারণে আঘাত করে, তবে সে দণ্ডনীয় হয়। নারোজী কত লোকের প্রাণ বধ করিয়াছেন, অতএব নারোজীর কি গতি হইল? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার তাৎপর্য্য শ্রবণ করুন।

যাঁহারা মহাজ্ঞানী তাঁহারা বলেন যে, কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে, তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার কাহারও যো নাই। অর্থাৎ তুমি তোমার ভাল মন্দের কর্ত্তা। তুমি ইচ্ছা কর ভাল ফল আহরণ করিতে পারিবে ও ইচ্ছা কর আপনার সর্ব্বনাশ করিতে পারিবে। তাহা যদি হইল তবে ভগবান্ কোথা থাকিলেন? ভগবান্‌কে কেন লোকে উপাসনা করিবে? লোকে ভগবানকে অবহেলা করিয়া বলিবে, আমি যদি ভাল হই, তবে তুমি ভগবান্ ক্রোধ করিয়াও কিছু করিতে পারিবে না। আর যদি মন্দ হই, তবে তুমি ভগবান আমাকে রক্ষা করিতেও পারিবে না। তাহা যদি হইল তবে ভগবানকে উপাসনা কেন করিব? এ সমুদায় জ্ঞানীলোক প্রকারান্তরে বলেন যে, আমাদের কর্ত্তা আর কেহ নাই, আমাদের কর্ম্মই আমাদের কর্ত্তা। ভগবদ্ ভজনের প্রয়োজন নাই।

যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা বলেন, শ্রীভগবানের আশ্রয় লইলে তিনি কর্ম্ম ধ্বংশ করেন। ইহার মধ্যে কোনটা ঠিক? এই তত্ত্ব নারোজীর জীবনীতে মীমাংসা হইবে।

নারোজী ঠাকুরের ভাব দেখুন। ঠাকুর হরিদাস চিরজীবন কঠোর ভজন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার হত্যাকারীগণের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছেন, আর নারোজী ঠাকুর চিরদিন অর্থের নিমিত্ত মনুষ্য বধ করিয়া আসিয়াছেন। হরিদাসের দেহ লইয়া প্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে দেহটী তখন মৃত। আর নারোজী জীবিত থাকিতে তাহার দেহ কোলে লইলেন, তাহার গাত্রে পদ্ম হস্ত বুলাইলেন, কর্ণে

কৃষ্ণ নাম দিলেন। প্রবোধানন্দ, প্রভুর দয়া ও শক্তি এই শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"ধর্ম্মাস্পৃষ্টঃ সততপরাবিষ্ট এবাত্যধর্ম্মে
দৃষ্টিং প্রাপ্তো নহি খলু সতাং সৃষ্টিষু ক্কাপি নো সন্।
যদ্দত্তং শ্রীহরিরসসুধাস্বাদমত্তঃ প্রনৃত্য
তুচ্চৈর্গায়ত্যথ বিলুঠতি স্তৌমি তং কঞ্চিদীশং॥"

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তিকে ধর্ম্ম কখন স্পর্শ করে নাই, যে সর্ব্বদা অধর্ম্মে আবিষ্ট, যে কখন পাপপুঞ্জ-নাশক সাধুজনের দৃষ্টিপথে ও সজ্জন রচিত স্থানে গমন করে নাই, সে ব্যক্তিও যদ্দত্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরস-সুধার আস্বাদনে মত্ত হইয়া নৃত্য, গীত ও ভূমিতে বিলুণ্ঠন করে, সেই গৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার।"

প্রভু জগাই মাধাইকে নিমেষ মধ্যে জীবাধম হইতে, ভক্ত শিরোমণি, করিলেন। নদীয়ার লোকে তাহাতে কি প্রভুকে দুষিয়াছিল? মনে ভাবুন একজন জগাই মাধাই কর্ত্তৃক অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। এমত লোক নদীয়ায় বিস্তর ছিল। তাহারা জগাই মাধাইর উদ্ধার শুনিয়া প্রতিশোধের ইচ্ছায় মনের আনন্দে জগাই মাধাইকে দেখিতে গিয়াছিল। মনে ভাবিয়াছিল যে, যাইয়া তাহাদিগকে বলিবে যে, "কেমনরে ডাকাতি এখন কেমন?" কিন্তু যাইয়া তাহাদিগকে দর্শন করিয়া তাহাদের প্রতি-শোধের ইচ্ছা একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছিল। যিনি ঘাটে যাইতেছেন, জগাই মাধাই, অমনি তাহার চরণে পড়িতেছেন, বলিতেছেন, "জানিয়া কি না জানিয়া যদি আমরা তোমার নিকট অপরাধ করিয়া থাকি আমাদের মাপ কর।" যাহাদের কাছে ইহারা প্রকৃত অপরাধ করিয়াছেন তাহারা তাহাদের তখনকার দশা দেখিয়া আর তাহাদের প্রতি কৃপার্ত্ত না হইয়া পারিতে-ছেন না, পূর্ব্বকার শত্রুতার নিমিত্ত যে প্রতিশোধ ইচ্ছা তাহা লোপ

হইয়া যাইতেছে। মাধাই যাহার অনিষ্ট করিয়াছে, সে ব্যক্তি তাহার পূর্ব্বকার প্রতাপ ও এখনকার দৈন্য ও দুর্দ্দশা দেখিয়া যখন তাহার প্রতি কৃপার্ত্ত হইতেছে, তখন ভগবান্ কেন হইবেন না? যাহাকে দণ্ড করিবে সে যদি সেই দণ্ড প্রার্থনা করে, তবে তাহার প্রতি ক্রোধ আর থাকে না।

বিদ্যাপতি প্রার্থনা করিলেন যে, "হে প্রভু যখন তুমি বিচার করিবে তখন আমার গুণলেশ পাইবে না, অতএব আমি বিচার চাহি না, আমি করুণা চাই।" আবার বড় লোক ভগবানের ন্যায়পরতার বড় পক্ষপাতী। তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত, যদি ভগবান বিচারপতি হয়েন, তবে তাহাদের নিজের কি দশা হইবে? ভগবান্ যদি বিচারপতি হইয়া বসেন তবে তোমার আমার কাহার অব্যাহতি নাই, তুমি যে এতবড় লোক তোমারও অব্যাহতি নাই। অতএব আমি আমার ভাল মন্দের কর্ত্তা, শ্রীভগবান নহেন, ইহা বাতুলের কথা, প্রকৃত জ্ঞানীর কথা নয়।

পূর্ব্বে বলিলাম প্রভু নাসিক নগরে গিয়াছিলেন। এখানে সূর্পনখার নাসিকা ছেদন হয় বলিয়া ইহা তীর্থস্থান। সেখানে রামের কুটির ও তাহার চরণ চিহ্ন আছে, প্রভু সেখানে গিয়া, (গোবিন্দ বলিয়াছেন)—

অবশেষে মোর কণ্ঠ আকড়ি বাঁধিয়া।
কোথা মোর রাম বলি উঠিল কান্দিয়া॥
পদ্ম গন্ধ বহিতেছে প্রভুর শরীরে।
সমীরণ বহিতে লাগিল ধীরে ধীরে॥
কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই।
এমন আশ্চর্য্য ভাব কভু দেখিনাই॥
কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাকে কথায় কথায়।
পাগলের ন্যায় কভু ইতি উতি চায়॥

কি জানি কাহাকে ডাকে আকাশে চাহিয়া।
কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া॥
উপবাসে কেটে যায় দুই একদিন।
অন্ন না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ॥

সেখানে লক্ষণ স্থাপিত গণেশ আছেন। সেই নিবিড় জঙ্গলের গুহায় প্রভু একা বসিয়াছেন। গোবিন্দ ভিক্ষা নিমিত্ত গিয়াছেন, নারোজী দূরে ফল আহরণ করিতেছেন।

ধীরে ধীরে গোবিন্দ সেখানে আইলেন। দেখেন যে জঙ্গলে আলো দেখা যাইতেছে, ইহাতে তিনি প্রভুর নিকট নিঃশব্দে আসিতে লাগিলেন. দেখেন কি ঃ—

ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে বনের ভিতর।
চক্ষু মুদি কি ভাবিছে গৌর সুন্দর॥
অঙ্গ হতে বাহির হতেছে তেজরাশি।

তেজ দেখিয়া গোবিন্দের নয়নে ধাধা লাগিল, তিনি গুটি গুটি আরো নিকট যাইতে লাগিলেন, যাইয়া এক ধারে দাঁড়াইলেন।

পদ শব্দ পেয়ে প্রভু যেন আচম্বিতে।
সব ভাব সম্বরিল দেখিতে দেখিতে॥

শ্রীনবদ্বীপে প্রভু মুহুর্মুহু প্রকাশ হইতেন, তখন তাঁহার শরীর সহস্র সূর্য্যের তেজ পরিত্যক্ত। নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে আর প্রকাশ হইতেন না। এক দিবস গোবিন্দের ভাগ্যে ছিল, তাই তিনি দেখিলেন।

সেখান হইতে দামন নগরে, সে স্থান ত্যাগ করিয়া ও পঞ্চদশ দিবস পথে পথে হাটিয়া সুরাটে গেলেন। প্রভু আজ সমুদ্র ধারে আসিয়াছেন, এবার পশ্চিম ধারে। সেখানে সুরাট রাজার প্রতিষ্ঠিত অষ্টভূজা দেবী। প্রভু সেখানে তিন দিবস ছিলেন। একজন ভাল মানুষ সন্ন্যাসী প্রভুর

নিকট সাধন ভজনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু তাহার সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ, একটি ছাগ বলি দিতে আইল। প্রভু তাহা দেখিয়া মনে ব্যথা পাইয়া তাহাকে বলিলেন যে, দেবী বৈষ্ণবী, তিনি মাংস আহার করেন না। তাঁহার ঘাড়ে দোষ দিয়া তোমরা মাংস ভক্ষণ করিবা? জীবটা পরিত্যাগ কর। ব্রাহ্মণ তাহাই করিল। তাহার পরে প্রভু তাপ্তী নদীতে স্নান করিতে চলিলেন, সেখানে বলি স্থাপিত বামন আছেন, আর সেই নিমিত্ত সেই নদী তীর্থরূপে পরিগণিত। সেখান হইতে যজ্ঞকুণ্ড দেখিবার নিমিত্ত বরোচ নগরে নর্ম্মদার তীরে গমন করিলেন। সেখান হইতে বরদা নগরে যাইয়া ডাকরজি দেখিতে চলিলেন। ডাকরজি দেখিয়া আবার বরদায় ফিরিয়া আসিলেন। বরদার রাজা পরম বৈষ্ণব। সেখানে মন্দিরে শ্রীগোবিন্দবিগ্রহ আছেন। প্রতাপরুদ্রের ন্যায় রাজা স্বহস্তে মন্দির পরিস্কার করেন। স্বহস্তে তুলসী মুঞ্জরী তুলিয়া, গোবিন্দের পাদপদ্মে দিয়া তাহার পূজা করেন। প্রভু সন্ধ্যাকালে গোবিন্দের মন্দিরে যাইয়া প্রেমে অধীর হইলেন:—

ছিন্ন এক বহির্বাস পাগলের বেশ।
সদা উনমত প্রভুর কৃষ্ণের আবেশ॥

এখানে নারোজী এক তমাল তলায় প্রভুর কোলে শয়ন করিয়া, তাঁহার চন্দ্রবদন দেখিতে দেখিতে দেহ ছাড়িলেন। এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রভু অমনি তমাল তলা হইতে দেহকে স্থানান্তরিত করিলেন ও ভিক্ষা করিয়া তাহার সমাধি দিলেন। পরে যেরূপ হরিদাসের অন্তর্ধানের সময়ে করিয়াছিলেন, সেইরূপ, সেই সমাধি বেড়িয়া, কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মহাকলরব হইল, শেষে রাজা আইলেন। রাজার ইচ্ছা প্রভুকে ভিক্ষা দিবেন। প্রভু বলিলেন, বিলাসীর ভিক্ষা তিনি লয়েন না। রাজা ছাড়েন না, তখন তাহার ইঙ্গিতক্রমে গোবিন্দ মুষ্টিভিক্ষা লইলেন।

প্রভু বরদা ত্যাগ করিয়া মহানদী, যাহা মানচিত্রে মাহি বলিয়া পরিচিত, পার হইলেন। পরে আহাম্মাদাবাদে যাইয়া প্রভু প্রথমে মুসলমানরাজ্যের নিদর্শন পাইলেন। বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া আর উহা দেখেন নাই। প্রতাপরুদ্রের সাম্রাজ্য গোদাবরীর ওপার পর্য্যন্ত। সেখান হইতে যত দেশ গিয়াছেন, সমুদায় হিন্দু শাসনাধীনে। আহাম্মাদাবাদেও যে কোন মুসলমানকে দেখিয়াছিলেন না, তাহার কোন উল্লেখ নাই। নগর অতি জাঁকের, বড় বড় অট্টালিকা কর্তৃক শোভিত, নগরবাসী অতিথি-সেবায় অনুরক্ত, প্রভুকে সকলে লইয়া টানাটানি করিতে লাগিল। প্রভু গৃহস্থের বাটী যাইতে অস্বীকার করিলেন। বহুতর লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। একজন পণ্ডিত শ্রীভাগবত কথা উঠাইয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। সুতরাং তাহার সহিত প্রভুর একটু কথা হইল। পরে লোককলরব, কীর্ত্তন, প্রভুর নৃত্য। তাহার পরে যাহা হয় তাহা হইল, প্রভু বহুলোকের হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ বপন করিলেন।

তাহার পরে শুভ্রামতী নদী পার হইলেন। সেখানে যাইয়া দেখেন কয়েক জন লোক দ্বারকা তীর্থে গমন করিতেছেন। তাহার মধ্যে দুই জন বাঙ্গালী আছেন, রামানন্দ বসু ও গোবিন্দচরণ। গোবিন্দ ইহাদের দেখিলেন, দেখিয়াই পরস্পরে বুঝিলেন যে, তাহারা বাঙ্গালী, সুতরাং সকলে সুখী হইলেন। গোবিন্দ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, রামানন্দ বলিলেন, তিনি কুলিন গ্রামের বসু পরিবারের একজন। রামানন্দ গোবিন্দের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় গোবিন্দ বলিলেন যে তিনি প্রভুর সঙ্গে যাইতেছেন।

রামানন্দ। প্রভু! তিনি কোথা?

গোবিন্দ। ঐ যে তিনি নদীতে (শুভ্রামতী) স্নান করিতেছেন।

অমনি ধেয়ে গিয়া রামানন্দ প্রণাম করিলেন।

প্রভু বলিলেন, তুমি দেশের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে। নিত্যানন্দ

প্রভৃতি দুই শত জনে নীলাচলে প্রভুকে অপেক্ষা করিতেছেন, প্রভু তাঁহাদের ভুলিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় লক্ষ লক্ষ লোকে তাঁহার অদর্শনে রোদন করিতেছেন, তাঁহার অভাবে শ্রীনবদ্বীপ অন্ধকার।

যথা প্রেমদাসের গীত ঃ—

নীলাচলপুরে, গতায়াত করে,
যত বৈরাগী সন্ন্যাসী।
তাহা সবাকারে, কান্দিয়া সুধায়,
যত নবদ্বীপবাসী॥
তোমরা কি সন্ন্যাসী দেখিয়াছ? ধ্রু।
বয়স নবীন, গলিত কাঞ্চন,
জিনি তনুখানি গোরা।
হরেকৃষ্ণ নাম, বলয়ে যখন,
নয়নে গলয়ে ধারা॥

আর প্রভুর নিজ বাড়ী? তাঁহার জননী? তাঁহার ঘরণী? কোথায় তাঁহারা. আর কোথায় আমাদের প্রভু? সকলকে ছাড়িয়া, সংসার ত্যাগ করিয়া, ছিন্ন কৌপীন পরিধান করিয়া, কৃষ্ণনাম বিলাইয়া বেড়াইতেছেন। সকলে একত্র হইয়া বাঙ্গালায় কথা কহিতে কহিতে দ্বারকায় চলিলেন। দুই গোবিন্দ মিতালি পাতাইয়াছেন। প্রভু গোবিন্দকে ও গোবিন্দ চরণকে বলিতেছেন, তোমরা যদি মিতা হইলে তবে রামানন্দ আমার মিতা! রামানন্দ ইহাতে লজ্জা পাইয়া করযোড়ে যেন অনুনয় করিতে লাগিলেন। রামানন্দকে কে না জানে, ইনি বিখ্যাত পদকর্ত্তা। প্রভু সমুদায় ভুলিয়াছেন, কেন? হৃদয়ে কেবল এক ইচ্ছা রহিয়াছে, জীবোদ্ধার, তাই রামানন্দ ও গোবিন্দচরণকে দেখিয়া বলিতেছেন. আমার যে একটা দেশ আছে তাহা তোমরা স্মরণ করাইয়া দিলে!

(৯ম—৬ষ্ঠ খণ্ড)

রামানন্দ নিজ পদে বলিয়াছেন—

রামানন্দের বাণী, দিবা নিশি নাহি জানি,
গৌর আমায় পাগল করিলে।

পরে সকলে ঘোগা নগরে গমন করিলেন। এ নগর সমুদ্রের পারে ও পুরবন্দর রাজধানী হইতে সেখানে এখন রেলপথ গিয়াছে। এখানে বারমুখী নামক বেশ্যা বাস করে। তাহার ন্যায় রূপবতী পৃথিবীতে নাই, তাহার ঐশ্বর্য্যের ও সীমা নাই।—

"বেশ্যাবৃত্তি করিয়া সাধিয়াছে বহুধন।
বহুমূল্য হয় তাহার বসন ভূষণ॥
বহু দাস দাসী লয়ে থাকে সেইখানে।
জাঁক পসারের কথা সব লোক জানে॥
প্রকাণ্ড বাগিচা নাম পিয়ারা কানন।
কাননের ধারে প্রভু করেন গমন॥
অতি বড় নিম্ববৃক্ষ আছে সেইখানে।
কি ভাবিয়া প্রভু গিয়া বসিল সেখানে॥

বারমুখীর প্রকাণ্ড বাড়ী। প্রভু তাহার বাড়ীর প্রকাণ্ড বাগানে, এমন স্থানে বসিলেন যে, বারমুখী জানালায় বসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পায়। প্রভু বাগানে, বারমুখী দোতালার জানালায় বসিয়া প্রভুকে দর্শন করিতেছে, কারণ প্রভু, সে যে তাঁহাকে দেখিতে পায়, এইরূপ স্থান ইচ্ছা করিয়া বসিয়াছেন। অথচ প্রভুর তাহাকে দেখিবার কোন সুবিধা নাই। তবু ঠিক জানিবেন যে, প্রভু জানিতেছেন যে, বারমুখী তাঁহাকে দেখিতেছে। বারমুখী তাঁহাকে দেখিবে না, তবে তিনি সেখানে গিয়াছেন কেন? বারমুখী যেমন পৃথিবীর মধ্যে সুন্দরীর শিরোমণি, প্রভু তেমনি সুন্দরের শিরোমণি। প্রভু ও তাহার তিন জন ভক্ত সেখানেই সেবা করিলেন, লোক জুটিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য।

পিচকারি সম অশ্রু বহিতে লাগিল।
তাহা দেখি ঘোগাবাসী আশ্চর্য্য হইল॥
দেখিয়া প্রভুর সেই হরি সংকীর্ত্তন।
মাতিয়া উঠিল প্রেমে দুই চারিজন॥
গ্রাম্য লোক জনের নয়নে বহে বারি।
বহুলোক আসি দাঁড়াইলা সারি সারি॥
কেমন ভক্তির ভাব কহনে না যায়।
অনিমিষে প্রভুর বদন পানে চায়॥
কখন হাসিছে প্রভু কখন কান্দিছে।
কখন বা বাহুতুলি নাচিছে গাইছে॥
থর থর কাঁপে কভু ঘর্ম্ম বারি বহে।
কখন বা প্রেমাবেশে চুপ করি রহে॥
কখন টলিছে রোমাঞ্চিত কলেবরে।
প্রাণ কৃষ্ণ বলি কভু ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে মত্ত নবীন সন্ন্যাসী।
এই কথা কানাকানি করে ঘোগাবাসী॥
হরি হরি বলিতে আনন্দ ধারা বহে।
পুতুলের প্রায় সবে দাণ্ডাইয়া রহে॥
আধ নিমিলিত চক্ষু জটা এলায়েছে।
ধুলা মাটি মেখে অঙ্গ মলিন হয়েছে॥
"কোথায় প্রাণের কৃষ্ণ" এই বলি ডাকে।
কখন বা হাত তুলি উর্দ্ধ মুখে থাকে॥
একবার ঐ যে বলি ধাইয়া চলিল।
বাহু পসারিয়া নিম্বে জড়ায়ে ধরিল॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে মত্ত হইল নিমাই।
এমন উন্মাদ মুঞি কভু দেখি নাই॥
বহুদিন সঙ্গে থাকি ফিরি নানা দেশ।
দেখি নাই কোন দিন এমন আবেশে॥
প্রকাণ্ড এক গর্ত্ত ছিল সড়কের ধারে।
আবেশে গড়ায়ে পড়ে তাহার ভিতরে॥

এ পর্য্যন্ত বারমুখী আপনার রূপ দেখাইয়া অন্যকে মুগ্ধ করিয়া আসিয়াছে। এখন প্রভু আপনার রূপ দেখাইয়া তাহাকে মুগ্ধ করিতেছেন দেহের রূপ নয়, ভিতরের রূপ। বারমুখীর তখন এরূপ হয়েছে যে, প্রভুর চরণে আসিয়া পড়ে আর কি, কিন্তু ভয় করিতেছে। প্রভু তাহার উপর কৃপা কেন করিবেন? সে না নগরের অথবা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধম? প্রভুর, বারমুখীর সেই ভ্রম ঘুচাইতে হইতেছে, ভ্রম এই যে সে অতি অধম সেই নিমিত্ত কৃপা পাইবার অনুপযুক্ত। সে এইরূপ করিলেন।

বালাজি বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ সেখানে ছিল, প্রভুর উপর তাহার ক্রোধ হইয়াছে। কেন হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করা কঠিন, তবে ভালর প্রতি মন্দের চিরকাল ঐ রূপ শত্রুতা। প্রভু যত উন্মত্ত হইতেছেন, তাহার তাঁহার প্রতি তত দ্বেষ হইতেছে। শেষে আর থাকিতে পারিল না। প্রভুর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল। বলিতেছে, "তুই ভণ্ড, তোর ভণ্ডামি ভাঙ্গিতেছি, এখানে ভণ্ডামি চলিবে না।" কেন যে ভণ্ডামি চলিবে না, তাহা আর বালাজি খুলিয়া বলিলেন না। বোধ হয় মনের ভাব এই যে, আমি বালাজি এখানে আছি, সেখানে কেমন করিয়া কেহ ভণ্ডামি করিয়া উহা জীর্ণ করিবে? শেষে প্রভুকে মারিবে তাহা বলিতে লাগিল, পরে তাহার উদ্যোগও করিল। অবশ্য বালাজি ভাবিতে

ন, এ তাহার স্থান আর সন্ন্যাসী বিদেশী, তাহার বলে সন্ন্যাসী পারিবে কেন। কিন্তু বলপ্রয়োগ করিতে গিয়া বালাজি একটু ফাঁফরে পড়িল। কারণ সকলে হাহাকার করিয়া, তাহাকেই আক্রমণ করিল। প্রভুর বাহ্য হইল। কাজেই তিনি বালাজির পক্ষ হইলেন। তাহাকে বলিতে লাগিলেন, ছি! এ সমস্ত প্রবৃত্তি কেন পোষণ করিতেছ? উহা পোষণ করিয়া তোমার লাভ কি? এসো তোমাকে পরম ধন দিতেছি। প্রভু তখন তাহাকে বাৎসল্য ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তখন বালাজি দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না, গ্রহগ্রস্তের ন্যায় শুনিতে লাগিল। যেহেতু প্রভু তখন তাহার স্বাতন্ত্র্য হরণ করিয়াছেন। তাহার পরে তাহার কর্ণে হরিনাম দিলেন। আর তখন বালাজি শক্তি পাইয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়া গেল। বালাজির উদ্ধার কার্য্য সমাধা হইল। কেননা সে অহেতুক প্রভুকে প্রহার করিতে গিয়াছিল!

বোধ হয় প্রভুর ইচ্ছাক্রমেই বালাজির ঘাড়ে দুষ্ট সরস্বতী আশ্রয় করেন। প্রভু বালাজিকে দেখাইলেন যে, ভগবানের দয়া মনুষ্যের দয়ার জাতীয় নয়, সে আর এক প্রকার, অনেক বড়। বালাজির উদ্ধার দেখিয়া বারমুখী আশ্বাসিত হইল। তখন আপনার গণকে এই কথা বলিল যে, আমি উদাসিনী হইব, ঠাকুরের আশ্রয় লইব, সেই নিমিত্ত যাইতেছি। তাহারা, তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিল যে, বারমুখীর সঙ্কল্প দৃঢ়। তাহারা রোদন করিতে লাগিল। বারমুখী অগ্রবর্ত্তী হইলে, তাহার অধীনা সহচরী নিরা, ক্রন্দন করিতে করিতে পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। বারমুখী তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিল, আমি নরক হইতে উদ্ধার হইব, তাই পতিতপাবন সন্ন্যাসীর স্মরণ লইব, তুমি আমার ধন ভোগ কর। কিন্তু কেবল সৎকার্য্যে ব্যয় করিও। আমি অবশ্য কৃপা পাইব। বালাজি ঠাকুরকে প্রহার করিতে গিয়াছিল, প্রভু তাহাকে কৃপা করিলেন, আমার তাই দেখিয়া ভরসা হইয়াছে।

বারমুখী আসিতেছে, কি জন্য আসিতেছে, তাহা তখন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কারণ বারমুখীর আসিবার সময় একটা প্রকাণ্ড গোল হইয়াছে। লোকে একবারে বিস্ময়ে ও আনন্দে বিভোর হইয়াছে। বারমুখী আসিতেছে লোকে মাঝে পথ দিতেছে। প্রভু নয়ন মুদিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বারমুখী আসিয়া পদতলে পড়িল, আর—

তিন চারি পদ প্রভু অমনি হটিল।

প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া আপনার কেশ এলাইয়া দিল। সে কেশ তাহার গৌর বর্ণের নিকট কিরূপ দেখাইতেছিল না—

বিদ্যুতের পাশে যেন মেঘ রাশি রাশি।

করযোড়ে বলিতেছে, "প্রভু, আমি আর পাপ করিব না। আমাকে চরণে স্থান দাও।" মিরা দাসী সঙ্গে একখানি কাঁচি ও মলিন বসন আনিয়াছিল, সে কাচিখানা লইয়া বারমুখী আপনার দীর্ঘ কেশ কচ্‌কচ্‌ করিয়া ছেদন করিল। পরে সেই মলিন বসন পরিয়া যোড় হস্তে প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। ইহাতে দর্শকগণের কিরূপ মনের ভাব হইল বিচার করুন।

প্রভু বারমুখীকে চুপে চুপে কৃপা করিলে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলেন না। কি করিলেন? না সেই পরমা সুন্দরী ধনশালী বেশ্যাকে, সহস্র লোকের সম্মুখে দাঁড় করাইলেন, করাইয়া কচচ্ছেদন (কেশচ্ছেদন) করাইলেন, কৌপীন পরাইলেন, পরাইয়া তাহাকে কৃপা করিলেন, উদ্দেশ্য যে বারমুখীর উদ্ধারের সঙ্গে এই সহস্র সহস্র লোক পবিত্র হউক।

বারমুখীকে প্রভু আশ্বাস দিলেন। দিয়া বলিতেছেন, তুমি তুলসী কানন করিয়া এখানে শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর। বারমুখী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী। অনেকে তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইত। আবার ভাল লোকে উহা দেখিয়া ভয়ে ও ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিতেন। এখন

তিনি চুল কাটিয়াছেন, ভূষণ ছাড়িয়াছেন, মলিন বসন পড়িয়াছেন, ইহাতে কি তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত হইয়াছেন? ঠিক তাহা নয়। বারমুখীর এক নূতন সৌন্দর্য্য হইল। পূর্ব্বে ঐ রূপে মন্দ লোকে কেবল মুগ্ধ হইত, কিন্তু বারমুখীর এখন যেরূপ হইল, তাহাতে ভাল মন্দ সকল লোকেই মোহিত হইতে লাগিলেন। সেই বারমুখীর সৌন্দর্য্যক্রমে এখন বাড়িতে লাগিল। কিন্তু এই যে বলিলাম, সে আর একরূপ সৌন্দর্য্য, পূর্ব্বকার সৌন্দর্য্য নয়।

বিবেচনা করুন, নারোজী প্রথম শ্রেণীর ডাকাইত, বারমুখী প্রথম শ্রেণীর বেশ্যা, প্রভুকে দর্শন মাত্র ইহাদের পুনর্জন্ম হইল। ইহাতে প্রভুর অবতারের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিবেন। সহচরী মিরাবাই অনেক কান্দিল। কিন্তু বারমুখী কিছু গ্রাহ্য করিল না। বরং মিরাকে উপদেশ দিল, ভাই আপনার পথ দেখ আর কুকর্ম্ম করিও না।

সেখান হইতে প্রভু ছয় দিন হাঁটিয়া সোমনাথে গেলেন, সে সোমনাথ মুসলমান কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়। মন্দিরের অবস্থা দেখিয়া প্রভু দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভু ক্রন্দন করিতেছেন। পথের মধ্যে ঝড় উঠিল। প্রভু বসিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় দুই চারিজন পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত, বলে টাকা দাও। প্রভু বলিলেন, আমরা সন্ন্যাসী টাকা কোথা পাব। ইহাতে গোবিন্দ চরণ, দুটি মুদ্রা দিলেন। এই পাণ্ডার উৎপাতে আমাদের দেবস্থানগুলির দশা এইরূপ হইয়াছে। সেখান হইতে জুনাগড়ে যাইয়া দেখিলেন, খুব বড় নগর। সেখানকার ঠাকুর রণছোড়জী। সেখানে গির্ণার পাহাড়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ চিহ্ন আছে, তাহাই দেখিতে প্রভু পাহাড়ে উঠিলেন পথে দেখেন দ্বাদশ জন সন্ন্যাসী দুঃখ মনে বসিয়া, তাহার কারণ, তাহাদের বৃদ্ধ গুরু ভার্গদেব পীড়িত। প্রভু অমনি যাইতে নিরস্ত হইলেন, হইয়া ভার্গদেবকে রোগ হইতে মুক্ত করিলেন। তাহাতে—

রোগ হইতে ভার্গদেব পেয়ে অব্যাহতি।
প্রভুর চরণে করে অসংখ্য প্রণতি ॥

ভার্গদেব বলিতেছেন, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। তাহাতেই আমার চক্ষুরোগ হইয়াছে বোধ হয়। কারণ আমি ত তোমাকে কৃষ্ণবর্ণ দেখিতেছি। প্রভু ইহা শুনিয়া জিভ কাটিলেন। তাহাতে ভার্গব স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন আমি তোমাকে চিনেছি।

কার কাছে ফাঁকি দেহ নবীন সন্ন্যাসী ?

প্রভু তাহাকে নয়নে নয়নে ভঙ্গিতে কি বলিলেন। যথা :—

কি কহিল ভর্গদেবে প্রভু আঁখি ঠারি।
অমনি তাহার চক্ষে বহে অশ্রুবারি ॥

পরে সকলে মিলিয়া গির্ণাব পাহাড়ে শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিলেন। সেখানে প্রভু অকথ্য প্রেমতরঙ্গ উঠাইলেন। রামানন্দ ও গোবিন্দ দুই জন চরণে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ভদ্রানদীতীরে রজনী কাটাইলেন। সম্মুখে দণ্ডিবনঝারি বিখ্যাত জঙ্গল। এখানে অদ্যাপি সিংহ পাওয়া যায়। এই জঙ্গল পার হইতে সাত দিন লাগিয়াছিল। কিন্তু এখন তাহারা ষোলজন, বোধ হয় এই বন পার হইতে প্রভুর সাহায্য করিতে হইবে বলিয়া ভর্গদেব পীড়িত হইয়া পড়েন। সুঁড়িপথ দিয়া যাইতে হয়, দুই প্রহর হইলে সূর্য্য দেখা যায়। তবে মাঝে মাঝে কাষ্ঠের দুর্গ আছে, সেখানে যাত্রীগণ রজনীতে বাস করেন, আহার বৃক্ষের ফল, এত ফল যে,—

সহস্র লোকের খাদ্য পথে পড়ে থাকে।
ঈশ্বরের কত দয়া কহিব কাহাকে ॥

তাহার একপ্রকার ফল কামরাঙ্গার মত।

চৌশিরা সিজ সম যেই গাছ শোভে।
আশ্চর্য্য তাহার ফল খাই অতি লোভে ॥

টপ টাপ খায় ফল গোবিন্দচরণ।
রামানন্দ ধীরে ধীরে করে আস্বাদন ॥

গোবিন্দ নিজে কিরূপে খান তাহা বলেন নাই, তবে এইটুকু বলিলেন :—

উদর পূরিয়া ফল সব পারি খাই।

মধ্যে মধ্যে এই নিবিড় জঙ্গলে প্রভু গান ধরিতেছেন :—

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ হরে !

যখন তখন প্রভু এই নামগান করেন। তখন এই ষোলজন সঙ্গে গান ধরিলেন। এইরূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভাস তীর্থে আইলেন। প্রভু অবশ্য যদুকুলের দুর্দ্দশার কথা মনে করিয়া খুব কান্দিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য এই :—

কান্দিয়া এতেক হর্ষ কেহ নাহি পায়।
কান্দিয়া আনন্দ প্রভু সবায় ছড়ায়।

অবশেষে প্রভু দ্বারকায় গমন করিলেন, কৃষ্ণের দুই স্থান, বৃন্দাবন ও দ্বারকা। বৃন্দাবনে প্রভু গমন করিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা জানেন। এখন দ্বারকায় সেই প্রকার লীলা আরম্ভ হইল। প্রভু সেখানে এক পক্ষ ছিলেন, দ্বারকানগর একেবারে উন্মত্ত হইল।

ধর্ম্মের ভারেতে পুরী করে টলমল।
সকলের চিত্ত যেন হইল নির্ম্মল ॥
মন্দ মন্দ বায়ু সদা বহিতে লাগিল।
পুষ্প গন্ধে সব বাড়ী যেন আমোদিল।
যেইখানে মরুক্ষেত্র কিছুমাত্র নাই।
সেখানে বহাল নদী চৈতন্য গোসাঁই ॥
সমস্ত দেশের মধ্যে পাপী না রহিল।

পাণ্ডাগণ ... প্রভু-আগমন উপলক্ষে একদিন মহোৎসব করিল, সকলের নিমন্ত্রণ, প্রভু নি... এক ভার লইলেন, যথা :—

...ক্তদের মধ্যে গিয়া গোরামণি।
...সাদ বণ্টন প্রভু করেন আপনি॥

দ্বারকা দে... হইলে, ওদিকে আর তীর্থস্থান নাই, অমনি প্রভু বলিলেন, চল নীলাচলে যাই। দ্বারকা ত্যাগ করিবার সময় বহু লোক প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল, তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া, পুনরায় বরদায় আইলেন। আর সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া, ষোল দিনে নর্ম্মদায় স্নান করিলেন, সেখানে প্রভু ভর্গদেবকে বিদায় করিয়া দিলেন, দিয়া নর্ম্মদার ধারে ধারে চলিলেন। প্রভুর দক্ষিণভ্রমণ সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছে, আমরা এখন অবশিষ্ট লীলাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

দোহদ বা ধানগর হইয়া কুক্ষী আইলেন, এখানে অনেক বৈষ্ণবের বাস। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তাঁহার লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা আছে। প্রভু সেখানে উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ অতি কাতর হইলেন। বলিলেন, "আমি দরিদ্র, আতিথ্য করিবার আমার শক্তি নাই।" প্রভু বলিলেন, "তাহাতে ব্যস্ত কি, যিনি জীব করিয়াছেন, তিনিই আহার দিবেন।" ব্রাহ্মণ ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে একজন বৈশ্য দুগ্ধ চিনি আটা আনিয়া উপস্থিত করিল। বলিতেছেন, "ব্রাহ্মণ ঠাকুর! তোমার যে লক্ষ্মীনারায়ণ উনি বড় জাগ্রত। কল্য নিশিতে তিনি নররূপ ধরিয়া আমাকে স্বপ্নে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার বড় পায়স খাইতে সাধ গিয়াছে, তাই আমাকে দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া তোমার নিকট আনিতে বলিয়াছেন, এই আমি আনিয়াছি, গ্রহণ করিয়া পায়স রান্ধিয়া লক্ষ্মীনারায়ণকে দাও।" ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া আকুল। প্রভুকে বলিতেছেন যে, বোধ হয় এ তোমার লাগিয়া, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তখন বৈশ্য প্রভুর পানে চাহিল, চাহিয়া

একেবারে অজ্ঞান মত হইয়া, প্রভুর পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, কিহে বণিক! তুমি কি দেখিতেছ? তখন বণিক্ গদ গদ হইয়া বলিলেন, কি আর বলিব, যিনি নররূপ হইয়া আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন, তিনি ঠিক ইঁহার মত, তিনিই এই। প্রভু ইহাতে বৈশ্যকে একটা তাড়া দিলেন, দিয়া বলিতেছেন, আচ্ছা লোক তুমি! আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এই ব্রাহ্মণের বাড়ী আসিয়াছি, ইহার মধ্যে তুমি আমাকে স্বপ্নে দেখিলে? বৈশ্য ভয়ে আর কিছু বলিল না। প্রভু দুগ্ধ পায়স রান্ধিলেন, সকলে প্রসাদ পাইলেন, প্রভু আপনি বৈশ্যকে ও আর সকলকে পরিবেশন করিলেন।

প্রাতে প্রভু যাইতেছেন, সেই বৈশ্য আসিয়া প্রভুর চরণতলে পড়িল, সে প্রভুকে পথে ধরিবে বলিয়া পথে লুকাইয়া ছিল। বলিতেছে, তুমি সেই তিনি, আমি চিনিয়াছি। নিতান্ত যাবে ত আমাকে কৃপা করিয়া যাও! প্রভু ঈষৎ হাসিয়া তাহাকে উঠাইলেন, কর্ণে হরিনাম দিলেন। বলিলেন, সব ত্যাগ করিয়া তুলসী কানন কর, করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর।

পরে আবার জঙ্গল সম্মুখে। দুদিন হাটিয়া গভীর জঙ্গল পার হইয়া সকলে আমঝোড়া নগরে পহুঁছিলেন। সেখানে যে লীলা করিলেন, তাহা না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

ক্ষুধার জ্বালায় মোরা ছটফট করি।
নির্ব্বিকার প্রভু মোর বলে হরি হরি॥

পরে গোবিন্দ দুই সের আটা ভিক্ষা করিয়া আনিয়া ষোলখান রুটী করিলেন, সকলের চারিখানা করিয়া হইল। সেবা করিতে বসিয়াছেন।

হেনকালে এক নারী বালক লইয়া।
বলে কিছু দেহ মরি ক্ষুধায় জ্বলিয়া॥

শুনিয়া তাহার বাণী প্রভু দয়াময়।
আপনার ভাগ তুলি দিলেন তাহায় ॥

দুঃখিনী খুসি হইয়া চলিয়া গেল, প্রভু এইস্থানে যে দয়া দেখাইলেন, তাহা আমার ভাল লাগিল না। দুঃখিনী খুসি হইলেন বটে, কিন্তু নিজজন যে ভক্ত সেখানে ছিলেন, তাহারা মরিয়া গেল। তাঁহাদের আহারীয় উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, প্রভুকে আর দিতে পারেন না, রজনীতে প্রভু কিছু জল আহার করিয়া রহিলেন।

পথে এক কুণ্ড পাইলেন। কথিত আছে, সীতা পিপাসাতুর হইলে লক্ষ্মণ বাণদ্বারা সেই কুণ্ড খনন করিয়া জল আহরণ করেন। সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া সকলে তাহার পরে, বিন্ধ্যগিরি গেলেন। তাহার উপরে মন্দুরা নগরে যাইয়া এক যোগীর কথা শুনিলেন, তিনি গুহায় থাকিয়া তপস্যা করেন। দেখিতে সুন্দর কাঞ্চন বর্ণ। ইনি প্রকৃত একজন যোগসিদ্ধ।

মহাপ্রভু সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।
তপস্বী ভাঙ্গিয়া ধ্যান চাহিতে লাগিল ॥
যেইক্ষণে চারিচক্ষে হইল মিলন।
অমনি তপস্বীবর হাসিল তখন ॥

তপস্বীর সঙ্গে প্রভুর যে কি কথা হইল, তাহা গোবিন্দ বলিতে পারিলেন না। সেখান হইতে মণ্ডল নগরে গেলেন, ও তাহার পরে [illegible] নগরে আদিনারায়ণের কুষ্ঠ আরাম করিলেন। আদিনারায়ণ একজন ধনী বণিক, অথচ পরম বৈষ্ণব, কিন্তু কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, সর্ব্বদা অসুখী। প্রভু গ্রামের বাহিরে এক বটতলায় বসিলেন। সেখানে ভোগকার্য্য সমাধা করিলেন। তাহার পরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কাজেই লোককলরব হইল, সেইসঙ্গে আদিনারায়ণ আইলেন। তিনি আসিয়া "নিস্তার কর

প্রভু" বলিয়া কান্দিতে লাগিলেন। প্রভু তাহাকে তাঁহার ভোগের কিঞ্চিৎ প্রসাদ ছিল, তাহা গ্রহণ করিতে বলিলেন।

ভক্তিসহ প্রসাদ করিয়া উপযোগ।
তখনি তাহার দূর হইল কুষ্ঠরোগ॥

তখন বহু রোগী আসিবে ভয়ে প্রভু সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। আদিনারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রভু তাহাকে সংসার ত্যাগ আজ্ঞা দিয়া ফিরাইয়া দিলেন।

প্রভু তাহার পরে শিবানি (শিউনি) নগর, মালপর্ব্বত, চণ্ডিপুর, রায়পুর অতিক্রম করিয়া পরিশেষে বিদ্যানগরে আইলেন, কোথা, না রামানন্দের বাড়ী। এতদিন পরে প্রভু নিজ ভক্তগণের মধ্যে উপস্থিত। দুইজনে গলাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন, রামরায় আমার সঙ্গে চল। চল দুইজনে কৃষ্ণকথায় সুখে দিন কাটাইব। রামরায় একটি রাজ্যে রাজত্ব করিতেছেন, তিনি যখন স্নান করিতে যান, তখন বাদ্য বাজাইয়া সঙ্গে সহস্র লোক যায়। তিনি ইহা ফেলিয়া কুটীরে বসিয়া কৃষ্ণকথা কইতে কেন যাইবেন? কিন্তু রামরায় তাহা ভাবিলেন না। প্রভুর আজ্ঞায় আপনাকে কৃতকৃতার্থ মানিলেন।

তিনি উত্তরে বলিলেন, আপনাকে দর্শন হইতে এই রাজ্যশাসন বিষের ন্যায় বোধ হইতেছে। আমি রাজাকে লিখিলাম যে, আমা হইতে আর তাঁহার কাজ হইবে না, তিনি অন্য লোক নিযুক্ত করুন। রাজা, তোমার নিকট থাকিব, এই নিমিত্ত এই প্রার্থনা করিতেছি, তাহা জানিয়াছেন। তাই তিনি তদ্দণ্ডে ছুটি দিলেন, তিনি তোমাকে দর্শন করিবেন বলিয়া নিতান্ত ব্যাগ্র হইয়া আছেন। তুমি যাও, আমার সঙ্গে সৈন্য যাইবে। তোমার আমার একত্র যাওয়া সুবিধা হইবে না। তাই প্রভু রামানন্দকে ছাড়িয়া নীলাচলে চলিলেন। প্রভু নাম বিলাইতে বিলাইতে আসিতেছেন,

পুনরুক্তি ভয়ে সে সব কথা আর উল্লেখ করিব না। তবে এক মাড়ুয়া ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হয়, সেটা বলিতে হইতেছে। সেরূপ কয়েকটী লীলাও পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অর্থাৎ প্রভুর মারি খেয়ে দয়া করা। কিন্তু এ মাড়ুয়া সম্বন্ধে যে লীলা তাহাতে একটু বিশেষত্ব আছে। তাই উহা একটু বিবরিয়া বলিব। এই লীলা রসালকুণ্ডে হয়। সেখানে একটি মাড়ুয়া ব্রাহ্মণ কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। আর মনেও খুব অভিমান আছে যে, আমি স্বাধীনপ্রকৃতির লোক কাহাকে ভয় করি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ সে একটি বর্ব্বর, মনুষ্যের হৃদয়ে যে সমুদায় কমনীয় ভাব আছে, তাহা তাহার নাই। যাহা কিছু ছিল, তাহা উৎপাটন করিয়াছে, আর তাহার হৃদয়ে যে কোন কমনীয় ভাব নাই, তাহার নিমিত্ত আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে।

এই ব্রাহ্মণের একটি প্রহ্লাদ জন্মিয়াছে। কাজেই সে প্রভুর চরণে আকৃষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। সেখান হইতে নড়িতেছে না, কি নড়িতে পারিতেছে না। প্রভুও তাহার প্রতি স্নেহনয়নে দৃষ্টি করিতেছেন। ব্রাহ্মণ পুত্রকে না পাইয়া তল্লাস করিতে করিতে শুনিল যে, সে প্রভুর ওখানে। সুতরাং ক্রুদ্ধ হইয়া আইল, আসিয়া দেখিল যে প্রকৃতই তাহার পুত্র করযোড়ে প্রভুর সম্মুখে বসিয়া আছে। ইহা দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া গেল। বলিতেছে, তুই এখানে কি করিতেছিস? বালক বলিল যে, এই ঠাকুরের কাছে আছি, ইনি বড় দয়াময়। এইরূপ বালকের মুখে প্রভুর স্তুতিবাণী শুনিয়া, মাড়ুয়ার যে ক্রোধ পুত্রের প্রতি হইয়াছিল, তাহা সমুদায় প্রভুতে নিয়োজিত হইল। অবশ্য তাহার হাতে একখানা যষ্টি ছিল, আর উহা পুত্রের পৃষ্ঠে প্রয়োগ করিবে বলিয়া আনিয়াছিল। এখন উহা হস্তে করিয়া প্রভুকে মারিতে চলিল। ইহাও বলা বাহুল্য যে, মারিবার আগে গালি আরম্ভ করিল। একবারে গমন মাত্র যাহারা প্রহার করে, তাহারা লোক

ভাল, তাহারা কিয়ৎ পরিমাণে পাগল, নিজ কার্য্যের নিমিত্ত সম্পূর্ণ দায়ী নহে। কিন্তু যাহারা কুটিল, তাহারা অগ্রে গালি দেয়, দিয়া ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া লয়, ক্রোধ আইলে কুকর্ম্ম করিতে যে বাধা তাহা থাকে না। এই ব্রাহ্মণ অগ্রে গালি দিতে লাগিল। গালি কি দিল, তাহা অ ভব করা যায়। বলিতেছে, তুই ভণ্ড জুয়াচোর সন্ন্যাসী, আমার পুত্রকে ন করিলি, ইত্যাদি। অদ্য তোকে প্রহার করিয়া তোর ভণ্ডামি ঘুচাইব। ত্যাদি ইত্যাদি।

ইহাতে বালকের মনে কি ভাব হইল বলা যায় তাহার পিতা পাষণ্ড, সে আপনি অতি স্নেহশীল, পিতাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। সেই পিতা, তাহার বিবেচনায়, একেবারে তাহার আপন সর্ব্বনাশ করিতেছে। অবশ্য পিতার চরণ ধরিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিব চা করিতে পারিত, কিন্তু সে বেশ জানিত যে, তাহাতে কোন ফল না। সুতরাং সে পিতাকে ছাড়িয়া প্রভুকে অনুনয় বিনয় করিতে া। যাহা বলিল তাহার ভাবার্থ এই। বলিতেছে, প্রভু, উনি আ , আমার নিমিত্ত পিতার অপরাধ না লইয়া উহাকে মাপ কর। কি হইতেছে, না প্রভুর উপর পিতার ক্রোধ আরো বাড়িয়া উ যদি পুত্র তাহার দিকে জুটিয়া প্রভুকে আক্রমণ করিত, তবে সে প দয় ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিত, কিন্তু পুত্র সন্ন্যাসীর দিকে প্রকারান্তরে বলিতে লাগিল যে, তাহার পিতা পাগল, প্রভুর দয় উ যুক্ত পাত্র, সুতরাং পুত্রের ব্যবহারে ব্রাহ্মণ জ্বলিয়া উঠিল।

আরো, পরে এককাণ্ড হইল, যাহাতে ব্রাহ্ম ধাগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া দেওয়া হইল। সেখানে যাহারা উপস্থিত ছি। তারা ব্রাহ্মণকে বেশ জানে, কাজেই তাহার দিকে না হইয়া, প্রভুর দি ল, হইয়া ব্রাহ্মণকে কটু বলিতে লাগিল। প্রভু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, মারিবে, কিন্তু তাহার মূল্য চাই!

যতবার হরিনাম মুখে উচ্চারিবে।
ততবার যষ্টিঘাত করিতে পারিবে॥

প্রভুর এই ব্যাঙ্গুক্তিতে ব্রাহ্মণের ক্রোধ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন বালক, পিতার চরণ ধরিল, ধরিয়া বলিল, পিতঃ! দেখিতেছেন না, উনি স্বয়ং জগন্নাথ। তাহাতে পিতার পদাঘাত খাইল, তখন বালক প্রভুর চরণে পড়িল। এইরূপে একবার প্রভুকে একবার পিতাকে অনুনয় করিতে লাগিল। তখন প্রভু ব্রাহ্মণের দিকে অরুণ করুণ চক্ষে চাহিলেন, সে চাহনির তুলনা নাই। চাহিয়া বলিতেছেন, "তোমার যে কঠিন মরুভূমির প্রায় হৃদয়, তাহা কৃষ্ণের কৃপায় রসাল হউক।"

যে মাত্র প্রভু এই বর দিলেন, ব্রাহ্মণ অমনি কাঁপিতে লাগিলেন। পরে ভয়ে তাহার পরিধান বস্ত্র অপবিত্র করিল।

ভয়ে জড়সড় বিপ্র দেখিতে না পায়।
কাঁদিয়া আকুল হয়ে পড়িল ধরায়॥
প্রভুর প্রভাবে বিপ্র আকুল হইয়া।
দুইহাতে দুই পদ ধরিল জড়া'য়া॥
অপরাধ করে বড় পাইয়াছি ভয়।
কৃপা করে অপরাধ ক্ষম দয়াময়॥

প্রভু যখন ব্রাহ্মণকে বর দিলেন, তখন তাহার পুনর্জন্ম হইল। তাহার কি কৃষ্ণপ্রেম হইল? তাহার কি ভক্তির উদয় হইল? তাহার কিছুই নয়, তাহার হইল ভয়। ইহার নিগূঢ় পরিগ্রহ করুন। সকল আধার একরূপ নয়, সকলের পীড়া একরূপ নয়, ঔষধ একরূপ হইতে পারে না। তবে কিনা, বিষঘ্ন বিষমোষধি, যাহা হইতে যাহার পীড়া তাহাকে তাহাই দিয়া আরাম করিতে হইবে। সার্বভৌমের পীড়ার কারণ বিদ্যা, তাহাকে বিদ্যাদ্বারা আরোগ্য করিতে হইবে। চাঁদকাজির পীড়া লোকবল,

তাহাকে লোকবল দিয়া সুস্থ করিতে হইবে। জগাই মাধাই নিঠুর অত্যাচারী, তাহার ঔষধ,—চক্র। সুতরাং ব্রাহ্মণ ভক্তি কি প্রেম পাইলেন না, পাইলেন ভয়, সে এত ভয় যে বস্ত্রখানি নষ্ট করিলেন, এবং পরিণামে ভয় হইতে তাহার ভক্তির উদয় হইল।

পুরীধামের নিকট আসিয়া প্রভু আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। তখন নিতাই, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি এক দৌড়ে আসিয়া, আলালনাথে প্রভুর লাগ পাইলেন। *

---

* গোবিন্দের কড়চা বলিয়া যে পুস্তক ছাপা হইয়াছে তাহার প্রথম ও শেষ কয়েক পত্র প্রক্ষিপ্ত। প্রভুর সঙ্গে রামানন্দের মিলনের পূর্ব্বে এই মুদ্রিত কড়চা গ্রন্থে যাহা আছে তাহা অলীক। আবার, প্রভু আলালনাথে আসিয়া যে বহু ভক্ত দেখিলেন, সেখান হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই কড়চার যাহা মুদ্রিত করা হইয়াছে তাহা সমস্তই অলীক। গ্রন্থখানি প্রামাণিক করিবার নিমিত্ত—গোবিন্দের দ্বারা লেখান হইয়াছে যে "আমি ও কালা কৃষ্ণদাস চলিলাম।" অথচ হস্তলিখিত কড়চায় কালা কৃষ্ণদাসের নাম গন্ধও নাই। যে কড়চা গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে তাহাতে রামানন্দ রায়ের মিলন হইতে আলালনাথে প্রভুর সহিত ভক্তদিগের মিলন পর্য্যন্ত প্রামাণিক। অবশিষ্ট সমস্তই প্রক্ষিপ্ত। প্রকাশক মহাশয় এইরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়া পরে অত্যন্ত লজ্জিত হয়েন। তাহার পর তিনি তাঁহার দোষ অপনয়নের নিমিত্ত যতদূর সম্ভব শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখেন। সে পত্র আমাদের নিকট আছে। গোবিন্দ দাসের কড়চার একখানি বিশুদ্ধ সংস্করণ বাহির হওয়া কর্ত্তব্য।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রভু দক্ষিণে যাইয়া কি কি কার্য্য সাধন করিলেন, তাহার অল্প কিছু বিচার করিব। জীবকে ভক্তিধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া এই অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য, প্রভু একমুহূর্ত্তের নিমিত্ত সে উদ্দেশ্য ভুলিতেন না। অতএব প্রভুর ইচ্ছা যে, যতদূর সম্ভব এই ধর্ম্ম সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচাব করিবেন। দক্ষিণদেশে এই ধর্ম্ম প্রচার করা বড় প্রয়োজন ছিল। তাহার এক কারণ, তখন ভারত-বর্ষের, দক্ষিণেই বিশুদ্ধ হিন্দুদেশ ছিল, অন্য স্থানের ন্যায় দক্ষিণে মুসলমান আধিপত্য প্রবেশ করিতে পারে নাই। আব এক কারণ, সে দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম এক প্রকার ছিল না। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া দক্ষিণ অঞ্চলে আশ্রয় লইল। শঙ্করাচার্য্যের উৎপত্তি স্থান দক্ষিণে, সেখানে তাঁহার প্রবল প্রতাপ। উদাসীন, সাধু, সন্ন্যাসিগণ, ঐ রূপে মুসলমান উৎপাতে দেশে স্থান না পাইয়া, কতক হিমালয়ের গহ্বরে, অবশিষ্ট দক্ষিণ দেশে পলায়ন করিলেন। অনেকে আধ্যাত্মিক উন্নতি, অর্থাৎ প্রেম ও ভক্তির নিমিত্ত, যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে বাস করিতেছেন। কিন্তু তবু বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত। আপনারা দেখিবেন যে, দক্ষিণে প্রভু সন্ন্যাসী ও যোগিগণকে যেন তল্লাস করিয়া কৃপা করিয়াছেন।

দক্ষিণে সাধারণ হিন্দুগণের মধ্যে অনেকেই শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মাবলম্বী, এবং বৈষ্ণবের সংখ্যা অতি অল্প। তবে সেখানে অনেক রামায়ত অর্থাৎ রামোপাসক বাস করিতেন। অবশ্য ইহাদিগকেও এক শ্রেণীর বৈষ্ণব বলে। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব তাঁহারা নহেন। তবে রামানুজ, দক্ষিণে বৈষ্ণব ধর্ম্মের জয়পতাকা লইয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। কিন্তু তাঁহার

প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও শাক্ত ধর্ম্ম, বলিতে কি, প্রায় এক প্রকার। উভয়ের মধ্যে মুখ্য বিভিন্নতা এই যে, শাক্তগণের উপাস্য দেবতা শিব ও দুর্গা, আর রামানুজের উপাস্য দেবতা কৃষ্ণ, কিন্তু সে কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যবিবর্জ্জিত দ্বিভুজ মুরলীধর নহেন, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ। সুতরাং দক্ষিণে প্রকৃত বৈষ্ণবের সংখ্যা অতি অল্প ছিল।

প্রভু দক্ষিণে যাইবার আর এক কারণ, রামানন্দ রায়কে আনয়ন করা। প্রভু যে ব্রজের নিগূঢ় রস জীবকে শিক্ষা দেন, রামানন্দকে অধিকারী জানিয়া, তাহার হৃদয়ে, সেই রসের বীজ বপন করিলেন। এই নিগূঢ় রস কি, যদি প্রভু শক্তি দেন তবে পরে বিস্তার করিয়া লিখিব। যাঁহারা লীলার সহায় ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রভুর নিকট আপনি আইসেন, কাহাকে আনিতে প্রভুর আপনার যাইতে হইয়াছিল। রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, ছয় গোস্বামীর একজন, তপন মিশ্রের তনয়। প্রভু তপন মিশ্রকে কাশীতে পাঠাইয়া সেই রঘুনাথের সৃষ্টি করেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপ ডাকাইয়া আনিলেন। পরে একবার, কেশে ধরিয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে আনিয়াছিলেন। হরিদাস আপনি আইলেন। আর যদিও নিত্যানন্দ, প্রভুর আকর্ষণে আপনি আসিয়াছিলেন, তবু তাঁহাকে নন্দন আচার্য্যের বাড়ী হইতে প্রভুর ধরিয়া আনিতে হইয়াছিল। উপরে যাহাদের নাম করিলাম, ইঁহারা সকলেই লীলার সহায়। অদ্বৈত বৈষ্ণব ধর্ম্মের জ্ঞানাংশ, নিতাই আনন্দাংশ, হরিদাস নাম কীর্ত্তনের প্রতিনিধি।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ যাহাদের ভজনীয় বস্তু, তাঁহাদের পীঠস্থান বৃন্দাবন। কিন্তু বৃন্দাবন কোথায়? বৃন্দাবন জঙ্গলময়। সেই জঙ্গলে, বৃন্দাবন সৃষ্টি করিতে হইবে। সেই বৃন্দাবন গঠন করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত পাত্র সংগ্রহ করিতে হইবে। বড় বড় মন্দির করিতে হইবে। অথচ প্রভুর

এক কপর্দ্দকও নাই। কাহার সাধ্য এই বৃন্দাবন সৃষ্টি করে? তাহাই উপযুক্ত পাত্রের প্রয়োজন।

আবার কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলে, তাহার একটি শাস্ত্র চাই, তাহা না হইলে সে ধর্ম্মের উপদেশ মুখে মুখে থাকে, আর মুখে মুখে থাকিলে সেই উপদেশগুলি অতি সত্বর কলঙ্কিত হয়। এই শাস্ত্র করে কে? প্রভু এই সমুদায় কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। যাহা তিনি করিলেন, অতি বড় যে সম্রাট, কি অতি বড় যে পণ্ডিত তিনিও তাহা করিতে পারিতেন না। কিন্তু আমার কৌপীনধারী প্রভু, ধন জন সহায় শূন্য থাকিয়া, সমুদায় করিয়াছিলেন। এই সমুদায় কার্য্য যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে গোস্বামী বলে, এইরূপ বৃন্দাবনে ছয় গোস্বামী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি, সেখানে এই ছয় গোস্বামী সেনাপতিস্বরূপ হইলেন। অন্তর্যামী প্রভু দেখিলেন যে, গৌড়ীয় পাতসাহের পরম পণ্ডিত ও বিচক্ষণ মন্ত্রিদ্বয় রূপসনাতনই কেবল এই সমুদায় বৃহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ। তাঁহারা গৌড়ে, প্রভু নীলাচলে, প্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইবেন উপলক্ষ করিয়া গৌড়ে যাইয়া তাঁহাদিগকে আনিলেন। যত পণ্ডিত যুদ্ধ করিতে আইসেন তাঁহারা এই গোস্বামিগণের, বিশেষতঃ রূপসনাতনের, নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইতেন।

দক্ষিণে যাইবার সুতরাং আর এক কারণ গোপালভট্টকে শক্তি সঞ্চার ও বৃন্দাবনে আনয়ন করা। ইনি ছয় গোস্বামীর একজন। আর গোপাল ভট্টকে না পাইলে আমরা প্রবোধানন্দ সরস্বতীকে পাইতাম না। সরস্বতীর বহু মুল্য গ্রন্থ চন্দ্রামৃত যিনি, পাঠ না করিয়াছেন তিনি অতি হতভাগা। মহাপ্রভু যে কি তত্ত্ব তাহার অতি প্রধান সাক্ষী এই প্রবোধানন্দ, ইঁহার সাক্ষ্য অমান্য করিবার একেবারে যো নাই। যখন বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের যশ ভারত ব্যাপিল, তখন পশ্চিম দেশীয় লোকের দীক্ষা রূপ সনাতন

কি ভাব, যে দিবেন এরূপ সময় তাঁহাদের রহিল না, সে কার্য্য সমাধা গোপাল ভট্ট করিতেন।

প্রভু দক্ষিণে ভ্রমণ করিতে করিতে যেখানে ফলবান্ বিষবৃক্ষ পাইতেছেন, তাঁহাকে ছেদন করিতেছেন। আবার স্থানে স্থানে ফলবান্ অমৃতবৃক্ষ রোপণ করিতেছেন। এইরূপে বেশ্যা দস্যু ও মায়াবাদী প্রভৃতি বিষবৃক্ষ ও, তাহা নষ্ট করিলেন। তুকারামের ন্যায় ফলবান্ বৃক্ষ রোপণ করিলেন। প্রভু উন্মাদের মত যাইতেছেন, কিন্তু কাজের ভুল হইতেছে না। সমুদ্রধার দিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে অভ্যন্তরে যাইতেছেন, কেন যাইতেছেন, তাহা তাঁহার কার্য্যের দ্বারা পরে প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাৎ আচার্য্য সৃষ্টি করা।

কোন মহাপুরুষ কি অবতার যদি কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন, তবে প্রথমে কিছুকাল সেই অবতারের শক্তিতে উহা বৃদ্ধি পায়। পরে মনুষ্যের দুর্ম্মতে আবার উহার শক্তির হ্রাস হইয়া পড়ে। এইরূপ ধর্ম্ম-গ্লানি হইলে, শ্রীভগবান সেখানে আবার অবতীর্ণ হইয়া, আবার সেই ভক্তি ধর্ম্ম স্থাপন করেন, ইহা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের বাক্য। তাই প্রভু যখন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তখন এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষের সমুদায় ধর্ম্মকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিল। এই বাঙ্গলায়, শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভুর সময়, শাক্ত ধর্ম্ম প্রায় যায় যায় হইয়াছিল। কিন্তু গৌড়ে আবার ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য বাড়িয়া গেল, আর এখন বৈষ্ণব ধর্ম্মের ছায়ামাত্র আছে।

সেইরূপ প্রভু যদিও সমুদায় দক্ষিণদেশ উত্তেজিত করিয়া গেলেন, কিন্তু সেখানে ধর্ম্মের আবার নির্জীব ভাব উপস্থিত হইয়াছে। তবু দক্ষিণে, প্রায় সমুদায় স্থানে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের আর এক আকার হইয়াছে। তুকারামের শিক্ষাগুলি ঠিক আমাদের গৌড়িয় বৈষ্ণবের মত। আমি বম্বে নগরে, আমাদের গৌড়িয় কীর্ত্তন শুনিয়াছি। বিখ্যাত ইতিহাস লেখক সত্যচরণ শাস্ত্রী বম্বে পরিভ্রমণকালীন সমুদ্র তীরে শ্রীবর্দ্ধন নামক স্থানে

একটী বৈষ্ণবের মঠ দেখিতে পাইয়াছিলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন যে, উহা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী অবধুতের মঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ; শুনিলেন যে, খ্যাতনামা গৌরভক্ত পরম পণ্ডিত বিশ্বনাথ তাঁহার শেষ জীবন শ্রীবর্দ্ধনে যাপন করেন। হইতে পারে স্বয়ং বিশ্বনাথ সেখানে গমন করেন নাই, ঐ মঠ তাঁহার শিষ্য দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। তত্রাচ, মহাপ্রভুর একজন গৌড়িয় ভৃত্য কর্ত্তৃক ঐ মঠ যে স্থাপিত হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। রামদেব বাগচি ইলোরানগরে যাইয়া রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিলেন পূর্ব্বে বলিয়াছি, অগ্রে দক্ষিণে বৈষ্ণবগণ দ্বিভুজ মুরলীধর, কি রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি ভজনা করিতেন না। তাঁহাদের সেবার বস্তু ছিলেন, লক্ষ্মী জনার্দ্দন। অর্থাৎ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ আর লক্ষ্মী। শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য মূর্ত্তিও দক্ষিণে পূজিত হইত, যেমন বিঠল দেব। দক্ষিণে বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপ্রধান মন্দির, শ্রীরঙ্গ পত্তন। সেখানে ভজনীয় বস্তু লক্ষ্মী জনার্দ্দন। তবে দক্ষিণে যে একেবারে রাধাকৃষ্ণ ভজন ছিল না, তাহা বলা যায় না। যদিও ছিল তবে অতি বিরল। মহাপ্রভু যাইয়া রাধাকৃষ্ণ ভজন প্রচলিত করিলেন। অতএব দক্ষিণে যেখানে রাধাকৃষ্ণের মন্দির দেখিবেন, তাহার প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ উৎপত্তির কারণ যে মহাপ্রভু, তাহার সন্দেহ নাই, রামযাদব শুনিলেন যে, সেই রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের সম্মুখে প্রভু নৃত্য করিয়াছিলেন।

আপনারা অগ্রে পাঠ করিয়াছেন যে, মহাপ্রভু ত্রিপতি নগরে গমন করেন। ইহা আরকট জেলায়, মান্দ্রাজ হইতে বহুদূরে নয়। সেখানে সাহিত্যসেবী শ্রীমান গোপাল শাস্ত্রী অল্প দিন হইল গিয়াছিলেন। সেখানে যাইয়া একটি তৈলঙ্গিপদ শুনিলেন। যথা :—

চেয়ে দেখ ঢুলু গোসাঞি বাঙ্গালার বীর।
আর কোথায় কে দেখচ এমন খোলা শির?

অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানে লোকে মাথায় আবরণ দিয়া থাকে, "লাঙ্গাশির" কেবল বাঙ্গালায়। সেই সব দেশের লোকের বিশ্বাস যে, স্ত্রীলোকের লাঙ্গাশির দেখিলে সে দিন তাহার উপবাস করিতে হয়। * ঢুলু গোসাঞি বাঙ্গালী, অতএব তাহার মাথার কোন আবরণ ছিল না। তাহা হইতেই এই তৈলঙ্গি কবিতাটী হইয়াছে। সে যাহা হউক, ঢুলু গোসাঞি কে? তিনি বাঙ্গালি, তাহা জানা গেল, তিনি একটি প্রধান লোক ছিলেন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ তিনি ঐ ত্রিপতিতে অবশ্য খ্যাতাপন্ন ছিলেন, তাহা না হইলে গ্রাম্য কবি, তাহাকে একটী কবিতার নায়ক কেন করিবে? অতএব তিনি কে? অনুসন্ধানে শ্রীল গোপাল শাস্ত্রী জানিলেন যে, তিনি একজন বৈষ্ণব মহান্ত, এখানে ছিলেন, এবং তাহার সমাধি, সেখানে পর্ব্বতের উপরে আছে। এই কথা শুনিয়া গোপাল বাবু প্রভৃতি অনেকে পদব্রজে অতি উচ্চ যে গোকর্ণ গিরি, তাহার উপরে উঠিলেন। দেখেন যে, পর্ব্বত নিবীড় জঙ্গলে পূর্ণ। পর্ব্বতে বহুতর গুহা আছে, তাহার মধ্যে সাধু বাস করিয়া ভজন করিতেন, হয় ত এখনও করিতেছেন। তাহারা একটী গুহায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাহার অভ্যন্তরে মন্দির, মনোহর কূপ, পুষ্পোদ্যান ও বাসের নিমিত্ত ছোট ছোট কুটীর। এই ত্রিপতিতে এখনও গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্য আছেন। এই গোকর্ণগিরি বৈষ্ণবগণের একটী মহাপীঠ

---

* পুনা নগরে শ্রীযুক্ত মহাদেব রাণাডে আর আমি একখানা অনাবৃত গাড়িতে অর্থাৎ ফেটনে বেড়াইতেছিলাম। আমার মাথা খোলা। মহারাষ্ট্রী রমণীগণ কূপে জল তুলিতেছিলেন। এমন সময় রাণাডে আমাকে বলিলেন, তোমার রুমাল দিয়া তোমার মস্তক আবরণ কর, ঐ দেখ ঐ সব স্ত্রীলোকে তোমাকে গালি দিতেছে, যে হেতু অদ্য তাঁহাদের উপবাসী থাকিতে হইবে। আমি কাজেই তাহাই করিলাম।

বলিয়া বিখ্যাত। ডুলু গোসাঞিঃর নাম দুর্ল্লভচন্দ্র সেন, পরে ভেক লইয়া ডুলু গোসাঞি হইলেন। তাহার সমাধি অদ্যাপি সেখানে পূজিত হইতেছে। দুর্ল্লভ গোসাঞির আশ্রমে মহাপ্রভু পূজিত হইতেন, গোসাঞির অন্তর্দ্ধানের পর সেই বিগ্রহ কম্বোকাননের একজন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়াছেন। ও সেই শ্রীবিগ্রহ এখনও সেখানে পূজিত হইতেছেন। কম্বোকানন কুম্ভকর্ণের সরোবর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। দুর্ল্লভ গোস্বামীর পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে চৈতন্য চরিতের কয়েক পৃষ্ঠা এখনও ওখানকার বৈষ্ণব-গণের মধ্যে রক্ষিত আছে।

মনে করুন, এই ত্রিপতি নগরে, প্রভুর সেখানে যাইবার পূর্ব্বে, একটীও বৈষ্ণব ছিলেন না। ছিলেন কেবল রামায়তগণ। তাহারা শ্রীরামের উপাসক। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান মথুরা স্বামী প্রভুর সহিত দ্বন্দ্ব করিতে আসিয়া, পরে তাহার চরণে আশ্রয় লইলেন।

প্রভুর ধর্ম্ম কিরূপে উত্তর পশ্চিমে প্রচারিত হইয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিতে গুঞ্জমালী, চক্রপাণি প্রভৃতি প্রচারকের নাম করিয়াছি। এইরূপে সুরাটে, গুজরাটে, মালবারে, লাহোরে ও সিন্ধুদেশে, প্রভুর ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাস ধর্ম্ম প্রচারার্থ দেরাগাজিখায় গিয়াছিলেন। তিনি সিন্ধু নদী পার হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির দেখিলেন ও দেখিলেন যে উহাতে বিগ্রহ আছেন। আর দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন যে, মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের ৫০।৬০ জন বৈষ্ণব সেখানে আছেন।

মহাপ্রভুর লীলাকথা এখনও বাহিরে প্রকাশ হয় নাই। যত প্রকাশ পাইবে ততই তাঁহার নূতন নূতন কীর্ত্তি জানা যাইবে। প্রভুর লীলা যখন তেলুগু, তৈলাঙ্গ ও মহারাঠী ভাষায় প্রকাশ হইবে, তখন উহা সর্ব্বসাধারণে জানিবেন। আমার বিশ্বাস যে, অনুসন্ধান করিলে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে প্রভুর অসংখ্য কীর্ত্তি পাওয়া

যাইবে। কিন্তু সে সমুদায় ক্রমে প্রকাশ হইবে, আমাদারা অবশ্য হইবে না। পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, সম্রাট আকবর তানসেনকে সঙ্গে করিয়া সনাতন গোস্বামীকে দর্শন করিতে আইসেন। এ কথা কোন গ্রন্থে পাই নাই, তবে একটী পদে পাইয়াছি; যথা :—

জিউজিউ মেরে মনচোরা গোরা।
আগোইলা চেত রসে ভোরা॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া।
ভজন আনন্দে নাচে লিকিলিকিয়া॥
পদ দুই চারি চলু নট নটনটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে লিখিয়া॥
ঐছন পহুকে যাঙ বলিহারি।
সাহ আকবর তেরি প্রেম ভিকারী॥

তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গির যে বৃন্দাবনে গোস্বামী দর্শন করিতে আইসেন আর তাঁহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হয়েন, তাহা তিনি তাহার জীবনী গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রভু দক্ষিণে আর এক মহৎ কার্য্য করেন। সেখানে বিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণ কর্ণামৃত, ও ব্রহ্ম সংহিতা এই দুইখানি পুস্তক সংগ্রহ করেন। যদিও ব্রহ্ম সংহিতা অমূল্য গ্রন্থ, তবে সেরূপ গ্রন্থ লেখা একেবারে অসম্ভব নয়, কিন্তু কর্ণামৃত লিখে কাহার সাধ্য? কেবল তাঁহারি সাধ্য যিনি কৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা পাত্র। শ্রীকৃষ্ণের তাঁহার প্রতি এত কৃপা কেন হইল? তাঁহার নয়ন রমণীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহাই বেলের কাটা দিয়া সে দুটী নয়ন ধ্বংশ করেন। কাজেই কৃষ্ণের কৃপাপাত্র হইলেন।

প্রভুর প্রকাশের পূর্ব্বে মাধুর্য্য ভজন যাহা কিছু ছিল, তাহা বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জয়দেব, রামরায়, বিল্বমঙ্গল জগতে দিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রভু ২৪ বৎসর বয়সে অবতাররূপে প্রকাশিত হয়েন। সেই অবধি তাঁহার প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ। তবু তাঁহার চারি বৎসর পূর্ব্বে, পূর্ব্ববঙ্গে নাম প্রচার করেন। তাঁহার প্রকৃত কার্য্য কি বলিতেছি। তাঁহার এক কার্য্য অন্তরঙ্গের সহিত, ও আর এক কার্য্য বহিরঙ্গের সহিত। অন্তরঙ্গের সহিত তাঁহার যে কার্য্য সে কথা পরে বলিব। বহিরঙ্গ সঙ্গে তাঁহার এই কার্য্য যে, শ্রীভগবানের প্রকৃতি ও ভজন কিরূপ, তাহা শিক্ষা দেওয়া। যে অবধি মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে, সেই অবধি জীবে শ্রীভগবানকে একটী অসুর সাজাইয়া তাঁহাকে ভজনা করিতে গিয়া কেবল তাঁহার গ্লানি করিয়াছে। প্রভু শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীভগবানের প্রকৃতি কিরূপ ও তাঁহার ভজন কিরূপ।

ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য অন্যান্য মহাপুরুষে পূর্ব্বে করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের পদ্ধতি ও প্রভুর পদ্ধতি স্বতন্ত্র। যীশুখৃষ্ট চারি বৎসর পরিশ্রম করিয়া লক্ষ লোকের মধ্যে মোটে দ্বাদশটি শিষ্য পাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একজন তাঁহার সহিত ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। মহাম্মদ মদিনা সহর হইতে অনুগত সংগ্রহ করিয়া মক্কা আক্রমণ করিয়া জয় করিলেন, করিয়া এক দিনে নগরের সমুদায় লোককে তাঁহার মতে আনিলেন। কারণ তিনি এক নিয়ম করিলেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহাকে ঈশ্বর প্রেরিত বলিতে অস্বীকার করিবে, তাহাকে তিনি প্রাণে বধ করিবেন। কাজেই এক মুহূর্ত্তে নগর সমেত লোক তাঁহার অনুগত হইল।

কিন্তু প্রভুর প্রচার পদ্ধতি স্বতন্ত্র। তিনি প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষ ঘু।

ভ্রমণ করিলেন, করিয়া তাঁহার অনুমোদিত যে ধর্ম্ম, তাহা প্রচার করিলেন। জীবকে বুঝাইলেন কিরূপে? বক্তৃতা করিয়া, কি তর্ক করিয়া নয়, তবে আপনি আচরিয়া। সহস্র লোকের মধ্যে তিনি আপনি কৃষ্ণ-প্রেম দ্বারা অভিভূত হইয়া দেখাইলেন যে, কৃষ্ণপ্রেম কি। আর তাহা দেখিয়া তাহাদের প্রায় সকলেরই সেই পরমধন লাভ করিতে প্রগাঢ় লোভ হইল। এইরূপে তিনি ৪।৫ বৎসরকাল প্রচার করিয়া দেশের শীর্ষ স্থানীয় লক্ষ লক্ষ লোককে বৈষ্ণব ধর্ম্মে আনয়ন করিলেন। এইরূপে নবদ্বীপের প্রধান অধ্যাপক সার্ব্বভৌম, সন্ন্যাসীর প্রধান প্রকাশানন্দ, বৈষ্ণবগণের প্রধান আচার্য্য শ্রীঅদ্বৈত, স্বাধীন ভূপতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী সম্রাট প্রতাপরুদ্র, গৌড়ের রাজার মন্ত্রী প্রভৃতিকে আপনার মতে আনিয়া নিজ ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা করিলেন। অন্যান্য ধর্ম্ম প্রচারকগণ আপনারা বড় অধিক প্রচার করিতে পারেন নাই। প্রকৃত প্রচার তাহাদের শিষ্য দ্বারা হইয়াছিল। যীশু যখন প্রাণ ত্যাগ করেন তখন তাহার একাদশটী শিষ্য মাত্র ছিল। প্রভু কিন্তু স্বয়ং যত প্রচার কার্য্য করেন, ভক্তগণ দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশ ও হয় নাই। এই শিষ্যগণের মধ্যে প্রধান নিতাই, অদ্বৈত, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রভুর ধর্ম্ম দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর স্থাপিত করিতে হইলে একটি শাস্ত্রের প্রয়োজন। যদি খৃষ্টীয়ানদের ম্যাথিউ প্রভৃতি চারি খানা খৃষ্টের লীলা গ্রন্থ না থাকিত, তবে তাহাদের ধর্ম্ম অতি অল্প দিনের মধ্যে লোপ হইয়া যাইত। মুসলমানদের কোরাণ না থাকিলে তাহাদের ধর্ম্মেরও সেই অবস্থা হইত। বৈষ্ণবদের সেই নিমিত্ত একটী শাস্ত্রের প্রয়োজন। প্রভু তাহা করাইলেন।

রূপ ও সনাতনকে আপন কাছে বসাইয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। রূপকে প্রয়াগে, সনাতনকে কাশীতে, এইরূপে রূপকে দশ দিবস, ও

সনাতকে দুই মাস শিক্ষা দিলেন। প্রভু আমাদের সমুদায় শাস্ত্র ফেলিয়া দিয়া, নূতন একটি করিতে পারিতেন। একেবারে চুরমার করিয়া সেই দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া পুনর্ব্বার গ্রন্থন করা পদ্ধতি প্রভুর অনুমোদনীয় নহে। তিনি সমুদায় শাস্ত্র রাখিলেন। এমন কি, তিনি তেত্রিশ কোটী দেবতা রাখিলেন, জ্ঞানবাদীদিগের তত্ত্ব কথা রাখিলেন। সে সমুদায় রাখিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্রের ভিত্তিভূমি করা প্রভুর মনের ইচ্ছা। মনে ভাবুন এ অতি অসম্ভব ব্যাপার। শিব থাকিবেন, কালী দুর্গা থাকিবেন, অথচ শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাস রাখিবেন। এই সমুদায় দেব দেবী উপাসনা, আর ব্রজের নিগূঢ় রস, ইহাদের সামঞ্জস্য করা ত বহুদূরের কথা, বিচার করিলে ইহারা পরস্পরের ধ্বংসকারী। রস বিচারের সময় পাঠক দেখিবেন, কালী পূজা ও রাধা-কৃষ্ণ ভজন পরস্পর ঘোর বিরোধী। দ্বৈতবাদে ও অদ্বৈতবাদে সেইরূপে অহিনকুলতা সম্বন্ধ, কিন্তু প্রভু এইরূপ সকল বিবাদ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।

আবার, বেদ হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান সম্মানের বস্তু। এই বেদে কি বৈষ্ণব ধর্ম্মের পোষকতা করে? তাহা যদি না করে তবে হিন্দুরা এই ধর্ম্ম লইবে না। যদি পোষকতা করে, তবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি ভূমি দৃঢ়তর হইবে। অতএব এই অসম্ভব কার্য্য, বেদের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের পোষকতা করা, তাহাও প্রভু করিলেন।

দ্বিতীয় কার্য্য ন্যায় শাস্ত্র অর্থাৎ শুদ্ধ বিচার দ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করা। বিচারে এরূপ দেখাইতে হইবে যে, শ্রীভগবান আছেন, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যময়, আর তাহার ভজন করিতে হইলে, তাহার ঐশ্বর্য্য অংশ বর্জ্জন না করিলে উহা সম্ভব হয় না। ইহার মধ্যে শেষ তত্ত্বটী কেবল বৈষ্ণবগণ মান্য করেন, আর কেহ করেন না।

আর এক কাজ রস বিস্তার। বৈষ্ণবদিগের সর্ব্বপ্রধান ভজন ব্রজের

রস লইয়া। সে রস কি তাহার একটি নূতন শাস্ত্র করা। এই রস পূর্ব্বে জগতে ভজনের নিমিত্ত কদাচিৎ ব্যবহৃত হইত। এরূপ ব্যবহার পূর্ব্বে ছিল না।

চতুর্থ বৈষ্ণবদিগের স্মৃতি করা। ইহারা সমাজ বদ্ধ হইয়া থাকিবে. অতএব নিয়ম চাই। আবার, নিয়মগুলি এরূপ হওয়া চাই যাহা বৈষ্ণব মাত্রই মান্য করিতে বাধ্য হইবে। এই সমস্ত শাস্ত্র কিরূপে লিখিতে হইবে, ইহার বিন্দু বিসর্গ কেহ জানিতেন না। প্রভুর এই সমুদায় অমানুষিক কার্য্য করিতে হইবে। আর তিনি করিয়াছিলেন কিরূপে, বলিতেছি। নূতন বৃন্দাবন সৃষ্টি ও বৈষ্ণব শাস্ত্র সৃষ্টি এ উভয় কার্য্য তিনি সমাধা করিয়া গিয়াছেন। প্রভু প্রধানতঃ উপরি উক্ত দুই ভাই রূপ সনাতন দ্বারা এই দুই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালীন প্রয়াগে, রূপ ও অনুপমের সহিত প্রভুর দেখা হইল। অমনি প্রভু সেখানে রহিয়া গেলেন, কেননা, রূপকে শিক্ষা দিবার জন্য। দশ দিবস শ্রীরূপকে শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। বলিলেন সেখানে যাও যাইয়া কার্য্য উদ্ধার কর।

পরে সেখান হইতে কাশীতে আগমন করিলেন, সেখানে সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ হইল, এবং তাহাকে দুই মাস শিক্ষা দিলেন। অতএব যদিও প্রভু প্রেমে সর্ব্বদা উন্মত্ত, তবু জীবের মঙ্গল কামনা সর্ব্বদা মনে জাগরুক রাখিতেন। প্রভু জননী, স্ত্রী, বন্ধুগণ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে রহিয়াছেন, সেখানে অনেকের সহিত প্রীতি হইয়াছে। এখন আবার তাহাদের ত্যাগ করিয়া কাশীতে কি প্রয়োগে নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া, সনাতনকে ও রূপকে তত্ত্ব কথা শিক্ষা দিলেন। এইরূপে প্রায় আড়াই মাস কাটাইলেন। ইহাদের কি শিক্ষা দিয়াছিলেন, ইহার আভাষ পূর্ব্বে বলিয়াছি, অর্থাৎ যে সমুদায় লোক তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, তাহাদের নিমিত্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন, তাই সে সমুদায় শাস্ত্র কি এবং তাহাতে কি কি সন্নিবেশিত থাকিবে তাই

শিখাইলেন। . সমুদায় শাস্ত্র পরিশেষে গোস্বামিগণ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহারা কি লিখিবেন কিছুই জানিতেন না। সে সমুদায় প্রভুর নিকট শিক্ষা করিলেন, করিয়া, যথা চরিতামৃতে ঃ—

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন করে দন্তে তৃণগুচ্ছ লইয়া ॥
নীচ জাতি নীচ সেবী মুঞিত পামর।
সিদ্ধান্ত শিখাইলে এই ব্রহ্মার অগোচর ॥
মোর তুচ্ছমন এই সিদ্ধান্তমৃত সিন্ধু।
মোর মন ছুতে নারে ইহার এক বিন্দু ॥
পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ ॥
মুই যে শিখাইনু তোরে স্ফুরুক সকল।
এই তোমার বল হইতে হবে মোর বল ॥
তবে মহাপ্রভু তার শিরে ধরি করে।
বর দিল এই সব স্ফুরুক তোমারে ॥

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রেম ভক্তির মত, বেদ সম্মত না, ইহা না দেখাইলে হিন্দুগণ উহা লইবে না। কিন্তু জগতে সকলে এরূপ জানিত যে : বেদ, প্রেম ভক্তি ধর্ম্মের বিরোধি। তাই সার্ব্বভৌম, প্রভুকে, তাহার নাচন গায়ন ছাড়াইবার নিমিত্ত বেদ পড়াইতে চাহেন। প্রভু প্রথম এই সার্ব্বভৌমের সহিত বিচারে দেখাইলেন যে, বেদ প্রেমভক্তি ধর্ম্মের বিরোধী নয়, বরং পক্ষপাতী। তাই সার্ব্বভৌম বলিলেন যে, প্রভু, তুমি স্বয়ং বেদ। ঠিক এই লীলা কাশীতে হয়, তখনকার সন্ন্যাসীর স্থান কাশী, আর কাশীর প্রধান সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী। প্রভু বেদের প্রকৃত অর্থ কি, তাহাকে বুঝাইলেন, অর্থাৎ দেখাইলেন যে, বেদ প্রেমভক্তি

র্ম্ম অনুমোদন করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে সরস্বতী ঠাকুর, প্রভুর ভাব-
কালিকে দুষিয়াছিলেন, প্রভুর কৃপা পাইলে তাঁহার মত কিরূপ পরিবর্ত্তিত
তাহা তাঁহার শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থে দেখা যাইবে।

এই প্রথম প্রভু দেখাইলেন যে, বেদ তাঁহার ধর্ম্মের পক্ষপাতী।
তাহার পরে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এ সম্বন্ধে বৃহৎ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। কিরূপে,
তাঁহার সে কাহিনী অতি অদ্ভুত! তাহার পরে শ্রীভগবানের প্রকৃতি কিরূপ,
ভজন সাধন কিরূপ, প্রেমভক্তি কিরূপ ইত্যাদি সমুদায় বিস্তার করিয়া
শিক্ষা দিলেন। আর শিক্ষা দিলেন যে, প্রেম ভক্তি-রস দিয়া যে ভজন
করিতে হইবে, সে সমুদায় রস কি।

তাহার পরে কিরূপে বৈষ্ণব স্মৃতি করিতে হইবে তাহাও শিখাইলেন।
যেমন রঘু নন্দনের স্মৃতি শাক্তদেব লিখিত, সেইরূপ বৈষ্ণবদের স্মৃতি হরি-
ভক্তি বিলাস। গোস্বামী গোপাল ভট্ট, গোস্বামী সনাতনের নিকট এই
সমস্ত তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া এই বৈষ্ণব স্মৃতি প্রকাশ করেন। এইরূপে বৈষ্ণব
শাস্ত্রের সৃষ্টি হইল। এই সমুদায় বৈষ্ণব গ্রন্থের তালিকা দিতে অনেক
স্থান লাগিবে, তবে প্রধান কয়েকটীর নাম ক্রমে করিতেছি। প্রভুর লীলা
লেখক শ্রীকবিরাজ গোস্বামী মোটামুটী বলিয়াছেন যে, তাহারা লক্ষ গ্রন্থ
প্রণয়ন করেন।

এখন বৃন্দাবন গঠন করিতে হইবে। যখন প্রভু প্রথমে লোকনাথ ও ভুগর্ভকে
বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন, তখন তাঁহারা যাইয়া দেখিলেন যে, বৃন্দাবনে কিছু
নাই, কেবল আছেন যমুনা ও গোবর্দ্ধন। তাহার পরে প্রভু গেলেন।
সেখানে যাইয়া শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড প্রভৃতি কয়েকটী লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার
করিলেন। তাহার পরে রূপ সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন।

সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রবোধানন্দ সরস্বতীকেও সেখানে প্রেরণ করিলেন।
ইহারা কেহই প্রভুকে ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে যাইতে চাহেন নাই, কিন্তু

প্রভু তাঁহাদিগকে আপনার নিকটে থাকিতে দিলেন না। বলিলেন, বৃন্দাবনে সত্বর যাইয়া আমার কার্য্য উদ্ধার কর। অতএব এই করঙ্গ, কৌপীন এবং কাথাধারী দুই চারিটী বস্তু বৃন্দাবন স্থাপন করিতে প্রেরিত হইলেন. তাঁহারা প্রভুর শক্তিতে বলীয়ান্।

তখন মিশ্রের আলয়ে তাহার পুত্র রঘুনাথ ভটকে বলিলেন, পিতামাতার সেবা কর, তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানে আমার এখানে আসিও, বিবাহ্ করিও না। রঘুনাথ ভট্ট তাহাই করিলেন। তখন প্রভু তাঁহাকে কিছুদিন সঙ্গে রাখিয়া তাহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া বলিলেন, যাও বৃন্দাবনে যাও। রঘুনাথ কান্দিলেন, যাইতে চাহিলেন না, তাহা হইল না, যাইতে হইল।

শ্রীরঙ্গপত্তনে বালক গোপালকে, রঘুনাথকে যে আজ্ঞা করেন, ঠিক তাহাই করেন। গোপাল, পিতামাতা গোলকগত হইলে, আজ্ঞা নাই বলিয়া নীলাচলে যাইতে পারিলেন না, একেবারে বৃন্দাবনে গেলেন। জীব এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী সর্ব্বশেষে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বৃন্দাবন গঠনের ভার, প্রধানতঃ রূপসনাতন ও প্রবোধানন্দের উপর হইল। প্রবোধানন্দের তত নাম নাই, তাহার কারণ রূপসনাতনের তাহার সহিত একটু মতের পার্থক্য ছিল। সে আর কিছু নয়, রূপসনাতনের কার্য্য রাধাকৃষ্ণের ভজন প্রচলন করা, আর প্রবোধানন্দের ভজনীয় শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ নহেন।

প্রবোধানন্দের শ্রীনবদ্বীপে আসা উচিত ছিল। বোধ হয় তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া, প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে শঙ্করীয় মায়াবাদিগণ হইতে ভক্তিধর্ম্ম রক্ষা করার নিমিত্ত বৃন্দাবনে রাখেন। শ্রীজীব গোস্বামী রূপ এবং সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র ও রূপের শিষ্য। তিনি রূপসনাতনের ছোট ভাই অনুপমের পুত্র। অনুপম অদর্শন হইলেন, রূপসনাতন উদাসীন হইলেন। রূপ বাড়ী আসিয়া অতুল সম্পত্তি নানা ভাল ভাল

কার্য্যে নিয়োগ করিয়া, তাঁহাদের রাজসিংহাসনে শ্রীজীবকে বসাইলেন। তখন নিঃসম্বল হইয়া একেবারে বৃন্দাবনে গমন করিলেন।

শ্রীজীব কিছুকাল রাজত্ব করিলেন, কিন্তু উহা ভাল লাগিল না, তিনি শ্রীনবদ্বীপে গমন করিলেন, করিয়া নিতাইর স্মরণ লইলেন. বলিলেন, আমি সংসারে থাকিতে পারিতেছি না, অথচ পিতৃব্যের ইচ্ছায় আমি রাজত্ব করি। নিতাই বলিলেন, প্রভু শ্রীবৃন্দাবন তোমাদের গোষ্ঠিকে দিয়াছেন। তোমার পিতৃব্যদ্বয় বৃদ্ধ হইলে তখন বৃন্দাবন কে রক্ষা করিবে? তুমি বৃন্দাবন যাও। এই আজ্ঞা পাইয়া শ্রীজীব বৃন্দাবন যাইয়া উপস্থিত। নিতাইর আজ্ঞা লইয়া আসিয়াছেন, কাজেই পিতৃব্যদ্বয় তাঁহাকে রাখিলেন।

শেষে রঘু... দাস, (প্রভু ইহাকে গোস্বামী পদ দিয়া কাছে রাখেন), প্রভুর অন্তর্ধানে বৃন্দাবনে গমন করিয়া সেখানে রহিলেন, এই হইল ছয় গোস্বামী।

নূতন যে বৈষ্ণব সাহিত্য হইল, তাহাতে বেদের আকার পরিবর্ত্তিত হইল। সে হিসাবে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকে একজন ব্যাস বলা যায়। বৈষ্ণব স্মৃতি যেরূপ সংস্কৃত ও পূর্ণ, এরূপ রঘুনন্দনের স্মৃতি নয়।

ভগবত্তত্ব সম্বন্ধে জীব গোস্বামী যেরূপ সন্দর্ভ লিখিয়াছেন, এরূপ গ্রন্থ জগতে নাই। ইহা অনুবাদ করিলে পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতগণ দেখিবেন যে, ঐ গোস্বামিগণ আধ্যাত্মিকজগতের কত অভ্যন্তরে গিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টি এক প্রকার বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রভুর শেষ লীলা।

হৃদয়েরি রাজা প্রাণারাম! অনাথিনী করি,
কোথা গেলে প্রাণনাথ।
তোমা বিনা ভুবন আন্ধার ॥ ধ্রু

কবে তোমায় পাব চাঁদ, আমার চাঁদ চাঁদ।
আমি তোমার চিরদিনের, হে পরাণের ফাঁদ ॥
গৌরচন্দ্র নাম আমার কর্ণে প্রবেশিল।
সেই হতে মতি গতি সব ফিরি গেল ॥
অলক্ষিতে তুমি আমার হিয়ায় প্রবেশিলে।
কিছু নাহি জানি আমার কাছে কেন এলে ॥
বড় বড় কত লোক ছিল এ জগতে।
তাহা সব ছাড়ি কৃপা করিলে আমাতে ॥
তুমি জান তোমার মন আমি কিবা জানি।
প্রাণে মেরনা মোরে শুন গুণমনি ॥
তুমি ছাড়া মোর আর আশা কোথা নাই;
তুমি ত্যেয়াগিলে বল যাব কার ঠাঁই ॥
আমি তোমায় খুঁজে বেড়াই হতভাগা অন্ধ।
দরশন দিয়ে আমার ঘুচাও মনের ধন্দ ॥
দেখা দিয়ে প্রাণ জুড়াও কোথায় মোর যাদু।
মধুময় তুমি নাথ মধু মধু মধু ॥

অনন্ত ভকত তোমায় ঘিরিয়া রয়েছে।
অতি ক্ষুদ্র বলরামে মনেতে কি আছে?
আমি চাতকিনী তুমি নব জলধর।
তুমি পূর্ণচন্দ্র আমি চকোর কাতর॥
আগে আসি বসো প্রভু মুখখানি দেখি।
এ দুঃখি দীন বালাই কর নাথ সুখী॥

প্রভু দক্ষিণ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া নদিয়া হইতে দুই শত ভক্ত নীলাচলে দৌড়িলেন। হাটিয়া যাইতে অন্ততঃ তিন চারি সপ্তাহের পথ, আবার সেখানে রাসের দিন পর্য্যন্ত থাকিবেন। অতএব ৪।৫ মাসের সম্বল লইয়া, ৪।৫ মাসের নিমিত্ত সম্বল রাখিয়া, বাড়ী ত্যাগ করিয়া ভক্তগণ চলিলেন। যখন প্রভু দক্ষিণে, তখন নদিয়ার কি অবস্থা তাহা বাসুঘোষ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

গোরাবিনা প্রাণ কান্দে কি বুদ্ধি করিব।
সে হেন গুণের নিধি কি সাধনে পাবো॥
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
পতিত দেখিয়া কেবা উঠিবে কান্দিয়া॥
গোরা বিনা শূন্য ভেল নদিয়া নগরী ইত্যাদি।

এই দুই বৎসর নদীয়া, শান্তিপুর, শ্রীখণ্ড, প্রভৃতি স্থানের ভক্তগণ রোদন করিয়া কাটাইয়াছিলেন। প্রভুর যেরূপ আকর্ষণ এরূপ জীবে সম্ভবে না।

তাঁহারা প্রভুকে দেখিতে যাইতেছেন। এদিকে প্রভু তাঁহার নিজের কার্য্য উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিতেছেন। নীলাচলে থাকিবেন, কেন না উহা হিন্দু রাজ্য। কিন্তু সে রাজ্যের রাজা যদি পাষণ্ড হয়েন, তবে সেখানে কিরূপে ধর্ম্ম প্রচার করিবেন? অতএব অগ্রে তাহাকে ভক্তি ধর্ম্ম অর্পণ প্রয়োজন। তুমি আমি হইলে ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব ভাবিতাম।

প্রতাপরুদ্র বস্তুটি কি একবার দেখুন, তিনি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের যথেচ্ছাচারি সম্রাট। তাহার রাজ্য এক সময় ত্রিবেনী হইতে গোদাবরীর ওপারে পর্য্যন্ত হইয়াছিল। একবার ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলিয়া দেখিবেন সে রাজ্য কত বড়। এইরূপ রাজাকে করায়ত্তে আনিতে হইবে, নতুবা সব কার্য্য পণ্ড হইবে।

প্রভু রাজাকে কিরূপে চরণানুগত করিলেন তাহা আপনারা জানেন। রথাগ্রে প্রভু মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন, রথ আসিতেছে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে আঘাত লাগিবে সকলের এরূপ ভয় হইল। রাজা সেখানে দাঁড়াইয়া। তাই তিনি প্রভুকে ধরিলেন, অভিপ্রায় স্থানান্তরিত করিবেন, কিন্তু রাজার স্পর্শ মাত্র প্রভুর চেতন হইল, অমনি সেই লক্ষ লোকের সম্মুখে তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিলেন। বলিলেন, ছি! বিষয়ী লোকে আমায় স্পর্শ করিল? রাজা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রভু লক্ষ লোকের সম্মুখে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। সে বেচারী কি অস্পৃশ্য হাড়ি কি চামার? তা নয়, ক্ষত্রিয়, জগন্নাথের সেবক ও সাম্রাজ্যের অধিপতি, ভারতবর্ষের মধ্যে ঐশ্বর্য্যে হিন্দুগণের সর্ব্বপ্রধান। তাঁহাকে এইরূপ অপমান, আর অহেতুক অপমান! তাহাও নয়, তিনি প্রভুকে বাঁচাইতে গিয়াছিলেন, আর তাঁহাকে অপমান!

প্রতাপরুদ্রের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিলেন, অথচ ত্রিবাঙ্কুরের ও বরদার রাজার সহিত বিনা আপত্তিতে ইষ্ট গোষ্ঠি করিলেন। তাহার প্রধান কার্য্য পতিত ও অস্পৃশ্য পামরকে আলিঙ্গন দান করা, অতএব প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে স্পর্শ করায় দোষ কি হইল? প্রভুর নিগূঢ় অভিপ্রায় কি শ্রবণ করুন। তিনি যথেচ্ছাচারী সম্রাটকে চরণতলে আনিবেন, তাই তাহাকে প্রথমে দেখাইলেন যে, যদিও তিনি রাজা তবু পাষণ্ড অতএব অস্পৃশ্য। বস্তুতঃ রাজা অপমানিত হইয়া প্রভুর কৃপা আহরণের নিমিত্ত প্রাণপণ করিলেন।

তাঁহার পরে প্রভু উদ্যানে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন, রাম রায়ের পরামর্শ অনুসারে রাজা তাঁহার পদতলে বসিয়া সেবা করিতে করিতে রাসের শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। প্রভু চেতন পাইয়া উঠিয়া ইহাই বলিয়া রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন—"কেগা তুমি আমাকে সুধা পিয়াইলে", ইহা বলিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় পড়িয়া গেলেন। সেই আলিঙ্গনের দ্বারা প্রভু রাজার শরীরে প্রবেশ করিলেন, আর তখন প্রতাপরুদ্র চারিদিকে গৌরময় দেখিতে লাগিলেন। সেখানে ভক্তগণ বসিয়াছিলেন রাজা তাহাদের মধ্যে দিয়া যাইবার সময় সকলকে প্রণাম করিতে করিতে চলিলেন। এই প্রভুর সহিত রাজার গোপনে মিলন হইল।

তাহার কিছুকাল পরে প্রভু যখন গৌড়ে আগমন করেন তখন কটক অর্থাৎ প্রতাপরুদ্রের রাজধানী হইয়া আইলেন। সেই সময় প্রকাশ্যে প্রভুতে ও রাজাতে মিলন হইল। প্রভু বকুল তলায় বসিয়া, রামরায় প্রভুকে রাখিয়া রাজাকে আনিতে গিয়াছেন। রসিক রাম রায় রাজাকে এবার সাজাইয়া আনিলেন। রাজা আসিতেছেন, আসিতেছেন কিনা রাজবেশে, রাজ সজ্জায়। রাজা হস্তীর উপরে। মন্ত্রিগণ হস্তীর উপরে, সহস্র সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সমভিব্যাহারে ও রণবাদ্যের সহিত প্রতাপরুদ্র আইলেন।

দূর হইতে হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া রাজা জোড় করে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়াছেন, প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই বাহু পসারিয়া রাজাকে আলিঙ্গন দিবেন, এই ভাব করিলেন, কিন্তু তাহা হইল না। রাজা দীঘল হইয়া সেই চরণে মস্তক দিয়া পড়িয়া গেলেন, সেই মণিমুক্তা খচিত মকুট শ্রীপদ স্পর্শ করিল।

রামরায় রসিক লোক, তিনি এইরূপ মিলনে আর কি দেখাইলেন, না, যে-

প্রতাপরুদ্র শ্রীভগবানকে জয় করিয়াছেন। আর যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ, তিনি প্রতাপরুদ্র রাজার রাজা।

যুদ্ধের নিমিত্ত পথ বন্ধ ছিল, অথচ ভক্তগণ আসিতেছেন। প্রভুর ইচ্ছায় অনায়াসে পথ পরিষ্কার হইয়া গেল। আর পথের ভয় রহিল না। ভক্তগণ পুরীধামে আসিয়া দেখিলেন যে, রাজা, প্রজা ও মন্দিরের সেবক, অর্থাৎ সমগ্র পুরী প্রভুর চরণে আশ্রয় করিলেন।

প্রভু নিত্যানন্দকে দ্বাদশ জন ভক্ত সঙ্গে দিয়া গৌড়দেশে প্রচার করিতে পাঠাইলেন। নিতাই গৌড়ে কি করিলেন, তাহা একটু পরে বলিতেছি।

প্রভু স্বয়ং বৃন্দাবনে গমন করিলেন, আর সেই জঙ্গলময় স্থানে কয়েকদিন মাত্র ছিলেন। ইহার মধ্যে প্রধান প্রধান যে লুপ্ত তীর্থ তাহা উদ্ধার করিলেন, আর প্রত্যাবর্ত্তন সময় প্রবোধানন্দ ও রূপসনাতনকে শক্তি সঞ্চার করিয়া উজাড় বৃন্দাবন ও ভক্তিশাস্ত্র গঠন করিতে পাঠাইলেন। এইরূপে প্রভুর জগতের সমুদায় বাহিরের কার্য্য হইয়া গেল। আর তখনি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট "বাউলকে কহিও বাউল" তর্জ্জা পাঠাইলেন

সপ্তম অধ্যায়।

মূলঘটনার মূলোৎপাটন।

এই প্রস্তাবে জীবের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের, দুর্দ্দশার কথা কিছু বলিব। ১৪০৭ শকে শ্রীভগবান্ ধরাধামে আইলেন, তাঁহার পরে লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাঁহার আশ্রয় লইলেন। তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান বৃন্দাবন সৃষ্টি হইল, বৈষ্ণবশাস্ত্র হইল, বড় বড় গ্রন্থ হইল, বেদ সংস্কৃত হইল, গোপী অনুগা ভজন প্রচলিত হইল, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহার মধ্যে মূল ঘটনা কি?

ইহার মধ্যে মূল ঘটনা প্রভুর অবতার অর্থাৎ শ্রীভগবানের মনুষ্যসমাজে উদয় হওয়া। আর অন্যান্য ঘটনা সেই মূল ঘটনার ফল বই নয়। ষট্‌সন্দর্ভ বড় গ্রন্থ সন্দেহ নাই, তবু সে মূল ঘটনা নয়, মূল ঘটনার ফল মাত্র। মূল ঘটনা **শ্রীভগবানের মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করা।**

এই মূল ঘটনা কি প্রকাণ্ড ব্যাপার, আরো বিস্তার করিয়া বলিতেছি। সেটী এই যে, সেই মায়াতীত জ্ঞানাতীত অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর, যাঁহার নখচ্ছটা সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া যোগিগণ দেখিতে পান না, তাঁহার মনুষ্য-সমাজে উদয় হওয়া। শুধু উদয় হওয়া নয়, পঞ্চবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করা, তাহাদের সহিত হাস্য ক্রন্দন, শয়ন, ভোজন ইত্যাদি করা। এরূপ ঘটনা জগতে কখন হয় নাই। যদি বল শ্রীকৃষ্ণ কি শ্রীরামচন্দ্র উদয় হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের কার্য্য ও উপদেশ কুজ্ঝটিকায় আবৃত। তাহাদের লীলা যে সত্য তাহার প্রমাণ নাই। শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা যে সত্য, তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে, যিনি তল্লাস করিবেন তিনিই দেখিবেন। তিনি কি বলিয়াছেন, কি করিয়াছেন,

তাহা সমুদয় পাথরে খোদিতের ন্যায় জাজ্জ্বল্যমান মনুষ্যের চক্ষের উপরে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

আমি একজন ক্ষুদ্র লোক, শুনিলাম (সে ত্রিশ বৎসরের কথা) যে, শ্রীগৌরাঙ্গ যখন জগতে বিচরণ করেন, তখন বহুতর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি তাহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া মানিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া আমি অতিশয় আগ্রহের সহিত তাঁহার লীলা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। হইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে ক্লেশে মরিয়া গেলাম। কেন, বলিতেছি। আচার্য্যগণের নিকট গেলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম যে তাঁহারা তাঁহাদের প্রভুর কথা আমাকে বলুন। দেখিলাম, তাঁহারা প্রভুকে ভগবান্ বলিয়া মানেন, অথচ তাঁহার কথা কিছু জানেন না। তাঁহারা আমার নিকট বড় বড় শ্লোক আওড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু আমি শ্লোক লইয়া কি করিব? আমার পিপাসায় প্রাণ যাইতেছিল, আমাকে এক অঞ্জলী মোহরে কেন শান্তি দিবে?

কেহ কেহ বলিলেন, তুমি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়। তাই সেই গ্রন্থ পড়িতে গেলাম। দেখি, সেই গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা, সেই অবতারের কথা, সেই মনুষ্য-দেহ-ধারী ভগবানের কথা অতি অল্প আছে, তবে আছে কি না সাত শত সংস্কৃত শ্লোক। একজন অতি পণ্ডিত গোস্বামী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া তিনি কে? তিনি তাহাও জানেন না। আমার নিকট প্রথম জানিলেন তিনি কে।

অনেক তল্লাস করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ পাইলাম। কোথা? না বটতলায়। বহুদিন, কদর্য্য রূপে ছাপা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, কেহ কিনে না। যাঁহারা ক্রয় করেন, তাঁহারা শ্রীচরিতামৃত লয়েন, চৈতন্যভাগবতের সংবাদও রাখেন না। সেই পুস্তক পাইবা মাত্র আমি ভাল করিয়া উহা ছাপাইলাম। সেই প্রথমে, সেই পুস্তকখানি ভদ্রলোকের হাতে গেলেন।

দেখিলাম যে, তাহাতে সেই মূল ঘটনাটীর কথা অর্থাৎ প্রভুর লীলা-কথা আছে! কাজেই সে গ্রন্থ কেহ ক্রয় করে না, কেহ পড়ে না, কেহ জানে না!

পরে মুরারির কড়চার কথা জানিলাম, সেই প্রভুর লীলার আদিগ্রন্থ। মুরারি চক্ষে দেখিয়া প্রভুর সব লীলা লিখিয়াছেন। সে গ্রন্থ তখন একখানাও পাইলাম না। ভাবিলাম, প্রভুর ভক্তগণ বোধ হয় উহা পুড়াইয়া ফেলিয়াছেন কি জলে ভাসাইয়া দিয়াছেন। এই যে শ্রীভগবান্ ২৫ বৎসর মনুষ্য-সমাজে বিচরণ করিলেন, তাহার নিদর্শন কি ছিল? কিছুই না। তবে ছিল হরিভক্তিবিলাস, প্রমেয় রত্নাবলী, ষট্‌সন্দর্ভ। দশসহস্র উত্তম উত্তম দুর্ব্বোধ্য শ্লোক। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া কি বস্তু ইত্যাদি সংবাদ তাহাতে ছিল না। যাহা কিছু ছিল, চৈতন্যভাগবতে। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ আমাদিগের এখানে আইলেন, তাঁহাকে লোকে টানিয়া ফেলিয়া দিল, তবে তাঁহার পরিবর্ত্তে বুকের মধ্যে গোটাকয়েক তত্ত্ব-কথা যত্ন করিয়া রাখিল। যদি বটতলায় দৈবাৎ একখণ্ড চৈতন্যভাগবত না পাওয়া যাইত, যদি উহা ভাল করিয়া ছাপা না হইত, যদি বাঙ্গালায় আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে, প্রভুর লীলা ধারাবাহিক না লেখা হইত, তবে এত দিন প্রভুর নিদর্শন পাওয়া দুর্ঘট হইত। প্রভু জগত হইতে "এবলিস" হইয়া যাইতেন।

আমাদের ঐ দুর্দ্দশার কারণ শ্রবণ করুন। প্রভু যখন প্রকাশ হইলেন, তখন ভক্তগণ বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ ভুলিয়া গৌর-নদিয়া নাগরীর ভজন আরম্ভ করিলেন। ইহা পূর্ব্বে বিস্তার করিয়া দেখাইয়াছি। তাহার পরে গোস্বামিগণ বৃন্দাবনে যাইয়া মন্দিরগঠন, বিগ্রহস্থাপন ও শাস্ত্রলিখন কার্য্য সমাধা করিলেন। তাহাদের প্রধান শত্রু পড়ুয়া পণ্ডিত; তাঁহারা ভাবিলেন এই পড়ুয়া পণ্ডিত নিরস্ত করা তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। পড়ুয়া পণ্ডিতকে নিরস্ত করিতে হইলে পাণ্ডিত্যের সাহায্য চাই। ইহা ভাবিয়া

তাঁহারা লীলাকথা ত্যাগ করিয়া তত্ত্বের জটিল রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। তাই বড় বড় গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া মূল ঘটনা অর্থাৎ ভগবানের অবতার ও লীলা—মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করা—ভুলিয়া গেলেন।

তাহার পরে, তাঁহাদের, এই মূল ঘটনা বিবর্জ্জিত যে বৈষ্ণবশাস্ত্র, তাহা শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সঙ্গে গৌড়ে পাঠাইয়া দিলেন। এখানে বৈষ্ণব শাস্ত্র আইল, শ্লোকপূর্ণ শাস্ত্র, কিন্তু প্রধান ঘটনাশূন্য। কাজেই যে বাঙ্গলায় প্রভুর ভক্তগণ রাধাকৃষ্ণ ভজনের পরিবর্ত্তে, গৌর-নদিয়া নাগরীয় ভজন করিতেছিলেন, তাঁহারা আবার উহা ত্যাগ করিয়া রাধাকৃষ্ণের ভজন আরম্ভ করিলেন। তাই গৌর-কথা উঠিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে যাইতে যাইতে আমি যখন অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন দেখিলাম যে, একজন অতি পণ্ডিত বৈষ্ণব আচার্য্য, জানেন না, যে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী কে? প্রধান আচার্য্যগণ বৈষ্ণবশাস্ত্রের সমুদায় জানেন. কেবল জানেন না প্রভুর কথা, মূলঘটনার কথা।

প্রভু নীলাচলে গমন করিলে সেই স্থান এই প্রধান ঘটনার কেন্দ্র হইল। প্রভুর অদর্শনে এই কেন্দ্র বৃন্দাবনে সরিয়া গেল, আর বৃন্দাবন হইতে এই মূল ঘটনা উৎপাটিত হইতে আরম্ভ হইল। যখন শ্রীনিত্যানন্দ গৌড়ে প্রচারের নিমিত্ত আইলেন, তখন গোস্বামীগণ তাঁহাদের আসনে উপবেশন করেন নাই। তখনকার এই যে মূলঘটনা উহা জাজ্জ্বল্যরূপে সমাজের চক্ষের উপরে ছিল।

নিতাইকে, আমার দয়াময় প্রভু কি বলিয়া গৌড়ে পাঠাইলেন, তাহা স্মরণ করুন। যথা—শ্রীপাদ আমার প্রাণ সর্ব্বদা কান্দিতেছে। জীবকে হরিনাম দিতেছিলাম, কিন্তু কৃষ্ণনামের শক্তিতে আমি পাগল হয়েছি, আমাদ্বারা আর উহা হইবে না। জীবগণের নিকট আমি ঋণি, আমি সেই দায়ে বিকাইয়া যাইতেছি। যে সম্বল ছিল, তাহা ফুরাইয়াছে,

তুমি আমার ব্যাথায় ব্যথিত, তোমা ছাড়া আমার হৃদয়ের ব্যথা কাহাকে বলিব? তুমি আমাকে জীবের নিকট ঋণ হইতে মুক্ত কর। গৌড়দেশে গমন কর, ছোট বড় ভাল মন্দ, সকলকে উদ্ধার কর। তোমার বিশেষ কৃপার পাত্র হইতেছে পড়ুয়া পণ্ডিতগণ, দেখিও যেন কেহ বাদ না যায়।*

নিতাই যাইয়া গৌড়ে কি ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, তাহা বহুতর পদে বিবর্ণিত আছে। আমরা সেই সমুদায় পদ হইতে প্রধানতঃ এই বিবরণ লিখিতেছি, ইহাতে আমাদের মনগড়া কথা একটীও নাই। যথা, একটী পদ:—

গজেন্দ্র গমনে নিতাই যায়।
যারে দেখে তারে প্রেমে ভাসায়॥
অধম পতিত পাপীর ঘরে গিয়া।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিচ্ছে যাচিয়া॥
যেনা লয় তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লও ভজ গৌরহরি॥
তো সবার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
শুন নাই গৌরাঙ্গসুন্দর নদিয়ার?

নিতাই আপনার পার্ষদ সঙ্গে, পায়ে নূপুর দিয়া, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ঘরে ঘরে কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছেন। বলিতে বলিতে যাইতেছেন—

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গ নাম।
যে ভজে গৌরাঙ্গচাঁদ সেই আমার প্রাণ॥

* এই যে কথাগুলি হইতেছে এ সমুদায় প্রভুর নিজ মুখের কথা, কল্পিত একটাও নয়।

কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু অবতার।
খেলা কৈলেন জীবসনে গোলকের ঈশ্বর ॥
গোলকের যে সম্পত্তি যতনে আনিয়া।
ঘরে ঘরে বিলাতেছেন আপনি যাচিয়া ॥ ইত্যাদি

এই গেল নিত্যানন্দের প্রচার-পদ্ধতি। অনেক লোক সমবেত হয়েছে, নিতাই তাহাদিগকে বলিতেছেন—"ভাই, তোমরা কি নদিয়ার অবতারের কথা শুন নাই? তোমরা কি শুন নাই যে সেই গোলকের পতি, জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া, ধরাধামে, আপনি ভক্ত হইয়া, জীবগণকে উদ্ধার করিতেছেন। তিনি কেবল তোমাদের জন্য আসিয়াছেন। আর ভয় কি? তিনি তোমাদিগকে কোলে করিয়া গোলকে লইয়া যাইবেন।" বলিতে বলিতে :—

গৌরপ্রেমের ভরে মাতিল নিতাই।
জোরে জোরে লম্ফ দেয় ধরা নাহি যায় ॥

আর বক্তৃতা চলিল না, নিতাই উন্মাদ হইলেন, কাজেই সেই সঙ্গে শ্রোতা ও দর্শকগণ উন্মাদ হইলেন। নিতাই সম্মুখস্থ গণকে ডাকিতেছেন, বলিতেছেন ভাই এসো তোমাদের জনা জনা কোলে করি। তোমরা আমার কোলে বসিয়া গৌর গৌর বল। ভাই তোমাদের আর কিছু করিতে হইবে না। দেখিতেছ না তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, তোমাদের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন, তোমাদের গোলকধামে লইয়া যাইবেন, তাই দাঁড়াইয়া আছেন

নিতাই বড় পাষণ্ডের দলে পড়িয়া গিয়াছেন, তাহারা কোনক্রমেই দ্রব হইতেছে না, তাঁহাকে ঠাট্টা করিতেছে। তিনি তখন দুই হস্তে তৃণ ও মুখে তৃণ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, ভাই আমাকে কিনিয়া লও. আমি তোমাদের দাসের দাস হইলাম, মুখে একবার গৌর গৌর বল।

হয়ত ইহাতেও হইল না, কঠিন হিয়া গলিল না। তখন "ভাই" "ভাই"

বলিয়া নিতাই চিৎকার করিয়া কান্দিতে লাগিলেন বা বৃশ্চিক দষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। এমন হইল যেন তাহারা নাম না লইলে নিতাই প্রাণে মরিবেন। তখন একজন দ্রবীভূত হইয়া পদতলে বসিয়া বলিতেছেন, "ঠাকুর শান্ত হও, আমি বলিতেছি। কি দয়া! কি দয়া" ইহা বলিয়া সেও মুখে নাম বলিল, আর নাম মুখে লাগিয়া গেল, সে আর উহা ছাড়িতে পারে না, আর সে নাচিতে লাগিল। তাহার বায়ু অন্যের অঙ্গে লাগিল, সেও দ্রবীভূত হইল।

গোস্বামিগণের পদ্ধতি ও নিতাইর পদ্ধতি কত বিভিন্ন দেখ। গোস্বামী তর্ক করিয়া বুঝাইতে গেলেন, নিতাই কান্দিয়া কান্দাইলেন। কাজেই গোস্বামিগণ কতকগুলি নিরস কঠিন পণ্ডিত বৈষ্ণব, আর নিতাই কতকগুলি সরল প্রেমিক বৈষ্ণব করিলেন। গোস্বামী অকাট্য তর্কের দ্বারা বুঝাইলেন যে ভগবান্ আছেন, নিতাই অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছেন আর বলিতেছেন, ঐ দেখ তিনি! গোস্বামী বিচার করিয়া সাব্যস্ত করিতেছেন যে, ভগবান প্রেমময়। কিন্তু নিতাই আপনার প্রেম দেখাইয়া ভগবানের প্রেম দেখাইতেছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের নয়ন জল দেখাইয়া ভগবানের কত প্রেম তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতেছেন।

গোস্বামিগণ সমুদায় শাস্ত্র মন্থন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের আধিপত্য স্থাপন করিলেন, অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বকে কোটী ভাগে বিভাগ করিয়া তাহাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। যাঁহারা পাঠ করেন তাহারা স্তম্ভিত হয়েন। আর নিতাই ইহা বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন:—

"তোদের, সম্মুখে দাঁড়ায়ে দেখ পূর্ণব্রহ্মসনাতন।
তোদের, গোলকধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিতপাবন॥"

শিক্ষার শক্তি অধিক গোস্বামিগণের না নিতাইর? আমরা শতবার বলিব যে, নিতাইর যে শিক্ষা ইহা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। নিতাই শিক্ষা দিলেন

যে শ্রীভগবান জীবের দুঃখে গোলকে রইতে না পারিয়া, ধরাধামে আসিয়া মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়াছেন, কেন না, তাহারা অনায়াসে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। অগ্রে শ্রীভগবান সম্বন্ধে যাহা কিছু তত্ত্ব তাহা লোকে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এখন তাঁহার অভ্যুদয়ে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় 'জানিলেন'। এতএব নিতাইর শিক্ষায় জীবগণ **জানিলেন** যে—

(১) আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর যে ব্রহ্মাণ্ড, ইহার কেহ স্রষ্টা আছেন কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত জীবগণ তাহাদের জন্মাবধি চেষ্টা করিয়া জানিতে পারে নাই, এখন নিতাই তাহাদিগকে সেই শ্রীভগবানকে দেখাইয়া দিতেছেন।

(২) যাঁহারা মনে আশা করেন যে ভগবান থাকিলেও থাকিতে পারেন, তাঁহাদের মধ্যে তাঁহারা প্রকৃতি লইয়া চিরদিন বিবাদ চলিতেছে। কেহ তাঁহার গলায় মুণ্ডমালা দিয়াছেন। কেহ তাঁহার হস্তে বাঁশী দিয়াছেন। সে বিবাদ আর রহিল না।

(৩) তিনি মনুষ্যকে কি রূপ চক্ষে দেখেন, ইহা লইয়াও চিরদিন বিবাদ চলিয়াছে। কেহ বলেন যে জীব আপনার কর্ম্মের ফল ভোগ করে, ভগবানের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। কেহ বলেন, ভগবান বিচারক, অপরাধ হইলে তিনি দণ্ড করেন, আর সে দণ্ড এমন যে পাপীকে চিরদিন নরকের অগ্নিকুণ্ডে রাখেন। নিতাই দেখাইয়া দিলেন যে এই অসীম শক্তিসম্পন্ন বস্তু, যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন "তিনি তোমার" আর "তুমি তাঁহার", বলিতে কি, তাঁহাতে ও তোমাতে যেরূপ গাঢ় সম্বন্ধ, এরূপ তোমাতে আর তোমার স্ত্রীর সঙ্গেও নাই। অর্থাৎ জীবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জন শ্রীভগবান। নিতাই এই সমুদায় দেখাইয়া দিলেন, অথচ আগম পুরাণ বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের নাম পর্য্যন্ত করিলেন না।

আচার্য্যগণের এখন শিক্ষা দেখুন। তাঁহারা শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীভগবান অবশ্য আছেন কারণ এই, এই, এই। তাঁহাকে এইরূপে ভজনা করিতে হয়, যেহেতু বিচারে দেখি এই গোপী অনুগা ভজন সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। তিনি আমাদের, আর আমরা তাঁহার, সে বিষয় সন্দেহ নাই, যে হেতু প্রথমতঃ এই—দ্বিতীয়তঃ এই—ইত্যাদি। নিতাইর শিক্ষায় জীব জানিলেন, যে ভগবান আছেন, আর তিনি তোমার আর তুমি তাঁহার। বৈষ্ণবশাস্ত্রের শিক্ষায় জীবকে বুঝাইতে চেষ্টা হইয়াছে যে, ভগবান বড় ভাল ইত্যাদি। নিতাই দেখাইয়া দিলেন, শাস্ত্রে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কাজেই শাস্ত্রের উপদেশে জীব কতকগুলি উপদেশ পাইলেন, কিন্তু তিনি যেমন তেমনি থাকিলেন। নিতাইর শিক্ষায় জীবের পুনর্জ্জন্ম হইল। তাঁহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন হইল, অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণপ্রেম পাইলেন। মোটামুটী এই—

শাস্ত্রের শিক্ষায় জীবগণ জ্ঞান পাইলেন, আর নিতাইর শিক্ষায় প্রেম পাইলেন। কাজেই এই পদ হইল—

ধর লও সে কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়।
প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়॥

অতএব যাঁহারা নিতাইর শিক্ষা পাইলেন তাঁহাদের শাস্ত্রের শিক্ষার কিছু প্রয়োজন রহিল না। আর যাঁহারা শাস্ত্রের শিক্ষা পাইলেন, অথচ নিতাইর শিক্ষা হইতে বঞ্চিত, তাঁহাদের বিশেষ কিছুই হইল না।

কথা উঠে যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত পাশ্চাত্যদেশে বৈষ্ণব-প্রচারক পাঠাইতে হইবে। এমন কথাও হয় যে গৌর-গত প্রাণ, পরম পণ্ডিত, বৃন্দাবনের রাধারমণ সেবাইত শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী যাইবেন। তখন ইহাই সাব্যস্ত হয় যে যিনি যাইবেন তাঁহার নিতাইর প্রচার-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ—

"কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু অবতার।
খেলা কৈলেন জীবের সনে গোলকের ঈশ্বর॥"

প্রচার করিতে হইবে।

জীব গৌরাঙ্গ গ্রহণ করিলে, শাস্ত্র আপনি আসিবেন, রাধাকৃষ্ণ আপনি আসিবেন, অর্থাৎ গোস্বামিগণ যাহা যাহা শিক্ষা দিয়াছেন সব আপনি আসিবেন। আর তাহা না করিয়া যদি ইহার উল্টা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তবে আর কেহ আসুন না আসুন প্রভু আসিবেন না।

অতএব বাসুঘোষ, নরহরি প্রভৃতির নদিয়া নাগরী অনুগা ভজন, আর নিতাইর "ভজ গৌরাঙ্গ" প্রচার পদ্ধতি উঠাইয়া দেওয়াতে জীবের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আগে গৌর—আগে মূল ঘটনা—পরে সমুদায় আপনি আসিবে।

অতএব হে জীবের দুঃখে কাতর ভক্তগণ! জীবকে শ্রীগৌরাঙ্গ শিখাও, সর্ব্বদেশে ইহা প্রচার কর যে, ১৪০৭ শকে এই দেশে শ্রীভগবান আসিয়া ৪৮ বৎসর মনুষ্যের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করেন। আর জানাও যে এ কথা যে সত্য তাহা যিনি অনুসন্ধান করিবেন তিনিই জানিতে পারিবেন। ইহা যদি কর, তবে নিতাই যেমন ভগবানকে ক্রয় করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ করিবে।

অষ্টম অধ্যায়।

প্রভুর দৌর্ব্বল্যের কথা কয়েক বার বলিয়াছি। শুধু যে আহার অল্প হওয়াতে এই প্রকাণ্ড শরীর দুর্ব্বল হইয়াছিল তাহা নহে, সাধন ভজনে এইরূপ শরীর ক্ষীণ হয়। কিন্তু যদিও শরীর বাহ্যিক ক্ষীণ হয়, তত্রাচ আভ্যন্তরিক তেজ বাড়িতে থাকে। প্রভুর কোন দ্রব্য কেহ স্পর্শ করিলে তাহার হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইত। এমন কি, তাঁহার বায়ু গাত্রে লাগিলে হৃদয়ে ঐরূপ ভক্তিভাব উদয় হইত। প্রভু নৃত্য করিতেছেন, মুখ দিয়া লালা পড়িতেছে, ভাগ্যবান শুভানন্দ সেই মৃত্তিকায় পতিত ফেণের এক বিন্দু লইয়া পান করিলেন, করিয়া তদ্দণ্ডে প্রেমে উন্মত্ত হইলেন। প্রভুর দেহের অলৌকিক তেজের কথা আর অধিক কি কহিব, ধীবর তাঁহার প্রায় মৃতদেহ সমুদ্র হইতে উঠাইতে উহা স্পর্শ করিয়া উন্মত্ত হইল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে নাচিতে গৃহে চলিল। তাহার ভাব দেখিয়া সরূপ জানিতে পারিলেন যে, এ প্রভুকে স্পর্শ করিয়াছে, আর প্রকৃত সেই প্রভুর ঠিকানা বলিয়া দিয়াছিল।

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ও মহাপ্রসাদ এই নিমিত্ত ভক্তদিগের নিকট এত বহু মূল্য দ্রব্য। রঘুনাথ দাস গোসাঞির খুড়া কালীনাথ দাসের প্রধান ভজন উচ্ছিষ্ট সেবন করা। তাই তিনি বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট সেবন করিয়া দেশে দেশে বেড়াইতেন। কোন বৈষ্ণবের বাড়ী গমন করিয়া প্রসাদ চাহিতেন, অবশ্য প্রথমে পাইতেন না। তখন ধন্না দিতেন, প্রসাদ সেবন না করিয়া আসিতেন না। যেখানে কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে না পারেন, সেখানে আঁস্তাকুঁড় হইতে পরিত্যক্ত পাত্র চাটিতেন। এ কাহিনী সংক্ষেপে পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি।

এইরূপে কালিদাস ঝড়ু ঠাকুরের কাছে প্রসাদ ভিক্ষা করিলেন। ঝড়ু ঠাকুর জাতীতে ভূইমালী, অতএব অতি নীচ, কিন্তু বৈষ্ণবগণের এ মহিমা বড় যে, তাঁহারা ভক্তি দেখিয়া ছোট বড় বিচার করেন, জাতি দেখিয়া নয়। ঝড়ু যদিও ভূইমালী, তবু তিনি বৈষ্ণবদের মধ্যে ঠাকুর হইলেন। কালিদাস পাতার দোনা করিয়া পাকা আম আনিয়া ঝড়ুকে দিলেন, ঝড়ু আম লইলেন, কিন্তু প্রসাদ দিতে চাহিলেন না। পরে যখন ঝড়ু সেই আমের আটি চুষিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিলেন, কালিদাস গোপনে তাহা কুড়াইয়া লইয়া পুনরায় চুষিলেন। এই তাঁহার ভজন।

নীলাচলে গিয়াছেন, এখন চিরদিনের সাধ মিটাইবেন, অর্থাৎ প্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। বৈষ্ণব কাহাকেও ইচ্ছা করিয়া প্রসাদ দেন না, তাহা কালিদাসের কাহিনীতে বুঝা যায়। কোন বৈষ্ণবের নিকট প্রসাদ চাহিলে তিনি দৈন্য করিয়া দিতে অস্বীকার করিবেন। আর এক কথা, প্রসাদ তাহাকেও দিতে নাই যাহার উহাতে নিতান্ত বিশ্বাস বা ভক্তি নাই। সেই নিমিত্ত স্বয়ং প্রভু উপযুক্ত লোক ব্যতীত কাহাকেও প্রসাদ দিতেন না। প্রভু অন্তর্যামী, জানিতেন কে উপযুক্ত কে অনুপযুক্ত। কালিদাস যে উপযুক্ত পাত্র তাহা অবশ্য প্রভু জানিতেন। কালিদাস প্রভুর প্রসাদ আহরণ করিতে নীলাচলে গিয়াছেন। প্রভুর পশ্চাতে পশ্চাতে আছেন, প্রভু মন্দির দর্শনে গমন করিতেছেন, কালিদাস পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছেন। প্রভুর নিয়ম আছে তিনি পাদপ্রক্ষালন না করিয়া ঠাকুর দর্শন করেন না। সিংহদ্বারের উত্তর দিকে, কপাটের আড়ে, বাইশ পশারের তলে, একটী গর্ত্ত আছে, প্রভু প্রত্যহ সেখানে পদধৌত করেন। প্রভুর আজ্ঞায় কেহ সেই জল লইতে পারেন না। প্রভু পদ বাড়াইয়া দিয়া থাকেন, গোবিন্দ জল দ্বারা প্রক্ষালন করেন। প্রভু তাহাই করিলেন, আর কালিদাস অগ্রবর্ত্তী

হইয়া তাঁহার নীচে অঞ্জলি করিয়া হাত পাতিলেন। মহাপ্রভু দেখিলেন, দেখিয়া কিছু বলিলেন না। তাহা দেখিয়া গোবিন্দও কিছু বলিলেন না। এইরূপে কালিদাস অঞ্জলি অঞ্জলি শ্রীপদ ধৌত জল পান করিতে লাগিলেন। তিনবার এইরূপ পান করিলে প্রভু নিষেধ করিলেন, বলিলেন, আর নয়, ঢের হয়েছে।

পরে কালিদাস প্রভুর বাসায় আসিয়াছেন, প্রসাদ চাহিতে সাহস হয় না, বসিয়া আছেন। প্রভু সেবা করিতেছেন, অন্তর্যামি প্রভু আপনার সেবা হইলে, গোবিন্দকে ইঙ্গিত করিলেন, আর সেই প্রসাদ তিনি লইয়া কালিদাসকে দিয়া তাহার জন্ম সার্থক করিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসাদের মাহাত্ম্য বড়। মহাপ্রসাদ মানে এই, শ্রীভগবানের ভুক্তাবশিষ্ট। অতএব ভক্তের প্রসাদে যদি ভক্তি উদ্দীপন করে, তবে শ্রীভগবানের প্রসাদ উহা আরও ভাল করিয়া করিবে। কিন্তু কথা এই, ভগবানকে অর্পণ করিলেই তিনি তাহা ভোগ করেন না, আর যদি ঠিক ভক্তি পূর্ব্বক দেওয়া যায়, তবে তিনি তাহা উপেক্ষাও করিতে পারেন না।

মনে ভাবুন ভক্তের ইচ্ছা ভগবানকে সেবা করিবে, শ্রীভগবান সে ইচ্ছা পুরণ করিতে বাধ্য, নতুবা তাঁহার ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু নাম বৃথা হয়। ভক্ত পায়স রন্ধন করিয়া একটী অতি পরিস্কার পাত্রে রাখিয়া করযোড়ে বলিতেছেন, শ্রীভগবান এই পায়সের গন্ধে আমার প্রাণ মাতিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আমি উহা মুখে কিরূপে দিব? তুমি যদি একটু মুখে দাও ত তবেই আমার পায়স সুস্বাদ হবে। ইহাই বলিয়া প্রাণের সহিত "খাও, খাও" বলিয়া ভগবানকে মিনতি করিতে লাগিলেন। পরে বলিতেছেন, আমার সম্মুখে সেবা করিবে না? আচ্ছা আমি এই প্রসাদ আবরণ করিতেছি, ইহাই বলিয়া বস্ত্র দ্বারা উহা আবরণ করিলেন, করিয়া তিনি করযোড়ে বসিয়া থাকিলেন। যদি কেহ এরূপ একান্ত মনে ইচ্ছা করেন, তবে নিশ্চয়ই

সেই মহাপ্রসাদ শ্রীভগবানের অধরামৃত দ্বারা পবিত্রীকৃত হয়। শ্রীখণ্ডের মুকুন্দের তনয়, নরহরির ভ্রাতুষ্পুত্র, রঘুনন্দের ঠাকুরকে নাড়ু খাওয়াইবার কথা, বৈষ্ণব মাত্রে জানেন। মুকুন্দ স্থানান্তরে যাইবেন, তাই তাহার পুত্র রঘুকে বলিয়া গেলেন যে, সে যেন ঠাকুরের সেবা করে। রঘু সেই পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতে ঠাকুরের কাছে সেবা দ্রব্য লইয়া যাইয়া বলিলেন, "ধর খাও"। বালকের মনে বিশ্বাস ঠাকুরকে দিলে তিনি খাইবেন, কিন্তু তাহাত নয়। ঠাকুর খাইবেন না, রঘু ছাড়েন না, রঘু কান্দিয়া আকুল। বলিতেছেন, তুমি খাবেনা বাবা আমাকে মারিবেন, বলিবেন, তুই দিস নাই, তুই আপনি খাইয়া ফেলিয়াছিস। ইহা বলিয়া অতিবালক রঘু ভূমে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। ঠাকুর করেন কি, দস্যু হস্তে পতিত, রঘুর সম্মুখে খাইলেন। মুকুন্দ বাড়ী আসিয়া শুনিয়া অবাক হইলেন, কারণ রঘু বলিলেন প্রসাদ সমুদায় ঠাকুর আপনি খাইয়া ফেলিয়াছেন। রঘুর মুখ দেখিয়া মুকুন্দ বুঝিলেন, সে মিথ্যা বলিতেছে না। পরে ঠিক হইল রঘু, আবার খাওয়াইবে। রঘু তাহাই করিল, আর ঠাকুর, হাতে নাড়ু লইয়া নিতান্ত লোভীর ন্যায় খাইতে লাগিলেন। তখনি চেঁচাইয়া রঘু বলিতেছেন, "বাবা দেখে দেখ ঠাকুর খাইতেছেন।" মুকুন্দ দৌড়িয়া আইলেন, আর অমনি খাওয়া বন্ধ হইল। তবে মুখে দিতে যাইতেছিলেন যে নাড়ুটী, সেইটি ঠাকুরের হাতেই রহিল। অদ্যাপি সেই নাড়ু হাতে ঠাকুর, শ্রীখণ্ডে ভক্তের সুখ দিতেছেন।

প্রভু মহাপ্রসাদকে কিরূপ ভক্তি করিতেন শ্রবণ করুন। পানা নরসিংহে প্রভু গমন করিলে, অধিকারী মাধবভট্টজা কিছু প্রসাদ আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন—

পূজারি প্রসাদ কিছু আনিল ত্বরিতে।
কণামাত্র প্রসাদ লইল প্রভু হাতে॥

হাতে করি প্রসাদের বহু স্তব করে।
প্রসাদ পাইতে দুই চক্ষে জল ঝরে।

প্রভু জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন, এমন সময় গোপাল বল্লভ ভোগ আরম্ভ হইল, দ্বারে কপাট পড়িল, শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, ভোগ সমাপ্ত হইলে, সেবকগণ প্রভুর নিকট প্রসাদ লইয়া আইল। প্রভুকে দিলে তিনি এক কণা জিহ্বাগ্রে দিলেন, দিয়া বলিতেছেন "সুকৃতি লভ্য ফেলা লব" ইহা বলিয়া আনন্দে পুলকাবৃত হইলেন, নয়নজলে ভাসিলেন। ভক্তগণ প্রভুকে ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, জিজ্ঞাসিলেন প্রভু আপনি বারে বারে "সুকৃতি লভ্য ফেলা" কেন বলিতেছেন? প্রভু বলিলেন, "কৃষ্ণের যে ভুক্তাবশেষ তাহাকে 'ফেলা' বলে, লব মানে অল্প অংশ, অর্থ এই যে, যিনি সুকৃতি তিনি এইরূপ মহামূল্য দ্রব্য লাভ করেন। এই যে ভোগ উহাতে কৃষ্ণের অধরামৃত স্পর্শ করিয়াছে। দেখ ইহার গন্ধে মন মোহিতেছে। আশ্চর্য্য দেখ, যদিও এ সামান্য ও প্রাকৃত, দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত, কিন্তু আস্বাদ ইহার অপ্রাকৃত। জগতে এইরূপ আস্বাদ মিলে না।"

প্রকৃতই ভক্তগণ উহা আস্বাদ করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইলেন। প্রভুর সারাদিন ঐ ভাবেই গেল, পরে সন্ধ্যাকৃত্য করিয়া ভক্তগণ লইয়া আবার বসিলেন, আবার প্রসাদ আস্বাদ করিলেন, আর পুরী ভারতীকে কিছু পাঠাইয়া দিলেন।

পুরীধামে প্রভুর অসীম শক্তিতে প্রসাদ অতি পবিত্র বস্তু, উহা অপবিত্র হয় না। উহা যিনি স্পর্শ করেন, তিনিই পবিত্র হয়েন, আর সেখানে অন্নে দোষ নাই। কিন্তু বাহিরে উহা কেন অপবিত্র আছে? কারণ বেদ বিধির শাসন। বহুদিন হইল আমার দেওঘর বাটীতে প্রায় পঞ্চাশ মূর্ত্তি বৈষ্ণব শুভাগমন করিয়া আমার স্থান পবিত্র করিলেন। সে বাসা-বাড়ী বলিয়াছি, তাহাদের সেবার নিমিত্ত কিছু ব্যস্ত হইলাম। এমন

সময় সর্দ্দার পাণ্ডা এই সংবাদ পাইয়া আপনি আতিথ্যের ভার লইলেন। তাঁহার শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে সেবা আছে তাঁহার প্রসাদ পাঠাইয়া দিবেন, এই কথা সাব্যস্ত হইল, এবং প্রকৃতই মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণগণ ভারে ভারে প্রসাদ আনিয়া আমার ঘর পূরিয়া ফেলিলেন। সকলে আনন্দে উন্মত্ত, বৈষ্ণবগণ সেবায় বসিলে, আমার পরিবেশন করিতে ইচ্ছা হইল, তাহাই মনন করিয়া আমি প্রসাদ স্পর্শ করিতে হস্ত বাড়াইলাম। এমন সময় আমার মনে পড়িল আমি শূদ্রাধম, আর ভক্তগণ প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ ঠাকুর, তখনই স্তম্ভিত হইলাম, হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রভু সন্তান ও ভক্ত মহাশয়গণ! আমি পরিবেশন করিতে যাইতেছিলাম কিন্তু আপনাদের অনুমতি না পাইলে করিতে পারি না। কারণ আমি শূদ্রাধম। এই মহাপ্রসাদ অতি পবিত্র বস্তু, ইহা আমি স্পর্শ করিলে উহা অপবিত্র হইবে না, বরং আমি পবিত্র হইব। আপনারা বলেন কি?" দেখিলাম সকলে চিন্তাকুল হইলেন, কারণ 'হাঁ' বলিতে পারেন না, আবার 'না' ও বলিতে পারেন না। এই তাঁহাদের অবস্থা, কাজেই আমি ক্ষান্ত হইলাম। যখন সার্ব্বভৌম, প্রাতে মুখ ধৌত না করিয়া প্রথমে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন তখন প্রভু বলিলেন :—

আইজ নিষ্কপটে তুমি হইলে কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে হইলা তোমারে সদয়॥
আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন।
আজি কৃষ্ণ প্রাপ্তি যোগ্য হইল তোমার মন॥
বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥

কথা এই, কুল ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের আশ্রয় না লইলে কৃষ্ণ তাহাকে গ্রহণ করেন না, বেদ ধর্ম্ম মানিয়া বৈষ্ণব হওয়া যায় না, প্রভুর শ্রীমুখের এই বাক্য। তাহার প্রমাণ উপরে শ্রীমুখের আদেশ।

অগ্রে বলিয়াছি যে, যদিও শ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুকে বিদায় দিলেন, তবু সে বিদায়ের পরে আর দ্বাদশ বৎসর তিনি ধরাধামে ছিলেন। অদ্বৈত ভাবিলেন, প্রভু যে জন্য আসিয়াছেন সে কার্য্য হইয়া গিয়াছে। অতএব আর তিনি কেন এই মলিন জগতে থাকিবেন, তাঁহার যাওয়াই উচিত। কিন্তু প্রভুর কিছু কাজ বাকি ছিল; তাহা শ্রীঅদ্বৈতও জানিতেন না। সে কাজ কি না আপনি আচরিয়া জীবকে সর্ব্বোত্তম ভজন শিক্ষা দেওয়া। সে ব্রজের নিগূঢ় রস।

এই ভজন ব্রজের নিগূঢ় রস দিয়া করিতে হয়। অতএব সে রস কি, আর রসদ্বারা কিরূপ ভজন করিতে হয়, তাহা জগতে অনর্পিত ছিল, তাহা তিনি আপনি আচরিয়া জগতকে শিখাইলেন। রস, বস্তু কি তাহার একটু আভাস এখানে দিব। শাস্ত্রে দেখিতে পাই, রস একাদশ প্রকার, তাহার মধ্যে সাতটি গৌণ ও চারিটী মুখ্য। গৌণরস কিনা হাস্য অদ্ভুত, ইত্যাদি সাত প্রকার। মুখ্যরস কিনা, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। গৌণরসের ভজন কিরূপ তাহার বিচার এখন থাকুক।

তবে গৌণ ও মুখ্যরসের বিভিন্নতা বলিতেছি। ভগবানকে নিজজন বলিয়া ভজন করিতে হইলে যে রস প্রয়োজন তাহাকে বলে মুখ্য। নিজজন কাহারা? নিজজন হইতেছেন মাতা, পিতা, স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা, সখা, ইত্যাদি। অতএব ভগবানকে ইহার একস্থানে বসাইয়া ভজনা, যেমন "পিতা" কি "মাতা" কি "নাথ" বলিয়া ভজনা, সে মুখ্য রসদ্বারা হয়।

আবার যে রসে শ্রীভগবানকে স্পষ্টরূপে নিজজন বুঝায় না, তাঁহাকে বলে গৌণরস। যেমন মনে ভাব শ্রীভগবানকে "শক্তিধর", বা "করুণাময়", বলিয়া ভজনা করা। কোন বস্তু নিজজন না হইলেও তাঁহাকে "শক্তিধর" বা "করুণাময়" বলিয়া ভজনা করা যায়। যেমন শুম্ভ নিশুম্ভ বধ করিয়াছেন বলিয়া কালীকে ভজনা করা। এ ভজনা "বীররস" দ্বারা, আর বীররস গৌণ মধ্যে গণনীয়।

মুখ্য যে চারিটি রস তাহাও এখন অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। শ্রীভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাইয়া চারি ভাবে ভজনা করা যায়। যথা, কর্ত্তা বা পিতা ভাবে, সখা বা ভ্রাতা ভাবে, বাৎসল্য বা সন্তান ভাবে, আর কান্তা বা পতি কি উপপতি ভাবে। শ্রীদাম সুবলের ভজন সখাভাবে, যশোমতীর ভজন বাৎসল্য ভাবে, ও গোপীগণের ভজন কান্তাভাবে। জগতে শেষের তিনটা রসের কথা কেহ স্পষ্ট জানিতেন না, তাঁহাদের ভজন কেবল দাস্য ভক্তি লইয়াই ছিল। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত ভগবানকে পিতা বা প্রভু বলিয়া ভজনা করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু এরূপ ভজন অতি স্থূল। এরূপ ভজনে হৃদয়ের ধনকে দূরে রাখিতে হয়। সর্ব্বোচ্চ ভজন কান্তাভাবে।

কান্তাভাবে শ্রীভগবানকে কি রূপে ভজনা করিতে হয় তাহার এখন সংক্ষেপে আভাস দিতেছি। অবশ্য এই রসের ভজনের কথা শ্রীভাগবতগ্রন্থে আছে। কিন্তু প্রভু উহা আপনি আচরিয়া জগতে দেখাইলেন। অর্থাৎ উহা প্রথমে শ্রীভাগবত গ্রন্থে ভাষায় ছিল। এখন কার্য্যে দেখান হইল। কান্তভাবে শ্রীভগবানকে ভজনা মানে এই যে, যেমন স্ত্রীলোকে পতির কি উপপতির প্রতি প্রীতি আরোপ করে, সেইরূপে আপনাকে স্ত্রীলোক অর্থাৎ প্রকৃতি ভাবিয়া ভগবানকে পতি বা উপপতি ভাব আরোপ করা।

এই কান্তাভাবে ভজন দুই প্রকারে হয়, প্রত্যক্ষ ও অনুগা। প্রত্যক্ষ ভজন এই যে; আপনাকে গোপী ভাবিয়া শ্রীভগবানের সহিত প্রীতিসংস্থাপন করা। আর অনুগা ভজন মানে আপনি মধ্যস্থ হইয়া, গোপীর সহিত শ্রীভগবানের প্রীতি সম্পাদন করিয়া, আপনার ভগবৎ প্রেম বৃদ্ধি করা। একটি প্রত্যক্ষ ভজনের নিবেদন শ্রবণ করুন।

নিশিদিন তোমার বিরহে ব্যাকুল প্রাণ।
হে মোর হরি, তৃষিত চাতকী সমান॥

এই গীতে সাধক তান্‌সেন বলিতেছেন যে, "হে ভগবান! যেমন চাতকিনী দিবানিশি জল জল করে, তেমনি আমার প্রাণ দিবানিশি তোমার লাগি ব্যাকুল।" ভগবানে এত পিপাসা অবশ্য গাঢ় প্রেম হইতে হয়, আর যাঁহার এরূপ পিপাসা আছে, তিনি তাহা শ্রীভগবানকে নিবেদন করিতে পারেন, অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ ভজনের অধিকারী। কিন্তু এতখানি পিপাসা যাঁহার নাই, তিনি যদি ঐরূপ বলেন, তবে তাঁহার ভজন হয় না, ভণ্ডামি হয়। সেই জন্য কান্তাভাবে প্রত্যক্ষ ভজন, বলিতে কি, একবারে উঠিয়া গিয়াছে। এই প্রত্যক্ষ ভজন করিতে গিয়া আউল বাউলের কদর্য্য পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে কোন কোন বৈষ্ণব শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহারা গোপীর প্রেম পাইলেন না, সুতরাং গোপীর দেহ অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণ লীলার রস প্রত্যক্ষ রূপে আস্বাদ করিতে গিয়া আপনারা রাধা কৃষ্ণ সাজিলেন, সাজিয়া আপনারা রাস লীলা আরম্ভ করিলেন, ইহাতেই ভাগবত সেবা স্থানে ইন্দ্রিয় সেবা প্রবেশ করিল।

প্রত্যক্ষ ভজনের পরিবর্ত্তে গোপী অনুগা ভজন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। গোপী অনুগা ভজন কিরূপ বলিতেছি। কৃষ্ণ মথুরায় যাইতেছেন, গোপীরা রথচক্র ধরিয়া, যাইতে দিবেন না, কেহ অশ্বের সম্মুখে শয়ন করিয়া আছেন। বলিতেছেন, নাথ! যাবে ত আমার বুকের উপর দিয়া যাও। এইরূপে গোপীগণ প্রাণপণ করিয়া কৃষ্ণকে যাইতে দিতেছেন না। এই যে একটি চিত্র তোমার হৃদয় পটে অঙ্কিত করিলে, ইহাতে তুমি কেহ নহ, একজন দর্শক মাত্র। কিন্তু তবু তুমি সম্যক রূপে সেই গোপীদের যে প্রেম তাহার আস্বাদ পাইতেছ। এ চিত্র হৃদয়ে দেখিলে তুমি বিগলিত হইবে। মনে ভাব তুমি মাথুরের গীত শুনিতেছ, ইহাতে শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণ বিরহ বেদনা বর্ণিত আছে। তোমার তাহা শুনিয়া নয়নে জল আসিবে, কেন? তুমি ত রাধা নহ, তুমি ত আর কৃষ্ণ-বিরহে প্রপীড়িত নও, তবু তুমি বিগলিত

হইবে, কেন? মনে ভাব প্রভাসের গীত শুনিতেছ, আর যশোমতী বলিতেছেন, "আয় গোপাল দেখা দিয়ে প্রাণে বাঁচা" তাহা শুনিয়া তোমার চক্ষে জল আসিবে কেন? তুমি ত যশোমতী নও। ইহাকে বলে গোপী অনুগা ভজন। তুমি রাধার কান্ত ভাবে ভজন ধ্যান করিতে করিতে সেই কান্ত ভাবের আস্বাদ পাইবে। তুমি যশোদার বাৎসল্য প্রেমের চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া, সেই বাৎসল্য প্রেমের কিছু আহরণ করিবে, এই রূপে গোপী ভাবে শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি আহরণ করাকে গোপী অনুগা ভজন বলে। বৈষ্ণবগণ এইরূপে গোপী অনুগা ভজন করিয়া তাঁহাদের প্রেম ও ভক্তি অর্জ্জন করিয়া থাকেন। ইহা আর কোন ধর্ম্মে নাই।

মনে ভাব অতি রনাল একটি প্রেম ঘটিত গল্প যোজনা করিতে হইবে। তাহা হইলে তাহার কি কি প্রকরণ প্রয়োজন?

ইহার প্রকরণ, একটি সুন্দর নাগর ও সুন্দরী নাগরী। একটি সঙ্কেত স্থান, একটি মিলন স্থান, ইত্যাদি। একট নাগর ও নাগরী হঠাৎ এক স্থানে দেখা হইল, হইয়া উভয়ের হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর হইল। পরে দুতী যাইয়া মধ্যস্থ করিলেন, না পরে তাঁহারি সাহায্যে উভয়ের মিলন হইল। হয়ত আর একটি প্রতিদ্বন্দী উপস্থিত হইলেন। তাহাতে ঈর্ষার সৃষ্টি হইল, পরে মান হইল, মানের পরে কলহ, কলহের পরে অনুতাপ ও আবার মিলন। এইরূপে সেই গল্প নানা রস দ্বারা সুস্বাদ করা যায়।

আরো শুনুন। তাহার পরে বিচ্ছেদ ঘটিল। পরস্পরে দেখা সাক্ষাৎ স্থগিত হইল, নাগর ক্রন্দন করেন, নাগরী ক্রন্দন করেন, পরে আবার মিলন হইল।

মনে করুন শকুন্তলার কাহিনী। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার দেখা সাক্ষাৎ হইল, সখীগণ দৌত্য করিলেন, মিলন হইল, বিচ্ছেদ হইল, ঘোর বিরহ উপস্থিত হইল, পরে মিলন হইল। এই কাহিনী পড়িতে পড়িতে পাঠক, নাগর ও

নাগরীর সহিত সহানুভূতি করিয়া কান্দিবেন, হাসিবেন ইত্যাদি। পাঠকের নাগর ও নাগরীর প্রতি অনিবার্য্য আকর্ষণ হইবে, অনেক দিন তাহাদিগকে ভুলিতে পারিবেন না। এইরূপে যদি শকুন্তলার কাহিনী লইয়া চর্চ্চা করিতে থাকো, তবে ক্রমে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা তোমার হৃদয় কিয়ৎ পরিমাণে অধিকার করিবেন।

দুষ্মন্ত রাজার স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ও শকুন্তলার স্থানে রাধাকে স্থাপিত কর, তাহা হইলে কৃষ্ণলীলা হইল। এই লীলা আস্বাদন করিতে করিতে সাধক কৃষ্ণপ্রেম আহরণ করিবেন, তাঁহার রাধা কৃষ্ণের প্রতি অনিবার্য্য আকর্ষণ হইবে। এইরূপ করিতে করিতে রাধাকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের সঞ্চার হইবে। মহাজনগণ জীবের নিমিত্ত বহুতর শ্রীকৃষ্ণ লীলা রাখিয়া গিয়াছেন। তুমি ইচ্ছা কর তবে কল্পনার দ্বারা উহা পরিবর্দ্ধন করিতে পারো, কি কল্পনার দ্বারা নূতন কৃষ্ণলীলা গঠন করিতে পারো। তুমি যদিও কল্পনা করিয়া লীলা সাজাইবে, কিন্তু তুমি উহা হইতে সম্পূর্ণরূপে ফলভোগী হইবে। যেমন, যদিও শকুন্তলার কাহিনী কল্পনার সৃষ্টি, তবু উহার আলোচনায় উহার নাগর নাগরীর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। শ্রীকালাচাঁদ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিতেছেন ঃ—

তথাস্তু তথাস্তু	বলিলেন মাধবে।
যে খেলা খেলিবে	মোদের পাইবে ॥
খেলিবে তোমরা	যাহা লয় মনে।
নিশ্চয় তাহাতে	রব দুই জনে ॥
কল্পনা করিয়া	খেলা সাজাইবে।
আমার বরেতে	সব সত্য হবে ॥

অর্থাৎ শ্রীকালাচাঁদ ভক্তগণকে এই বর দিতেছেন যথা—"তোমরা আমাকে ও শ্রীমতী রাধাকে লইয়া খেলা করিও। এই খেলা তোমরা

কল্পনা বলে প্রস্তুত করিও, কিন্তু যদিও তোমরা কল্পনা দ্বারা খেলা সাজাইবে, তবু আমি আর শ্রীমতী সেই খেলায় থাকিব।" মনে ভাব তুমি গ্রীষ্মকালে মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে কুসুমাসনে বসাইলে, বামে শ্রীমতীকে বসাইলে, সম্মুখে নৃত্যকারী ময়ূর রাখিলে, রাখিয়া উভয়কে বায়ু ব্যজন করিতে লাগিলে। কালাচাঁদ বলিতেছেন, এরূপ যদি তোমরা কর, তবে এই ছবিটি আমরা সত্য করিব। অর্থাৎ আমরা প্রকৃতই সাধকের সম্মুখে কুসুমাসনে বসিয়া তাহার বায়ু ব্যজনরূপ উপহার গ্রহণ করিব। এই যে কালাচাঁদ গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বর, ইহার ভিত্তিভুমি, গীতা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমাকে যে, যেরূপ ভজনা করে আমি তাহাকে সেইরূপ ভজনা করিয়া থাকি। যদি শ্রীভগবান থাকেন, আর ভজন থাকে, তবে এ তত্ত্বটি সত্য। যদি শ্রীদুর্গা বলিয়া শ্রীভগবানকে ভজনা কর, তবে তিনি তোমার নিকট দুর্গা হইবেন। তুমি নিরাকার উপাসনা কর, তবে তোমার নিকট তিনি নিরাকার, তুমি নাস্তিক তোমার কাছে তিনি নাই। তুমি রাধাকৃষ্ণরূপে যুগল উপাসনা কর, তিনি তোমার কাছে রাধাকৃষ্ণ হইয়া তোমাকে ভজনা করিবেন। গীতার বাক্যের তাৎপর্য্য এই।

এইরূপে ভক্তগণ এই যে বিশ্বস্রষ্টা ভগবান, যিনি অপরিমেয়, তাঁহার সঙ্গ করিয়া থাকেন ও ক্রমে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণে লোভের সৃষ্টি ও পরিশেষে কৃষ্ণপ্রেম আহরণ করেন। যখন আমরা ব্রাহ্ম ছিলাম, তখন আমরা ঈশ্বরকে ইহা বলিয়া নিবেদন করিতাম, "হে ঈশ্বর আমি পাপী তুমি দয়াময় তুমি আমার পাপ মার্জ্জনা কর।" এইরূপ প্রার্থনা প্রত্যহ করিতাম, কারণ আমাদের আর কোন কথা কহিবার ছিল না। খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি ধর্ম্ম যাচকগণ এই এক রূপ প্রার্থনা চিরদিন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের মুখে ঐ এক কথা, কারণ মায়াতীত জ্ঞানাতীত, নিরাকার ঈশ্বরের সহিত আর কোন কথা হইতে পারে না। কিন্তু যিনি প্রকৃত সাধক, তিনি ভগবানের

নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না, তিনি তাঁহাকে চান। শ্রীকালাচাঁদ গীতায় এক গোপী শ্রীভগবানকে বলিতেছেন ঃ—

মোদের সবারে পুতুল গড়িয়া।
খেলা কর তুমি যা তোমার হিয়া॥
কখন ভাঙ্গিছ কখন গড়িছ।
এই মত দিবা রজনী খেলিছ॥
এই মত মোরা তু তুহারে লয়ে।
খেলিব সকলে যাহা চাহে হিয়ে॥
কখন মিলাব কখন ছাড়াব।
কখন দুজনে কলহ করাব॥ ইত্যাদি।

অর্থাৎ ভক্তের প্রার্থনা এই যে আমরা তোমাকে দেখিব, দিবা নিশি তোমার সঙ্গে থাকিব, তোমার সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিব, তোমার কাছে শিখিব, তোমার সহিত কথা কহিব, আমোদ করিব, কলহ করিব ইত্যাদি অর্থাৎ তোমাকে পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা আস্বাদ করিব, আর তাহা হইলেই আমাদের অনিবার্য্য পিপাসা মিটিবে। তাই ভগবান উত্তরে বলিলেন, তুমি আমাকে যেরূপ ভজনা করিবে আমিও তোমাকে সেইরূপ ভজনা করিব। তুমি আমার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতে চাও, আমিও তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিব। তুমি ইষ্টগোষ্ঠী করিবে আমিও করিব ইত্যাদি।

এইরূপ ভজনে ভক্তগণ সেই মাধুর্য্যময় শ্রীভগবান, সেই শ্যামসুন্দর, সেই বনমালী, সেই নটবর, সেই রসরাজকে খেলার সঙ্গী করিতে পারেন। যাঁহারা ওতপ্রোত জগদ্ব্যাপী নিরাকার পরমেশ্বরকে ভজনা করেন, তাঁহারা বড়লোক, তাঁহাদের স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু মূর্খ গোপিনীগণ বলেন যে—

হৃদ্ সিংহাসনে রসের বালিস।
শুয়ে তাহে নাথ ঘুচাও আলিস ॥

অর্থাৎ তোমাকে হৃদয়ে করিয়া শয়ন করিব, যেমন স্ত্রীলোকে পতিকে কি উপপতিকে লইয়া করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রস, গৌণ সাত ও মুখ্য চারি প্রকার। গৌণ সাত যথা হাস্য প্রভৃতি। এই সমুদায় রস দ্বারা কিরূপে ভজনা করা যায়, পরে বলিতেছি। মুখ্য যে চারি রস অর্থাৎ দাস্য সখ্য ইত্যাদি ইহার আভাস দিয়াছি। আর বোধ হয় ইহার তথ্য, ভক্তগণ বেশ বুঝিয়াছেন।

রস উদ্দীপনের নিমিত্ত দুই বস্তুর প্রয়োজন, যথা—নায়ক ও নায়িকা বা ভগবান ও ভক্ত। আপনারা জানেন নায়ক ও নায়িকা কত প্রকারের আছেন। নায়ক সুন্দর আছেন, কি ধীর আছেন, কি পণ্ডিত আছেন ইত্যাদি। কেহ নায়িকার বশ, কেহ স্বাধীন প্রকৃতির ইত্যাদি। এখন শ্রীকৃষ্ণকে ইহার একটি নায়ক করিয়া বিচার করা যাউক।

যদি শ্রীকৃষ্ণ নায়ক হইলেন, তবে আদৌ আমরা তিন প্রকারের শ্রীকৃষ্ণ পাইতেছি, যথা—প্রথম বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ, ইনি কি রূপ, না বনমালী, সরল, প্রেমভিখারী, প্রেমিক ইত্যাদি। দ্বিতীয় মথুরার শ্রীকৃষ্ণ। ইনি মহাজ্ঞানী, ক্ষমতাশালী, দণ্ডধারী শাসন কর্ত্তা রাজা। তৃতীয় দ্বারকার কৃষ্ণ। ইনি মহা সংসারী, স্ত্রী, পুত্র, পৌত্র, পিতা, মাতা, ভগিনী প্রভৃতি পরি-বেষ্টিত। যদিও তিন জনেই শ্রীকৃষ্ণ, তথাচ তাঁহাদের প্রকৃতি অনেক বিভিন্ন। কাজেই ইঁহাদের ভজন সেইরূপ পৃথক পৃথক। শ্রীরাধিকার ভজনীয় যে ব্রজের কৃষ্ণ, তাঁহার যে ভজন, তাহা মথুরায় কৃষ্ণের হইতে পারে না। শ্রীমতী রাধিকা তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম দিয়া প্রেমভিক্ষা করেন। ইঁহার আর কোন সাধ নাই, ভজন নাই। তিনি কৃষ্ণকে কি বলিয়া নিবেদন করিতেছেন শ্রবণ কর—

দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে, চাঁদ মুখ না দেখিলে,
মরমে মরিয়া আমি থাকি।
দুই বাহু পশারিয়া, হৃদি মাঝে আকর্ষিয়া,
নয়নে নয়নে তোমায় রাখি॥

শ্রীমতী রাধা যেরূপ নায়ক প্রার্থনা করেন, বনমালী কি কালাচাঁদ ঠিক তাই। ইঁহার হাতে দণ্ড নাই, বাঁশী; মাথায় পাগ নাই, চূড়া। অর্থাৎ বনমালী, শাসন কি দণ্ড করেন না, মুগ্ধ করেন; আর কোন কাজ নাই, কেবল গোপীগণ লইয়া প্রেমানন্দে ভোগ করা।

শ্রীমতীর মনে বিশ্বাস হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন, এই ভাব মনে উদয় হওয়ায় উল্লাসে বলিতেছেন ঃ—

আমার আঙ্গিনায় আওবে যবে ও রসিয়া।
পালটি চলব হাম ঈষৎ হসিয়া॥

অর্থাৎ শ্রীমতী, শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন এই আনন্দে সখীকে বলিতেছেন, সখি! কৃষ্ণ যখন আমার আঙ্গিনায় আসিবেন, তখন আমি কি করিব বল দেখি? "আমি একবার তাহার প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া যাইব।" এখন পরাৎপর পরমেশ্বর সম্বন্ধে কি ঐরূপ ভজনা করা যায় যে, সেই নিরাকার পরম ঈশ্বর যখন আমার বাড়ী আসিবেন, তখন আমি ঈষৎ হাসিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া চলিয়া যাইব? তা হইবে না, সে একবারে বাতুলের কার্য্য হইবে। আমরা এখনি দেখাইব যে, এরূপ ভাবোল্লাস কুব্জার সম্ভবে না, রুক্মিণীরও সম্ভবে না, এই রস দ্বারা কেবল ব্রজের কৃষ্ণকে ভজনা করা যায়। অতএব যেরূপ নায়ক, ভজন প্রণালীও তাহার উপযোগী হওয়া চাই, নতুবা সে ভণ্ডামী হইবে। যাঁহারা পরাৎপর পরমেশ্বরকে নিবেদন করিবেন, তাঁহাদের উহা আর এক রসের সাহায্যে করিতে হইবে। মথুরায় কি দ্বারকায় শ্রীমতী নাই।

তাহার পরে মথুরার শ্রীকৃষ্ণ। ইনি রাজ্যেশ্বর, ইঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। ইঁহার নিকট যদি কিছু চাহিতে হয়, তবে মথুরাবাসিগণ ঐশ্বর্য্য চাহিবেন, প্রেম নহে; ঐশ্বর্য্যই তিনি দিয়া থাকেন। মথুরাবাসিগণ প্রেমের ধার ধারেন না। আর কিনা তিনি অপরাধীকে দণ্ড ও মার্জ্জনা করিতে পারেন। ব্রজের গোপীর প্রার্থনা বা নিবেদন উপরে দিয়াছি। এখন মথুরাবাসীর প্রার্থনা শ্রবণ করুন। এটি বিদ্যাপতির গীত :—

"মাধব হে, বহুত মিনতি করি তোমায়।"

আমি, দিয়ে তুলসী তিল, এ দেহ সমর্পিল,
দয়া করি না ছাড়িবে আমায়॥
গণইতে দোষগুণ, গুণলেশ না পাওবি,
যবে তুমি করিবে বিচার।
তুমি জগন্নাথ, জগতে বলাইয়াছ,
জগ ছাড়া নহি মুই ছার॥

বিদ্যাপতি বলিতেছেন, "শ্রীকৃষ্ণ! আমি তুলসী তিল দিয়া আমার এই দেহ তোমার পাদ পদ্মে একবারে সমর্পণ করিলাম, আমাকে ত্যাগ করিও না। অবশ্য যখন তুমি দোষ গুণ বিচার করিবে, তখন তুমি আমার কোন গুণ পাইবে না। কিন্তু তুমি জগতের নাথ, আমি তোমার সেই জগতে বাস করি, আমাকে তুমি একবারে ত্যাগ করিতে পার না।"

উপরে দুই প্রকার কৃষ্ণ দেখাইলাম, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণ দুই প্রকার নহেন। শ্রীকৃষ্ণ মোটে এক প্রকার, তবে সাধক ভেদে তিনি পৃথক হয়েন। যিনি বলেন, হে কৃষ্ণ আমার পাপ মার্জ্জনা কর, তাহার কৃষ্ণ দণ্ডধারী, তিনি বংশীধারী হইলে চলিবে না। আর যিনি বলেন, তোমাকে হৃদয়ে ধরিয়া নয়নে নয়নে রাখি, তাহার কৃষ্ণ আর ঐশ্বর্য্যশালী পাগবান্ধা হইতে পারেন না, তাহার কৃষ্ণ রাখাল রাজা ইত্যাদি।

যাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট কেবল প্রেম-ভক্তি ভিক্ষা করেন, তাঁহারা ব্রজবাসী। তাঁহাদের লীলাময় সুন্দর ঠাকুরের প্রয়োজন। যাঁহারা শ্রীভগবানের নিকট পাপ মার্জ্জনা, মুক্তি প্রভৃতি, কি কোন আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য যথা, অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি কামনা করেন, তাঁহারা মথুরার লোক, তাঁহাদের ঠাকুর সুন্দর হউন, কি কুৎসিত হউন, নিরাকার হউন, কি তেজোময় হউন, ইহাতে আইসে যায় না। যাঁহারা শুদ্ধ সাংসারিক উন্নতি কি বিপদ হইতে উদ্ধার কামনা করেন, তাঁহারা দ্বারকার লোক। তাঁহাদের ঠাকুরও যেরূপই হউন, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

শাক্ত মহাশয়গণের শ্রীদুর্গা যেরূপ বৈষ্ণবগণের দ্বারকার কৃষ্ণ সেইরূপ। দুর্গা পূজাতে সাধক প্রার্থনা করেন, ধনং দেহী, পুত্রং দেহী ইত্যাদি। দ্বারকার কৃষ্ণও সেইরূপ, ধনবর, পুত্রবর ইত্যাদি দিয়া থাকেন। অতএব যাঁহারা নিরাকারবাদী, অথচ বলেন ঈশ্বরের প্রেম সর্ব্বোচ্চ সাধনা, তাঁহাদের কথায় মিল নাই। কারণ ঠাকুর লীলাময় বিগ্রহ না হইলে, সাধকের প্রেম হইতে পারে না ও ভগবানের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী চলে না। অনেকে এই শেষের তত্ত্ব না মানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের সহিত তর্ক করিতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। তবে এই মাত্র বলি যে, কোনও সময়ে আমরা সরল ভাবে নিরাকার ঈশ্বরকে ভজনা করিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহার নিকটে যেসিতে পারি নাই, তিনি চিরদিন সমান দূরে ছিলেন।

আবার নাগর উপরি উক্ত তিন প্রকার কেন, বহু প্রকারের হইতে পারেন। এমন কি, ব্রজের, কি মথুরার, কি দ্বারকার কৃষ্ণেরও নানারূপ আছে, ইহা ক্রমে দেখাইতেছি।

সাতটী গৌণ রস যথা—হাস্য, বীর, করুণ, অদ্ভুত, বিভৎস, রৌদ্র ও ভয়ানক।

১। হাস্য। ইহার অবলম্বন শ্রীকৃষ্ণ, উদ্দীপক কৃষ্ণের বিদূষক।

ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে মধুমঙ্গল নামক একটী বিদূষক দিয়াছেন। ইনি একটী ব্রাহ্মণ যুবক, অত্যন্ত পেটুক, দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষুধার যন্ত্রণার কথা বলেন। বড়াইকে দেখিয়া ডাকিনী ভাবিয়া ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়েন। কখন বা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিদূষক হয়েন। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বিদূষক সাজাইয়া তাঁহার ভক্তগণ আনন্দে আকুল হয়েন।

২। বীর। বৈষ্ণবগণের মধ্যে যাঁহারা বীর রস দ্বারা ভজনা করেন, তাঁহাদের ঠাকুর সাধারণতঃ নৃসিংহ বা রামচন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে [illegible] কখন কখন ভক্তগণ বীররসে মোহিত হয়েন, কিন্তু যাঁহারা শক্তি উপাসক তাঁহাদের বীররসই প্রধান অবলম্বন। যেমন শুম্ভ, নিশুম্ভ কালিকা ইত্যাদি।

৩। করুণরস। ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে কান্দাইয়া থাকেন, কখন নিজেও আর্দ্র করিয়া থাকেন। দুই একটি উদাহরণ শ্রবণ করুন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইবেন, আর বৃন্দাবনে আসিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলেন। যশোমতী নানা কুচিন্তায় ব্যাকুলিত হইতে লাগিলেন। [illegible] সখীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন; যথা —পদ

দুদিনের তরে, যাবে মথুরানগরে,
যাবার বেলা কেন কান্দিল ?

বলিতেছেন, "সখি! মথুরায় কৃষ্ণ গেল, কালি আসবে বলিয়া গেল, তবে যখন আমাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হয়, তখন কান্দিল কেন?" কথা এই শ্রীকৃষ্ণ জানেন যে, তিনি আর আসিবেন না। আর এই কথা জননীর নিকট গোপন রাখিয়াছেন। কিন্তু যখন জননীর নিকট বিদায় হয়েন, তখন ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না, কান্দিয়া ফেলিলেন। অবশ্য ভক্তগণ এই লীলা মনে করিয়া দ্রবীভূত হয়েন।

শ্রীভগবান্ কিরূপ স্নেহশীল, প্রেমকাঙ্গাল, তাহার আর একটি কাহিনী শ্রবণ করুন। ভক্তেরা এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের করুণ হৃদয় বর্ণনা করিয়া ভক্তিতে

গদগদ হয়েন। দেবকী কৃষ্ণকে বাড়ীর ভিতর ডাকাইয়া আনিয়াছেন। কৃষ্ণ অন্তঃপুরে আসিয়া একটি আসনে বসিলেন। তাঁহার সম্মুখে, পাত্রে যথেষ্ট ননী আছে। দেবকী তাহার একটু ননী হাতে লইয়া বলিতেছেন, "কৃষ্ণ! আমি শুনিয়াছি যে সেই গোয়ালা মাগী যশোদা নাকি তোমাকে ননী খাওয়াইত। আর তুমি নাকি তাহা বড় ভালবাসিতে। আজ আমি তোমাকে সেইরূপ ননী খাওয়াইব।" এই কথা বলিয়া ননী লইয়া কৃষ্ণের মুখে দিতে গেলেন, আর শ্রীভগবানের বদন একবারে আন্ধার হইয়া গেল। কারণ তখন তাহার দুঃখিনী জননীর ও তাঁহার প্রেমের কথা মনে পড়িল। শ্রীকৃষ্ণের কোমল হৃদয় ও ঔদার্য্য দেখাইবার আর একটী মাত্র কাহিনী বলিব।

মুনিগণের মধ্যে বিচার হইতেছে, কে বড়, মহাদেব, ব্রহ্মা, না কৃষ্ণ? ইহার সাব্যস্ত করার ভার পাইলেন ভৃগুমুনি। তিনি অগ্রে ব্রহ্মার ওখানে গেলেন। ব্রহ্মা তাহাকে আদর করিলেন, আর ভৃগু তাঁহাকে গালি দিতে লাগিলেন। ইহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে আইলেন, পরে নারদের অনুরোধে তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। ভৃগু পরে মহাদেবের ওখানে গমন করিলেন, যাইয়া "তুমি ভাঙ্গ খোর উলঙ্গ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য" ইত্যাদি বচনে তাহাকে অভিবাদন করিলেন। মহাদেব ত্রিশূল লইয়া ভৃগুকে বধ করিতে আইলেন। আর ভগবতী তাঁহার হাত ধরিলেন।

পরে শ্রীকৃষ্ণের ওখানে আইলেন। আসিয়াই তাঁহার হৃদয়ে পদাঘাত করিলেন। অমনি শ্রীকৃষ্ণ অতি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া ভৃগুর হাত দুখানি ধরিয়া অতি নম্র হইয়া বলিতে লাগিলেন, "মুনিবর! আমার অপরাধ ক্ষমা কর, অবশ্য তোমাকে আমি উপযুক্ত সমাদর করি নাই। আমার কঠিন হৃদয়ে তোমার কোমল পদ অতিশয় ব্যথা পাইয়াছে।" ইহা বলিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া লক্ষ্মীর সঙ্গে সেবা করিতে লাগিলেন, সেই

ভৃগুপদচিহ্ন শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে একটি অতি সুন্দর শোভা হইল। ভক্তগণ গদগদ হইয়া বলিয়া থাকেন যে, শ্রীকৃষ্ণের যত ভূষণ আছে তাহার মধ্যে ভৃগুপদচিহ্ন সর্ব্বপ্রধান।

৪ অদ্ভুত। এই রসের দ্বারা প্রধানতঃ নিরাকারবাদিগণ ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা নিরাকারবাদী তাঁহারা নাস্তিক হইতে এক সিঁড়ি উপরে। তাঁহাদের ভগবানের সহিত যে ইষ্টগোষ্ঠী, তাহা কেবল তাঁহার সৃষ্টিপ্রক্রিয়া লইয়া, সুতরাং তাঁহারা অদ্ভুতরসের সাহায্যে ভগবানকে উপাসনা করিয়া থাকেন। একটী কীট এত ক্ষুদ্র যে, চক্ষে দেখা যায় না, কিন্তু যন্ত্রে দেখা গেল যে, যদিও এত ক্ষুদ্র, তবু তাহার জীবনযাত্রা দিব্য চলিতেছে। অমনি ভক্ত বলিলেন, অদ্ভুত! অদ্ভুত! বিজ্ঞানবিৎ বলিলেন, এক সেকেণ্ডে একটী ধূমকেতু সহস্র সহস্র ক্রোশ ভ্রমণ করে। অমনি ক্ষুদ্র জীব একবারে শ্রীভগবানের শক্তি দেখিয়া মোহিত হইলেন।

গৌণ রসের মধ্যে বীর, রৌদ্র, বীভৎস, অদ্ভুত, দ্বারা শক্তি উপাসকগণ (যাঁহারা কালী, তারা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি শক্তির উপাসনা করেন) এইরূপে শ্রীভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানের মাধুর্য্য উপাসক, সুতরাং তাঁহাদের গৌণরসের মধ্যে হাস্য আর করুণ ব্যতীত অন্য রসের সাহায্য প্রয়োজন হয় না। শক্তি উপাসকগণ শ্রীভগবানকে ভজনা করিতে এ সমুদায় অভদ্র রসের কেন আশ্রয় লয়েন, তাহা ঠিক আমরা বলিতে পারি না।*

---

* শক্তি উপাসকগণ সাধন দ্বারা কুলকুণ্ডলিনী, যিনি নিদ্রিত আছেন, তাঁহাকে জাগরূক করেন। বৈষ্ণবগণ ইহাকে বলেন শ্রীমতীর কৃপা লাভ করা, কি প্রেমলাভ করা। যাঁহারা কুলকুণ্ডলিনী জাগরূক করেন, তাঁহারা অষ্টসিদ্ধি পায়েন। যাঁহারা শ্রীমতীর কৃপালাভ করেন, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেম পায়েন।

মনে ভাবুন, শ্রীভগবানের গলে মুণ্ডমালা, শিরোভূষণ সর্প ইত্যাদি। বিভৎসরস শ্রীভগবানের ভজনায় কি রূপে প্রবেশ করিল বলিতে পারি না। বিভৎস কি রৌদ্ররস দ্বারা যে শ্রীভগবানের ভজনা হইতে পারে ইহা আপাততঃ মনে ধরে না। কিন্তু আমরা চক্ষে দেখিতেছি, ভগবানের গলায় মুণ্ডমালা, গাত্রে মনুষ্যরক্ত ইত্যাদি। তবে বিভৎসরস দ্বারা প্রকৃত ভজনা হয় না সে ঠিক। যাঁহারা এইরূপ ভজনা করেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য শ্রীভগবান-প্রেমাহরণ নয়, শক্তি কি সিদ্ধিলাভ করা। বোধ হয় সেই নিমিত্ত তাঁহাদের ভদ্র কি অভদ্র রস বিচারের প্রয়োজন হয় নাই।

ফলে এ প্রস্তাব বাড়াইবার আর আমাদের ইচ্ছা নাই। রসশাস্ত্রের মর্ম্ম আমরা ভাষা কথায় প্রকাশ করিতেছি। যাঁহারা ইচ্ছা করেন শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বল নীলমণি পড়িতে পারেন। আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, প্রভু গম্ভীরা-লীলায় যে সমুদায় রসের চর্চ্চা করেন, তাহারই আলোচনা করি। এখানে মাথুরের পালা দিব, যাহার দ্বারা অনেকগুলি রসের মর্ম্ম প্রকাশ পাইবে।

ভক্তগণের ভজন সুবিধার নিমিত্ত কৃষ্ণলীলা দ্বারা অনেকটি পালা বিভক্ত হইয়াছে। যথা---পূর্ব্বরাগ, মিলন, মান, মাথুর, নৌকাখণ্ড, দানখণ্ড। এই সমুদয় প্রভু আপনি আচরিয়া জীবকে দেখাইয়াছেন। কতক নদীয়ায়, কতক নীলাচলে ও কতক গম্ভীরায়। নদীয়ায় মাথুর, দান ও নৌকাখণ্ড, নীলাচলে রাস ও নন্দোৎসব, ও গম্ভীরায় প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ ও মান। দানখণ্ড চন্দ্রশেখরের বাড়ী কৃষ্ণযাত্রার দিবস দেখান হয়। নৌকাখণ্ড তাহার পরে ও মাথুর সন্ন্যাসের কিছু পূর্ব্বে আপনার বাড়ীতে। নীলাচলে যে রাস রস প্রকাশ করেন, তাহা পাঠক পূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন। তবে এ সমুদায় আবার গম্ভীরায় আরো পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া ছিলেন।

এখন মাথুরের পালা একবার আলোচনা করুন। শ্রীনবদ্বীপে প্রভু মাথুরের পালা আরম্ভ করেন, তাহার পদ শ্রবণ করুন :—

অক্রূর অক্রূর বলি পুন পুন ধাবই
ভাবই পুরব পিরীত।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ, লই যাও হে
ডারি মোরে শোকের কূপে।
কো পুন বারণ. বোলে নাহি ঐ ছন
সব জন রহল নিচুপে॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ প্রভু অক্রূর এসেছেন বলিয়া কান্দিয়া আকুল। বলিতেছেন. "হে অক্রূর, আমার প্রাণনাথকে কোথায় লইয়া যাও আমাকে শোকে ডুবাইয়া ?" আবার সঙ্গিগণকে বলিতেছেন, "তোমরা যে চুপ করে রহিলে, কথা কও না, কৃষ্ণকে যে নিয়া গেল দেখছ না ?" ইত্যাদি।

এইরূপ নৌকাখণ্ডের ও দানখণ্ডের পদ দ্বারা জানা যায় প্রভু ঐ সমুদায় কিরূপে প্রকাশ করেন। রাখালরাজ মথুরার রাজা হইয়াছেন, সেখানে তাঁহার নিকট ব্রজের গোপীগণ গিয়াছেন। দেখেন, কৃষ্ণ রাজা হইয়া বসিয়া আছেন। গোপীগণ বলিতেছেন, যথা গীত :—

রাজসেবা বাস ভাল ব্রজ ভাল লাগে না।
(আমরা) অবোধিনী গোয়ালিনী ভজন সাধন
(শ্লোক শাস্ত্র) (তন্ত্র মন্ত্র) জানি না।

অর্থাৎ হে ভগবান, তুমি কি রাজসেবা ভালবাস, তাহা যদি হয়, আমাদের উপায় কি ? আমরা মুর্খ, কাঙ্গাল, আমরা রাজসেবা কোথা পাব ? আমরা বক্তৃতা দ্বারা, কি শ্লোক দ্বারা, কি রাজভোগ অর্থাৎ ভাল বসনভূষণ দ্বারা কিরূপে তোমার সেবা করিব ? পরে শুনুন :—

রতনে জড়িত তুমি কি দিব তার তুলনা।
(আমরা) কাঙ্গালিনী বনে থাকি হীরা মতি চিনি না॥

আমাদের রাজপাট কদম্বতলা, সে বনের রাজা চিকণ কালা,
বংশীসিংহাসনে রসের বালিশ, শোয়াতাম তাকি জানি না।
ব্রজে আমরা সবাই সরল আমরা লৌকিকতা জানি না।

এই গেল শ্রীভগবানকে রসের দ্বারা ভজনা করা। গোপীরা বলিতেছেন, ছি! তোমার চরিত্র কি? লোকে তোমাকে খোসামোদ করে, তাই তুমি ভুলে যাও? তোমাকে হীরামুক্তা দেয়, আর তাই তুমি আদর করে লও? কিন্তু আমাদের যে সরল ভালবাসা, তাহা তোমার ভাল লাগে না? ছি!

ইহা শুনিয়া সভাসদগণ হাসিলেন, কৃষ্ণও সঙ্গে মধুর হাসিলেন, কারণ তিনি সভাসদগণকে গোপীর মহিমা দেখাইতেছেন। এই স্বার্থপর অসরল সভাসদগণ স্তুতি বাক্যে বড় মজবুত। স্বার্থ সাধন নিমিত্ত মুখে কেবল দয়াময়, দয়াময় করিতেছেন। মুখে পাপ পাপ বলিয়া দৈন্যতা দেখাইতেছেন, কেননা রাজাকে তুষ্ট করিয়া কিছু স্বার্থ সাধন করিবেন। গোপীগণের ঠিক উহার বিপরীত, তাঁরা কিছুই করেন না। পরে গোপিনীগণ আবার বলিতেছেন—যথা পদঃ—

দে দে দে মোদের চূড়া দে।
(চূড়াত মথুরার নয়) (চূড়াত আমাদের দেওয়া)
চূড়ায় মথুরা ভুলবে না।
চূড়া দে মুরলী দে (শুন রাজেশ্বর হে)
আমাদের পিরীতি, ফিরায়ে দে।

জীব চিরদিন শ্রীভগবানকে রাজি রাজেশ্বর বলিয়া ভজনা করিয়াছেন। আপনারা দেখিবেন জগতের ভগবান এইরূপ।

ব্রজগোপীগণ প্রথমে তাঁহার রাজমুকুট কাড়িয়া লইলেন, লইয়া চূড়া দিলেন, হাতের দণ্ড কাড়িয়া লইয়া মুরলী দিলেন। এখন মথুরায় তাঁহাকে রাজবেশ, রাজ-পদে দেখিয়া গোপীগণ কাজেই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেছেন। বলিতেছেন, তুমি যদি রাজা হবে, তবে চূড়া মুরলী আর আমাদের পিরীতি ফিরায়ে দাও। কারণ উহাতে ত তোমার আর প্রয়োজন নাই। যেহেতু মথুরার লোক বাঁশীতে ভুলিবে না। তাহারা প্রেম চাহে না। যাহাদের সর্ব্বদা ভয়, ভগবান তাঁহাদের উপর রাগ করিবেন, তাঁহার বিগ্রহ করিলে তিনি রাগ করিবেন, তাঁহার বিগ্রহ আছে বলিলে তিনি রাগ করিবেন, করজোড় করিয়া কথা না বলিলে রাগ করিবেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাহারা শ্রীভগবানকে একটু প্রীতি করেন, তাঁহারা তাঁহার বদনে গাম্ভীর্য্য দেখিলে সেটা অস্বাভাবিক ভাবিয়া বড় ক্লেশ পায়েন। কারণ তাঁহাদের ভগবান হাস্যময়, রসিক, করুণাময়, স্নেহশীল, প্রেমের কাঙ্গাল।

এখন শ্রবণ করুন, গোপীগণ তাহার পরে শ্রীভগবানকে কেমন বিদুষক সাজাইলেন। ব্রজগোপীগণ আবার বলিতেছেন, হে রাজরাজেশ্বর, আমরা তোমাকে ব্রজে ধরিয়া লইয়া যাইব। কারণ আমরা বুঝিতেছি যে এই অসরল স্বার্থপর স্থানে তোমার একটুও আরাম নাই।

সভাসদগণ। তোমরা পল্লীগ্রামের লোক, তায় আবার তোমরা মূর্খ, তোমরা বলিতে পার যে ত্রিলোকের অধিপতিকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু তোমাদের প্রাণে ভয় নাই? যাহার ইচ্ছায় এই ত্রিলোক নষ্ট হয়, আর তাঁহাকে এরূপ অপমান বাক্য বলিতেছ?

গোপী। আপনারা রাজাকে ভয় করেন, আমরা ভয় করি না, কারণ আমাদের কোন প্রার্থনা নাই। আমরা জানি উহার যে ক্রোধ, সে হাস্যময়, তাহাতে ধার নাই। বিশেষতঃ তিনি নিজহাতে

এক দাসখত লিখিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে যে, আমাদের যে প্রধানা শ্রীমতী, তাঁহার নিঃস্বার্থ প্রেমের জন্য তিনি তাঁহার দাস হইলেন। সেই খতের বলে, আমরা শ্রীমতীর দাস কে ধরিয়া লইয়া যাইব।

শ্রীকৃষ্ণ। বোধ হয় এ তোমরা মিথ্যা কথা বলিতেছ। আমি দাসখত লিখিয়া দিয়াছি, ইহা ত আমার স্মরণ হয় না।

গোপী। এই দেখ তোমার দাসখত। ইহাতে তোমার স্বাক্ষর আছে।

কৃষ্ণ। তোমরা যে মিথ্যাবাদী তাহা এই এক কথায় ধরা পড়িয়াছ। আদৌ আমি দস্তখত করিতে জানি না। সে অতি লজ্জার কথা, সন্দেহ নাই। কিন্তু লেখা পড়া শিখিতে আমার সুবিধা হয় নাই। বৃন্দাবনে গরু রাখিতাম, পাঠশালায় যাইবার সময় কোথা? তবু একবার গিয়াছিলাম, কিন্তু বেশী দূর শিখিতে পারি নাই। প্রথম আখর ক হইতে বেশ শিখিলাম, তাহার পরে যখন খ য়ে আইলাম, তখনি গণ্ডগোল বাঁধিয়া গেল। একটার আঁকড় ডাহিনে, একটার বাঁয়ে, এই আমার গোল বাধিয়া গেল। কোন ক্রমে ঠিক করিতে পরি না, কোনটা "ক," কোনটা "খ"।

তাহার পরে এখন রাজা হইয়াছি, লেখা পড়া শিখিবার আর এখন প্রয়োজন নাই।

কৃষ্ণ যাত্রার, উপরে যে কাহিনী বলিলাম, তাহার অভিনয় হইয়া থাকে। কৃষ্ণ উপরের কথাগুলি অতি গাম্ভীর্য্যের সহিত বলেন। তিনি বলেন কিনা, "আমি শ্রীভগবান, ক আর খ ঠিক করিতে না পারিয়া বর্ণমালা শিখিতে পারিলাম না। আর তখন দর্শক সভাসদগণ হাস্য রসে ও ভক্তিতে মুগ্ধ হয়েন, অথচ শ্রীভগবানের প্রতি তাঁহাদের অতিশয় আকর্ষণ বাড়ে।

এই কাহিনীর শেষ বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। গোপীগণের সহিত

মথুরার রাজা শ্রীকৃষ্ণের যখন এইরূপ বাক্য বিতণ্ডা হইতেছে, তখন কুব্জা তাঁহার রাণী, তাঁহার বামে বসিয়া এ সমুদয় শুনিতেছেন। তিনি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী ভাবিতেন; কারণ তিনি রাজরাজেশ্বরের রাণী। সুতরাং যখন মলিনবসনা গোপীগণ আসিয়া কৃষ্ণের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, তখন তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। ভাবিলেন মহারাজের এই সমুদয় নীচ লোকের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করা তাঁহার উচ্চপদের উপযোগী নয়। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় যে, মথুরাবাসিগণকে গোপীগণের মহিমা দেখাইবেন। প্রকৃতই কুব্জা উহা দেখিয়া একেবারে মোহিত হইলেন, এমন কি তাঁহার পুনর্জন্ম হইল। তখন তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া কৃষ্ণের অগ্রে, দাঁড়াইয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, যথা—পদ :—

এই নিবেদন, শ্রীনন্দের নন্দন, ও বংশীবদন।
যে ধনে পিয়াসী আমি, সে ধন কর বিতরণ ॥
কিবা তন্ত্র কিবা মন্ত্র, জানি না হে রাধাকান্ত,
এ দাসীরে না হইও ভ্রান্ত।
কোরো নাহে অন্য যুক্তি, চাইনা কিছু মোক্ষ মুক্তি,
ও চরণে থাকে ভক্তি সেবাতে নিযুক্ত মন।
যেন, জন্ম হয় গোপকুলে, বৃন্দাবনে বসতি।
রাধাকৃষ্ণ মনাভীষ্ট হইনা যেন বিস্মৃতি ॥
কিঞ্চিত করি যাচিঞা, তব নেত্র ভ্রূভঙ্গে।
চিরদিন থাকি যেন সঙ্গে ॥
শ্রীরাধারে লয়ে বামে, বসবে যখন নিধুবনে,
কৃপা করি এ অধিনীর মাথায় দিও শ্রীচরণ ॥

মথুরার রাজা কৃষ্ণ; দৈবকী নন্দন, দণ্ডধারী বলিয়া, বিখ্যাত, কিন্তু

কুব্জা তাঁহাকে তখন নন্দের নন্দন বংশীবদন বলিয়া নিবেদন করিতেছেন, অর্থাৎ কুব্জা সম্মুখের কাণ্ড দেখিয়া একেবারে ব্রজের গোপীভাব পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ একটু হাসিয়া বলিতেছেন, তুমি বৃন্দাবনে থাকিতে চাও সেখানে ত বসন ভূষণ নাই, তাহারা সকলে অতি দরিদ্র। বিশেষতঃ দেখিলে ত তাহারা পল্লীগ্রামের লোক, তাহাদের জ্ঞানের লেশ মাত্র নাই।

কুব্জা। আমাকে আর বঞ্চনা করিবেন না। আমি বুঝিয়াছি, আমি হতভাগ্য, আর তাঁহারা ভাগ্যবতী। আমি যথেষ্ট ধন পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহারা ধনীকে পাইয়াছে। আমি ধন পাইয়াছি ধনীকে পাই নাই পাইবার চেষ্টাও করি নাই।

উপরের কাহিনীতে অনেক তত্ত্ব নিহিত আছে। যথা,—প্রথমতঃ তত্ত্ব এই যে, রসাশ্রয়ে কিরূপ শ্রীভগবানকে ভজনা করা যায়। দ্বিতীয়, ভজনা মানে কি। তৃতীয়, মথুরা ও ব্রজের ভজনের বিভিন্নতা কি। ইত্যাদি।

নবম অধ্যায়।

মান।

এইরূপ মানের পালা আলোচনা করিলে নানা রসের আস্বাদ পাওয়া যায়। উহা এখন বর্ণনা করিব। শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ, তাঁহার অনুগত নাগরী অগণন। আর তাঁহাদের সকলের সর্ব্বস্ব তিনি, কাজেই মান হইবার কথা। মনে ভাবুন,' শ্রীকৃষ্ণের উপর মান করায় গোপীগণকে তত অপরাধ দেওয়া যায়না। কারণ, মানের ভিত্তিভূমি প্রেম। যেখানে প্রেম সেখানে মান। না, ভাল বলিলাম না, যেখানে মান, সেখানে প্রেম জানিবেন। যে নায়িকা কৃষ্ণের উপর ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিতে চাহেন, কি তাঁহাকে কটু বলেন, তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে প্রমাণ করে যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিতান্ত অনুগত। কি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রাণ।

গম্ভীরায় প্রভু বসিয়া আছেন, বদন অতি প্রফুল্ল। সরূপ, রাম রায় মনে মনে ভাবিতেছেন যে, প্রভু, না জানি কি ভাবে বিভাবিত। এমন সময় প্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া বলিলেন,' "সখি! বড় শুভ সংবাদ, অদ্য শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন, শীঘ্র তাঁহার আয়োজন কর।" এখন, 'প্রিয়তম', রজনীতে নায়িকার মন্দিরে আসিতেছেন, তাঁহার অভ্যর্থনার 'আয়োজন' কি? তাহার আয়োজন শয্যা প্রভৃতি। প্রভু বলিতেছেন, "শীঘ্র কুসুমচয়ন কর, চন্দন চূয়া সংগ্রহ কর। মালতীর মালা গাঁথ। দেখ সখি! শ্রীকৃষ্ণ বড় পাখীর গীত ভাল বাসেন, বৃন্দাবনে শুক সারিকে সংবাদ দাও। তাহারা এই কুঞ্জ ঘিরিয়া বসুক।

বন্ধু আইলে তাহারাই অগ্রে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবে। আর ময়ূর ময়ূরীর নৃত্য নিতান্ত প্রয়োজন।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া প্রভু আবার বলিতেছেন, "আমি আর তোমাদিগকে কি বলিব, তোমরাত জানো। কৃষ্ণ আসিতেছেন তাঁহার উপযুক্ত বাসক শয্যা কর।" ইহাকে বলে বাসক শয্যা। ইহার একটি গীত শ্রবন করুন।

শ্রীমতী বলিতেছেন :—

সুখের রাতি, জ্বালহে বাতি,
মন্দির কর আলা।
কুসুম তুলিয়া, বোটা ফেলি দিয়া,
গাঁথহে মালতী মালা॥
অগুরু চন্দন, কুসুম আসন,
সপুষ্প লবঙ্গ ডাল।
শুভ আলিপনা, কুসুম বিছানা,
গাঁথহে কদম্ব মাল॥
যমুনার বারি, পূরি হেম ঝারি,
রাখহে শীতল করি।
পিক শুক সারী, ডাক ত্বরা করি,
নিকুঞ্জে বসুক ঘেরি॥

হে কৃষ্ণ-প্রাণ গোপীভাবে অভিভূত পাঠক! এইরূপ হৃদয় মাঝারে বাসক সজ্জা করিয়া, বন্ধুর নিমিত্ত বসিয়া থাকিও। তিনি আইলেও পারেন, না আইলেও পারেন। কিন্তু আসুন আর না আসুন উভয়েতেই তুমি আনন্দ পাইবে, এবং কিছু প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে।

সরূপ, প্রভুর ভাবের সহানুভূতি করিয়া বলিতেছেন, বেশ! আমরা

বীণার স্বর বান্ধি। কিন্তু শ্রীমতি! সর্ব্বাগ্রে তোমার বেশভূষা করা উচিত। তোমাকে এমন ভুবনমোহিনী সাজাইব যে, বন্ধু একবারে মোহিত হইবেন। প্রভু (রাধাভাবে), "না না আমাকে সাজাইতে হইবে না। আমার ত সর্ব্বাঙ্গে ভূষণ রহিয়াছে। আর ভূষণের স্থান কোথা? ভূষণে আদৌ আমার প্রয়োজন নাই। যথা পদ —

শ্যাম পরশ মণি, সখি তা কি জান না।
সে অঙ্গ পরশে আমার এ অঙ্গ সোণা॥*

প্রভু বলিতেছেন "যাহার পরশমণির পরশ হয়েছে, তাহার আবার ভূষণের কি প্রয়োজন? তোরা ত জানিস আমি ছিলাম লোহা, আর তিনি পরশ করিয়া আমাকে সোণা করিয়াছেন।" স্বরূপ বলিলেন, "তবু নয়নে, হস্তে, কর্ণে, বদনে, সকল স্থানে ভূষণ দিয়া তোমাকে সাজাইব।" প্রভু বলিতেছেন, "আমার গলার ভূষণ ত আছে, সে শ্যাম নামের হার।" যথা পদ —

আমি পরেছি শ্যাম নামের হার।
হস্তের ভূষণ আমার চরণ সেবন।
বদনের ভূষণ আমার শ্যাম গুণ গান।
কর্ণের ভূষণ আমার নাম শ্রবণ।
নয়নের ভূষণ আমার রূপ দরশন॥
যদি তোরা সাজাবি মোরে।
কৃষ্ণ নাম লেখ আমার অঙ্গ ভরে॥

প্রভুর মুখে একটু দুঃখের ছায়া দেখিয়া স্বরূপ বুঝিলেন যে, কৃষ্ণের আসিতে বিলম্ব হওয়া তাঁহার সহিতেছে না। তাই সে ভাব ফিরাইবার নিমিত্ত এই গীতটি গাইলেন।

---

* এই পদটী প্রভুর নিজের বলিয়া খ্যাত।

আমার আঙ্গিনায় আওবে যবে রসিয়া।
পালটি চলব হাম ঈষত হাসিয়া॥

প্রভুকে বলিতেছেন, "কেমন সখি তাহাই করিতে পারিবে তো?"

প্রভু প্রকৃতই একটু মধুর হাসিলেন! বলিতেছেন, "ভাই! ও সব তোমাদের কাজ, আমার ওসব চপলতা ভাল আইসে না। তবে আমি—

গাঢ় আলিঙ্গনে, ঘন ঘন চুম্বনে,
ঘুচাইব হৃদয়ের তাপ।"

"কৃষ্ণ এখনি আসিবেন ব্যস্ত হইও না" এই যে সখীর আশ্বাস বাক্য, ইহাকে বলে বিপ্রলব্ধা। কিন্তু প্রভুর মুখে আবার দুঃখের ছায়া দেখা দিল। শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন না। প্রভু ক্রমে ক্রমে উদ্বিগ্ন হইতেছেন। শেষে, মৃদু স্বরে উহু উহু আরম্ভ করিলেন। এই "উহু উহু" ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। শেষে নানা প্রকারে আপনার ক্লেশ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, স্বরূপ ধরিয়া বসাইলেন। বলিতেছেন, "সখি কই, কই তিনি?" স্বরূপ বলিতেছেন, "ধৈর্য ধর, এই এলেন বলে।"

প্রভু বলিলেন, "তবে আমি একটু নিদ্রা যাই", ইহা বলিয়া স্বরূপের জানুতে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু আবার তখনি উঠিলেন, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। বলিতেছেন,—"সখি! কই? কই, তিনি কই। তিনি কি আসিবেন না? সখি! আমার সেই চন্দ্রবদন কোথা, সখি! কোথা আমার চিত্তচোর, কোথা আমার রাসবেহারি, কোথা আমার নৃত্যকারী।" ইহাই বলিতে বলিতে রোদন করিতে লাগিলেন। স্বরূপ নানারূপে প্রবোধ দিতেছেন। প্রভু একবার উঠিতেছেন, একবার বসিতেছেন, একবার শয়ন করিতেছেন, একবার উকি মারিতেছেন। একবার বাহিরে যাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। পরিশেষে সহস্র সহস্র বৃশ্চিক কর্তৃক দষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। হে গোপীভাবে

অভিভূত পাঠক মহাশয়! কৃষ্ণের আসিতে বিলম্ব হইলে ঐরূপ অধৈর্য্য হইও, তাহা হইলে তিনি আর বিলম্ব করিবেন না। ইহাকে বলে উৎকণ্ঠিতা। প্রভুর তখন কি দশা হয়েছে; না,—

"পড়ে পাতের উপরে পাত,
ঐ এল প্রাননাথ"

বলিয়া চমকাইয়া উঠিতেছেন। কোন একটি শব্দ হইলেই অমনি ঐ বুঝি এলেন, বলিতে লাগিলেন। পরে কৃষ্ণ আসিবার ভরসা গেল, তখন, যথা চণ্ডীদাসের পদ:—

দুকান পাতিয়া, ছিল এতক্ষণ,
বঁধু পথ পানে চাই।
পরভাত নিশি, দেখিয়া অমনি,
চমকি উঠিল রাই॥
পাতায় পাতায়, পড়িছে শিশির,
সখিরে কহিছে ধনি।
বাহির হইয়া, দেখলো সজনী,
বঁধুর শবদ শুনি॥
পুন কহে রাই, না আসিল বঁধু,
মরমে রহিল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব, পাষানে ধরিয়া,
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা,
সেয বিছাইনু ফুলে।
সব হইল বাসি, আর কেন সই,
ভাসাগে যমুনা জলে॥

তুমি শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত, আয়োজন করিয়া পরে যখন তিনি আইলেন না, দেখিয়া রাগ করিয়া বাসি ফুল ফেলিয়া দিতে পারিবে, তখন রসিক শেখর শ্রীমতীকে যাহা করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে স্তুতি বাক্য বলিয়াছিলেন, তোমাকে ততদূর না করুন সেইরূপ কিছু করিবেন।

হে পাঠক! রসের ভজন-শিক্ষা কিরূপ তাহা প্রভু আপনি আচরিয়া দেখাইয়াছেন। ক্ষুদ্র জীব শ্রীভগবানকে "রক্ষমাং পাহিমাং" বলিয়া ভজন করিয়া থাকে। এখন দেখুন সেই জীব আপন ভাবিয়া তাঁহার প্রতি ক্রোধ করিয়া তাঁহাকে কিরূপ ভজন করিতেছেন। প্রভু তখন সুমুখে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন, দেখিয়া বলিতেছেন "ঐ দেখ আসিতেছেন" অমনি বদন প্রফুল্ল হইল। মনে ক্রোধ ছিল, আনন্দে উহা ভাসিয়া গেল। তখন চুপে চুপে সরূপকে বলিতেছেন, "ঐ দেখ, বন্ধু বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া ভয়ে ভয়ে আসিতেছেন। আসিতে সাহস হইতেছে না।" তখন শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "এসো বন্ধু তুমি সচ্ছন্দে এসো, আমি রাগ করিব না। যে দুঃখে রজনী কাটাইয়াছি তাহা আমার প্রাণ জানে। বল দেখি রজনী কোথা বঞ্চিলে?" আবার বলিতেছেন, "একি! তোমার বদনে তাম্বুলের দাগ কেন? ওমা, এ আবার কি ভয়ানক! তোমার বদনে দংশনের দাগ কেন? বুঝেছি, তুমি আমাকে বঞ্চিয়া আর কোথায় ছিলে। আর সেই পাপিয়সী আপনার সুখের নিমিত্ত তোমার বদনে দন্তাঘাত করিয়াছে। ছি! ইহা বলিয়া প্রভু মুখ ফিরাইয়া বসিলেন, অর্থাৎ রাধা মান করিলেন।

এখানে চণ্ডীদাসের যে পদ আছে, তাহা দিতে ইচ্ছা করিতেছে। ইহাতে সখীগণ শ্রীভগবানকে, কিরূপ বিদ্রূপ করিতেছেন তাহা বর্ণিত আছে। এই রসকে খণ্ডিতা বলে।

ছাড়হে চাতুরী ও নাগর রতি চোর।
জানি জানি জানি তুমি মদনে বিভোর।
কোন ধনি উঠাইল নব অনুরাগ।
চুম্বনে দেওল (চাঁদ বদনে) তাম্বুল দাগ।

তাহার পরে বিদ্রুপের ছটা দেখুন। তাই চণ্ডীদাস প্রভুর এত প্রিয়, তাই অনেকে বলেন, জগতে চণ্ডীদাসের ন্যায় কবি আর জন্ম গ্রহণ করেন নাই।

শুন শুন বঁধু তোমায়, বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও, তোমার চাঁদমুখ চাই॥
আই আই পড়েছে মুখে, কাজলের শোভা।
ভালে সে সিন্দুর বিন্দু মুনি মনলোভা॥
হাদে হে নিলাজ বঁধু, লাজ নাহি বাস।
বিহানে পরের বাড়ী, কোন লাজে এস॥
সাধিলে মনের সাধ, যে ছিল তোমারি।
দূরে রহ দূর রহ প্রণাম হামারি॥
কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি।
কে কোথা শিখালে তারে, এ হেন পিরীতি॥
বড় দুঃখ পাইয়াছ, যামিনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া॥

দেখুন, পরাৎপর-পরমেশ্বর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয়-অধীশ্বরের, লাঞ্ছনা দেখুন। ভাল, তিনি কি এইরূপ বিদ্রূপে রাগ করেন? আপনি বলেন কি? চণ্ডীদাস শেষে এই অতুল কবিতার অতুলন সমাপ্তি করিয়াছেন। যথা :—

বড় দুঃখ পাইয়াছ রজনী জাগিয়া।
চণ্ডীদাসের হিয়ায় শোও হে আসিয়া॥

চণ্ডীদাস বড় চতুর, এই উদ্‌যোগে শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে পুরিবেন। প্রভু বলিতেছেন, সখি, উঁহাকে যেতে বল! আমি উঁহাকে চাহি না। প্রভু, রাধাভাবে মান করিয়া ক্রোধে কৃষ্ণের কথা বন্ধ করিয়া সখীকে বলিতেছেন, আমি উঁহাকে চাহি না। আমি তাহা হইলে মরিব, বলিতেছ? বেশ, তা মরি মরিব, সেও ভাল; এরূপ নাগর আমি চাই না। প্রভু তখন দেখিতেছেন, যেন কৃষ্ণ জয়দেবের শ্লোক, অর্থাৎ মুঞ্চময়ীমানমনিদানং, পড়িয়া তাঁহাকে তুষিতেছেন। তখন কৃষ্ণকে বলিতেছেন, তুমি এই জয়দেবের শ্লোক যেখানে রজনী বঞ্চিয়াছ সেখানে যাইয়া পড়, এখানে কেন?

পরে কৃষ্ণ, কোন ক্রমে শ্রীমতীর ক্রোধ শান্তি করিতে না পারিয়া কান্দিতে কান্দিতে চলিয়া গেলেন, তখন "কলহাঁন্তরিতা" রসের সৃষ্টি হইল। কৃষ্ণ গেলে, তখন শ্রীমতী অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, যথা—

"সখি, যাবার বেলা কেন্দে গেল।
আরত ফিরে নাহি এলো॥"

পূর্ব্বে মাথুর লীলার কথা বলিয়াছি। এখন মান লীলার কথা বলিলাম। ইহা ব্যতীত অন্যান্য লীলার আভাস দিতেছি যথা, আপনি কাণ্ডারী হইয়া ব্রজগোপীকে পার করিতেছেন। গোপীগণ কূলে দাঁড়াইয়া কাণ্ডারীকে বলিতেছেন

আমাদিগে পার করে দে।
ও সুন্দর নেয়ে হে। ধ্রু।
আমাদের, বেলা গেল সন্ধ্যা হলো
আমাদের বিকি কিনি সারা হলো।
আমরা বাড়ী যাব নিয়ে চল।

মোদের পারের কড়ি দিবার নাই।
পার কর বাড়ী যাই। ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীনিতাই যখন গৌড়ে প্রচার করেন, তখন বলিয়া বেড়াইতেন. "আমাদের, গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান খেওয়া বয়।"

অর্থাৎ হে জীব! আমাদের প্রভুর ঘাটে দান অর্থাৎ পারের কড়ি লাগে না।

পরে আর একটি লীলা, দানখণ্ড। গোপীগণ বৃন্দাবনে যাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পথ আগুলিয়া দাঁড়াইলেন। বলিতেছেন, তোমরা বৃন্দাবনে

শ্রীকৃষ্ণ। তবে তোমরা আপনাকে সমর্পণ কর।

শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে, বৃন্দাবনে যাইতে হইলে অগ্রে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। এইরূপে কীর্ত্তন করিয়া, ভক্তগণ নানা রসে শ্রীভগবানের সঙ্গ করিয়া থাকেন। কখন কাণ্ডারী ভাবে, কখন মহাদানী ভাবে, কখন নানাবিধ নাগর ভাবে তাঁহাকে ভজন করেন। ভক্ত, সঙ্গীতজ্ঞ-কবিগণ এই সমুদয় চিত্তহর কীর্ত্তন সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই বলরাম দাস শ্রীগৌরাঙ্গকে বলিয়াছেন :—

সাধন কণ্টকীপথে ফুল ছড়াইল।

অর্থাৎ মহাপ্রভু ভজন সাধন অতি সুখকর করিয়া দিয়াছেন।

কৃষ্ণলীলার কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। এ সব কি সত্য হইয়াছিল, না কল্পনার সৃষ্টি? যে ভাগ্যবানেরা শাস্ত্র মানেন, তাঁহারা বলেন, সব সত্য হইয়াছিল। যাঁহারা না মানেন, তাঁহারা বলেন এ সমুদয় কল্পনার সৃষ্টি। কিন্তু পূর্ব্বের কথা স্মরণ করুন। এই সমুদায় লীলা শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের নিমিত্ত, তাঁহার সহিত সঙ্গ করিবার নিমিত্ত। অতএব

ইহা সত্য কি কল্পিত তাহাতে আইসে যায় না। বিবেচনা কর, মান লীলা। ইহা আলোচনা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে নানা ভাবে সাজাইয়া তাঁহার সহিত বহুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করা যায়। আর ওরূপ ইষ্টগোষ্ঠী করার ফল, কৃষ্ণপ্রেম যাহা জীবের পরমপুরুষার্থ। সব লীলার উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করা, আর ভগবান্ লীলাময় না হইলে তাঁহার সহিত এরূপ ইষ্টগোষ্ঠী করা যায় না।

কিন্তু যদি প্রকৃতই এই সমুদায় লীলা ভক্তগণের সৃষ্ট হয়, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ, প্রভু সমুদায় কৃষ্ণলীলা সাক্ষী দিয়া উহা য়োছেন।

দশম অধ্যায়।

প্রভুর অবস্থা।

গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়, জাগিয়া রজনী পোহায়।
খেনে, খেনে করয়ে বিলাপ, খেনে রোয়ত খেনে খেনে কাঁপ।
খেনে ভিতে মুখ শির ঘসে, কই নাহি রহু পহু পার্শে।
খেনে কান্দে তুলি দুই হাত, কোথায় আমার প্রাণনাথ।
নরহরি কহে মোর গোরা, রাইপ্রেমে হলো মাতোয়ারা॥

শ্রীভগবানের প্রেম জীবের সর্ব্বাপেক্ষা বহু মূল্য ধন। [illegible] দেখি যে, সে প্রেম কেবল শ্রীমতী রাধার আছে, আর শ্রীগৌরাঙ্গ আপনি আচরিয়া জীবকে দেখাইয়া গিয়াছেন। যখন সার্ব্বভৌম প্রথমে প্রেমে অচেতন প্রভুকে দেখিলেন, তখন মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রে যে ভগবৎপ্রেমের কথা শুনিয়াছি, তাহা তবে সত্য। প্রভু এ পর্য্যন্ত যে কঠোর জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়াছিল, কিন্তু তিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে আর তাহা রহিল না। যখন প্রভু দক্ষিণ হইতে নীলাচলে আইলেন, তখনও তাঁহার পদতল পদ্ম ফুলের মত, আর তাঁহার অঙ্গ দিয়া চিরদিন যেমন হইত সেইরূপ পদ্মগন্ধ বাহির হইতেছিল। রামচন্দ্র পুরী আসিয়া প্রভুর ভোজন কমাইয়া দিলেন। প্রভু অগ্রে একপ্রকার উপবাস করিতেছিলেন, ভক্তগণের অনুরোধে তাহা ছাড়িয়া অর্দ্ধভোজন আরম্ভ করিলেন। প্রভু অর্দ্ধ ভোজন করিয়া প্রাণ রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অতিশয় দুর্ব্বল হইলেন। বাসুদেবের পদ এই :—

সিংহদ্বার ছাড়ি গোরা সমুদ্র পথে ধায়।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সবারে সুধায়॥

অতি দুরবল দেহ ধরা নাহি যায়।
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়॥
দীঘল শরীরে গোরা পড়ে মুরছায়।
উত্তান নয়ন মুখে ফেণ বহি যায়॥
চৌদিকে ভকতগণ কান্দিয়া ভাসায়।
বাসুদেব ঘোষের হিয়া বিদরিয়া যায়॥

এই একটী পদ বিচার করিয়া দেখুন, তাহা হইলে ভগবৎ প্রেম কাহাকে বলে, তাহা কতক বুঝা যাইবে। মন্দিরের সিংহদ্বার ছাড়িয়া প্রভু সমুদ্র পথে চলিলেন। যাইতে সম্মুখে একজনকে দেখিলেন। দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই কৃষ্ণ কোথা বলিতে পার? সে প্রথমে অবাক্, পরে কান্দিয়া ফেলিল। কান্দিল কেন বলিতেছি। প্রভুর মুখের ভাব দেখিয়া তাহার একটী অবস্থার কথা মনে পড়িল। পুত্র এই মাত্র মরিয়াছে, জননী পাগলিনী হইয়া ছুটাছুটি করিতেছেন, আর যাঁহাকে পাইতেছেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমার অমুক কোথা দেখিয়াছ, বলিতে পারো? তাহার মুখে যেরূপ অবর্ণনীয় দুঃখের চিহ্ন দেখা যায়, প্রভুর মুখেও সেইরূপ দুঃখের ছায়াবৃত। সেই পুত্রশোকাকুলি মাতার প্রশ্নে লোকে যেরূপ কান্দিবে, এ সেইরূপ, সেই লোকটি প্রভুর প্রশ্নে কান্দিল। প্রভু দেখেন সম্মুখে আর একজন, আবার তাহাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেও কান্দিল। প্রভু এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে লোককে কান্দাইতে কান্দাইতে চলিয়াছেন, প্রভুর বদনে ঘোর বিয়োগের রেখা পড়িয়াছে। গলা শুষ্ক হইয়াছে, কথা বলিতে পারিতেছেন না।

এদিকে শরীর অতিশয় দুর্ব্বল, এমন দুর্ব্বল যে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে হয়। অতি দীর্ঘ, তাহাতে অতি দুর্ব্বল, হাটিতে কাঁপিতেছেন। হৃদয়ে বিষের ন্যায় জ্বালা, কাজেই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, কাজেই

মূর্চ্ছায় অভিভূত হইয়া লম্বা হইয়া পড়িয়া গেলেন। দেবচক্ষু হইয়াছে, নয়নতারা ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস একপ্রকার নাই, হৃদয়ে স্পন্দন নাই, মুখ দিয়া ফেণ বহিয়া পড়িতেছে, আর কণ্ঠে ঘরঘর শব্দ হইতেছে। বাসুদেব বলিতেছেন, সে দৃশ্য দেখিয়া সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ইহাঁর কথা বটে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কৃষ্ণপ্রেম কাহাকে বলে, তাহা আমাদের প্রভু জগতে দেখাইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ উপরে ঐ চিত্রটি দেখাইলাম।

বিবেচনা করুন যাঁহার ভগবানে এত প্রেম, ভগবান যদি নিতান্ত নিষ্ঠুর না হয়েন, তবে তিনি এরূপ ভক্তের অনুগত হইবেন। এইরূপ আর একটি লীলার আভাস পূর্ব্বে বলিয়াছি, অদ্য বিবরিয়া বলিতেছি। রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহার স্তবাবলীতে এই লীলাটি এইরূপ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একদিন প্রভু মন্দিরে দর্শনে গিয়াছেন। দ্বারি আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দনা করিল। অমনি প্রভু তাহাকে বলিতেছেন, "হে সখে, আমার প্রাণকান্ত কৃষ্ণ কোথা, তাঁহাকে আমায় শীঘ্র দেখাও।" উন্মাদের ন্যায় এইরূপ বলিলে, সরস্বতী, মূর্খ দ্বারীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে এইরূপ বলাইলেন, যথাঃ—প্রভু আপনি আসুন, আপনার প্রিয়তমকে শীঘ্র দর্শন করাইতেছি। দ্বারী ইহা বলিলে, প্রভু অমনি তাহার হাত ধরিলেন, ধরিয়া বলিলেন, তবে চল আমাকে লইয়া তাঁহাকে দেখাও। দ্বারী তাঁহাকে জগন্নাথের সম্মুখে লইয়া চলিল, যাইয়া বলিল, ঐ দেখুন আপনার প্রাণকান্ত।

পুত্র যাঁহার প্রাণ, এরূপ জননী, তাহার সেই পুত্র জীবন ত্যাগ করিলে ক্ষণকালের নিমিত্ত উন্মাদ হইতে পারে, এমন কি তাহার এমন ভ্রমও হইতে পারে যে, নিকটস্থ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে, আমার সেই অমুক কোথা, তাহাকে দেখেছ? এমন শোকাকুল জননীও পোরে

কিছুকাল পরে সান্ত্বনা লাভ করিবে, করিয়া সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। প্রভুর এই যে "আমার কৃষ্ণ কোথা," এই অন্বেষণে চিরজীবন গিয়াছে, আর যত অন্বেষণ করিয়াছেন, তত এই তল্লাসস্পৃহা বাড়িয়া গিয়াছে। ইহাকে বলে কৃষ্ণপ্রেম। প্রভু যেরূপ কৃষ্ণপ্রেম দেখাইয়াছেন, এমন প্রেম কেহ কোন কালে কাহারও নিমিত্ত দেখাইতে পারেন নাই। স্ত্রী স্বামীর নিমিত্ত নয়, জননী পুত্রের নিমিত্ত নয়। কোন কবি এরূপ প্রেম কল্পনা করিতেও শক্ত হন নাই।

উপরে দেখিবেন, নরহরির পদে, ভিতে মুখ ও শির ঘসার কথা আছে। এই শির ঘসা লীলা ভক্তগণ ভাল বাসেন না। তাঁহাদের ইচ্ছা এই যে প্রভু এ লীলা না করিলে পারিতেন। এ লীলার কিরূপে সৃষ্টি হয় শ্রবণ করুন। স্বরূপ একদিন প্রাতে দেখেন যে, প্রভুর নাসিকা ক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতেছে। তখন ব্যথিত হইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি? ইহা কিরূপে হইল? প্রভু একটু লজ্জিত হইলেন। স্বরূপের ভাব দেখিয়া ভয়ও পাইলেন। বলিলেন, উদ্বেগে গৃহের বাহিরে যাইতে চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না, দ্বার তল্লাস করিয়া বেড়াই, ঘোর অন্ধকার দ্বার পাই না, তাই নাসিকাতে আঘাত লাগিয়া ক্ষত হইয়াছে।

কথা এই, প্রভু কৃষ্ণবিরহে জর জর। তিনি স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। ঘরের মধ্যে অস্থির হইয়া বেড়াইতেছেন। কোথা যাবেন, কি করিবেন, কোথা যাইয়া বিরহ যন্ত্রণা থেকে শান্তি পাইবেন, এই তখনকার চেষ্টা ও মনোভাব। চরিতামৃত বলেন :—

এইমত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা বাক্য হা হা হুতাস॥
কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলী বদন॥

কাহারে কহিব কথা কেবা জানে দুঃখ।
ব্রজেন্দ্র নন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥

এই গেল প্রভুর সহজ অবস্থার কথা। দিবানিশি হা হুতাস, দিবানিশি অস্থির, শান্তিহীন। রাত্রিতে তাঁহাকে শয়ন করাইয়া ভক্তগণ নিজ নিজ স্থানে গিয়াছেন। ভক্তগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গমন করিলে, হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, অমনি কৃষ্ণ বিরহ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, অমনি উঠিয়া বসিয়াছেন, ইচ্ছা হয়েছে বাহিরে গমন করেন। সেই চেষ্টা করিতেছেন, দ্বার পাইতেছেন না, নাসিকায় আঘাত লাগিয়া ক্ষত হইয়াছে।

এখন অগ্রে বিচার করুন, প্রভুর যে কৃষ্ণবিরহ ইহা কি সত্য না কাল্পনিক? যদি কৃষ্ণবিরহ তাঁহার প্রকৃত না হইয়া অভিনয় হইত, তবে নাসিকায় আঘাত লাগিত না। যেরূপ, কোন রঙ্গভূমিতে প্রভু সাজিয়া কৃষ্ণবিরহ দেখাইবার নিমিত্ত যদি কেহ ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইত, তবে তাহার নাসিকায় কখন আঘাত লাগিত না। কিন্তু যদি সত্য কৃষ্ণবিরহ হয়, তবে ত নাসিকায় আঘাত লাগিবারই কথা, আঘাত না লাগাই আশ্চর্য্য। কথা এই, প্রভুর নাসিকায় যে আঘাত ইহাই অব্যর্থ প্রমাণ যে, প্রভুর কৃষ্ণবিরহ সত্য, কাল্পনিক নয়, আর এই আঘাত একটি পরিমাপক যন্ত্রের কার্য্য করিতেছে, অর্থাৎ প্রভুর কৃষ্ণবিরহ কতখানি, এই ক্ষত দ্বারা তাহার কতক পরিমাণ পাওয়া যাইতেছে।

যখন স্বরূপ নাসিকা ক্ষত হইবার কারণ শুনিলেন, তখন উপায় স্থির করিলেন। সেই অবধি প্রভুকে আর একাকী শয়ন করিতে দেওয়া হইত না। প্রভুর পদতলে শঙ্কর সেই গম্ভীরায় শয়ন করিতেন। প্রভু একখানি পাথরে শয়ন করিতেন। আর শঙ্কর প্রভুর পদ দুখানি আপনার হৃদয়ে রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন। সেই শঙ্করের একটি পদ শ্রবণ করুন।

* কৃষ্ণবিরহে প্রভুর কিরূপ অবস্থা হয়েছিল, তাহা এই ভক্তগণ, যাঁহারা দিবানিশি সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহাদের দ্বারা জানা যায়।

সে যে মোর গৌরকিশোর।
মুরছি মুরছি পড়ে ভকতের কোর॥
সোণার বরণ তনু হইল মলিন।
দেখিয়া ভকতগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ॥
বচন না নিঃসরে সে চাঁদ বদনে।
অবিরল ধারা বহে অরুণ নয়নে॥
কান্দে সহচরগণ গৌরাঙ্গ বেড়িয়া।
পাষাণ শঙ্কর দাস না যায় মরিয়া॥